রবীন্দ্র রচনাবলী

দশম খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দশম খণ্ড

বিশ্বভারতী

২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

সূচী

চিত্রসূচী	।৶০
কবিতা ও গান	
উৎসর্গ	৩
খেয়া	৯৩
নাটক ও প্রহসন	
রাজা	১৯১
উপন্যাস ও গল্প	
শেষের কবিতা	২৬৯
প্রবন্ধ	
রাজা ও প্রজা	৩৭৭
সমূহ	৪৮৫
পরিশিষ্ট	৫৩৩
গ্রন্থ-পরিচয়	৬৪৩
বর্ণানুক্রমিক সূচী	৬৬৭

চিত্রসূচী

আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ ৭
'খেয়া'র পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা ১২৪

কবিতা ও গান

উৎসর্গ

রেভারেণ্ড সি. এফ. এণ্ড্রুজ

প্রিয়বন্ধুবরেষু

শান্তিনিকেতন

১লা বৈশাখ

১৩২১

আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ

উৎসর্গ

১

ভোরের পাখি ডাকে কোথায়
ভোরের পাখি ডাকে।
ভোর না হতে ভোরের খবর
কেমন করে রাখে!
এখনো যে আঁধার নিশি
জড়িয়ে আছে সকল দিশি
কালিবরন পুচ্ছ-ডোরের
হাজার লক্ষ পাকে।
ঘুমিয়ে-পড়া বনের কোণে
পাখি কোথায় ডাকে!

ওগো তুমি ভোরের পাখি,
ভোরের ছোটো পাখি।
কোন্ অরুণের আভাস পেয়ে
মেল তোমার আঁখি।
কোমল তোমার পাখার 'পরে
সোনার রেখা স্তরে স্তরে,
বাঁধা আছে ডানায় তোমার
উষার রাঙা রাখি
ওগো তুমি ভোরের পাখি।
ভোরের ছোটো পাখি।

রয়েছে বট, শতেক জটা
ঝুলছে মাটি ব্যেপে,
পাতার উপর পাতার ঘটা
উঠছে ফুলে ফেঁপে।
তাহারি কোন্ কোণের শাখে
নিদ্রাহারা ঝিঁঝির ডাকে
বাঁকিয়ে গ্রীবা ঘুমিয়েছিলে
পাখাতে মুখ ঝেঁপে,
যেখানে বট দাঁড়িয়ে একা
জটায় মাটি ব্যেপে।

ওগো ভোরের সরল পাখি
কহ আমায় কহ—
ছায়ায় ঢাকা দ্বিগুণ রাতে
ঘুমিয়ে যখন রহ,
হঠাৎ তোমার কুলায় 'পরে
কেমন ক'রে প্রবেশ করে
আকাশ হতে আঁধার পথে
আলোর বার্তাবহ?
ওগো ভোরের সরল পাখি
কহ আমায় কহ!

কোমল তোমার বুকের তলে
রক্ত নেচে উঠে
উড়বে ব'লে পুলক জাগে
তোমার পক্ষপুটে।
চক্ষু মেলি পূবের পানে
নিদ্রা-ভাঙা নবীন গানে

অকুণ্ঠিত কণ্ঠ তোমার
উৎস-সমান ছুটে।
কোমল তোমার বুকের তলে
রক্ত নেচে উঠে।

এত আঁধারমাঝে তোমার
এতই অসংশয়।
বিশ্বজনে কেহই তোরে
করে না প্রত্যয়।
তুমি ডাক, "দাঁড়াও পথে,
সূর্য আসেন স্বর্ণরথে,
রাত্রি নয়, রাত্রি নয়,
রাত্রি নয় নয়।"
এত আঁধারমাঝে তোমার
এতই অসংশয়!

আনন্দেতে জাগো আজি
আনন্দেতে জাগো।
ভোরের পাখি ডাকে যে ঐ
তন্দ্রা এখন না গো।
প্রথম আলো পড়ুক মাথায়,
নিদ্রা-ভাঙা আঁখির পাতায়,
জ্যোতির্ময়ী উদয়-দেবীর
আশীর্বচন মাগো।
ভোরের পাখি গাহিছে ঐ,
আনন্দেতে জাগো।

২

কেবল তব মুখের পানে
চাহিয়া,
বাহির হনু তিমির রাতে
তরণীখানি বাহিয়া।
অরুণ আজি উঠেছে,
অশোক আজি ফুটেছে,
না যদি উঠে, না যদি ফুটে,
তবুও আমি চলিব ছুটে,
তোমার মুখে চাহিয়া।

নয়নপাতে ডেকেছ মোরে
নীরবে।
হৃদয় মোর নিমেষমাঝে
উঠেছে ভরি গরবে।
শঙ্খ তব বাজিল,
সোনার তরী সাজিল,
না যদি বাজে, না যদি সাজে,
গরব যদি টুটে গো লাজে,
চলিব তবু নীরবে।

কথাটি আমি শুধাব নাকো
তোমারে।
দাঁড়াব নাকো ক্ষণেক তরে
দ্বিধার ভরে দুয়ারে।
বাতাসে পাল ফুলিছে,
পতাকা আজি দুলিছে,
না যদি ফুলে, না যদি দুলে,
তরণী যদি না লাগে কূলে,
শুধাব নাকো তোমারে।

৩

মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
বাকি সব ধন স্বপনে,
নিভৃত স্বপনে।
ওগো কোথা মোর আশার অতীত,
ওগো কোথা তুমি পরশ-চকিত,
কোথা গো স্বপনবিহারী।
তুমি এস এস গভীর গোপনে,
এস গো নিবিড় নীরব চরণে,
বসনে প্রদীপ নিবারি,
এস গো গোপনে।
মোর কিছু ধন আছে সংসারে
বাকি সব আছে স্বপনে
নিভৃত স্বপনে।

রাজপথ দিয়ে আসিয়ো না তুমি
পথ ভরিয়াছে আলোকে,
প্রখর আলোকে।
সবার অজানা, হে মোর বিদেশী,
তোমারে না যেন দেখে প্রতিবেশী,
হে মোর স্বপনবিহারী।
তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে,
চিনিব সজল আঁখির পলকে,
চিনিব বিরলে নেহারি
পরম পুলকে।
এস প্রদোষের ছায়াতল দিয়ে,
এসো না পথের আলোকে
প্রখর আলোকে।

৪

তোমারে পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল,
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব
ছলনা,
যে-কথা তুমি বলিতে চাও
সে-কথা তুমি বল না।

তোমারে পাছে সহজে ধরি
কিছুরি তব কিনারা নাই,
দশের দলে টানি গো পাছে
বিরূপ তুমি, বিমুখ তাই।
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব
ছলনা,
যে-পথে তুমি চলিতে চাও
সে-পথে তুমি চল না।

সবার চেয়ে অধিক চাহ
তাই কি তুমি ফিরিয়া যাও?
হেলার ভরে খেলার মতো
ভিক্ষাঝুলি ভাসায়ে দাও?
বুঝেছি আমি বুঝেছি তব
ছলনা,
সবার যাহে তৃপ্তি হল
তোমার তাহে হল না!

৫

আপনারে তুমি করিবে গোপন
কী করি ?
হৃদয় তোমার আঁখির পাতায়
থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি'।
আজ আসিয়াছ কৌতুক-বেশে,
মানিকের হার পরি এলোকেশে,
নয়নের কোণে আধো হাসি হেসে
এসেছ হৃদয়-পুলিনে।
ভুলি নে তোমার বাঁকা কটাক্ষে,
ভুলি নে চতুর নিঠুর বাক্যে
ভুলি নে।
কর-পল্লবে দিলে যে আঘাত
করিব কি তাহে আঁখিজলপাত ?
এমন অবোধ নহি গো।
হাসো তুমি, আমি হাসিমুখে সব
সহি গো।

আজ এই বেশে এসেছ আমায়
ভুলাতে।
কভু কি আস নি দীপ্ত ললাটে
স্নিগ্ধ পরশ বুলাতে ?
দেখেছি তোমার মুখ কথাহারা
জলে ছলছল ম্লান আঁখিতারা,
দেখেছি তোমার ভয়-ভরে সারা
করুণ পেলব মুরতি।
দেখেছি তোমার বেদনা-বিধুর
পলক-বিহীন নয়নে মধুর
মিনতি।

আজি হাসিমাখা নিপুণ শাসনে
তরাস আমি যে পাব মনে মনে
এমন অবোধ নহি গো।
হাসো তুমি, আমি হাসিমুখে সব
সহি গো।

৬

তোমায় চিনি বলে আমি করেছি গরব
লোকের মাঝে;
মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমায়
অনেকে অনেক সাজে।
কত জনে এসে মোরে ডেকে কয়—
"কে গো সে"—শুধায় তব পরিচয়,
"কে গো সে?"
তখন কী কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি, "কী জানি কী জানি।"
তুমি শুনে হাস, তারা দুষে মোরে
কী দোষে।

তোমার অনেক কাহিনী গাহিয়াছি আমি
অনেক গানে।
গোপন বারতা লুকায়ে রাখিতে
পারি নি আপন প্রাণে।
কত জন মোরে ডাকিয়া কয়েছে,
"যা গাহিছ তার অর্থ রয়েছে
কিছু কি?"
তখন কী কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি, "অর্থ কী জানি।"
তারা হেসে যায়, তুমি হাস বসে
মুচকি।

তোমায় জানি না চিনি না এ-কথা বলো তো
কেমনে বলি ?
খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও,
খনে খনে যাও ছলি ।
জ্যোৎস্না-নিশীথে, পূর্ণ শশীতে,
দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে,
আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায়
লখিতে ।
বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি,
অকারণে আঁখি উঠেছে আকুলি,
বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছ চরণ
চকিতে ।

তোমায় খনে খনে আমি বাঁধিতে চেয়েছি
কথার ডোরে ।
চিরকাল তরে গানের সুরেতে
রাখিতে চেয়েছি ধরে ।
সোনার ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ,
বাঁশিতে ভরেছি কোমল নিখাদ,
তবু সংশয় জাগে—ধরা তুমি
দিলে কি ?
কাজ নাই, তুমি যা খুশি তা করো
ধরা নাই দাও, মোর মন হরো,
চিনি বা না চিনি প্রাণ উঠে যেন
পুলকি ।

৭

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগসম।
ফাল্গুন-রাতে দক্ষিণ-বায়ে
কোথা দিশা খুঁজে পাই না,
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকাসম।
বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে
বক্ষে ফিরিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

নিজের গানেরে বাঁধিয়া ধরিতে
চাহে যেন বাঁশি মম,
উতলা পাগলসম।
যারে বাঁধি ধরে তার মাঝে আর
রাগিণী খুঁজিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

৮

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসি।
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার
পরশ পাবার প্রয়াসী।
আমি সুদূরের পিয়াসি।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর। তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই,
সে-কথা যে যাই পাসরি।

আমি উৎসুক হে,
হে সুদূর, আমি প্রবাসী।
তুমি দুর্লভ দুরাশার মতো
কী কথা আমায় শুনাও সতত।
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়
জেনেছে তাহার স্বভাষী।
হে সুদূর, আমি প্রবাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর। তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
নাহি জানি পথ, নাহি মোর রথ
সে-কথা যে যাই পাসরি।

আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী।
রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়
তরু-মর্মরে, ছায়ার খেলায়

কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি।
হে সুদূর, আমি উদাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর। তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে-কথা যে যাই পাসরি।

৭

কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে—
কাঁদিছে আপন মনে,—
কুসুমের দলে বদ্ধ হয়ে
করুণ কাতর স্বনে
কহিছে সে—হায় হায়,
বেলা যায় বেলা যায় গো
ফাগুনের বেলা যায়।
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।
কুসুম ফুটিবে, বাঁধন টুটিবে,
পুরিবে সকল কামনা।
নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই
ফাগুন তখনো যাবে না।

কুঁড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে
ফিরিছে আপনমাঝে,
বাহিরিতে চায় আকুল শ্বাসে
কী জানি কিসের কাজে।

কহিছে সে—হায় হায়,
কোথা আমি যাই, কারে চাই গো
না জানিয়া দিন যায়।
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।
দখিন-পবন দ্বারে দিয়া কান
জেনেছে রে তোর কামনা।
আপনারে তোর না করিয়া ভোর
দিন তোর চলে যাবে না।

কুঁড়ির ভিতরে আকুল গন্ধ ভাবিছে বসে—
ভাবিছে উদাসপারা,—
জীবন আমার কাহার দোষে
এমন অর্থহারা।
কহিছে সে—হায় হায়।
কেন আমি কাঁদি, কেন আছি গো
অর্থ না বুঝা যায়।
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।
যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি, পুরাবি কামনা,
আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি।
জনম ব্যর্থ যাবে না।

১০

আমার মাঝারে যে আছে, কে গো সে,
কোন্ বিরহিণী নারী ?
আপন করিতে চাহিনু তাহারে,
কিছুতেই নাহি পারি।

রমণীরে কে বা জানে—
মন তার কোন্‌খানে।
সেবা করিলাম দিবানিশি তার,
গাঁথি দিনু গলে কত ফুলহার,
মনে হল, সুখে প্রসন্ন মুখে
চাহিল সে মোর পানে।
কিছু দিন যায়, একদিন হায়
ফেলিল নয়নবারি—
"তোমাতে আমার কোনো সুখ নাই"
কহে বিরহিণী নারী।

রতনে জড়িত নূপুর তাহারে
পরায়ে দিলাম পায়ে,
রজনী জাগিয়া ব্যজন করিনু
চন্দন-ভিজা বায়ে।
রমণীরে কে বা জানে—
মন তার কোন্‌খানে।
কনক-খচিত পালঙ্ক 'পরে
বসানু তাহারে বহু সমাদরে,
মনে হল হেন হাসিমুখে যেন
চাহিল সে মোর পানে।
কিছু দিন যায়, লুটায়ে ধুলায়
ফেলিল নয়নবারি—
"এ-সবে আমার কোনো সুখ নাই"
কহে বিরহিণী নারী।

বাহিরে আনিনু তাহারে, করিতে
হৃদয়-দিগ্‌বিজয়।
সারথি হইয়া রথখানি তার
চালানু ধরণীময়।

রমণীরে কে বা জানে—
মন তার কোন্‌খানে।
দিকে দিকে লোক সঁপি দিল প্রাণ,
দিকে দিকে তার উঠে চাটুগান,
মনে হল তবে দীপ্ত গরবে
চাহিল সে মোর পানে।
কিছু দিন যায় মুখ সে ফিরায়
ফেলে সে নয়নবারি।
"হৃদয় কুড়ায়ে কোনো সুখ নাই"
কহে বিরহিণী নারী।

আমি কহিলাম, "কারে তুমি চাও
ওগো বিরহিণী নারী।"
সে কহিল, "আমি যারে চাই, তার
নাম না কহিতে পারি।"
রমণীরে কে বা জানে—
মন তার কোন্‌খানে।
সে কহিল, "আমি যারে চাই তারে
পলকে যদি গো পাই দেখিবারে,
পুলকে তখনি লব তারে চিনি,
চাহি তার মুখপানে।"
দিন চলে যায়, সে কেবল হায়
ফেলে নয়নের বারি।
"অজানারে কবে আপন করিব"
কহে বিরহিণী নারী॥

১১

না জানি কারে দেখিয়াছি,
দেখেছি কার মুখ।
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি।
পেয়েছি তাই সুখে আছি,
পেয়েছি এই সুখ
কারেও আমি দেখাব নাকো সেটি।
লিখন আমি নাহিকো জানি
বুঝি না কী যে রয়েছে বাণী,
যা আছে থাক্ আমার থাক্ তাহা।
পেয়েছি এই সুখে আজি
পবনে উঠে বাঁশরি বাজি,
পেয়েছি সুখে পরান গাহে আহা।

পণ্ডিত সে কোথা আছে,
শুনেছি নাকি তিনি
পড়িয়া দেন লিখন নানামতো।
যাব না আমি তাঁর কাছে,
তাঁহারে নাহি চিনি,
থাকুন লয়ে পুরানো পুঁথি যত।
শুনিয়া কথা পাব না দিশে,
বুঝেন কিনা বুঝিব কিসে।
ধন্দ লয়ে পড়িব মহাগোলে।
তাহার চেয়ে এ লিপিখানি
মাথায় কভু রাখিব আনি
যতনে কভু তুলিব ধরি কোলে।

রজনী যবে আঁধারিয়া
আসিবে চারিধারে,
গগনে যবে উঠিবে গ্রহতারা ;

ধরিব লিপি প্রসারিয়া
বসিয়া গৃহদ্বারে
পুলকে রব হয়ে পলকহারা।
তখন নদী চলিবে বাহি
যা আছে লেখা তাহাই গাহি,
লিপির গান গাবে বনের পাতা।
আকাশ হতে সপ্তঋষি
গাহিবে ভেদি গহন নিশি
গভীর তানে গোপন এই গাথা।

বুঝি না বুঝি ক্ষতি কিবা,
রব অবোধসম।
পেয়েছি যাহা কে লবে তাহা কাড়ি।
রয়েছে যাহা নিশিদিবা
রহিবে তাহা মম,
বুকের ধন যাবে না বুক ছাড়ি।
খুঁজিতে গিয়া বৃথাই খুঁজি,
বুঝিতে গিয়া ভুল যে বুঝি,
ঘুরিতে গিয়া কাছেরে করি দূর।
না বোঝা মোর লিখনখানি
প্রাণের বোঝা ফেলিল টানি,
সকল গানে লাগায়ে দিল সুর।

১২

হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা।
ওগো তপন তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারি নে সেবা।
শিশির কহিল কাঁদিয়া,
"তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
হে রবি, এমন নাহিকো আমার বল।
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলি অশ্রুজল।"

"আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি
বাসিতে পারি যে ভালো।"
শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া,
"ছোটো হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি,
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
হাসির মতন করি।"

১৩

আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভালোবেসেছি।
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে
শুধু তুমি আমি এসেছি।
দেখি চারিদিক পানে,
কী যে জেগে ওঠে প্রাণে।
তোমার আমার অসীম মিলন
যেন গো সকল খানে।
কত যুগ এই আকাশে যাপিনু
সে-কথা অনেক ভুলেছি।
তারায় তারায় যে-আলো কাঁপিছে
সে-আলোকে দোঁহে দুলেছি।

তৃণ-রোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী,

মূক মেদিনীর মর্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি।
এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা জেগেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি।

প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস
সুখের দুখের কাহিনী;
পরিচিতসম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিণী।
পুরাতন সেই গীতি
সে যেন আমার স্মৃতি।
কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার
গোপনে রয়েছে নিতি।
প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে
কত বা উঠিছে মেলিয়া—
পিতামহদের জীবনে আমরা
দু-জনে এসেছি খেলিয়া।

লক্ষ বরষ আগে যে-প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে
তাহার অরুণ-কিরণ-কণিকা
গাঁথ নি কি মোর জীবনে?
সে-প্রভাতে কোন্খানে
জেগেছিনু কেবা জানে।
কী মুরতি মাঝে ফুটালে আমারে
সেদিন লুকায়ে প্রাণে।

হে চির-পুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া।
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
রবে চিরদিন ধরিয়া।

১৪

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে-দুয়ারে চাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

রহিয়া রহিয়া নব বসন্তে
ফুল-সুগন্ধ গগনে
কেঁদে ফেরে হিয়া মিলন-বিহীন
মিলনের শুভ লগনে।
আপনার যারা আছে চারিভিতে
পারি নি তাদের আপন করিতে,
তারা নিশিদিসি জাগাইছে চিতে
বিরহ-বেদনা সঘনে।
পাশে আছে যারা তাদেরি হারায়ে
ফিরে প্রাণ সারা গগনে।

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
　　লুটায় আমার সামনে—
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
　　কেন যে, কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে-দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
　　বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
　　লুটায় আমার সামনে।

নিশার আকাশ কেমন করিয়া
　　তাকায় আমার পানে সে।
লক্ষযোজন দূরের তারকা
　　মোর নাম যেন জানে সে।
যে-ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কী আর মনে তাহা আনি;
চিরদিবসের ভুলে-যাওয়া বাণী
　　কোন্ কথা মনে আনে সে।
অনাদি উষার বন্ধু আমার
　　তাকায় আমার পানে সে।

এ সাত-মহলা ভবনে আমার,
　　চির-জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
　　বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।
তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে
দূরে এসে ঘর চাই বাঁধিবারে,

আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে
ঘরের বাসনা মিটাতে ?
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায়
চির-জনমের ভিটাতে।

যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই,
ধুলারেও মানি আপনা।
ছোটো-বড়ো হীন সবার মাঝারে
করি চিত্তের স্থাপনা।
হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুলফল,
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাহি ভাবনা।
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।

বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে
প্রতি কণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ
শত কোটি কর হানিছে।
ওরে মাটি, তুই আমারে কী চাস ?
মোর তরে জল দু-হাত বাড়াস ?
নিশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস
চির-আহ্বান আনিছে।
পর ভাবি যারে তারা বারে বারে
সবাই আমারে টানিছে।

আছে আছে প্রেম ধুলায় ধুলায়,
আনন্দ আছে নিখিলে।

মিথ্যায় ঘেরে, ছোটো কণাটিরে
তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।
জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চির-গৌরব—
এ-কথা না যদি শিখিলে,
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে
প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে।

ধুলা সাথে আমি ধুলা হয়ে রব
সে গৌরবের চরণে।
ফুলমাঝে আমি হব ফুলদল
তাঁর পূজারতি বরণে।
যেথা যাই আর যেথায় চাহি রে
তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে,
প্রবাস কোথাও নাহি রে নাহি রে
জনমে জনমে মরণে।
যাহা হই আমি তাই হয়ে রব।
সে গৌরবের চরণে।

ধন্য রে আমি অনন্ত কাল,
ধন্য আমার ধরণী।
ধন্য এ মাটি, ধন্য সুদূর
তারকা হিরণ-বরনী।
যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে,
নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কারে।
আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে
বিপুল ভুবন-তরণী।
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি
ধন্য এ মোর ধরণী॥

১৫

আকাশ-সিন্ধু মাঝে এক ঠাঁই
কিসের বাতাস লেগেছে,—
জগৎ ঘূর্ণি জেগেছে।
ঝলকি উঠেছে রবিশশাঙ্ক
ঝলকি ছুটেছে তারা,
অযুত চক্র ঘুরিয়া উঠেছে
অবিরাম মাতোয়ারা।
স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
ঘূর্ণির মাঝখানে—
সেইখান হতে স্বর্ণকমল
উঠেছে শূন্যপানে।
সুন্দরী, ওগো সুন্দরী,
শতদলদলে ভুবনলক্ষ্মী
দাঁড়ায়ে রয়েছ মরি মরি।
জগতের পাকে সকলি ঘুরিছে,
অচল তোমার রূপরাশি।
নানাদিক হতে নানা দিন দেখি,—
পাই দেখিবারে ওই হাসি।

জনমে মরণে আলোকে আঁধারে
চলেছি হরণে পূরণে,
ঘুরিয়া চলেছি ঘুরনে।
কাছে যাই যার দেখিতে দেখিতে
চলে যায় সেই দূরে,
হাতে পাই যারে, পলক ফেলিতে
তারে ছুঁয়ে যাই ঘুরে।
কোথাও থাকিতে না পারি ক্ষণেক,
রাখিতে পারি নে কিছু,

মত্ত হৃদয় ছুটে চলে যায়
ফেনপুঞ্জের পিছু।
হে প্রেম, হে ধ্রুবসুন্দর,
স্থিরতার নীড় তুমি রচিয়াছ
ঘূর্ণার পাকে খরতর।
দ্বীপগুলি তব গীতমুখরিত,
ঝরে নির্ঝর কলভাষে,
অসীমের চির-চরম শান্তি
নিমেষের মাঝে মনে আসে।

১৬

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্বগগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
ললাট তোমার নীল নভতল,
বিমল আলোকে চির-উজ্জ্বল,
নীরব আশিস-সম হিমাচল
তব বরাভয় কর,—
সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ;
জাহ্নবী তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষ'পর।
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা
মোর সনাতন স্বদেশে।

শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র
অতীতের তপোবনেতে,—
অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া
ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে।
প্রভাতে, হে দেব, তরুণ তপনে
দেখা দাও যবে উদয়-গগনে
মুখ আপনার ঢাকি আবরণে
হিরণ-কিরণে গাঁথা,—
তখন ভারতে শুনি চারিভিতে
মিলি কাননের বিহঙ্গগীতে,
প্রাচীন নীরব কণ্ঠ হইতে
উঠে গায়ত্রীগাথা।
হৃদয় খুলিয়া দাঁড়ানু বাহিরে
শুনিনু আজিকে নিমেষে,
অতীত হইতে উঠিছে হে দেব,
তব গান মোর স্বদেশে।

নয়ন মুদিয়া শুনিনু, জানি না
কোন্ অনাগত বরষে
তব মঙ্গলশঙ্খ তুলিয়া
বাজায় ভারত হরষে।
ডুবায়ে ধরার রণহুংকার
ভেদি বণিকের ধনঝংকার
মহাকাশতলে উঠে ওংকার
কোনো বাধা নাহি মানি।
ভারতের শ্বেত হৃদিশতদলে,
দাঁড়ায়ে ভারতী তব পদতলে,
সংগীত-তানে শূন্যে উথলে
অপূর্ব মহাবাণী।

নয়ন মুদিয়া ভাবীকালপানে
চাহিনু, শুনিনু নিমেষে
তব মঙ্গলবিজয়শঙ্খ
বাজিছে আমার স্বদেশে।

১৭

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

১৮

তোমার বীণায় কত তার আছে
কত না সুরে,
আমি তার সাথে আমার তারটি
দিব গো জুড়ে।
তার পর হতে প্রভাতে সাঁঝে
তব বিচিত্র রাগিণী মাঝে
আমারো হৃদয় রণিয়া রণিয়া
বাজিবে তবে।
তোমার সুরেতে আমার পরান
জড়ায়ে রবে।

তোমার তারায় মোর আশাদীপ
রাখিব জ্বালি।
তোমার কুসুমে আমার বাসনা
দিব গো ঢালি।
তার পর হতে নিশীথে প্রাতে
তব বিচিত্র শোভার সাথে
আমারো হৃদয় জ্বলিবে, ফুটিবে
দুলিবে সুখে।
মোর পরানের ছায়াটি পড়িবে
তোমার মুখে।

১৯

হে রাজন্, তুমি আমারে
বাঁশি বাজাবার দিয়েছ যে ভার
তোমার সিংহ-দুয়ারে—
ভুলি নাই তাহা ভুলি নাই,
মাঝে মাঝে তবু ভুলে যাই,
চেয়ে চেয়ে দেখি কে আসে কে যায়
কোথা হতে যায় কোথা রে।

কেহ নাহি চায় থামিতে।
শিরে লয়ে বোঝা চলে যায় সোজা
না চাহে দখিনে বামেতে।
বকুলের শাখে পাখি গায়,
ফুল ফুটে তব আঙিনায়,
না দেখিতে পায় না শুনিতে চায়,
কোথা যায় কোন্ গ্রামেতে।

বাঁশি লই আমি তুলিয়া।
তারা ক্ষণতরে পথের উপরে
বোঝা ফেলে বসে ভুলিয়া।

আছে যাহা চিরপুরাতন
তারে পায় যেন হারাধন,
বলে, "ফুল এ কী ফুটিয়াছে দেখি।
পাখি গায় প্রাণ খুলিয়া।"

হে রাজন্, তুমি আমারে
রেখো চিরদিন বিরামবিহীন
তোমার সিংহ-দুয়ারে।
যারা কিছু নাহি কহে যায়,
সুখদুখভার বহে যায়,
তারা ক্ষণতরে বিস্ময়ভরে
দাঁড়াবে পথের মাঝারে
তোমার সিংহ-দুয়ারে।

২০

দুয়ারে তোমার ভিড় ক'রে যারা আছে,
ভিক্ষা তাদের চুকাইয়া দাও আগে।
মোর নিবেদন নিভৃতে তোমার কাছে,
সেবক তোমার অধিক কিছু না মাগে।
ভাঙিয়া এসেছি ভিক্ষাপাত্র,
শুধু বীণাখানি রেখেছি মাত্র,
বসি এক ধারে পথের কিনারে
বাজাই সে বীণা দিবসরাত্র।

দেখো কতজন মাগিছে রতনধূলি,
কেহ আসিয়াছে যাচিতে নামের ঘটা,—
ভরি নিতে চাহে কেহ বিদ্যার ঝুলি,
কেহ ফিরে যাবে লয়ে বাক্যের ছটা।

আমি আনিয়াছি এ বীণাযন্ত্র,
তব কাছে লব গানের মন্ত্র,
তুমি নিজ-হাতে বাঁধো এ বীণায়
তোমার একটি স্বর্ণতন্ত্র।

নগরের হাটে করিব না বেচাকেনা,
লোকালয়ে আমি লাগিব না কোনো কাজে,
পাব না কিছুই, রাখিব না কারো দেনা,
অলস জীবন যাপিব গ্রামের মাঝে।
তরুতলে বসি মন্দ-মন্দ
ঝংকার দিব কত কী ছন্দ,
যত গান গাব, তব বাঁধা-তারে
বাজিবে তোমার উদার মন্দ্র।

২১

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে।

সাগরে সাগরে কলরবে যাহা বাজে,
মেঘগর্জনে ছুটে ঝঞ্ঝার মাঝে,
নীরব মন্দ্রে নিশীথ-আকাশে রাজে
আঁধার হইতে আঁধারে আসন পাতিয়া,—
আমি সেই এই মানবের লোকালয়ে
বাজিয়া উঠেছি সুখে দুখে লাজে ভয়ে,
গরজি ছুটিয়া ধাই জয়ে পরাজয়ে
বিপুল ছন্দে উদার মন্দ্রে মাতিয়া।

যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে,
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,
শারদধান্যে যে আভা আভাসে নাচে
কিরণে কিরণে হসিত হিরণে-হরিতে,
সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া,
সে গান আমাতে রচিছে নূতন মায়া,
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া ;—
আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধরিতে ?

নব-অরণ্যে মর্ম্মর-তান তুলি
যৌবন-বনে উড়াই কুসুমধূলি,
চিত্ত-গুহায় সুপ্ত রাগিণীগুলি
শিহরিয়া উঠে আমার পরশে জাগিয়া।
নবীন উষার তরুণ অরুণে থাকি'
গগনের কোণে মেলি পুলকিত আঁখি,
নীরব প্রদোষে করুণ-কিরণে ঢাকি'
থাকি মানবের হৃদয়চূড়ায় লাগিয়া।

তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীতরবে,
লাজুক হৃদয় যে-কথাটি নাহি কবে
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।
নাহি জানি আমি কী পাখা লইয়া উড়ি,
খেলাই ভুলাই দুলাই ফুটাই কুঁড়ি,
কোথা হতে কোন্ গন্ধ যে করি চুরি
সন্ধান তার বলিতে পারি না কাহারে।

যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে।

মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতি-নিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

২২

আছি আমি বিন্দুরূপে, হে অন্তরযামী,
আছি আমি বিশ্বকেন্দ্রস্থলে। "আছি আমি"
এ-কথা স্মরিলে মনে মহান্ বিস্ময়
আকুল করিয়া দেয়, স্তব্ধ এ হৃদয়
প্রকাণ্ড রহস্যভারে। "আছি আর আছে,"
অন্তহীন আদি প্রহেলিকা, কার কাছে
শুধাইব অর্থ এর? তত্ত্ববিদ্ তাই
কহিতেছে, "এ নিখিলে আর কিছু নাই,
শুধু এক আছে।" করে তারা একাকার
অস্তিত্ব-রহস্যরাশি করি অস্বীকার।
একমাত্র তুমি জান এ ভব সংসারে।
যে আদি গোপন তত্ত্ব,—আমি কবি তারে
চিরকাল সবিনয়ে স্বীকার করিয়া
অপার বিস্ময়ে চিত্ত রাখিব ভরিয়া।

২৩

শূন্য ছিল মন,
নানা কোলাহলে ঢাকা,
নানা আনাগোনা-আঁকা
দিনের মতন।
নানা জনতায় ফাঁকা,
কর্মে অচেতন
শূন্য ছিল মন।

জানি না কখন এল নূপুর-বিহীন
নিঃশব্দ গোধূলি।
দেখি নাই স্বর্ণ-রেখা,
কী লিখিল শেষ লেখা
দিনান্তের তুলি।
আমি যে ছিলাম একা
তাও ছিনু ভুলি।
আইল গোধূলি।

হেনকালে আকাশের বিস্ময়ের মতো
কোন্ স্বর্গ হতে
চাঁদখানি লয়ে হেসে
শুক্ল-সন্ধ্যা এল ভেসে
আঁধারের স্রোতে।
বুঝি সে আপনি মেশে
আপন আলোতে।
এল কোথা হতে।

অকস্মাৎ বিকশিত পুষ্পের পুলকে
তুলিলাম আঁখি।
আর কেহ কোথা নাই
সে শুধু আমারি ঠাঁই
এসেছে একাকী।
সম্মুখে দাঁড়াল তাই
মোর মুখে রাখি
অনিমেষ আঁখি।

রাজহংস এসেছিল কোন্ যুগান্তরে
শুনেছি পুরাণে।

দময়ন্তী আলবালে
স্বর্ণঘটে জল ঢালে
নিকুঞ্জ-বিতানে,—
কার কথা হেনকালে
কহি গেল কানে
শুনেছি পুরাণে।

জ্যোৎস্নাসন্ধ্যা তারি মতো আকাশ বাহিয়া
এল মোর বুকে।
কোন্ দূর প্রবাসের
লিপিখানি আছে এর
ভাষাহীন মুখে।
সে যে কোন্ উৎসুকের
মিলনকৌতুকে
এল মোর বুকে।

দুইখানি শুভ্র ডানা ঘেরিল আমারে
সর্বাঙ্গে হৃদয়ে।
স্কন্ধে মোর রাখি শির
নিস্পন্দ রহিল স্থির,
কথাটি না কয়ে।
কোন্ পদ্ম-বনানীর
কোমলতা লয়ে
পশিল হৃদয়ে?

আর কিছু বুঝি নাই, শুধু বুঝিলাম
আছি আমি একা।
এই শুধু জানিলাম
জানি নাই তার নাম
লিপি যার লেখা।

এই শুধু বুঝিলাম
না পাইলে দেখা
রব আমি একা।

ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয় এ দিনরজনী,
এ মোর জীবন।
হায় হায়, চিরদিন
হয়ে আছে অর্থহীন
এ বিশ্বভুবন।
অনন্ত প্রেমের ঋণ
করিছে বহন
ব্যর্থ এ জীবন।

ওগো দূত দূরবাসী, ওগো বাক্যহীন,
হে সৌম্য-সুন্দর।
চাহি তব মুখপানে
ভাবিতেছি মুগ্ধপ্রাণে
কী দিব উত্তর ?
অশ্রু আসে দু-নয়নে,
নির্বাক অন্তর,
হে সৌম্য-সুন্দর।

২৪

হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কী জানি কী বাণীর সন্ধানে।
দুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তব শেষ প্রান্তে উঠি আপনার
সহসা মুহূর্তে যেন হারায়ে ফেলেছে কণ্ঠ তার,
ভুলিয়া গিয়াছে সব সুর,—সামগীত শব্দহারা
নিয়ত চাহিয়া শূন্যে বরষিছে নির্ঝরিণীধারা।

হে গিরি, যৌবন তব যে দুর্দম অগ্নিতাপবেগে
আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে—
সে তাপ হারায়ে গেছে, সে প্রচণ্ড গতি অবসান,
নিরুদ্দেশ চেষ্টা তব হয়ে গেছে প্রাচীন পাষাণ।
পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজি মৌন শান্ত হিয়া
সীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া।

২৫

ক্ষান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে, তাই হেরো আজি
তোমার সর্বাঙ্গ ঘেরি পুলকিছে শ্যাম শস্পরাজি
প্রস্ফুটিত পুষ্পজালে ; বনস্পতি শত বরষার
আনন্দবর্ষণকাব্য লিখিতেছে পত্রপুঞ্জে তার
বল্কলে শৈবালে জটে ; সুদুর্গম তোমার শিখর
নির্ভয় বিহঙ্গ যত কলোল্লাসে করিছে মুখর ;
আসি নরনারীদল তোমার বিপুল বক্ষপটে
নিঃশঙ্ক কুটিরগুলি বাঁধিয়াছে নির্ঝরিণীতটে।
যেদিন উঠিয়াছিলে অগ্নিতেজে স্পর্ধিতে আকাশ,
কম্পমান ভূমণ্ডলে, চন্দ্রসূর্য করিবারে গ্রাস,—
সেদিন, হে গিরি, তব এক সঙ্গী আছিল প্রলয় ;
যখনি থেমেছ তুমি বলিয়াছ, "আর নয়, নয়,"
চারিদিক হতে এল তোমা'পরে আনন্দ-নিশ্বাস,
তোমার সমাপ্তি ঘেরি বিস্তারিল বিশ্বের বিশ্বাস।

২৬

আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমাদ্রি, গভীর নির্জনে
পাঠকের মতো তুমি বসে আছ অচল আসনে,
সনাতন পুঁথিখানি তুলিয়া লয়েছ অঙ্ক'পরে।
পাষাণের পত্রগুলি খুলিয়া গিয়াছে থরে থরে,
পড়িতেছ একমনে। ভাঙিল গড়িল কত দেশ,
গেল এল কত যুগ—পড়া তব হইল না শেষ।

আলোকের দৃষ্টিপথে এই যে সহস্র খোলা পাতা
ইহাতে কি লেখা আছে ভব-ভবানীর প্রেম-গাথা ?
নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর
কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্বল সুন্দর
বাহুর করুণ আকর্ষণে ? কিছু নাহি চাহি যাঁর,
তিনি কেন চাহিলেন—ভালোবাসিলেন নির্বিকার,—
পরিলেন পরিণয়পাশ ? এই যে প্রেমের লীলা
ইহারি কাহিনী বহে, হে শৈল, তোমার যত শিলা।

২৭

তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত
তপস্যার মতো। স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন রোমাঞ্চিত
নিবিড় নিগূঢ়ভাবে পথশূন্য তোমার নির্জনে,
নিষ্কলঙ্ক নীহারের অভ্রভেদী আত্মবিসর্জনে।
তোমার সহস্র শৃঙ্গ বাহু তুলি কহিছে নীরবে
ঋষির আশ্বাসবাণী—"শুন শুন বিশ্বজন সবে
জেনেছি, জেনেছি আমি।" যে ওংকার আনন্দ-আলোতে
উঠেছিল ভারতের বিরাট গভীর বক্ষ হতে
আদিঅন্তবিহীনের অখণ্ড অমৃত লোকপানে,
সে আজি উঠিছে বাজি, গিরি, তব বিপুল পাষাণে।
একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমাগ্নি-আহুতি
ভাষাহারা মহাবার্তা প্রকাশিতে করেছে আকুতি,
সেই বহ্নিবাণী আজি অচল প্রস্তরশিখারূপে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোন্ মন্ত্র উচ্ছ্বাসিছে মেঘধূম্রস্তূপে।

২৮

হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার
অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারংবার
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া ধরিছেন বিচিত্র মুরতি।
ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি,

দুর্গম দুঃসহ মৌন,—জটাপুঞ্জ তুষারসংঘাত
নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্ত রবিরশ্মিপাত
পূজাস্বর্ণপদ্মদল। কঠিন প্রস্তরকলেবর
মহান্-দরিদ্র, রিক্ত, আভরণহীন দিগম্বর।
হেরো তাঁরে অঙ্গে অঙ্গে এ কী লীলা করেছে বেষ্টন—
মৌনেরে ঘিরিছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন
সফেন চঞ্চল নৃত্য, রিক্ত কঠিনেরে ওই চুমে
কোমল শ্যামলশোভা নিত্যনব পল্লবে কুসুমে
ছায়ারৌদ্রে মেঘের খেলায়। গিরিশেরে রয়েছেন ঘিরি
পার্বতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি।

২৯

ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাস নিশ্বসে গগনে
আলোক করিয়া পান, উদাস দক্ষিণ-সমীরণে,
অনির্বচনীয় যেন আনন্দের অব্যক্ত আবেগ।
ঊর্ধ্ববাহু হিমাচল, তুমি সেই উদ্বাহিত মেঘ
শিখরে শিখরে তব ছায়াচ্ছন্ন গুহায় গুহায়
রাখিছ নিরুদ্ধ করি,—পুনর্বার উন্মুক্ত ধারায়
নূতন আনন্দ-স্রোতে নব প্রাণে ফিরাইয়া দিতে
অসীম-জিজ্ঞাসারত সেই মহাসমুদ্রের চিতে।
সেইমতো ভারতের হৃদয়সমুদ্র এতকাল
করিয়াছে উচ্চারণ ঊর্ধ্বপানে যে বাণী বিশাল,—
অনন্তের জ্যোতিস্পর্শে অনন্তেরে যা দিয়েছে ফিরে—
রেখেছ সঞ্চয় করি, হে হিমাদ্রি, তুমি স্তব্ধশিরে।
তব মৌন শৃঙ্গমাঝে তাই আমি ফিরি অন্বেষণে
ভারতের পরিচয় শান্ত-শিব-অদ্বৈতের সনে।

৩০

ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি
হে আর্য আচার্য জগদীশ? কী অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণ-নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে?
কোথা পেলে সেই শান্তি এ উন্মত্ত জনকোলাহলে
যার তলে মগ্ন হয়ে মুহূর্তে বিশ্বের কেন্দ্রমাঝে
দাঁড়াইলে একা তুমি—এক যেথা একাকী বিরাজে
সূর্যচন্দ্র-পুষ্পপত্র-পশুপক্ষী-ধুলায়-প্রস্তরে,—
এক তন্দ্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক'পরে
দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সংগীতে। মোরা যবে
মত্ত ছিনু অতীতের অতিদূর নিষ্ফল গৌরবে,
পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পর-ভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীতকণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে—
তুমি ছিলে কোন্ দূরে? আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসন
কোথায় পাতিয়াছিলে? সংযত গম্ভীর করি মন
ছিলে রত তপস্যায় অরূপরশ্মির অন্বেষণে
লোকলোকান্তের অন্তরালে,—যেথা পূর্ব ঋষিগণে
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড়হাতে।
হে তপস্বী, ডাকো তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জনে
"উত্তিষ্ঠত নিবোধত।" ডাকো শাস্ত্র-অভিমানী জনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে। সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাকো মূঢ় দাম্ভিকেরে। ডাক দাও তব শিষ্যদলে
একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া।
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে,—বসুক সে অপ্রমত্ত চিত্তে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে॥

৩১

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো,
দিক্-দিগন্ত ঢাকি।—
আজিকে আমরা কাঁদিয়া শুধাই সঘনে ওগো,
আমরা খাঁচার পাখি,—
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি কি আসিল প্রলয় রাত্রি ঘোর?
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া?
চিরদিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া?
দেবতার কৃপা আকাশের তলে
কোথা কিছু নাহি বাকি?—
তোমাপানে চাই, কাঁদিয়া শুধাই
আমরা খাঁচার পাখি।

ফাল্গুন এলে সহসা দখিন পবন হতে
মাঝে মাঝে রহি রহি
আসিত সুবাস সুদূর কুঞ্জভবন হতে
অপূর্ব আশা বহি।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
মাঝে মাঝে যবে রজনী হইত ভোর,
কী মায়ামন্ত্রে বন্ধনদুখ নাশিয়া
খাঁচার কোণেতে প্রভাত পশিত হাসিয়া
ঘনমসি-আঁকা লোহার শলাকা
সোনার সুধায় মাখি।
নিখিল বিশ্ব পাইতাম প্রাণে
আমরা খাঁচার পাখি।

আজি দেখো ওই পূর্ব-অচলে চাহিয়া, হোথা
কিছুই না যায় দেখা,—

আজি কোনো দিকে তিমিরপ্রান্ত দাহিয়া, হোথা
পড়ে নি সোনার রেখা।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি শৃঙ্খল বাজে অতি সুকঠোর।
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহি রে,
কার সন্ধান করি অন্তরে-বাহিরে।
মরীচিকা লয়ে জুড়াব নয়ন
আপনারে দিব ফাঁকি
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি
আমরা খাঁচার পাখি।

ওগো আমাদের এই ভয়াতুর বেদনা যেন
তোমারে না দেয় ব্যথা।
পিঞ্জরদ্বারে বসিয়া তুমিও কেঁদো না যেন
লয়ে বৃথা আকুলতা।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
তোমার চরণে নাহি তো লৌহডোর।
সকল মেঘের ঊর্ধ্বে যাও গো উড়িয়া,
সেথা ঢালো তান বিমল শূন্য জুড়িয়া,—
"নেবে নি, নেবে নি প্রভাতের রবি"
কহ আমাদের ডাকি,
মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান
আমরা খাঁচার পাখি।

৩২

যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে, হে নারী,
কবির বিচিত্র গান নিতে পার কাড়ি
আপন চরণপ্রান্তে; তুমি মুগ্ধ চিতে
মগ্ন আছ আপনার গৃহের সংগীতে।

স্তবে তব নাহি কান, তাই স্তব করি,
তাই আমি ভক্ত তব, অনিন্দ্যসুন্দরী,
ভুবন তোমারে পূজে, জেনেও জান না ;
ভক্তদাসীসম তুমি কর আরাধনা
খ্যাতিহীন প্রিয়জনে। রাজমহিমারে
যে কর-পরশে তব পার করিবারে
দ্বিগুণ মহিমান্বিত, সে সুন্দর করে
ধূলি ঝাঁট দাও তুমি আপনার ঘরে।
সেই তো মহিমা তব সেই তো গরিমা,
সকল মাধুর্য চেয়ে তারি মধুরিমা।

৩৩

দেখো চেয়ে গিরির শিরে
মেঘ করেছে গগন ঘিরে,
আর ক'রো না দেরি।
ওগো আমার মনোহরণ,
ওগো স্নিগ্ধ ঘনবরন,
দাঁড়াও তোমায় হেরি।
দাঁড়াও গো ঐ আকাশকোলে,
দাঁড়াও আমার হৃদয়-দোলে,
দাঁড়াও গো ঐ শ্যামলতৃণ 'পরে,
আকুল চোখের বারি বেয়ে
দাঁড়াও আমার নয়ন ছেয়ে,
জন্মে জন্মে যুগে যুগান্তরে।
অমনি করে ঘনিয়ে তুমি এসো,
অমনি করে তড়িৎ হাসি হেসো,
অমনি করে উড়িয়ে দিয়ো কেশ।
অমনি করে নিবিড় ধারাজলে
অমনি করে ঘন তিমির তলে
আমায় তুমি করো নিরুদ্দেশ।

ওগো তোমার দরশ লাগি,
ওগো তোমার পরশ মাগি,
গুমরে মোর হিয়া।
রহি রহি পরান ব্যেপে
আগুনরেখা কেঁপে কেঁপে
যায় যে ঝলকিয়া।
আমার চিত্ত-আকাশ জুড়ে
বলাকা-দল যাচ্ছে উড়ে
জানি নে কোন্ দূর সমুদ্রপারে।
সজল বায়ু উদাস ছুটে,
কোথায় গিয়ে কেঁদে উঠে
পথবিহীন গহন অন্ধকারে।
ওগো তোমার আনো খেয়ার তরী,
তোমার সাথে যাব অকূল 'পরি,
যাব সকল বাঁধন-বাধা-খোলা।
ঝড়ের বেলা তোমার স্মিতহাসি
লাগবে আমার সর্বদেহে আসি,
তরাস-সাথে হরষ দিবে দোলা।

ঐ যেখানে ঈশানকোণে
তড়িৎ হানে ক্ষণে ক্ষণে
বিজন উপকূলে,
তটের পায়ে মাথা কুটে
তরঙ্গদল ফেনিয়ে উঠে
গিরির পদমূলে;
ঐ যেখানে মেঘের বেণী
জড়িয়ে আছে বনের শ্রেণী
মর্মরিছে নারিকেলের শাখা,

কত আষাঢ় মাসে
ভিজে মাটির বাসে
বাদলা হাওয়া বয়ে গেছে তাদের কাঁচা ধানে।
সে-সব ঘনঘটার দিনে সে ছিল এইখানে।

এই দিঘি, ঐ আমের বাগান, ঐ যে শিবালয়,
এই আঙিনা ডাক-নামে তার জানে পরিচয়।
এই পুকুরে তারি
সাঁতার-কাটা বারি ;
ঘাটের পথ-রেখা তারি চরণ-লেখাময়।
এই গাঁয়ে সে ছিল কে সেই জানে পরিচয়।

এই যাহারা কলস নিয়ে দাঁড়ায় ঘাটে আসি
এরা সবাই দেখেছিল তারি মুখের হাসি।
কুশল পুছি তারে
দাঁড়াত তার দ্বারে
লাঙল কাঁধে চলছে মাঠে ঐ যে প্রাচীন চাষি।
সে ছিল এই গাঁয়ে আমি যারে ভালোবাসি।

পালের তরী কত যে যায় বহি দখিন বায়ে,
দূরপ্রবাসের পথিক এসে বসে বকুলছায়ে ;
পারের যাত্রিদলে
খেয়ার ঘাটে চলে,
কেউ গো চেয়ে দেখে না ঐ ভাঙা ঘাটের বাঁয়ে।
আমি যারে ভালোবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে॥

৩৫

ওরে আমার কর্মহারা ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া
ওরে আমার মন রে আমার মন।
জানি নে তুই কিসের লাগি কোন্ জগতে আছিস জাগি,
কোন্ সেকালের বিলুপ্ত ভুবন।

কোন্ পুরানো যুগের বাণী অর্থ যাহার নাহি জানি,
তোমার মুখে উঠছে আজি ফুটে।
অনন্ত তোর প্রাচীন স্মৃতি কোন্ ভাষাতে গাঁথছে গীতি
শুনে চক্ষে অশ্রুধারা ছুটে।
আজি সকল আকাশ জুড়ে যাচ্ছে তোমার পাখা উড়ে
তোমার সাথে চলতে আমি নারি।
তুমি যাদের চিনি ব'লে টানছ বুকে নিচ্ছ কোলে
আমি তাদের চিনতে নাহি পারি।

আজকে নবীন চৈত্রমাসে পুরাতনের বাতাস আসে,
খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।
মিথ্যা আজি কাজের কথা, আজ জেগেছে যে-সব ব্যথা
এই জীবনে নাইকো তাহার হেতু।
গভীর চিত্তে গোপন শালা সেথা ঘুমায় যে রাজবালা
জানি নে সে কোন্ জনমের পাওয়া।
দেখে নিলেম ক্ষণেক তারে, যেমনি আজি মনের দ্বারে
যবনিকা উড়িয়ে দিল হাওয়া।
ফুলের গন্ধ চুপে চুপে আজি সোনার কাঠিরূপে
ভাঙাল তার চিরযুগের ঘুম।
দেখছে লয়ে মুকুর করে আঁকা তাহার ললাট 'পরে
কোন্ জনমের চন্দন-কুঙ্কুম।

আজকে হৃদয় যাহা কহে মিথ্যা নহে সত্য নহে,
কেবল তাহা অরূপ অপরূপ।
খুলে গেছে কেমন করে আজি অসম্ভবের ঘরে
মর্চে-পড়া পুরানো কুলুপ।
সেথায় মায়াদ্বীপের মাঝে নিমন্ত্রণের বীণা বাজে,
ফেনিয়ে উঠে নীল সাগরের ঢেউ,
মর্মরিত-তমাল-ছায়ে ভিজে-চিকুর শুকায় বায়ে
তাদের চেনে চেনে না বা কেউ।

শৈলতলে চরায় ধেনু রাখালশিশু বাজায় বেণু,
চূড়ায় তারা সোনার মালা পরে।
সোনার তুলি দিয়া লিখা চৈত্রমাসের মরীচিকা
কাঁদায় হিয়া অপূর্বধন-তরে।

গাছের পাতা যেমন কাঁপে দখিন-বায়ে মধুর তাপে,
তেমনি মম কাঁপছে সারা প্রাণ।
কাঁপছে দেহে কাঁপছে মনে হাওয়ার সাথে আলোর সনে,
মর্মরিয়া উঠছে কলতান।
কোন্ অতিথি এসেছে গো কারেও আমি চিনি নে গো
মোর দ্বারে কে করছে আনাগোনা।
ছায়ায় আজি তরুর মূলে ঘাসের 'পরে নদীর কূলে
ওগো তোরা শোনা আমায় শোনা—
দূর আকাশের ঘুম-পাড়ানি মৌমাছিদের মন-হারানি
জুঁই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান,
জলের গায়ে পুলক-দেওয়া ফুলের গন্ধ কুড়িয়ে-নেওয়া
চোখের পাতে ঘুম-বোলানো তান।

শুনাস নে গো ক্লান্ত বুকের বেদনা যত সুখের দুখের
প্রেমের কথা, আশার নিরাশার।
শুনাও শুধু মৃদুমন্দ অর্থবিহীন কথার ছন্দ
শুধু সুরের আকুল ঝংকার।
ধারাযন্ত্রে সিনান করি যত্নে তুমি এস পরি'
চাঁপাবরন লঘু বসনখানি।
ভালে আঁকো ফুলের রেখা চন্দনেরি পত্রলেখা,
কোলের 'পরে সেতার লহ টানি।
দূর দিগন্তে মাঠের পারে সুনীলছায়া গাছের সারে
নয়ন দুটি মগন করি চাও।
ভিন্নদেশী কবির গাঁথা অজানা কোন্ ভাষার গাথা
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া গাও।

৩৬

আমার খোলা জানালাতে
শব্দবিহীন চরণপাতে
কে এলে গো, কে গো তুমি এলে।
একলা আমি বসে আছি
অস্তলোকের কাছাকাছি
পশ্চিমেতে দুটি নয়ন মেলে।
অতি সুদূর দীর্ঘপথে
আকুল তব আঁচল হতে
আঁধারতলে গন্ধরেখা রাখি'
জোনাক-জ্বালা বনের শেষে
কখন এলে দুয়ারদেশে
শিথিল কেশে ললাটখানি ঢাকি।

তোমার সাথে আমার পাশে
কত গ্রামের নিদ্রা আসে,
পান্থবিহীন পথের বিজনতা,
ধূসর আলো কত মাঠের,
বধূশূন্য কত ঘাটের
আঁধার কোণে জলের কলকথা।
শৈলতটের পায়ের 'পরে
তরঙ্গদল ঘুমিয়ে পড়ে
স্বপ্ন তারি আনলে বহন করি,
কত বনের শাখে শাখে
পাখির যে গান সুপ্ত থাকে
এনেছ তাই মৌন নূপুর ভরি।

মোর ভালে ঐ কোমল হস্ত
এনে দেয় গো সূর্য-অস্ত,
এনে দেয় গো কাজের অবসান,

সত্যমিথ্যা ভালোমন্দ
সকল সমাপনের ছন্দ,
সন্ধ্যানদীর নিঃশেষিত তান।
আঁচল তব উড়ে এসে
লাগে আমার বক্ষে কেশে,
দেহ যেন মিলায় শূন্য'পরি,
চক্ষু তব মৃত্যুসম
স্তব্ধ আছে মুখে মম
কালো আলোয় সর্বহৃদয় ভরি।

যেমনি তব দখিন-পাণি
তুলে নিল প্রদীপখানি
রেখে দিল আমার গৃহকোণে।
গৃহ আমার একনিমেষে
ব্যাপ্ত হল তারার দেশে
তিমিরতটে আলোর উপবনে।
আজি আমার ঘরের পাশে
গগনপারের কারা আসে
অঙ্গ তাদের নীলাম্বরে ঢাকি।
আজি আমার দ্বারের কাছে
অনাদি রাত স্তব্ধ আছে
তোমার পানে মেলি তাহার আঁখি।

এই মুহূর্তে আধেক ধরা
লয়ে তাহার আঁধার-ভরা
কত বিরাম, কত গভীর প্রীতি
আমার বাতায়নে এসে
দাঁড়াল আজ দিনের শেষে,
শোনায় তোমায় গুঞ্জরিত গীতি।

চক্ষে তব পলক নাহি,
ধ্রুবতারার দিকে চাহি
তাকিয়ে আছ নিরুদ্দেশের পানে।
নীরব দুটি চরণ ফেলে
আঁধার হতে কে গো এলে
আমার ঘরে আমার গীতে গানে।
কত মাঠের শূন্যপথে,
কত পুরীর প্রান্ত হতে
কত সিন্ধুবালুর তীরে তীরে,
কত শান্ত নদীর পারে,
কত স্তব্ধ গ্রামের ধারে,
কত সুপ্ত গৃহদুয়ার ফিরে
কত বনের বায়ুর 'পরে
এলোচুলের আঘাত ক'রে
আসিলে আজ হঠাৎ অকারণে।
বহু দেশের বহু দূরের
বহু দিনের বহু সুরের
আনিলে গান আমার বাতায়নে।

৩৭

আলোকে আসিয়া এরা লীলা করে যায়
আঁধারেতে চলে যায় বাহিরে।
ভাবে মনে বৃথা এই আসা আর যাওয়া,
অর্থ কিছুই এর নাহি রে।
কেন আসি, কেন হাসি,
কেন আঁখিজলে ভাসি,
কার কথা বলে যাই,
কার গান গাহি রে—
অর্থ কিছুই তার নাহি রে।

ওরে মন আয় তুই সাজ ফেলে আয়,
মিছে কী করিস নাট-বেদীতে ?
বুঝিতে চাহিস যদি বাহিরেতে আয়
খেলা ছেড়ে আয় খেলা দেখিতে।
ওই দেখ্ নাটশালা
পরিয়াছে দীপমালা,
সকল রহস্য তুই
চাস যদি ভেদিতে
নিজে না ফিরিস নাট-বেদীতে।

নেমে এসে দূরে এসে দাঁড়াবি যখন,—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি,
এই হাসি-রোদনের মহানাটকের
অর্থ তখন কিছু বুঝিবি।
একের সহিত একে
মিলাইয়া নিবি দেখে,
বুঝে নিবি,—বিধাতার
সাথে নাহি যুঝিবি,—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি।

৩৮

চিরকাল এ কী লীলা গো—
অনন্ত কলরোল।
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল।
দুলিছ গো, দোলা দিতেছ।
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।

সম্মুখে যখন আসি,
তখন পুলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি।
সম্মুখে যেমন পিছেও তেমন
মিছে করি মোরা গোল।
চিরকাল এ কী লীলা গো
অনন্ত কলরোল।

ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।
নিজধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী যে কর কে বা জানে।
কোথা বসে আছ একেলা।
সব রবিশশী কুড়ায়ে লইয়া
তালে তালে কর এ খেলা।
খুলে দাও ক্ষণতরে,
ঢাকা দাও ক্ষণপরে,
মোরা কেঁদে ভাবি আমারি কী ধন
কে লইল বুঝি হ'রে?
দেওয়া-নেওয়া তব সকলি সমান,
সে-কথাটি কে বা জানে।
ডান হাত হতে বাম হাতে লও
বাম হাত হতে ডানে।

এইমতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।
চির দিনরাত আপনার সাথ
আপনি খেলিছ পাশা।

আছে তো যেমন যা ছিল।
হারায় নি কিছু ফুরায় নি কিছু
যে মরিল যে বা বাঁচিল।
বহি সব সুখদুখ
এ ভুবন হাসিমুখ,
তোমারি খেলার আনন্দে তার
ভরিয়া উঠেছে বুক।
আছে সেই আলো, আছে সেই গান,
আছে সেই ভালোবাসা।
এইমতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।

৩৯

সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো
সে কি তুমি, মোর সভাতে?
হাতে ছিল তব বাঁশি,
অধরে অবাক হাসি,
সেদিন ফাগুন মেতে উঠেছিল
মদবিহ্বল শোভাতে।
সে কি তুমি, ওগো, তুমি এসেছিলে
সেদিন নবীন প্রভাতে—
নবযৌবন-সভাতে?

সেদিন আমার যত কাজ ছিল
সব কাজ তুমি ভুলালে।
খেলিলে সে কোন্ খেলা,
কোথা কেটে গেল বেলা।
ঢেউ দিয়ে দিয়ে হৃদয়ে আমার
রক্তকমল দুলালে।

পুলকিত মোর পরানে তোমার
বিলোল নয়ন বুলালে,—
সব কাজ মোর ভুলালে।

তার পরে হায় জানি নে কখন
ঘুম এল মোর নয়নে।
উঠিনু যখন জেগে,
ঢেকেছে গগন মেঘে,—
তরুতলে আছি একেলা পড়িয়া
দলিত পত্র-শয়নে।
তোমাতে আমাতে রত ছিনু যবে
কাননে কুসুম-চয়নে
ঘুম এল মোর নয়নে।

সেদিনের সভা ভেঙে গেছে সব
আজি ঝরঝর বাদরে।
পথে লোক নাহি আর,
রুদ্ধ করেছি দ্বার,
একা আছে প্রাণ ভূতলে শয়ান
আজিকার ভরা ভাদরে।
তুমি কি দুয়ারে আঘাত করিলে,
তোমারে লব কি আদরে
আজি ঝরঝর বাদরে?

তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন
তাপস-মূরতি ধরিয়া।
স্তিমিত নয়নতারা
ঝলিছে অনলধারা,
সিক্ত তোমার জটাজুট হতে
সলিল পড়িছে ঝরিয়া।

বাহির হইতে ঝড়ের আঁধার
আনিয়াছ সাথে করিয়া
তাপস-মুরতি ধরিয়া।

নমি হে ভীষণ, মৌন, রিক্ত,
এস মোর ভাঙা আলয়ে।
ললাটে তিলকরেখা,
যেন সে বহ্নিলেখা,
হস্তে তোমার লৌহদণ্ড
বাজিছে লৌহবলয়ে।
শূন্য ফিরিয়া যেয়ো না, অতিথি,
সব ধন মোর না লয়ে।
এস এস ভাঙা আলয়ে।

৪০

মন্ত্রে সে যে পূত
রাখির রাঙা সুতো,
বাঁধন দিয়েছিনু হাতে
আজ কি আছে সেটি হাতে?
বিদায়-বেলা এল মেঘের মতো ব্যেপে,
গ্রন্থি বেঁধে দিতে দু-হাত গেল কেঁপে,
সেদিন থেকে থেকে চক্ষুদুটি ছেপে
ভরে যে এল জলধারা।
আজকে বসে আছি পথের এক পাশে,
আমের ঘন বোলে বিভোল মধুমাসে,
তুচ্ছ কথাটুকু কেবল মনে আসে
ভ্রমর যেন পথহারা;—
সেই যে বাম হাতে একটি সরু রাখি
আধেক রাঙা, সোনা আধা
আজো কি আছে সেটি বাঁধা?

পথ যে কতখানি
কিছুই নাহি জানি,
মাঠের গেছে কোন্ শেষে,
চৈত্র ফসলের দেশে।
যখন গেলে চলে তোমার গ্রীবামূলে
দীর্ঘ বেণী তব এলিয়ে ছিল খুলে,
মাল্যখানি গাঁথা সাঁজের কোন্ ফুলে
লুটিয়ে পড়েছিল পায়ে।
একটুখানি তুমি দাঁড়িয়ে যদি যেতে।
নতুন ফুলে দেখো কানন ওঠে মেতে,
দিতেম ত্বরা করে নবীন মালা গেঁথে
কনকচাঁপা-বনছায়ে।
মাঠের পথে যেতে তোমার মালাখানি
প'ল কি বেণী হতে খসে?
আজকে ভাবি তাই বসে।

নূপুর ছিল ঘরে
গিয়েছ পায়ে পরে,
নিয়েছ হেথা হতে তাই,
অঙ্গে আর কিছু নাই।
আকুল কলতানে শতেক রসনায়
চরণ ঘেরি তব কাঁদিছে করুণায়,
তাহারা হেথাকার বিরহবেদনায়
মুখর করে তব পথ।
জানি না কী এত যে তোমার ছিল ত্বরা,
কিছুতে হল না যে মাথার ভূষা পরা,
দিতেম খুঁজে এনে সিঁথিটি মনোহরা
রহিল মনে মনোরথ।

হেলায় বাঁধা সেই নূপুর দুটি পায়ে
আছে কি পথে গেছে খুলে,
সে-কথা ভাবি তরুমূলে।

অনেক গীত গান
করেছি অবসান
অনেক সকালে ও সাঁজে
অনেক অবসরে কাজে।
তাহারি শেষ গান আধেক লয়ে কানে
দীর্ঘপথ দিয়ে গেছ সুদূর পানে,
আধেক জানা সুরে আধেক ভোলা তানে
গেয়েছ গুনগুন স্বরে।
কেন না গেলে শুনি একটি গান আরো,
সে গান শুধু তব, সে নহে আর কারো,
তুমিও গেলে চলে সময় হল তারো,
ফুটল তব পূজা-তরে।
মাঠের কোন্খানে হারাল শেষ সুর
যে গান নিয়ে গেলে শেষে,
ভাবি যে তাই অনিমেষে।

৪১

পথের পথিক করেছ আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো।
আলেয়া জ্বালালে প্রান্তরভালে
সেই আলো মোর সেই আলো।
ঘাটে বাঁধা ছিল খেয়া-তরি,
তাও কি ডুবালে ছল করি?
সাঁতারিয়া পার হব বহি ভার,
সেই ভালো মোর সেই ভালো।

ঝড়ের মুখে যে ফেলেছ আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো।
সব সুখজালে বজ্র জ্বালালে
সেই আলো মোর সেই আলো।
সাথি যে আছিল নিলে কাড়ি,
কী ভয় লাগালে, গেল ছাড়ি।
একাকীর পথে চলিব জগতে
সেই ভালো মোর সেই ভালো।

কোনো মান তুমি রাখ নি আমার
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো।
হৃদয়ের তলে যে আগুন জ্বলে
সেই আলো মোর সেই আলো।
পাথেয় যে-কটি ছিল কড়ি
পথে খসি কবে গেছে পড়ি,
শুধু নিজবল আছে সম্বল
সেই ভালো মোর সেই ভালো।

৪২

আলো নাই, দিন শেষ হল, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
ঘণ্টা বাজিল দূরে,
ওপারের রাজপুরে,
এখনো যে পথে চলেছিস তুই
হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

দেখ্ সবে ঘরে ফিরে এল, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

পূজা সারি দেবালয়ে
প্রসাদী কুসুম লয়ে,
এখন ঘুমের কর্ আয়োজন
হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

রজনী আঁধার হয়ে আসে, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
ওই যে গ্রামের 'পরে
দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে,
দীপহীন পথে কী করিবি একা
হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

এত বোঝা লয়ে কোথা যাস, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
নামাবি এমন ঠাঁই
পাড়ায় কোথা কি নাই?
কেহ কি শয়ন রাখে নাই পাতি
হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

পথের চিহ্ন দেখা নাহি যায়
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
কোন্ প্রান্তরশেষে
কোন্ বহুদূরদেশে,
কোথা তোর রাত হবে যে প্রভাত
হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ॥

৪৩

সাঙ্গ হয়েছে রণ।
অনেক যুঝিয়া অনেক খুঁজিয়া
শেষ হল আয়োজন।
তুমি এস, এস নারী,
আনো তব হেমঝারি।
ধুয়ে-মুছে দাও ধূলির চিহ্ন,
জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন-ছিন্ন,
সুন্দর করো, সার্থক করো
পুঞ্জিত আয়োজন।
এস সুন্দরী নারী
শিরে লয়ে হেমঝারি।

হাটে আর নাহি কেহ।
শেষ করে গেলা ছেড়ে এনু মেলা,
গ্রামে গাড়িলাম গেহ।
তুমি এস, এস নারী,
আনো গো তীর্থবারি।
স্নিগ্ধ-হসিত বদন-ইন্দু
সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদুর-বিন্দু,
মঙ্গল করো, সার্থক করো
শূন্য এ মোর গেহ।
এস কল্যাণী নারী
বহিয়া তীর্থবারি।

বেলা কত যায় বেড়ে।
কেহ নাহি চাহে খর-রবি-দাহে
পরবাসী পথিকেরে।
তুমি এস, এস নারী,
আনো তব সুধাবারি।

বাজাও তোমার নিষ্কলঙ্ক
শত-চাঁদে-গড়া শোভন শঙ্খ,
বরণ করিয়া সার্থক করো
পরবাসী পথিকেরে।
আনন্দময়ী নারী,
আনো তব সুধাবারি।

স্রোতে যে ভাসিল ভেলা।
এবারের মতো দিন হল গত
এল বিদায়ের বেলা।
তুমি এস, এস নারী,
আনো গো অশ্রুবারি।
তোমার সজল কাতর দৃষ্টি
পথে করে দিক করুণাবৃষ্টি,
ব্যাকুল বাহুর পরশে ধন্য
হ'ক বিদায়ের বেলা।
অয়ি বিষাদিনী নারী
আনো গো অশ্রুবারি।

আঁধার নিশীথরাতি।
গৃহ নির্জন শূন্য শয়ন
জ্বলিছে পূজার বাতি।
তুমি এস, এস নারী,
আনো তর্পণবারি।
অবারিত করি ব্যথিত বক্ষ
খোলো হৃদয়ের গোপন কক্ষ,
এলো-কেশপাশে শুভ্র-বসনে
জ্বালাও পূজার বাতি।
এস তাপসিনী নারী,
আনো তর্পণবারি॥

৪৪

আমাদের এই পল্লিখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা,
দেবদারুর কুঞ্জে ধেনু চরায় রাখালেরা।
কোথা হতে চৈত্রমাসে হাঁসের শ্রেণী উড়ে আসে
অঘ্রানেতে আকাশপথে যায় যে তারা কোথা
আমরা কিছুই জানি নেকো সেই সুদূরের কথা।
আমরা জানি গ্রাম কখানি, চিনি দশটি গিরি,
মা ধরণী রাখেন মোদের কোলের মধ্যে ঘিরি।

সে ছিল ঐ বনের ধারে ভুট্টাখেতের পাশে
যেখানে ঐ ছায়ার তলে জলটি ঝরে আসে।
ঝরনা হতে আনতে বারি জুটত হোথা অনেক নারী,
উঠত কত হাসির ধ্বনি তারি ঘরের দ্বারে,
সকাল-সাঁঝে আনাগোনা তারি পথের ধারে।
মিশত কুলুকুলুধ্বনি তারি দিনের কাজে,
ঐ রাগিণী পথ হারাত তারি ঘুমের মাঝে।

সন্ধ্যাবেলায় সন্ন্যাসী এক বিপুল জটা শিরে
মেঘে-ঢাকা শিখর হতে নেমে এলেন ধীরে।
বিস্ময়েতে আমরা সবে শুধাই, "তুমি কে গো হবে?"
বসল যোগী নিরুত্তরে নির্ঝরিণীর কূলে
নীরবে সেই ঘরের পানে স্থির নয়ন তুলে।
অজানা কোন্ অমঙ্গলে বক্ষ কাঁপে ডরে,
রাত্রি হল, ফিরে এলেম যে যার আপন ঘরে।

পরদিনে প্রভাত হল দেবদারুর বনে,
ঝরনাতলায় আনতে বারি জুটল নারীগণে।
দুয়ার খোলা দেখে আসি, নাই সে খুশি, নাই সে হাসি,
জলশূন্য কলসখানি গড়ায় গৃহতলে,
নিব-নিব প্রদীপটি সেই ঘরের কোণে জ্বলে।

কোথায় সে যে চলে গেল রাত না পোহাতেই
শূন্য ঘরের দ্বারের কাছে সন্ন্যাসীও নেই।

চৈত্রমাসে রৌদ্র বাড়ে বরফ গলে পড়ে,—
ঝরনাতলায় বসে মোরা কাঁদি তাহার তরে।
আজিকে এই তৃষার দিনে কোথায় ফিরে নিঝর বিনে
শুষ্ক কলস ভরে নিতে কোথায় পাবে ধারা।
কে জানে সে নিরুদ্দেশে কোথায় হল হারা।
কোথাও কিছু আছে কি গো—শুধাই যারে তারে,—
আমাদের এই আকাশ-ঢাকা দশপাহাড়ের পারে ?

গ্রীষ্মরাতে বাতায়নে বাতাস হু হু করে,
বসে আছি প্রদীপ-নেবা তাহার শূন্য ঘরে।
শুনি বসে দ্বারের কাছে ঝরনা যেন তারেই যাচে
বলে, "ওগো আজকে তোমার নাই কি কোনো তৃষা,
জলে তোমার নাই প্রয়োজন এমন গ্রীষ্মনিশা ?"
আমিও কেঁদে কেঁদে বলি, "হে অজ্ঞাতচারী,
তৃষা যদি হারাও তবু ভুলো না এই বারি।"

হেনকালে হঠাৎ যেন লাগল চোখে ধাঁধা,
চারিদিকে চেয়ে দেখি নাই পাহাড়ের বাধা।
ঐ যে আসে, কারে দেখি ? আমাদের যে ছিল সে কি ?
ওগো তুমি কেমন আছ, আছ মনের সুখে ?
খোলা আকাশতলে হেথা ঘর কোথা কোন্ মুখে ?
নাইকো পাহাড়, কোনোখানে ঝরনা নাহি ঝরে,
তৃষ্ণা পেলে কোথায় যাবে বারিপানের তরে ?

সে কহিল, "যে ঝরনা সেথা মোদের দ্বারে,
নদী হয়ে সে-ই চলেছে হেথা উদার-ধারে।

সে আকাশ সেই পাহাড় ছেড়ে অসীম পানে গেছে বেড়ে
সেই ধরারেই নাইকো হেথা পাষাণ-বাঁধা বেঁধে।"
"সবই আছে, আমরা তো নেই" কইনু তারে কেঁদে।
সে কহিল করুণ হেসে, "আছ হৃদয়মূলে।"
স্বপন ভেঙে চেয়ে দেখি আছি ঝরনাকূলে॥

৪৫

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো এ কি প্রণয়েরি ধরণ?
যবে সন্ধ্যাবেলায় ফুলদল
পড়ে ক্লান্ত বৃন্তে নমিয়া,
যবে ফিরে আসে গোঠে গাভীদল
সারা দিনমান মাঠে ভ্রমিয়া,
তুমি পাশে আসি বস অচপল
ওগো অতি মৃদুগতি-চরণ।
আমি বুঝি না যে কী যে কথা কও,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

হায় এমনি করে কি, ওগো চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
চোখে বিছাইয়া দিবে ঘুমঘোর
করি হৃদিতলে অবতরণ।
তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অবশ বক্ষশোণিতে?
কানে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কিঙ্কিণি-রণরণিতে?

শেষে পসারিয়া তব হিম-কোল
মোরে স্বপনে করিবে হরণ ?
আমি বুঝি না যে কেন আস-যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

কহ মিলনের এ কি রীতি এই,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তার সমারোহভার কিছু নেই
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ ?
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না ?
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে-পিছে কেহ ববে না ?
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙাবরন ?
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তাঁর কতমতো ছিল আয়োজন,
ছিল কতশত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্বম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

শুনি শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থর থর
তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জরজর
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর,
খেপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

তুমি চুরি করি কেন এস চোর
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
শুধু নীরবে কখন নিশি ভোর,
শুধু অশ্রু-নির্ঝর-ঝরন।
তুমি উৎসব করো সারারাত
তব বিজয়-শঙ্খ বাজায়ে।
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত
নব রক্তবসনে সাজায়ে।
তুমি কারে করিয়ো না দৃকপাত
আমি নিজে লব তব শরণ,
যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
ক'রো সব লাজ অপহরণ।

যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধজাগরূক নয়নে,—
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

আমি যাব, যেথা তব তরী রয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
করি আঁধারের অনুসরণ।
যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

৪৬

সে তো সেদিনের কথা, বাক্যহীন যবে
এসেছিনু প্রবাসীর মতো এই ভবে
বিনা কোনো পরিচয়, রিক্ত শূন্য হাতে,
একমাত্র ক্রন্দন সম্বল লয়ে সাথে।
আজ সেথা কী করিয়া মানুষের প্রীতি
কণ্ঠ হতে টানি লয় যত মোর গীতি।

এ ভুবনে মোর চিত্তে অতি অল্প স্থান
নিয়েছ, ভুবননাথ। সমস্ত এ প্রাণ
সংসারে করেছ পূর্ণ। পাদপ্রান্তে তব
প্রত্যহ যে ছন্দে বাঁধা গীত নব নব
দিতেছি অঞ্জলি, তাও তব পূজাশেষে
লবে সবে তোমা সাথে মোরে ভালোবেসে
এই আশাখানি মনে আছে অবিচ্ছেদে।
যে প্রবাসে রাখ সেথা প্রেমে রাখো বেঁধে॥

নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে
বাঁধিবে এমনি প্রেমে। প্রেমের আলোকে
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পুষ্পদলে; প্রেম-আকর্ষণে
যত গূঢ় মধু মোর অন্তরে বিলসে
উঠিবে অক্ষয় হয়ে নব নব রসে
বাহিরে আসিবে ছুটি,— অন্তহীন প্রাণে
নিখিল জগতে তব প্রেমের আহ্বানে
নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে,
নব নব বিকাশের বর্ণ যাব এঁকে।
কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতা-কূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে? নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে॥

সংযোজন

১

"হে পথিক, কোন্‌খানে
চলেছ কাহার পানে ?"

"গিয়েছে রজনী উঠে দিনমণি
চলেছি সাগরস্নানে।
উষার আভাসে তুষার বাতাসে
পাখির উদার গানে
শয়ন তেয়াগি উঠিয়াছি জাগি
চলেছি সাগরস্নানে।"

"শুধাই তোমার কাছে
সে সাগর কোথা আছে ?"

"যেথা এই নদী বহি নিরবধি
নীল জলে মিশিয়াছে।
সেথা হতে রবি উঠে নবছবি
লুকায় তাহারি পাছে,
তপ্ত প্রাণের তীর্থ-স্নানের
সাগর সেথায় আছে।"

"পথিক তোমার দলে
যাত্রী কজন চলে ?"

"গনি তাহা, ভাই, শেষ নাহি পাই,
চলেছে জলে স্থলে।
তাহাদের বাতি জ্বলে সারারাতি
তিমির আকাশতলে।
তাহাদের গান সারা দিনমান
ধ্বনিছে জলে স্থলে।"

"সে সাগর কহ তবে
আর কত দূরে হবে?"

"আর কত দূরে আর কত দূরে
সেই তো শুধাই সবে।
ধ্বনি তার আসে দখিন বাতাসে
ঘন ভৈরব রবে।
কভু ভাবি কাছে, কভু দূরে আছে,
আর কত দূরে হবে?"

"পথিক, গগনে চাহ,
বাড়িছে দিনের দাহ।"

"বাড়ে যদি দুখ হব না বিমুখ,
নিবাব না উৎসাহ।
ওরে ওরে ভীত তৃষিত তাপিত
জয়সংগীত গাহ।
মাথার উপরে খর রবিকরে
বাড়ুক দিনের দাহ।"

"কী করিবে চলে চলে
পথেই সন্ধ্যা হলে?"

"প্রভাতের আশে স্নিগ্ধ বাতাসে
ঘুমাব পথের কোলে।
উদিবে অরুণ নবীন করুণ
বিহঙ্গ-কলরোলে।
সাগরের স্নান হবে সমাধান
নূতন প্রভাত হলে।"

২

কী কথা বলিব বলে
বাহিরে এলেম চলে
দাঁড়ালেম দুয়ারে তোমার,
ঊর্ধ্বমুখে উচ্চরবে
বলিতে গেলেম যবে
কথা নাহি আর।
যে-কথা বলিতে চাহে প্রাণ
সে শুধু হইয়া উঠে গান।
নিজে না বুঝিতে পারি
তোমারে বুঝাতে নারি
চেয়ে থাকি উৎসুক-নয়ান।

তবে কিছু শুনায়ো না
শুনে যাও আনমনা
যাহা বোঝ, যাহা নাই বোঝ।
সন্ধ্যার আঁধার 'পরে
মুখে আর কণ্ঠস্বরে
বাকিটুকু খোঁজো।
কথায় কিছু না যায় বলা
গান সেও উন্মত্ত উতলা।
তুমি যদি মোর সুরে
নিজ কথা দাও পুরে
গীতি মোর হবে না বিফলা।

৩

কত দিবা কত বিভাবরী
কত নদী নদে লক্ষ স্রোতের
মাঝখানে এক পথ ধরি,
কত ঘাটে ঘাটে লাগায়ে,
কত সারিগান জাগায়ে,
কত অঘ্রানে নব নব ধানে
কতবার কত বোঝা ভরি',
কর্ণধার হে কর্ণধার,
বেচে কিনে কত স্বর্ণভার,
কোন্ গ্রামে আজ সাধিতে কী কাজ
বাঁধিয়া ধরিলে তব তরী।

হেথা বিকিকিনি কার হাটে?
কেন এত ত্বরা লইয়া পসরা,
ছুটে চলে এরা কোন্ বাটে?
শুন গো থাকিয়া থাকিয়া
বোঝা লয়ে যায় হাঁকিয়া,
সে করুণ স্বরে মন কী যে করে
কী ভেবে আমার দিন কাটে।
কর্ণধার হে কর্ণধার,
বেচে কিনে লও স্বর্ণভার,
হেথা কারা রয় লহ পরিচয়
কারা আসে যায় এই ঘাটে।

যেথা হতে যাই, যাই কেঁদে।
এমনটি আর পাব কি আবার
সরে না যে মন সেই খেদে।
সে-সব কাঁদন ভুলালে,
কী দোলায় প্রাণ দুলালে?

হোথা যারা তীরে আনমনে ফিরে
আমি তাহাদের মরি সেধে।
কর্ণধার হে কর্ণধার,
বেচে কিনে লও স্বর্ণভার।
এই হাটে নামি দেগে লব আমি
এক বেলা তরী রাখো বেঁধে।

গান ধর তুমি কোন্ সুরে।
মনে পড়ে যায় দূর হতে এনু,
যেতে হবে পুন কোন্ দূরে।
শুনে মনে পড়ে দুজনে
খেলেছি সজনে বিজনে,
সে যে কত দেশ নাহি তার শেষ
সে যে কত কাল এনু ঘুরে।
কর্ণধার হে কর্ণধার,
বেচে কিনে লও স্বর্ণভার।
বাজিয়াছে শাঁখ, পড়িয়াছে ডাক
সে কোন্ অচেনা রাজপুরে।

৪

দিয়েছ প্রশ্রয় মোরে, করুণানিলয়,
হে প্রভু, প্রত্যহ মোরে দিয়েছ প্রশ্রয়।
ফিরেছি আপন-মনে আলসে লালসে
বিলাসে আবেশে ভেসে প্রবৃত্তির বশে
নানা পথে, নানা ব্যর্থ কাজে,—তুমি তবু
তখনো যে সাথে সাথে ছিলে মোর, প্রভু,
আজ তাহা জানি। যে অলস চিন্তা-লতা
প্রচুর পল্লবাকীর্ণ ঘন জটিলতা

হৃদয়ে বেষ্টিয়াছিল, তারি শাখাজালে
তোমার চিন্তার ফুল আপনি ফুটালে,
নিগূঢ় শিকড়ে তার বিন্দু বিন্দু সুধা
গোপনে সিঞ্চন করি'। দিয়ে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
দিয়ে দণ্ড পুরস্কার, সুখ দুঃখ ভয়
নিয়ত টানিয়া কাছে দিয়েছ প্রশ্রয়।

৫

রোগীর শিয়রে রাত্রে একা ছিনু জাগি,
বাহিরে দাঁড়ানু এসে ক্ষণেকের লাগি।
শান্ত মৌন নগরীর সুপ্ত হর্ম্যশিরে
হেরিনু জ্বলিছে তারা নিস্তব্ধ তিমিরে।
ভূত ভাবী বর্ত্তমান একটি পলকে
মিলিল বিষাদস্নিগ্ধ আনন্দপুলকে
আমার অন্তরতলে ; অনির্বচনীয়
সে-মুহূর্তে জীবনের যত কিছু প্রিয়,
দুর্লভ বেদনা যত, যত গত সুখ,
অনুদ্‌গত অশ্রুবাষ্প, গীত মৌনমূক
আমার হৃদয়পাত্রে হয়ে রাশি রাশি
কী অনলে উজ্জ্বলিল। সৌরভে নিঃশ্বাসি'
অপরূপ ধূপধূম্র উঠিল সুধীরে
তোমার নক্ষত্রদীপ্ত নিঃশব্দ মন্দিরে।

৬

কাল যবে সন্ধ্যাকালে বন্ধুসভাতলে
গাহিতে তোমার গান কহিল সকলে,
সহসা রুধিয়া গেল হৃদয়ের দ্বার,
যেথায় আসন তব গোপন আগার।

স্থানভেদে তব গান মূর্তি নব নব,
সভাসনে হাস্যোচ্ছ্বাস সেও গান তব,
প্রিয়াসনে প্রিয়ালাপ, শিশুসনে খেলা,
জগতে যেথায় যত আনন্দের মেলা,
সর্বত্র তোমার গান বিচিত্র গৌরবে
আপনি ধ্বনিতে থাকে সরবে নীরবে।
আকাশে তারকা ফুটে ফুলবনে ফুল,
খনিতে মানিক থাকে হয় নাকো ভুল,
তেমনি আপনি তুমি যেখানে যে গান
রেখেছ, কবিও যেন রাখে তার মান।

৭

নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয় ;
হেরি সে মত্ততা মোর বৃদ্ধ আসি কয়—
তাঁর ভৃত্য হয়ে তোর এ কী চপলতা।
কেন হাস্য-পরিহাস, প্রণয়ের কথা,
কেন ঘরে ঘরে ফিরি তুচ্ছ গীতরসে
ভুলাস এ সংসারের সহস্র অলসে।
দিয়েছি উত্তর তাঁরে—ওগো পককেশ,
আমার বীণায় বাজে তাঁহারি আদেশ।
যে আনন্দে, যে অনন্ত চিত্তবেদনায়
ধ্বনিত মানব-প্রাণ, আমার বীণায়
দিয়েছেন তারি সুর,—সে তাঁহারি দান,
সাধ্য নাই নষ্ট করি সে বিচিত্র গান।
তব আজ্ঞা রক্ষা করি নাই সে-ক্ষমতা,
সাধ্য নাই তাঁর আজ্ঞা করিতে অন্যথা।

৮

বিরহ-বৎসর পরে, মিলনের বীণা
তেমন উন্মাদ-মন্দ্রে কেন বাজিলি না ?
কেন তোর সপ্তস্বর সপ্তস্বর্গপানে
ছুটিয়া গেল না ঊর্ধ্বে উদ্দাম পরানে
বসন্তে মানস-যাত্রী বলাকার মতো ?
কেন তোর সর্ব তন্ত্র সবলে প্রহত
মিলিত ঝংকারভরে কাঁপিয়া কাঁদিয়া
আনন্দের আর্তরবে চিত্ত উন্মাদিয়া
উঠিল না বাজি' ? হতাশ্বাস মৃদুস্বরে
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া লাজে শঙ্কাভরে
কেন মৌন হল ? তবে কি আমারি প্রিয়া
সে পরশ-নিপুণতা গিয়াছে ভুলিয়া ?
তবে কি আমারি বীণা ধূলিচ্ছিন্ন-তার,
সেদিনের মতো ক'রে বাজে নাকো আর ?

৯

ওরে পদ্মা, ওরে মোর রাক্ষসী প্রেয়সী
লুব্ধ বাহু বাড়াইয়া উচ্ছ্বসি উল্লসি
আমারে কি পেতে চাস চির আলিঙ্গনে ?
শুধু এক মুহূর্তের উন্মত্ত মিলনে
তোর বক্ষমাঝে চাস করিতে বিলয়
আমার বক্ষের যত সুখ দুঃখ ভয় ?
আমিও তো কতদিন ভাবিয়াছি মনে
বসি' তোর তটোপান্তে প্রশান্ত নির্জনে,
বাহিরে চঞ্চলা তুই প্রমত্ত মুখরা
শাণিত অসির মতো ভীষণ প্রখরা,

অন্তরে নিভৃত স্নিগ্ধ শান্ত সুগম্ভীর,—
দীপহীন রুদ্ধদ্বার অর্ধ রজনীর
বাসরঘরের মতো নিষুপ্ত নির্জন ;—
সেথা কার তরে পাতা সুচির শয়ন ?

১০

অচির বসন্ত হায় এল, গেল চলে,
এবার কিছু কি কবি করেছ সঞ্চয় ?
ভরেছ কি কল্পনার কনক-অঞ্চলে
চঞ্চল-পবন-ক্লিষ্ট শ্যাম কিশলয়,
ক্লান্ত করবীর গুচ্ছ ? তপ্ত রৌদ্র হতে
নিয়েছ কি গলাইয়া যৌবনের সুরা,
ঢেলেছ কি উচ্ছলিত তব ছন্দঃস্রোতে,
রেখেছ কি করি তারে অনন্ত মধুরা।

এ বসন্তে প্রিয়া তব পূর্ণিমা নিশীথে
নবমল্লিকার মালা জড়াইয়া কেশে,
তোমার আকাঙ্ক্ষাদীপ্ত অতৃপ্ত আঁখিতে
যে দৃষ্টি হানিয়াছিল একটি নিমেষে,
সে কি রাখ নাই গেঁথে অক্ষয় সংগীতে ?
সে কি গেছে পুষ্পচ্যুত সৌরভের দেশে ?

১১

হে জনসমুদ্র, আমি ভাবিতেছি মনে
কে তোমারে আন্দোলিছে বিরাট মন্থনে
অনন্ত বরষ ধরি। দেব-দৈত্যদলে
কী রত্ন সন্ধান লাগি তোমার অতলে
অশান্ত আবর্ত নিত্য রেখেছে জাগায়ে
পাপে পুণ্যে সুখে দুঃখে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়

ফেনিল কল্লোলভঙ্গে ? ওগো দাও দাও
কী আছে তোমার গর্ভে—এ ক্ষোভ থামাও।
তোমার অন্তরলক্ষ্মী যে শুভপ্রভাতে
উঠিবেন অমৃতের পাত্র বহি হাতে
বিস্মিত ভুবনমাঝে,—লয়ে বরমালা
ত্রিলোকনাথের কণ্ঠে পরাবেন বালা,
সেদিন হইবে ক্ষান্ত এ মহামন্থন,
থেমে যাবে সমুদ্রের রুদ্র এ ক্রন্দন।

১২

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে
শুন এ কবির গান।
তোমার চরণে নবীন হর্ষে
এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের দেহের শকতি,
এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্মের মতি,
এনেছি মোদের প্রাণ।
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান।

কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের,
অন্ন নাহিকো জুটে।
যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে
নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজ নাই প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,

চিরদারিদ্র্য করিব মোচন
চরণের ধুলা লুটে।
সুর-দুর্লভ তোমার প্রসাদ
লইব পর্ণপুটে।

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয়।
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয়।
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন
তাই আমাদের দিয়ো।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয়।

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র,
অশোকমন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,
দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব।

১৩

নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত, লব শিক্ষা।
পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন,
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।
নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা।

না থাকে প্রাসাদ, আছে তো কুটির
কল্যাণে সুবিচিত্র।
না থাকে নগর আছে তব বন
ফলে ফুলে সুপবিত্র।
তোমা হতে যত দূরে গেছি সরে
তোমারে দেখেছি তত ছোটো করে
কাছে দেখি আজ, হে হৃদয়রাজ
তুমি পুরাতন মিত্র।
হে তাপস, তব পর্ণকুটির
কল্যাণে সুপবিত্র।

পরের বাক্যে তব পর হয়ে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা।
তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ,
পরেছি পরের সজ্জা।

কিছু নাহি গনি' কিছু নাহি কহি'
জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি,
তব সনাতন ধ্যানের আসন
মোদের অস্থিমজ্জা।
পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা।

সে সকল লাজ তেয়াগিব আজ
লইব তোমার দীক্ষা।
তব পদতলে বসিয়া বিরলে
শিখিব তোমার শিক্ষা।
তোমার ধর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম,
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম্ম
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা।
তব গৌরবে গরব মানিব
লইব তোমার দীক্ষা।

———

খেয়া

উৎসর্গ

বিজ্ঞানাচার্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

করকমলেষু

বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা।

কী পেয়েছে আকাশ হতে,

কী এসেছে বায়ুর স্রোতে,

পাতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে

সে যে প্রাণের কথা।

যত্নভরে খুঁজে খুঁজে

তোমায় নিতে হবে বুঝে,

ভেঙে দিতে হবে যে তার

নীরব ব্যাকুলতা।

আমার লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু, সন্ধ্যা এল, স্বপনভরা

পবন এরে চুমে।

ডালগুলি সব পাতা নিয়ে

জড়িয়ে এল ঘুমে।

ফুলগুলি সব নীল নয়ানে

চুপি চুপি আকাশপানে

তারার দিকে চেয়ে চেয়ে

কোন্ ধেয়ানে রতা।

আমার লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু, আনো তোমার তড়িৎ-পরশ,
হরষ দিয়ে দাও,—
করুণ চক্ষু মেলে ইহার
মর্মপানে চাও।
সারাদিনের গন্ধগীতি
সারাদিনের আলোর স্ফূর্তি
নিয়ে এ যে হৃদয়ভারে
ধরায় অবনতা ;—
আমার লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু, তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয় ;—
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।
এই যে মুদে আছে লাজে
পড়বে তুমি এরি মাঝে
জীবনমৃত্যু রৌদ্রছায়া
ঝটিকার বারতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।

১৮ আষাঢ় ১৩১৩
কলিকাতা

খেয়া

শেষ খেয়া

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ঐ ছায়া
ভুলাল রে ভুলাল মোর প্রাণ।
ওপারেতে সোনার কূলে আঁধারমূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান।
নামিয়ে মুখ চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা
ফেরার পথে ফিরেও নাহি চায়,
তাদের পানে ভাঁটার টানে যাব রে আজ ঘরছাড়া,
সন্ধ্যা আসে দিন যে চলে যায়।
ওরে আয়।
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনশেষের শেষ খেয়ায়।

সাঁজের বেলা ভাঁটার স্রোতে ওপার হতে একটানা
একটি-দুটি যায় যে তরী ভেসে।
কেমন করে চিনব ওরে ওদের মাঝে কোন্‌খানা
আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে।
অস্তাচলে তীরের তলে ঘন গাছের কোল ঘেঁষে
ছায়ায় যেন ছায়ার মতো যায়,
ডাকলে আমি ক্ষণেক থামি হেথায় পাড়ি ধরবে সে
এমন নেয়ে আছে রে কোন্ নায়?
ওরে আয়
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনশেষের শেষ খেয়ায়।

ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে ;
ঘরেও নহে পারেও নহে যে-জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।
ফুলের বার নাইক আর ফসল যার ফলল না,
চোখের জল ফেলতে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরাল সাঁজের আলো জ্বলল না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়
ওরে আয়।
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলাশেষের শেষ খেয়ায়।

আষাঢ় ১৩১২

ঘাটের পথ

ওরা চলেছে দিঘির ধারে।
ঐ শোনা যায় বেণুবনছায়
কঙ্কণ-ঝংকারে।
আমার চুকেছে দিবসের কাজ,
শেষ হয়ে গেছে জলভরা আজ,
দাঁড়ায়ে রয়েছি দ্বারে।
ওরা চলেছে দিঘির ধারে।

আমি কোন্ ছলে যাব ঘাটে—
শাখা-থরথর পাতা-মরমর
ছায়া-সুশীতল বাটে ?
বেলা বেশি নাই, দিন হল শোধ,
ছায়া বেড়ে যায়, পড়ে আসে রোদ,
এ বেলা কেমনে কাটে ?
আমি কোন্ ছলে যাব ঘাটে ?

ওগো কী আমি কহিব আর ?
ভাবিস নে কেহ ভয় করি আমি
ভরা-কলসের ভার।
যা হ'ক তা হ'ক এই ভালোবাসি,
বহে নিয়ে যাই, ভরে নিয়ে আসি,
কতদিন কতবার।
ওগো আমি কী কহিব আর।

একি শুধু জল নিয়ে আসা ?
এই আনাগোনা কিসের লাগি যে
কী কব, কী আছে ভাষা !
কত-না দিনের আঁধারে আলোতে
বহিয়া এনেছি এই বাঁকা পথে
কত কাঁদা কত হাসা।
একি শুধু জল নিয়ে আসা ?

আমি ডরি নাই ঝড়জল
উড়েছে আকাশে উতলা বাতাসে
উদ্দাম অঞ্চল।
বেণুশাখা 'পরে বারি ঝরঝরে,
এ-কূলে ও-কূলে কালো ছায়া পড়ে,
পথঘাট পিচ্ছল।
আমি ডরি নাই ঝড়জল।

আমি গিয়াছি আঁধার সাঁজে।
শিহরি শিহরি উঠে পল্লব
নির্জন বনমাঝে।
বাতাস থমকে, জোনাকি চমকে,
ঝিল্লীর সাথে ঝমকে ঝমকে
চরণে ভূষণ বাজে।
আমি গিয়াছি আঁধার সাঁজে।

যবে বুকে ভরি উঠে ব্যথা,—
ঘরের ভিতরে না দেয় থাকিতে
অকারণ আকুলতা,—
আপনার মনে একা পথে চলি,
কাঁখের কলসী বলে ছলছলি
জলভরা কলকথা,
যবে বুকে ভরি উঠে ব্যথা।

ওগো দিনে কতবার করে
ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি
ঐ পথ ডাকে মোরে।
কুসুমের বাস ধেয়ে ধেয়ে আসে,
কপোত-কূজন-করুণ আকাশে
উদাসীন মেঘ ঘোরে—
ওগো দিনে কতবার করে।

আমি বাহির হইব বলে
যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে
নীল আকাশের কোলে!
তাই কানাকানি পাতায় পাতায়,—
কালো লহরীর মাথায় মাথায়
চঞ্চল আলো দোলে—
আমি বাহির হইব বলে।

আজ ভরা হয়ে গেছে বারি।
আঙিনার দ্বারে চাহি পথপানে
ঘর ছেড়ে যেতে নারি।
দিনের আলোক ম্লান হয়ে আসে,
বধূগণ ঘাটে যায় কলহাসে
কক্ষে লইয়া ঝারি।
মোর ভরা হয়ে গেছে বারি।

ঘাটে

বাউলের সুর

আমার নাই বা হল পারে যাওয়া।
যে হাওয়াতে চলত তরী
অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া॥
নেই যদি বা জমল পাড়ি
ঘাট আছে তো বসতে পারি,
আমার আশার তরী ডুবল যদি
দেখব তোদের তরী বাওয়া॥
হাতের কাছে কোলের কাছে
যা আছে সেই অনেক আছে,
আমার সারাদিনের এই কি রে কাজ
ওপার পানে কেঁদে চাওয়া?
কম কিছু মোর থাকে হেথা
পুরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা,
আমার সেই পানেতেই কল্পলতা
যেখানে মোর দাবি-দাওয়া॥

২৭ ভাদ্র ১৩১২
গিরিডি

শুভক্ষণ

ওগো মা,
রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে
রহিব বলো কী মতে?

বলে দে আমায় কী করিব সাজ,
কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে
কোন্ বরনের বাস ?
মাগো, কী হল তোমার, অবাকনয়নে
মুখপানে কেন চাস ?
আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়নকোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ
যাবে সে সুদূর পুরে ;—
শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হতে
বাজিবে ব্যাকুল সুরে।

তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,
শুধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ
রহিব বলো কী মতে ?

ত্যাগ

ওগো মা,
রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়নে থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধুলার 'পরে।

মাগো কী হল তোমার, অবাকনয়নে
চাহিস কিসের তরে।
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কি দিলেম কারে জানে না সে কেউ
ধুলায় রহিল ঢাকা।

তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বলো কী মতে?

১৩ শ্রাবণ ১৩১২
বোলপুর

আগমন

তখন রাত্রি আঁধার হল
সাঙ্গ হল কাজ—
আমরা মনে ভেবেছিলেম
আসবে না কেউ আজ।
মোদের গ্রামে দুয়ার যত
রুদ্ধ হল রাতের মতো,
দু-এক জনে বলেছিল,
"আসবে মহারাজ।"
আমরা হেসে বলেছিলেম
"আসবে না কেউ আজ।"

দ্বারে যেন আঘাত হল
শুনেছিলেম সবে,
আমরা তখন বলেছিলেম,
"বাতাস বুঝি হবে!"
নিবিয়ে প্রদীপ ঘরে ঘরে
শুয়েছিলেম আলসভরে,
দু-এক জনে বলেছিল,
"দূত এল বা তবে!"
আমরা হেসে বলেছিলেম
"বাতাস বুঝি হবে।"

নিশীথ রাতে শোনা গেল
কিসের যেন ধ্বনি।
ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলেম
মেঘের গরজনি।
ক্ষণে ক্ষণে চেতন করি
কাঁপল ধরা থরহরি,
দু-এক জনে বলেছিল,
"চাকার ঝনঝনি।"
ঘুমের ঘোরে কহি মোরা,
"মেঘের গরজনি!"

তখনো রাত আঁধার আছে,
বেজে উঠল ভেরী,
কে ফুকারে "জাগো সবাই,
আর ক'রো না দেরি।"
বক্ষ'পরে দু-হাত চেপে
আমরা ভয়ে উঠি কেঁপে,

দু এক জনে কহে কানে,
"রাজার ধ্বজা হেরি।"
আমরা জেগে উঠে বলি
"আর তবে নয় দেরি।"

কোথায় আলো, কোথায় মাল্য,
কোথায় আয়োজন।
রাজা আমার দেশে এল
কোথায় সিংহাসন।
হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা,
কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।
দু-এক জনে কহে কানে,
"বৃথা এ ক্রন্দন—
রিক্তকরে শূন্য ঘরে
করো অভ্যর্থন।"

ওরে দুয়ার খুলে দে রে,
বাজা শঙ্খ বাজা!
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখরাতের রাজা।

২৮ শ্রাবণ ১৩১২
কলিকাতা

দুঃখমূর্তি

দুখের বেশে এসেছ বলে
তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় ক'রে ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে, স্বামী,
তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণরূপে আসিলে, প্রভু,
চরণ ধরি' মরিব হে—
যেমন করে দাও না দেখা
তোমারে নাহি ডরিব হে।

নয়নে আজি ঝরিছে জল
ঝরুক জল নয়নে হে।
বাজিছে বুকে বাজুক, তব
কঠিন বাহুবাঁধনে হে।
তুমি যে আছ বক্ষে ধরে
বেদনা তাহা জানাক মোরে
চাব না কিছু, কব না কথা,
চাহিয়া রব বদনে হে।
নয়নে আজি ঝরিছে জল
ঝরুক জল নয়নে হে।

মুক্তিপাশ

ওগো নিশীথে কখন এসেছিলে তুমি
কখন যে গেছ বিহানে
তাহা কে জানে।
আমি চরণশবদ পাই নি শুনিতে
ছিলেম কিসের খেয়ানে
তাহা কে জানে।
রুদ্ধ আছিল আমার এ গেহ
কতকাল আসে-যায় নাই কেহ,
তাই মনে মনে ভাবিতেছিলাম
এখনো রয়েছে যামিনী,—
যেমন বদ্ধ আছিল সকলি
বুঝি বা রয়েছে তেমনি।
হে মোর গোপনবিহারী,
ঘুমায়ে ছিলেম যখন, তুমি কি
গিয়েছিলে মোরে নেহারি ?

আজ নয়ন মেলিয়া একী হেরিলাম
বাধা নাই কোনো বাধা নাই—
আমি বাঁধা নাই।
ওগো যে-আঁধার ছিল শয়ন ঘেরিয়া
আধা নাই তার আধা নাই,
আমি বাঁধা নাই।
তখনি উঠিয়া গেলেম ছুটিয়া,
দেখিনু কে মোর আগল টুটিয়া
ঘরে ঘরে যত দুয়ার-জানালা
সকলি দিয়েছে খুলিয়া ;—
আকাশ-বাতাস ঘরে আসে মোর
বিজয়পতাকা তুলিয়া !

হে বিজয়ী বীর অজানা,
কখন যে তুমি জয় করে যাও
কে পায় তাহার ঠিকানা !

আমি ঘরে বাঁধা ছিনু, এবার আমারে
আকাশে রাখিলে ধরিয়া
দৃঢ় করিয়া।
সব বাঁধা খুলে দিয়ে মুক্তিবাঁধনে
বাঁধিলে আমারে হরিয়া
দৃঢ় করিয়া।
রুদ্ধদুয়ার ঘরে কতবার
খুঁজেছিল মন পথ পালাবার,
এবার তোমার আশাপথ চাহি
বসে রব খোলা দুয়ারে,—
তোমারে ধরিতে হইবে বলিয়া
ধরিয়া রাখিব আমারে।
হে মোর পরানবঁধু হে
কখন যে তুমি দিয়ে চলে যাও
পরানে পরশমধু হে।

প্রভাতে

এক রজনীর বরষনে শুধু
কেমন করে
আমার ঘরের সরোবর আজি
উঠেছে ভরে।
নয়ন মেলিয়া দেখিলাম ওই
ঘন নীল জল করে থইথই,

কূল কোথা এর, তল মেলে কই
কহ গো মোরে—
এক বরষায় সরোবর দেখো
উঠেছে ভরে।

কাল রজনীতে কে জানিত মনে
এমন হবে
ঝরঝর বারি তিমির নিশীথে
ঝরিল যবে,—
ভরা শ্রাবণের নিশি দু-পহরে
শুনেছিনু শুয়ে দীপহীন ঘরে
কেঁদে যায় বায়ু পথে প্রান্তরে
কাতর রবে
তখন সে রাতে কে জানিত মনে
এমন হবে।

হেরো হেরো মোর অকূল অশ্রু-
সলিলমাঝে
আজি এ অমল কমলকান্তি
কেমনে রাজে।
একটিমাত্র শ্বেত শতদল
আলোক-পুলকে করে ঢলঢল,
কখন ফুটিল বল্ মোরে বল্
এমন সাজে
আমার অতল অশ্রু-সাগর-
সলিলমাঝে!

আজি একা বসে ভাবিতেছি মনে
ইহারে দেখি,
দুখ-যামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কী।

ইহারি লাগিয়া হৃদ্ বিদারণ,
এত ক্রন্দন, এত জাগরণ,
ছুটেছিল ঝড় ইহারি বদন
বক্ষে লেখি।
দুখ-যামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কী।

১৪ শ্রাবণ ১৩১২

দান

ভেবেছিলাম চেয়ে নেব—
চাই নি সাহস করে—
সন্ধ্যেবেলায় যে মালাটি
গলায় ছিলে পরে—
আমি চাই নি সাহস করে।
ভেবেছিলাম সকাল হলে
যখন পারে যাবে চলে
ছিন্নমালা শয্যাতলে
রইবে বুঝি পড়ে।
তাই আমি কাঙালের মতো
এসেছিলেম ভোরে—
তবু চাই নি সাহস করে।

এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারি—
এ যে তোমার তরবারি।

তরুণ আলো জানলা বেয়ে
পড়ল তোমার শয়ন ছেয়ে
ভোরের পাখি শুধায় গেয়ে
"কী পেলি তুই নারী ?"
নয় এ মালা, নয় এ থালা,
গন্ধজলের ঝারি,
এ যে ভীষণ তরবারি।

তাই তো আমি ভাবি বসে
এ কী তোমার দান ?
কোথায় এরে লুকিয়ে রাখি
নাই যে হেন স্থান।
ওগো এ কী তোমার দান ?
শক্তিহীনা মরি লাজে,
এ ভূষণ কি আমায় সাজে ?
রাখতে গেলে বুকের মাঝে
ব্যথা যে পায় প্রাণ।
তবু আমি বইব বুকে
এই বেদনার মান—
নিয়ে তোমারি এই দান।

আজকে হতে জগৎমাঝে
ছাড়ব আমি ভয়,
আজ হতে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর করে
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ ক'রে
রাখব পরানময়।

তোমার তরবারি আমার
করবে বাঁধন ক্ষয়।
আমি ছাড়ব সকল ভয়।

তোমার লাগি অঙ্গ ভরি
করব না আর সাজ।
নাই বা তুমি ফিরে এলে
ওগো হৃদয়রাজ।
আমি করব না আর সাজ।
ধুলায় বসে তোমার তরে
কাঁদব না আর একলা ঘরে,
তোমার লাগি ঘরে-পরে
মানব না আর লাজ।
তোমার তরবারি আমায়
সাজিয়ে দিল আজ,
আমি করব না আর সাজ।

২৬ ভাদ্র ১৩১২
গিরিডি

বালিকা বধূ

ওগো বর, ওগো বঁধু,
এই যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা
এ তব বালিকা বধূ।
তোমার উদার প্রাসাদে একেলা
কত খেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা,
তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তার
খেলিবার ধন শুধু,
ওগো বর, ওগো বঁধু।

জানে না করিতে সাজ।
কেশবেশ তার হলে একাকার
মনে নাহি মানে লাজ।
দিনে শতবার ভাঙিয়া গড়িয়া,
ধুলা দিয়ে ঘর রচনা করিয়া,
ভাবে মনে মনে সাধিছে আপন
ঘরকরনের কাজ।
জানে না করিতে সাজ।

কহে এরে গুরুজনে,
"ও যে তোর পতি, ও তোর দেবতা"
ভীত হয়ে তাহা শোনে।
কেমন করিয়া পূজিবে তোমায়
কোনোমতে তাহা ভাবিয়া না পায়,
খেলা ফেলি কভু মনে পড়ে তার
"পালিব পরানপণে
যাহা কহে গুরুজনে।"

বাসকশয়ন'পরে
তোমার বাহুতে বাঁধা রহিলেও
অচেতন ঘুমভরে।
সাড়া নাহি দেয় তোমার কথায়
কত শুভখন বৃথা চলি যায়,
যে-হার তাহারে পরালে, সে-হার
কোথায় খসিয়া পড়ে
বাসকশয়ন'পরে।

শুধু দুদিনে ঝড়ে
—দশদিক ত্রাসে আঁধারিয়া আসে
ধরাতলে অম্বরে—
তখন নয়নে ঘুম নাই আর,
খেলাধুলা কোথা পড়ে থাকে তার,

তোমারে সবলে রহে আঁকড়িয়া,
হিয়া কাঁপে থরথরে—
দুঃখদিনের ঝড়ে।

মোরা মনে করি ভয়
তোমার চরণে অবোধজনের
অপরাধ পাছে হয়।
তুমি আপনার মনে মনে হাস
এই দেখিতেই বুঝি ভালোবাস,
খেলাঘরদ্বারে দাঁড়াইয়া আড়ে
কী যে পাও পরিচয়।
মোরা মিছে করি ভয়।

তুমি বুঝিয়াছ মনে
একদিন এর খেলা ঘুচে যাবে
ওই তব শ্রীচরণে।
সাজিয়া যতনে তোমারি লাগিয়া
বাতায়নতলে রহিবে জাগিয়া,
শতযুগ করি মানিবে তখন
ক্ষণেক অদর্শনে,
তুমি বুঝিয়াছ মনে।

ওগো বর, ওগো বঁধু,
জান জান তুমি—ধুলায় বসিয়া
এ বালা তোমারি বধূ।
রতন-আসন তুমি এরি তরে
রেখেছ সাজায়ে নির্জন ঘরে,
সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ
নন্দনবন-মধু—
ওগো বর, ওগো বঁধু।

১৫ শ্রাবণ ১৩১২

অনাহত

দাঁড়িয়ে আছ আধেকখোলা
বাতায়নের ধারে
নূতন বধূ বুঝি ?
আসবে কখন চুড়িওলা
তোমার গৃহদ্বারে
লয়ে তাহার পুঁজি।
দেখছ চেয়ে গোরুর গাড়ি
উড়িয়ে চলে ধূলি
খর রোদের কালে ;
দূর নদীতে দিচ্ছে পাড়ি
বোঝাই নৌকাগুলি
বাতাস লাগে পালে।

আধেক খোলা বিজনঘরে
ঘোমটা-ছায়ায় ঢাকা
একলা বাতায়নে,
বিশ্ব তোমার আঁখির 'পরে
কেমন পড়ে আঁকা,
তাই ভাবি যে মনে।
ছায়াময় সে ভুবনখানি
স্বপন দিয়ে গড়া
রূপকথাটি ছাঁদা,
কোন্ সে পিতামহীর বাণী
নাইকো আগাগোড়া
দীর্ঘ ছড়া বাঁধা।

আমি ভাবি হঠাৎ যদি
বৈশাখের এক দিন

বাতাস বহে বেগে—
লজ্জা ছেড়ে নাচে নদী
শূন্যে বাঁধনহীন,
পাগল উঠে জেগে,—
যদি তোমার ঢাকা ঘরে
যত আগল আছে
সকলি যায় দূরে—
ওই যে বসন নেমে পড়ে
তোমার আঁখির কাছে
ও যদি যায় উড়ে,—

তীব্র তড়িৎহাসি হেসে
বজ্রভেরীর স্বরে
তোমার ঘরে ঢুকি
জগৎ যদি এক নিমেষে
শক্তিমূর্তি ধ'রে
দাঁড়ায় মুখোমুখি—
কোথায় থাকে আধেকঢাকা
অলস দিনের ছায়া,
বাতায়নের ছবি,
কোথায় থাকে স্বপনমাখা
আপনগড়া মায়া,—
উড়িয়া যায় সবি।

তখন তোমার ঘোমটা-খোলা
কালো চোখের কোণে
কাঁপে কিসের আলো,
ডুবে তোমার আপনা-ভোলা
প্রাণের আন্দোলনে
সকল মন্দভালো।

বক্ষে তোমার আঘাত করে
উত্তাল নর্তনে
রক্ততরঙ্গিণী।
অঙ্গে তোমার কী সুর তুলে
চঞ্চল কম্পনে
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী।

আজকে তুমি আপনাকে
আধেক আড়াল ক'রে
দাঁড়িয়ে ঘরের কোণে
দেখতেছ এই জগৎটাকে
কী যে মায়ায় ভরে,
তাহাই ভাবি মনে।
অর্থবিহীন খেলার মতো
তোমার পথের মাঝে
চলছে যাওয়া-আসা,
উঠে ফুটে মিলায় কত
ক্ষুদ্র দিনের কাজে
ক্ষুদ্র কাঁদা-হাসা।

২৬ শ্রাবণ ১৩১২
বোলপুর

বাঁশি

ঐ তোমার ঐ বাঁশিখানি
শুধু ক্ষণেক তরে
দাও গো আমার করে।
শরৎ-প্রভাত গেল ব'য়ে,
দিন যে এল ক্লান্ত হয়ে,

বাঁশি-বাজা সাঙ্গ যদি
কর আলস ভরে
তবে তোমার বাঁশিখানি
শুধু ক্ষণেক তরে
দাও গো আমার করে।

আর কিছু নয় আমি কেবল
করব নিয়ে খেলা
শুধু একটি বেলা।
তুলে নেব কোলের 'পরে,
অধরেতে রাখব ধরে,
তারে নিয়ে যেমন খুশি
যেথা-সেথায় ফেলা--
এমনি করে আপন মনে
করব আমি খেলা
শুধু একটি বেলা।

তার পরে যেই সন্ধ্যে হবে
এনে ফুলের ডালা
গেঁথে তুলব মালা।
সাজাব তায় যূথীর হারে,
গন্ধে ভরে দেব তারে
করব আমি আরতি তার
নিয়ে দীপের থালা।
সন্ধ্যে হলে সাজাব তায়
ভরে ফুলের ডালা
গেঁথে যূথীর মালা।

রাতে উঠবে আধেক শশী
তারার মধ্যখানে,
চাবে তোমার পানে।

তখন আমি কাছে আসি
ফিরিয়ে দেব তোমার বাঁশি,
তুমি তখন বাজাবে সুর
গভীর রাতের তানে
রাতে যখন আধেক শশী
তারার মধ্যখানে
চাবে তোমার পানে।

২৯ শ্রাবণ ১৩১২
কলিকাতা

অনাবশ্যক

কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে
আমি তারে জিজ্ঞাসিলাম ডেকে,
"একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে
আঁচল আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে।
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।"
গোধূলিতে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে আমার মুখে তুলে
সে কহিল, "ভাসিয়ে দেব আলো
দিনের শেষে তাই এসেছি কূলে।"
চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কাশের বনে
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে।

ভরা সাঁঝে আঁধার হয়ে এলে
আমি ডেকে জিজ্ঞাসিলাম তারে,
"তোমার ঘরে সকল আলো জ্বেলে
এ দীপখানি সঁপিতে যাও কারে?

আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।”
আমার মুখে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে রৈল চেয়ে ভুলে
সে কহিল “আমার এ যে আলো
আকাশপ্রদীপ শূন্যে দিব তুলে।”
চেয়ে দেখি শূন্য গগনকোণে
প্রদীপখানি জ্বলে অকারণে।

অমাবস্যা আঁধার দুই পহরে
জিজ্ঞাসিলাম তাহার কাছে গিয়ে
“ওগো তুমি চলেছ কার তরে
প্রদীপখানি বুকের কাছে নিয়ে?
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।”
অন্ধকারে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক মোরে দেখলে চেয়ে তবে,
সে কহিল, “এনেছি এই আলো
দীপালিতে সাজিয়ে দিতে হবে।”
চেয়ে দেখি লক্ষ দীপের সনে
দীপখানি তার জ্বলে অকারণে।

২৫ শ্রাবণ ১৩১২
বোলপুর

অবারিত

ওগো তোরা বল্‌ তো, এরে
ঘর বলি কোন্‌ মতে?
এরে কে বেঁধেছে হাটের মাঝে
আনাগোনার পথে?

আসতে যেতে বাঁধে তরী
আমারি এই ঘাটে,
যে খুশি সেই আসে,—আমার
এই ভাবে দিন কাটে।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
কী কাজ নিয়ে আছি,—আমার
বেলা বহে যায় যে, আমার
বেলা বহে যায় রে।

পায়ের শব্দ বাজে তাদের,
রজনীদিন বাজে।
ওগো মিথ্যে তাদের ডেকে বলি
"তোদের চিনি না যে!"
কাউকে টেনে পরশ আমার
কাউকে টেনে ঘ্রাণ,
কাউকে টেনে বুকের রক্ত
কাউকে টেনে প্রাণ।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
ডেকে বলি, "আমার ঘরে
যার খুশি সেই আয় রে, তোরা
যার খুশি সেই আয় রে।"

সকালবেলায় শঙ্খ বাজে
পুবের দেবালয়ে,—
ওগো স্নানের পরে আসে তারা
ফুলের সাজি লয়ে।
মুখে তাদের আলো পড়ে
তরুণ আলোখানি।

অরুণ পায়ের ধুলোটুকু
বাতাস লহে টানি।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
ডেকে বলি, "আমার বনে
তুলিবি ফুল, আয় রে তোরা,
তুলিবি ফুল আয় রে।"

দুপুরবেলা ঘণ্টা বাজে
রাজার সিংহদ্বারে।
ওগো কী কাজ ফেলে আসে তারা
এই বেড়াটির ধারে।
মলিনবরন মালাখানি
শিথিল কেশে সাজে,
ক্লিষ্টকরুণ রাগে তাদের
ক্লান্ত বাঁশি বাজে।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
ডেকে বলি, "এই ছায়াতে
কাটাবি দিন, আয় রে তোরা
কাটাবি দিন আয় রে।"

রাতের বেলা ঝিল্লি ডাকে
গহন বনমাঝে।
ওগো ধীরে ধীরে দুয়ারে মোর
কার সে আঘাত বাজে?
যায় না চেনা মুখখানি তার,
কয় না কোনো কথা,
ঢাকে তারে আকাশভরা
উদাস নীরবতা।

ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
চেয়ে থাকি সে-মুখপানে
রাত্রি বহে যায়, নীরবে
রাত্রি বহে যায় রে।

১৫ পৌষ ১৩১২
শান্তিনিকেতন

গোধূলিলগ্ন

আমার গোধূলি-লগন এল বুঝি কাছে
গোধূলি-লগন রে।
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে
সোনার গগন রে।
শেষ করে দিল পাখি গান গাওয়া,
নদীর উপরে পড়ে এল হাওয়া,
ওপারের তীর ভাঙা মন্দির
আঁধারে মগন রে।
আসিছে মধুর ঝিল্লি-নূপুরে
গোধূলি-লগন রে।

আমার দিন কেটে গেছে কখনো খেলায়,
কখনো কত কী কাজে।
এখন কি শুনি পুরবীর সুরে
কোন্ দূরে বাঁশি বাজে।
বুঝি দেরি নাই, আসে বুঝি আসে,
আলোকের আভা লেগেছে আকাশে,

বেলাশেষে মোরে কে সাজাবে ওরে
নবমিলনের সাজে ?
সারা হল কাজ মিছে কেন আজ
ডাক মোরে আর কাজে ?

এখন নিরিবিলি ঘরে সাজাতে হবে রে
বাসক-শয়ন যে।
ফুলশেজ লাগি রজনীগন্ধা
হয় নি চয়ন যে।
সারা যামিনীর দীপ সযতনে
জ্বালায়ে তুলিতে হবে বাতায়নে,
যূথীদল আনি গুণ্ঠনখানি
করিব বয়ন যে।
সাজাতে হবে রে নিবিড় রাতের
বাসক-শয়ন যে।

প্রাতে এসেছিল যারা কিনিতে বেচিতে
চলে গেছে তারা সব।
রাখালের গান হল অবসান,
না শুনি ধেনুর রব।
এই পথ দিয়ে প্রভাতে দুপুরে
যারা এল আর যারা গেল দূরে
কে তারা জানিত আমার নিভৃত
সন্ধ্যার উৎসব।
কেনাবেচা যারা করে গেল সারা
চলে গেল তারা সব।

আমি জানি যে আমার হয়ে গেছে গনা
গোধূলি-লগন রে।
ধূসর আলোকে মুদিবে নয়ন
অস্ত-গগন রে—

এখন নিরিবিলি ঘর সাজাতে হবে রে

বাসক শয়ন যে —

ফুলশেজে লাগি রজনীগন্ধা

হয়নি চয়ন যে।

সারা যামিনীর দীপ সযতনে

জ্বালায়ে তুলিতে হবে বাতায়নে, —

যূথীদল আনি গুণ্ঠনখানি

করিব রচন যে, —

সাজাতে হবে রে নিবিড় রাতের

বাসক শয়ন যে।

প্রাতে এসেছিল যারা কিনিতে বেচিতে

চলে গেছে তারা সব, —

রাখালের গান হল অবসান,

না শুনি ধেনুর রব।

এই পথ দিয়ে প্রভাতে দুপুরে

যারা এল আর যারা গেল দূরে,

কে তারা জানিত, আমার নিভৃত

সন্ধ্যার উৎসব।

কেনাবেচা যারা করে গেল সারা

চলে গেল তারা সব।

‘খেয়া’র পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

তখন এ-ঘরে কে খুলিবে দ্বার,
কে লইবে টানি বাহুটি আমার,
আমায় কে জানে কী মন্ত্রে গানে
করিবে মগন রে—
সব গান সেরে আসিবে যখন
গোধূলি-লগন রে।

লীলা

আমি শরৎশেষের মেঘের মতো
তোমার গগনকোণে
সদাই ফিরি অকারণে।
তুমি আমার চিরদিনের
দিনমণি গো—
আজো তোমার কিরণপাতে
মিশিয়ে দিয়ে আলোর সাথে
দেয় নি মোরে বাষ্প ক'রে
তোমার পরশনি—
তোমা হতে পৃথক হয়ে
বৎসর মাস গনি।

ওগো এমনি তোমার ইচ্ছা যদি,
এমনি খেলা তব
তবে খেলাও নব নব।
লয়ে আমার তুচ্ছ কণিক
ক্ষণিকতা গো—
সাজাও তারে বর্ণে বর্ণে,
ডুবাও তারে তোমার স্বর্ণে,

বায়ুর স্রোতে ভাসিয়ে তারে
খেলাও যথা-তথা,—
শূন্য আমায় নিয়ে রচ
নিত্য বিচিত্রতা।

ওগো আবার যবে ইচ্ছা হবে
সাঙ্গ ক'রো খেলা
ঘোর নিশীথরাত্রিবেলা।
অশ্রুধারে ঝরে যাব
অন্ধকারে গো—
প্রভাতকালে রবে কেবল
নির্মলতা শুভ্রশীতল,
রেখাবিহীন মুক্ত আকাশ
হাসবে চারিধারে,—
মেঘের খেলা মিশিয়ে যাবে
জ্যোতিঃসাগরপারে।

২০ পৌষ ১৩১২
শান্তিনিকেতন, বোলপুর

মেঘ

আদি অন্ত হারিয়ে ফেলে,
সাদা কালো আসন মেলে,
পড়ে আছে আকাশটা খোশখেয়ালি,
আমরা যে সব রাশি রাশি
মেঘের পুঞ্জ ভেসে আসি,
আমরা তারি খেয়াল তারি হেঁয়ালি।
মোদের কিছু ঠিকঠিকানা নাই,
আমরা আসি আমরা চলে যাই।

ঐ যে সকল জ্যোতির মালা,
গ্রহতারা রবির ডালা,
জুড়ে আছে নিত্যকালের পসরা ;
ওদের হিসেব পাকা খাতায়
আলোর লেখা কালো পাতায়,
মোদের তরে আছে মাত্র খসড়া ;
রংবেরঙের কলম দিয়ে এঁকে
যেমন খুশি মোছে আবার লেখে।

আমরা কভু বিনা কাজে
ডাক দিয়ে যাই মাঝে মাঝে
অকারণে মুচকে হাসি হামেশা।
তাই বলে সব মিথ্যে না কি ?
বৃষ্টি সে তো নয়কো ফাঁকি,
বজ্রটা তো নিতান্ত নয় তামাশা।
শুধু আমরা থাকি নে কেউ, ভাই,
হাওয়ায় আসি হাওয়ায় ভেসে যাই।

নিরুদ্যম

তখন আকাশতলে ঢেউ তুলেছে
পাখিরা গান গেয়ে ;
তখন পথের দুটি ধারে
ফুল ফুটেছে ভারে ভারে,
মেঘের কোণে রং ধরেছে
দেখি নি কেউ চেয়ে।
মোরা আপন মনে ব্যস্ত হয়ে
চলেছিলেম ধেয়ে।

মোরা সুখের বশে গাই নি তো গান,
করি নি কেউ খেলা ;
চাই নি ভুলে ডাহিন-বাঁয়ে,
হাটের লাগি যাই নি গাঁয়ে,
হাসি নি কেউ, কই নি কথা,
করি নি কেউ হেলা ;
মোরা ততই বেগে চলেছিলেম
যতই বাড়ে বেলা।

শেষে সূর্য যখন মাঝ আকাশে
কপোত ডাকে বনে,
তপ্ত হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
শুকনো পাতা বেড়ায় উড়ে,
বটের তলে রাখালশিশু
ঘুমায় অচেতনে,
আমি জলের ধারে শুলেম এসে
শ্যামল তৃণাসনে।

আমার দলের সবাই আমার পানে
চেয়ে গেল হেসে ;
চলে গেল উচ্চ শিরে
চাইল না কেউ পিছু ফিরে,
মিলিয়ে গেল সুদূর ছায়ায়
পথতরুর শেষে ;
তারা পেরিয়ে গেল কত যে মাঠ,
কতদূরের দেশে !

ওগো ধন্য তোমরা দুখের যাত্রী,
ধন্য তোমরা সবে।
লাজের ঘায়ে উঠিতে চাই,
মনের মাঝে সাড়া না পাই,

মগ্ন হলেম আনন্দময়
অগাধ অগৌরবে,—
পাখির গানে, বাঁশির তানে,
কম্পিত পল্লবে।

আমি মুগ্ধতনু দিলাম মেলে
বসুন্ধরার কোলে।
বাঁশের ছায়া কী কৌতুকে
নাচে আমার চক্ষে মুখে,
আমের মুকুল গন্ধে আমায়
বিধুর ক'রে তোলে
নয়ন মুদে আসে মৌমাছিদের
গুঞ্জন-কল্লোলে।

সেই রৌদ্রে ঘেরা সবুজ আরাম
মিলিয়ে এল প্রাণে।
ভুলে গেলেম কিসের তরে
বাহির হলেম পথের 'পরে,
ঢেলে দিলেম চেতনা মোর
ছায়ায় গন্ধে গানে;
ধীরে ঘুমিয়ে প'লেম অবশ দেহে
কখন কে তা জানে।

শেষে গভীর ঘুমের মধ্য হতে
ফুটল যখন আঁখি,
চেয়ে দেখি, কখন এসে
দাঁড়িয়ে আছ শিয়রদেশে
তোমার হাসি দিয়ে আমার
অচৈতন্য ঢাকি'।
ওগো ভেবেছিলেম আছে আমার
কত না পথ বাকি।

মোরা ভেবেছিলেম পরানপণে
সজাগ রব সবে ;
সন্ধ্যা হবার আগে যদি
পার হতে না পারি নদী,
ভেবেছিলেম তাহা হলেই
সকল ব্যর্থ হবে।
যখন আমি থেমে গেলাম. তুমি
আপনি এলে কবে।

৬ চৈত্র ১৩১২
কলিকাতা

কৃপণ

আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম
গ্রামের পথে পথে,
তুমি তখন চলেছিলে
তোমার স্বর্ণরথে।
অপূর্ব এক স্বপ্নসম
লাগতেছিল চক্ষে মম
কী বিচিত্র শোভা তোমার
কী বিচিত্র সাজ।
আমি মনে ভাবতেছিলেম
এ কোন্ মহারাজ।

আজি শুভক্ষণে রাত পোহাল
ভেবেছিলেম তবে,
আজ আমারে দ্বারে দ্বারে
ফিরতে নাহি হবে।

বাহির হতে নাহি হতে
কাহার দেখা পেলেম পথে,
চলিতে রথ ধনধান্য
ছড়াবে দুইধারে—
মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব,
নেব ভারে ভারে।

দেখি সহসা রথ থেমে গেল
আমার কাছে এসে,
আমার মুখপানে চেয়ে
নামলে তুমি হেসে।
দেখে মুখের প্রসন্নতা
জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা,
হেনকালে কিসের লাগি
তুমি অকস্মাৎ
"আমায় কিছু দাও গো" বলে
বাড়িয়ে দিলে হাত।

মরি, এ কী কথা রাজাধিরাজ,
"আমায় দাও গো কিছু।"
শুনে ক্ষণকালের তরে
রৈনু মাথা-নিচু।
তোমার কী বা অভাব আছে,
ভিখারি ভিক্ষুকের কাছে?
এ কেবল কৌতুকের বশে
আমায় প্রবঞ্চনা।
ঝুলি হতে দিলেম তুলে
একটি ছোটো কণা।

যবে পাত্রখানি ঘরে এনে
উজাড় করি—এ কী
ভিক্ষামাঝে একটি ছোটো
সোনার কণা দেখি।
দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে
দুটি নয়ন ভরে
তোমায় কেন দিই নি আমার
সকল শূন্য করে।

৮ চৈত্র [১৩১২]
কলিকাতা

কুয়ার ধারে

তোমার কাছে চাই নি কিছু,
জানাই নি মোর নাম,
তুমি যখন বিদায় দিলে
নীরব রহিলাম।
একলা ছিলাম কুয়ার ধারে
নিমের ছায়াতলে,
কলস নিয়ে সবাই তখন
পাড়ায় গেছে চলে।
আমায় তারা ডেকে গেল
"আয় গো বেলা যায়।"
কোন্ আলসে রইনু বসে
কিসের ভাবনায়।

পদধ্বনি শুনি নাইকো
কখন তুমি এলে।
কইলে কথা ক্লান্তকণ্ঠে
করুণ চক্ষু মেলে—
"তৃষাকাতর পান্থ আমি"—
শুনে চমকে উঠে
জলের ধারা দিলেম ঢেলে
তোমার করপুটে।
মর্মরিয়া কাঁপে পাতা,
কোকিল কোথা ডাকে
বাবলা ফুলের গন্ধ ওঠে
পল্লীপথের বাঁকে।

যখন তুমি শুধালে নাম
পেলেম বড়ো লাজ,
তোমার মনে থাকার মতো
করেছি কোন্ কাজ?
তোমায় দিতে পেরেছিলেম
একটু তৃষার জল
এই কথাটি আমার মনে
রহিল সম্বল।
কুয়ার ধারে দুপুরবেলা
তেমনি ডাকে পাখি,
তেমনি কাঁপে নিমের পাতা,
আমি বসেই থাকি।

৯ চৈত্র ১৩১২

জাগরণ

পথ চেয়ে তো কাটল নিশি,
লাগছে মনে ভয়—
সকালবেলা ঘুমিয়ে পড়ি
যদি এমন হয়।
যদি তখন হঠাৎ এসে
দাঁড়ায় আমার দুয়ার-দেশে।
বনচ্ছায়ায় ঘেরা এ ঘর
আছে তো তার জানা,—
ওগো তোরা পথ ছেড়ে দিস
করিস নে কেউ মানা।

যদি বা তার পায়ের শব্দে
ঘুম না ভাঙে মোর
শপথ আমার তোরা কেহ
ভাঙাস নে সে ঘোর।
চাই নে জাগতে পাখির রবে
নতুন আলোর মহোৎসবে,
চাই নে জাগতে হাওয়ায় আকুল
বকুলফুলের বাসে,
তোরা আমায় ঘুমোতে দিস
যদিই বা সে আসে।

ওগো আমার ঘুম যে ভালো
গভীর অচেতনে,
যদি আমায় জাগায় তারি
আপন পরশনে।
ঘুমের আবেশ যেমনি টুটি
দেখব তারি নয়ন দুটি

মুখে আমার তারি হাসি
পড়বে সকৌতুকে—
সে যেন মোর সুখের স্বপন
দাঁড়াবে সম্মুখে।

সে আসবে মোর চোখের 'পরে
সকল আলোর আগে,
তাহারি রূপ মোর প্রভাতের
প্রথম হয়ে জাগে।
প্রথম চমক লাগবে সুখে
চেয়ে তারি করুণ মুখে,
চিত্ত আমার উঠবে কেঁপে
তার চেতনায় ভ'রে—
তোরা আমায় জাগাস নে কেউ,
জাগাবে সেই মোরে।

১০ চৈত্র ১৩১২
কলিকাতা

ফুল ফোটানো

তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে।
যতই বলিস, যতই করিস,
যতই তারে তুলে ধরিস,
ব্যগ্র হয়ে রজনীদিন
আঘাত করিস বোঁটাতে
তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে।

দৃষ্টি দিয়ে বারে বারে
ম্লান করতে পারিস তারে,

ছিঁড়তে পারিস দলগুলি তার,
ধুলায় পারিস লোটাতে,
মোদের বিষম গণ্ডগোলে
যদিই বা সে মুখটি খোলে,
ধরবে না রং, পারবে না তার
গন্ধটুকু ছোটাতে।
তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে।

যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে,
অমনি যেন পূর্ণপ্রাণের
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে!
যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।

নিঃশ্বাসে তার নিমেষেতে
ফুল যেন চায় উড়ে যেতে,
পাতার পাখা মেলে দিয়ে
হাওয়ায় থাকে লোটাতে।
রং যে ফুটে ওঠে কত
প্রাণের ব্যাকুলতার মতো,
যেন কারে আনতে ডেকে
গন্ধ থাকে ছোটাতে।
যে পারে সে আপনি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।

১১ চৈত্র [১৩১২]
বোলপুর

হার

মোদের হারের দলে বসিয়ে দিলে,
জানি আমরা পারব না।
হারাও যদি হারব খেলায়
তোমার খেলা ছাড়ব না।
কেউ বা ওঠে, কেউ বা পড়ে,
কেউ বা বাঁচে, কেউ বা মরে,
আমরা না হয় মরার পথে
করব প্রয়াণ রসাতলে,
হারের খেলাই খেলব মোরা
বসাও যদি হারের দলে।

আমরা বিনা পণে খেলব না গো
খেলব রাজার ছেলের মতো।
ফেলব খেলায় ধনরতন
যেথায় মোদের আছে যত।
সর্বনাশা তোমার যে ডাক,
যায় যদি যাক সকলি যাক,
শেষ কড়িটি চুকিয়ে দিয়ে
খেলা মোদের করব সারা।
তার পরে কোন বনের কোণে
হারের দলটি হব হারা।

তবু এই হারা তো শেষ হারা নয়,
আবার খেলা আছে পরে।
জিতল যে সে জিতল কি না
কে বলবে তা সত্য করে।
হেরে তোমার করব সাধন,
ক্ষতির ক্ষুরে কাটব বাঁধন,

শেষ দানেতে তোমার কাছে
বিকিয়ে দেব আপনারে।
তার পরে কী করবে তুমি
সে-কথা কেউ ভাবতে পারে ?

১২ চৈত্র [১৩১২]
বোলপুর

বন্দী

বন্দী, তোরে কে বেঁধেছে
এত কঠিন করে ?

প্রভু আমায় বেঁধেছে যে
বজ্রকঠিন ডোরে।
মনে ছিল সবার চেয়ে
আমিই হব বড়ো,
রাজার কড়ি করেছিলেম
নিজের ঘরে জড়ো।
ঘুম লাগিতে শুয়েছিলেম
প্রভুর শয্যা পেতে,
জেগে দেখি বাঁধা আছি
আপন ভাণ্ডারেতে।

বন্দী ওগো কে গড়েছে
বজ্রবাঁধন খানি ?

আপনি আমি গড়েছিলেম
বহু যতন মানি।
ভেবেছিলেম আমার প্রতাপ
করবে জগৎ গ্রাস,

আমি রব একলা স্বাধীন
সবাই হবে দাস।
তাই গড়েছি রজনীদিন
লোহার শিকলখানা—
কত আগুন কত আঘাত
নাইকো তার ঠিকানা।
গড়া যখন শেষ হয়েছে
কঠিন সুকঠোর,
দেখি আমায় বন্দী করে
আমারি এই ডোর।

১ বৈশাখ ১৩১৩
বোলপুর

পথিক

পথিক, ওগো পথিক, যাবে তুমি
এখন এ যে গভীর ঘোর নিশা।
নদীর পারে তমাল-বনভূমি
গহন ঘন অন্ধকারে মিশা।
মোদের ঘরে হয়েছে দীপ জ্বালা,
বাঁশির ধ্বনি হৃদয়ে এসে লাগে,
নবীন আছে এখনো ফুলমালা,
তরুণ আঁখি এখনো দেখো জাগে।
বিদায়-বেলা এখনি কিগো হবে,
পথিক, ওগো পথিক, যাবে তবে?

তোমারে মোরা বাঁধি নি কোনো ডোরে
রুধিয়া মোরা রাখি নি তব পথ,
তোমার ঘোড়া রয়েছে সাজ প'রে
বাহিরে দেখো দাঁড়ায়ে তব রথ।

বিদায়-পথে দিয়েছি বটে বাধা,
কেবল শুধু করুণ কলগীতে।
চেয়েছি বটে রাখিতে হেথা বাঁধা
কেবল শুধু চোখের চাহনিতে।
পথিক ওগো মোদের নাহি বল,
রয়েছে শুধু আকুল আঁখিজল!

নয়নে তব কিসের এই গ্লানি,
রক্তে তব কিসের তরলতা।
আঁধার হতে এসেছে নাহি জানি
তোমার প্রাণে কাহার কী বারতা।
সপ্তঋষি গগনসীমা হতে
কখন কী যে মন্ত্র দিল পড়ি,—
তিমির রাতি শব্দহীন স্রোতে
হৃদয়ে তব আসিল অবতরি।
বচনহারা অচেনা অদ্ভুত
তোমার কাছে পাঠাল কোন্ দূত?

এ মেলা যদি না লাগে তব ভালো,
শান্তি যদি না মানে তব প্রাণ,
সভার তবে নিবায়ে দিব আলো,
বাঁশির তবে থামায়ে দিব তান।
স্তব্ধ মোরা আঁধারে রব বসি,
ঝিল্লিরব উঠিবে জেগে বনে.
কৃষ্ণরাতে প্রাচীন ক্ষীণ শশী
চক্ষে তব চাহিবে বাতায়নে।
পথ-পাগল পথিক রাখো কথা,
নিশীথে তব কেন এ অধীরতা?

৮ বৈশাখ ১৩১৩
বোলপুর

মিলন

আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
জুড়াল হৃদয় জুড়াল—আমার
জুড়াল হৃদয় প্রভাতে।
আমি কেমন করিয়া জানাব, আমার
পরান কী নিধি কুড়াল—ডুবিয়া
নিবিড় নীরব শোভাতে।
আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায়
দেখেছি একেলা আলোকে—দেখেছি
আমার হৃদয়-রাজারে।
আমি দু-একটি কথা কয়েছি তা-সনে
সে নীরব সভামাঝারে—দেখেছি
চিরজনমের রাজারে।

ওগো সে কি মোরে শুধু দেখেছিল চেয়ে
অথবা জুড়াল পরশে—তাহার
কমল করের পরশে—
আমি সে-কথা সকলি গিয়েছি যে ভুলে
ভুলেছি পরম হরষে।
আমি জানি না কী হল, শুধু এই জানি
চোখে মোর সুখ মাখাল—কে যেন
সুখ-অঞ্জন মাখাল,—
কার আঁখিভরা হাসি উঠিল প্রকাশি
যেদিকেই আঁখি তাকাল।

আজ মনে হল কারে পেয়েছি—কারে যে
পেয়েছি সে-কথা জানি না।
আজ কী লাগি উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
সারা আকাশের আঙিনা—কিসে যে
পুরেছে শূন্য জানি না।

এই বাতাস আমারে হৃদয়ে লয়েছে,
আলোক আমার তনুতে—কেমনে
মিলে গেছে মোর তনুতে ;—
তাই এ গগনভরা প্রভাত পশিল
আমার অণুতে অণুতে।

আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে
দেহমন মোর ফুরাল,—যেন রে
নিঃশেষে আজি ফুরাল,—
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে
জুড়াল জীবন জুড়াল—আমার
আদি ও অন্ত জুড়াল।

২৩ মাঘ সোমবার ১৩১২
শিলাইদহ। পদ্মা

বিচ্ছেদ

তোমার বীণার সাথে আমি
সুর দিয়ে যে যাব
তারে তারে খুঁজে বেড়াই
সে-সুর কোথায় পাব।

যেমন সহজ ভোরের জাগা,
স্রোতের আনাগোনা,
যেমন সহজ পাতায় শিশির,
মেঘের মুখে সোনা,
যেমন সহজ জ্যোৎস্নাখানি
নদীর বালু-পাড়ে,
গভীর রাতে বৃষ্টিধারা
আষাঢ়-অন্ধকারে,—

খুঁজে মরি তেমনি সহজ,
তেমনি ভরপুর,
তেমনিতরো অর্থ-ছোটা
আপনি-ফোটা সুর ;
তেমনিতরো নিত্য নবীন,
অফুরন্ত প্রাণ,
বহুকালের পুরানো সেই
সবার জানা গান।

আমার যে এই নূতন গড়া
নূতন-বাঁধা তার
নূতন সুরে করতে সে যায়
সৃষ্টি আপনার।
মেশে না তাই চারিদিকের
সহজ সমীরণে,
মেলে না তাই আকাশ-ডোবা
স্তব্ধ আলোর সনে।
জীবন আমার কাঁদে যে তাই
দণ্ডে পলে পলে,
যত চেষ্টা করি কেবল
চেষ্টা বেড়ে চলে।
ঘটিয়ে তুলি কত কী যে
বুঝি না এক তিল,
তোমার সঙ্গে অনায়াসে
হয় না সুরের মিল।

২৪ মাঘ ১৩১২

শিলাইদহ। পদ্মা

বিকাশ

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,
আকাশেতে সোনার আলোয়
ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।
কুঁড়ির মতো ফেটে গিয়ে
ফুলের মতো উঠল কেঁদে,
সুধাকোষের সুগন্ধ তার
পারলে না আর রাখতে বেঁধে।
ওরে মন, খুলে দে মন,
যা আছে তোর খুলে দে।
অন্তরে যা ডুবে আছে
আলোকপানে তুলে দে।
আনন্দে সব বাধা টুটে
সবার সাথে ওঠ রে ফুটে,
চোখের 'পরে আলসভরে
রাখিস নে আর আঁচল টানি।
আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি।

২৪ মাঘ ১৩১২
শিলাইদহ। পদ্মা

সীমা

সেটুকু তোর অনেক আছে
যেটুকু তোর আছে খাঁটি।
তার চেয়ে লোভ করিস যদি
সকলি তোর হবে মাটি।

একমনে তোর একতারাতে
একটি যে তার সেইটে বাজা,
ফুলবনে তোর একটি কুসুম
তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা।
যেখানে তোর বেড়া, সেথায়
আনন্দে তুই থামিস এসে,
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া
সেই কড়ি তুই নিস রে হেসে।
লোকের কথা নিস নে কানে,
ফিরিস নে আর হাজার টানে
যেন রে তোর হৃদয় জানে
হৃদয়ে তোর আছেন রাজা,—
একতারাতে একটি যে তার
আপন মনে সেইটি বাজা।

২৫ মাঘ ১৩১২
শিলাইদহ। পদ্মা

ভার

তুমি যত ভার দিয়েছ, সে ভার
করিয়া দিয়েছ সোজা,
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি
সকলি হয়েছে বোঝা।
এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু,
নামাও।
ভারের বেগেতে চলেছি, আমার
এ যাত্রা তুমি থামাও।

যে তোমার ভার বহে, কভু তার
সে ভারে ঢাকে না আঁখি,
পথে বাহিরিলে জগৎ তারে তো
দেয় না কিছুই ফাঁকি।
অবারিত আলো ধরে আসি তার
হাতে,
বনে পাখি গায় নদীধারা ধায়,
চলে সে সবার সাথে।

তুমি কাজ দিলে কাজেরি সঙ্গে
দাও যে অসীম ছুটি,
তোমার আদেশ আবরণ হয়ে
আকাশ লয় না লুটি।
বাসনায় মোরা বিশ্বজগৎ
ঢাকি,
তোমা পানে চেয়ে যত করি ভোগ
তত আরো থাকে বাকি।

আপনি যে দুখ ডেকে আনি, সে যে
জ্বালায় বজ্রানলে,
অঙ্গার করে রেখে যায়, সেথা
কোনো ফল নাহি ফলে।
তুমি যাহা দাও সে যে দুঃখের
দান,
শ্রাবণধারায় বেদনার রসে
সার্থক করে প্রাণ।

যেখানে যা-কিছু পেয়েছি, কেবলি
সকলি করেছি জমা,—
যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব,
কেহ নাহি করে ক্ষমা।

এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু,
নামাও।
ভাবের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছে
এ যাত্রা মোর থামাও।

২৫ মাঘ [১৩১২]
পদ্মা

টিকা

আজ পুরবে প্রথম নয়ন মেলিতে
হেরিনু অরুণ শিখা,—হেরিনু
কমলবরন শিখা,
তখনি হাসিয়া প্রভাত-তপন
দিলেন আমারে টিকা—আমার
হৃদয়ে জ্যোতির টিকা।
কে যেন আমার নয়ন-নিমেষে
রাখিল পরশমণি,
যেদিকে তাকাই সোনা করে দেয়
দৃষ্টির পরশনি।
অন্তর হতে বাহিরে সকলি
আলোকে হইল মিশা,
নয়ন আমার হৃদয় আমার
কোথাও না পায় দিশা।

আজ যেমনি নয়ন তুলিয়া চাহিনু
কমলবরন শিখা—আমার
অন্তরে দিল টিকা।

ভাবিয়াছি মনে দিব না মুছিতে
এ পরশ রেখা দিব না ঘুচিতে,
সন্ধ্যার পানে নিয়ে যাব বহি
নবপ্রভাতের লিখা
উদয়-রবির টিকা।

২৬ মাঘ [১৩১২]
পদ্মা

বৈশাখে

তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ
আমলা গাছের কচি পাতায়
কোথা থেকে ক্ষণে ক্ষণে
নিমের ফুলে গন্ধে মাতায়।
কেউ কোথা নেই মাঠের 'পরে,
কেউ কোথা নেই শূন্য ঘরে
আজ দুপুরে আকাশতলে
রিমিঝিমি নূপুর বাজে।
বারে বারে ঘুরে ঘুরে
মৌমাছিদের গুঞ্জ স্বরে
কার চরণের নৃত্য যেন
ফিরে আমার বুকের মাঝে,
রক্তে আমার তালে তালে
রিমিঝিমি নূপুর বাজে।

ঘন মহুল-শাখার মতো
নিশ্বাসিয়া উঠিছে প্রাণ;
গায়ে আমার লেগেছে কার
এলোচুলের সুদূর ঘ্রাণ।

আজি রোদের প্রখর তাপে
বাঁধের জলে আলো কাঁপে,
বাতাস বাজে মর্মরিয়া
সারি-বাঁধা তালের বনে।
আমার মনের মরীচিকা
আকাশপারে পড়ল লিখা,
লক্ষ্যবিহীন দূরের 'পরে
চেয়ে আছি আপন মনে।
অলস ধেনু চরে বেড়ায়
সারি-বাঁধা তালের বনে।

আজিকার এই তপ্ত দিনে
কাটল বেলা এমনি করে।
গ্রামের ধারে ঘাটের পথে
এল গভীর ছায়া পড়ে।
সন্ধ্যা এখন পড়ছে হেলে
শালবনেতে আঁচল মেলে,
আঁধার-ঢালা দিঘির ঘাটে
হয়েছে শেষ-কলস ভরা।
মনের কথা কুড়িয়ে নিয়ে
ভাবি মাঠের মধ্যে গিয়ে—
সারা দিনের অকাজে আজ
কেউ কি মোরে দেয় নি ধরা?
আমার কি মন শূন্য, যখন
হল বধূর কলস-ভরা?

৭ বৈশাখ ১৩১৩

বিদায়

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি তো আর নাই।
এগিয়ে সবে যাও না দলে দলে,
জয়মাল্য লও না তুলি গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই।

অনেক দূরে এলেম সাথে সাথে,
চলেছিলেম সবাই হাতে হাতে।
এইখানেতে দুটি পথের মোড়ে
হিয়া আমার উঠল কেমন করে
জানি নে কোন্ ফুলের গন্ধ ঘোরে
সৃষ্টিছাড়া ব্যাকুল বেদনাতে।
আর তো চলা হয় না সাথে সাথে।

তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে
সে-সব মিছে হয়েছে মোর কাছে।
রত্ন খোঁজা, রাজ্য ভাঙা-গড়া,
মতের লাগি দেশবিদেশে লড়া,
আলবালে জল সেচন করা
উচ্চশাখা স্বর্ণচাঁপার গাছে।
পারি নে আর চলতে সবার পাছে।

আকাশ ছেয়ে মন-ভোলানো হাসি
আমার প্রাণে বাজাল আজ বাঁশি।
লাগল আলস পথে চলার মাঝে,
হঠাৎ বাধা পড়ল সকল কাজে,

একটি কথা পরান জুড়ে বাজে
"ভালোবাসি, হায় রে ভালোবাসি।"
সবার বড়ো হৃদয়-হরা হাসি।

তোমরা তবে বিদায় দেহ মোরে,
অকাজ আমি নিয়েছি সাধ করে।
মেঘের পথের পথিক আমি আজি,
হাওয়ার মুখে চলে যেতেই রাজি,
অকূল-ভাসা তরীর আমি মাঝি
বেড়াই ঘুরে অকারণের ঘোরে।
তোমরা সবে বিদায় দেহ মোরে।

১৭ চৈত্র ১৩১২
বোলপুর

পথের শেষ

পথের নেশা আমায় লেগেছিল,
পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।
সূর্য তখন পূব-গগনমূলে,
নৌকা তখন বাঁধা নদীর কূলে,
শিশির তখন শুকায় নিকো ফুলে,
শিবালয়ে উঠল বেজে শাঁখ,
পথের নেশা তখন লেগেছিল,
পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।

আঁকাবাঁকা রাঙা মাটির লেখা
ঘরছাড়া ওই নানা দেশের পথ—
প্রভাতকালে অপার পানে চেয়ে
কী মোহগান উঠতেছিল গেয়ে,
উদার সুরে ফেলতেছিল ছেয়ে
বহুদূরের অরণ্য-পর্বত,

নানা দিনের নানা পথিক-চলা
ঘরছাড়া ওই নানা দেশের পথ।

ভাবি নাইকো কেন কিসের লাগি
ছুটে চলে এলেম পথের 'পরে।
নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ,
বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুক,
প্রতি পদেই অন্তর উৎসুক
অজানা কোন্ নিরুদ্দেশের তরে,
ভোরের বেলা দুয়ার খুলে দিয়ে
বাহির হয়ে এলেম পথের 'পরে।

বেলা এখন অনেক হয়ে গেছে,
পেরিয়ে চলে এলেম বহুদূর।
ভেবেছিলেম পথের বাঁকে বাঁকে
নব নব ভাগ্য আমায় ডাকে,
হঠাৎ যেন দেখতে পাব কাকে,
শুনতে যেন পাব নূতন সুর।
তার পরে তো অনেক বেলা হল
পেরিয়ে চলে এলেম বহুদূর।

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,
এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পারে খেয়ার তরী ভাসা।
জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।

১৪ চৈত্র [১৩১২]

বোলপুর

নীড় ও আকাশ

নীড়ে বসে গেয়েছিলেম
আলোছায়ার বিচিত্র গান।
সেই গানেতে মিশেছিল
বনভূমির চঞ্চল প্রাণ।
দুপুরবেলার গভীর ক্লান্তি,
রাত্রিবেলার নিবিড় শান্তি,
প্রভাতকালের বিজয়যাত্রা,
মলিন মৌন সন্ধ্যাবেলার,
পাতার কাঁপা, ফুলের ফোটা,
শ্রাবণ রাতে জলের ফোঁটা,
উস্খুস্ শব্দটুকুন
কোটরমাঝে কীটের খেলার,
কত আভাস আসা-যাওয়ার,
ঝরঝরানি হঠাৎ হাওয়ার,
বেণুবনের ব্যাকুল বার্তা
নিশ্বসিত জ্যোৎস্নারাতে,
ঘাসের পাতার মাটির গন্ধ,
কত ঋতুর কত ছন্দ,
সুরে সুরে জড়িয়ে ছিল,
নীড়ে গাওয়া গানের সাথে।

আজ কি আমায় গাইতে হবে
নীল আকাশের নির্জন গান?
নীড়ের বাঁধন ভুলে গিয়ে
ছড়িয়ে দেব মুক্ত পরান?
গন্ধবিহীন বায়ুস্তরে,
শব্দবিহীন শূন্য'পরে,

ছায়াবিহীন জ্যোতির মাঝে,
সঙ্গিবিহীন নির্মমতায়
মিশে যাব অবাধ সুখে,
উড়ে যাব ঊর্ধ্বমুখে,
গেয়ে যাব পূর্ণস্বরে
অর্থবিহীন কলকথায় ?
আপন মনের পাই নে দিশা,
ভুলি শঙ্কা, হারাই তৃষা,
যখন করি বাঁধনহারা
এই আনন্দ-অমৃতপান।
তবু নীড়েই ফিরে আসি,
এমনি কাঁদি এমনি হাসি
তবুও এই ভালোবাসি
আলোছায়ার বিচিত্র গান।

১২ চৈত্র [১৩১২]
বোলপুর

সমুদ্রে

সকালবেলায় ঘাটে যেদিন
ভাসিয়ে দিলেম নৌকোখানি
কোথায় আমার যেতে হবে
সে-কথা কি কিছুই জানি ?
শুধু শিকল দিলেম খুলে,
শুধু নিশান দিলেম তুলে,
টানি নি দাঁড়, ধরি নি হাল,
ভেসে গেলেম স্রোতের মুখে ;
তীরে তরুর ডালে ডালে
ডাকল পাখি প্রভাত কালে,

তীরে তরুর ছায়ায় রাখাল
বাজায় বাঁশি মনের সুখে।

তখন আমি ভাবি নাইকো
সূর্য যাবে অস্তাচলে,
নদীর স্রোতে ভেসে ভেসে
পড়ব এসে সাগর-জলে ;
ঘাটে ঘাটে তীরে তীরে
যে-তরী ধায় ধীরে ধীরে,
বাইতে হবে নিয়ে তারে
নীল পাথারে একলা প্রাণে।
তারাগুলি আকাশ ছেয়ে
মুখে আমার রৈল চেয়ে,
সিন্ধু-শকুন উড়ে গেল
কূলে আপন কুলায় পানে।

দুলুক তরী ঢেউয়ের 'পরে
ওরে আমার জাগ্রত প্রাণ।
গাও রে আজি নিশীথরাতে
অকূল-পাড়ির আনন্দগান।
যাক না মুছে তটের রেখা,
নাই বা কিছু গেল দেখা
অতল বারি দিক না সাড়া
বাঁধনহারা হাওয়ার ডাকে।
দোসর-ছাড়া একার দেশে
একেবারে এক নিমেষে,
লও রে বুকে দু-হাত মেলি
অন্তবিহীন অজানাকে।

৭ বৈশাখ ১৩১৩

দিনশেষ

ভাঙা অতিথশালা।
ফাটা ভিতে অশথ-বটে
মেলেছে ডালপালা।
প্রখর রোদে তপ্ত পথে
কেটেছে দিন কোনোমতে,
মনে ছিল সন্ধ্যাবেলায়
মিলবে হেথা ঠাঁই ;
মাঠের 'পরে আঁধার নামে,
হাটের লোকে ফিরল গ্রামে,
হেথায় এসে চেয়ে দেখি
নাই যে কেহ নাই।

কত কালে কত লোকে
কত দিনের শেষে
ধুয়েছিল পথের ধুলা
এইখানেতে এসে।
বসেছিল জ্যোৎস্নারাতে
স্নিগ্ধ শীতল আঙিনাতে,
কয়েছিল সবাই মিলে
নানাদেশের কথা।
প্রভাত হলে পাখির গানে
জেগেছিল নূতন প্রাণে,
দুলেছিল ফুলের ভারে
পথের তরুলতা।

আমি যেদিন এলেম, সেদিন
দীপ জ্বলে না ঘরে।
বহুদিনের শিখার কালি
আঁকা ভিতের 'পরে।

শুক্লজলা দিঘির পাড়ে
জোনাক ফিরে ঝোপে ঝাড়ে,
ভাঙা পথে বাঁশের শাখা
ফেলে ভয়ের ছায়া।
আমার দিনের যাত্রাশেষে
কার অতিথি হলেম এসে ?
হায় রে বিজন দীর্ঘ রাত্রি,
হায় রে ক্লান্ত কায়া।

৮ বৈশাখ ১৩১৩

সমাপ্তি

বন্ধ হয়ে এল স্রোতের ধারা,
শৈবালেতে আটক প'ল তরী ;
নৌকা-বাওয়া এবার করো সারা,
নাই রে হাওয়া, পাল নিয়ে কী করি।
এখন তবে চলো নদীর তটে,
গোধূলিতে আকাশ হল রাঙা,
পশ্চিমেতে আঁকা আগুন-পটে
বাবলাবনে ঐ দেখা যায় ডাঙা।
ভেসো না আর, যেয়ো না আর ভেসে,
চলো এখন, যাবে যে দূরদেশে।

এখন তোমায় তারার ক্ষীণালোকে
চলতে হবে মাঠের পথে একা,
গিরিকানন পড়বে কি আর চোখে,
কুটিরগুলি যাবে কি আর দেখা ?
পিছন হতে দখিন-সমীরণে
ফুলের গন্ধ আসবে আঁধার বেয়ে

অসময়ে হঠাৎ ক্ষণে ক্ষণে
আবেশেতে দিবে হৃদয় ছেয়ে।
চলো এবার ক'রো না আর দেরি—
মেঘের আভাস আকাশকোণে হেরি।

হাটের সাথে ঘাটের সাথে আজি
ব্যবসা তোর বন্ধ হয়ে গেল।
এখন ঘরে আয় রে ফিরে মাঝি,
আঙিনাতে আসনখানি মেলো।
ভুলে যা রে দিনের আনাগোনা
জ্বালতে হবে সারারাতের আলো,
শ্রান্ত ওরে, রেখে দে জাল-বোনা,
গুটিয়ে ফেলো সকল মন্দভালো।
ফিরিয়ে আনো ছড়িয়ে-পড়া মন,
সফল হ'ক রে সকল সমাপন।

১০ বৈশাখ ১৩১৩
বোলপুর

কোকিল

আজ বিকালে কোকিল ডাকে,
শুনে মনে লাগে
বাংলাদেশে ছিলেম যেন
তিন-শ বছর আগে।
সে দিনের সে স্নিগ্ধ গভীর
গ্রামপথের মায়া
আমার চোখে ফেলেছে আজ
অশ্রুজলের ছায়া।

পল্লীখানি প্রাণে ভরা,
গোলায় ভরা ধান,
ঘাটে শুনি নারীর কণ্ঠে
হাসির কলতান।
সন্ধ্যাবেলায় ছাদের 'পরে
দখিন হাওয়া বহে,
তারার আলোয় কারা ব'সে
পুরাণ-কথা কহে।

ফুলবাগানের বেড়া হতে
হেনার গন্ধ ভাসে,
কদমশাখার আড়াল থেকে
চাঁদটি উঠে আসে।
বধূ তখন বিনিয়ে খোপা
চোখে কাজল আঁকে,
মাঝে মাঝে বকুলবনে
কোকিল কোথা ডাকে।

তিন-শ বছর কোথায় গেল,
তবু বুঝি নাকো
আজো কেন ওরে কোকিল
তেমনি সুরেই ডাক।
ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে গেছে
ফেটেছে সেই ছাদ,
রূপকথা আজ কাহার মুখে
শুনবে সাঁঝের চাঁদ ?

শহর থেকে ঘণ্টা বাজে,
সময় নাই রে হায়—
ঘর্ঘরিয়া চলেছি আজ
কিসের ব্যর্থতায় !

আর কি বধূ, গাঁথ মালা,
চোখে কাজল আঁক ?
পুরানো সেই দিনের সুরে
কোকিল কেন ডাক ?

২৯ বৈশাখ [১৩১৩]
বোলপুর

দিঘি

জুড়াল রে দিনের দাহ, ফুরাল সব কাজ,
কাটল সারা দিন।
সামনে আসে বাক্যহারা স্বপ্নভরা রাত
সকল কর্মহীন।
তারি মাঝে দিঘির জলে যাবার বেলাটুকু,
এইটুকু সময়,
সেই গোধূলি এল এখন, সূর্য ডুবুডুবু,
ঘরে কি মন রয় ?

কূলে কূলে পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালো
শীতল জলরাশি,
নিবিড় হয়ে নেমেছে তায় তীরের তরু হতে
সকল ছায়া আসি।
দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ওই পারে
জলের কিনারায়,
পথে চলতে বধূ যেমন নয়ন রাঙা ক'রে
বাপের ঘরে চায়।

শেওলা-পিছল পৈঠা বেয়ে নামি জলের তলে
একটি একটি করে,

ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মতো যেন
অঙ্গ উঠে ভরে।
ভেসে গেলেম আপন মনে ভেসে গেলেম পারে,
ফিরে এলেম ভেসে,
সাঁতার দিয়ে চলে গেলেম, চলে এলেম যেন
সকল-হারা দেশে।

ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তব্ধ সুগম্ভীর
গভীর ভয়ংকর,
তুমি নিবিড় নিশীথ রাত্রি বন্দী হয়ে আছ,
মাটির পিঞ্জর।
পাশে তোমার ধুলার ধরা কাজের রঙ্গভূমি,
প্রাণের নিকেতন,
হঠাৎ থেমে তোমার 'পরে নত হয়ে প'ড়ে
দেখিছে দর্পণ।

তীরের কর্ম সেরে আমি গায়ের ধুলো নিয়ে
নামি তোমার মাঝে;
এ কোন্ অশ্রুভরা গীতি ছলছলিয়ে উঠে
কানের কাছে বাজে?
ছায়া-নিচোল দিয়ে ঢাকা মরণভরা তব
বুকের আলিঙ্গন
আমায় নিল কেড়ে নিল সকল বাঁধা হতে
কাড়িল মোর মন।

শিউলিশাখে কোকিল ডাকে করুণ কাকলিতে
ক্লান্ত আশার ডাক।
ম্লান ধূসর আকাশ দিয়ে দূরে কোথায় নীড়ে
উড়ে গেল কাক।

মর্মরিয়া মর্মরিয়া বাতাস গেল মরে
বেণুবনের তলে,
আকাশ যেন ঘনিয়ে এল ঘুমঘোরের মতো
দিঘির কালো জলে।

সন্ধ্যাবেলার প্রথম তারা উঠল গাছের আড়ে,
বাজল দূরে শাঁখ।
রন্ধ্রবিহীন অন্ধকারে পাখার শব্দ মেলে
গেল বকের ঝাঁক।
পথে কেবল জোনাক জ্বলে নাইকো কোনো আলো
এলেম যবে ফিরে।
দিন ফুরাল রাত্রি এল, কাটল মাঝের বেলা
দিঘির কালো নীরে।

২৭ বৈশাখ ১৩১৩
শান্তিনিকেতন

ঝড়

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে
ঝড় এল রে আজ,
মেঘের ডাকে ডাক মিলিয়ে
বাজ্ রে মৃদঙ বাজ্।
আজকে তোরা কী গাবি গান,
কোন্ রাগিণীর সুরে?
কালো আকাশ নীল ছায়াতে
দিল যে বুক পুরে।

বৃষ্টিধারায় ঝাপসা মাঠে
ডাকছে ধেনুদল,

তালের তলে শিউরে ওঠে
বাঁধের কালো জল।
প'ড়ো বাড়ির ভাঙা ভিতে
ওঠে হাওয়ার হাঁক,
শূন্যপেতের ওপার যেন
এপারকে দেয় ডাক।

আমাকে আজ কে খুঁজেছে
পথের থেকে চেয়ে?
জলের বিন্দু পড়ছে রে তার
অলক বেয়ে বেয়ে।
মল্লারেতে মীড় মিলায়ে
বাজে আমার প্রাণ,
দুয়ার হতে কে ফিরেছে
না গেয়ে তার গান?

আয় গো তোরা ঘরেতে আয়,
ব'স্ গো তোরা কাছে।
আজ যে আমার সমস্ত মন
আসন মেলে আছে।
জলে স্থলে শূন্যে হাওয়ায়
ছুটেছে আজ কী ও?
ঝড়ের 'পরে পরান আমার
উড়ায় উত্তরীয়।

আসবি তোরা কারা কারা
বৃষ্টিধারার স্রোতে
কোন্ সে পাগল পারাবারের
কোন্ পরপার হতে?
আসবি তোরা ভিজে বনের
কান্না নিয়ে সাথে,

আসবি তোরা গন্ধরাজের
গাঁথন নিয়ে হাতে।

ওরে আজি বহুদূরের
বহুদিনের পানে
পাঁজর টুটে বেদনা মোর
ছুটেছে কোন্‌খানে ?
ফুরিয়ে যাওয়ার ছায়াবনে,
ভুলে যাওয়ার দেশে
সকল গড়া সকল ভাঙা
সকল গানের শেষে।

কাজল মেঘে ঘনিয়ে ওঠে
সকল ব্যাকুলতা
এলোমেলো হাওয়ায় ওড়ে
এলোমেলো কথা।
দুলছে দূরে বনের শাখা,
বৃষ্টি পড়ে বেগে,
মেঘের ডাকে কোন্ অশান্ত
উঠিস জেগে জেগে ?

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩
কলিকাতা

প্রতীক্ষা

আমি এখন সময় করেছি—
তোমার এবার সময় কখন হবে ?
সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি—
শিখা তাহার জ্বালিয়ে দেবে কবে ?

নামিয়ে দিয়ে এসেছি সব বোঝা,
তরী আমার বেঁধে এলেম ঘাটে,—
পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজা,
কেনাবেচা নানান হাটে হাটে।

সন্ধ্যাবেলায় যে মল্লিকা ফুটে
গন্ধ তারি কুঞ্জে উঠে জাগি,
ভরেছি জুঁই পদ্মপাতার পুটে
তোমার করপদ্মদলের লাগি।
রেখেছি আজ শান্ত শীতল ক'রে
অঙ্গন মোর চন্দন-সৌরভে!
সেরেছি কাজ সারাটা দিন ধরে
তোমার এবার সময় কখন হবে।

আজিকে চাঁদ উঠবে প্রথম রাতে
নদীর পারে নারিকেলের বনে,
দেবালয়ের বিজন আঙিনাতে
পড়বে আলো গাছের ছায়া সনে।
দখিন হাওয়া উঠবে হঠাৎ বেগে
আসবে জোয়ার সঙ্গে তারি ছুটে;
বাঁধা তরী ঢেউয়ের দোলা লেগে
ঘাটের 'পরে মরবে মাথা কুটে।

জোয়ার যখন মিশিয়ে যাবে কূলে,
থমথমিয়ে আসবে যখন জল,
বাতাস যখন পড়বে ঢুলে ঢুলে,—
চন্দ্র যখন নামবে অস্তাচল,—

শিথিল তনু তোমার ছোঁওয়া ঘুমে
চরণতলে পড়বে লুটে তবে।
বসে আছি শয়ন পাতি ভূমে
তোমার এবার সময় হবে কবে?

১৭ বৈশাখ [১৩১৩]
কলিকাতা

গান শোনা

আমার এ গান শুনবে তুমি যদি
শোনাই কখন বলো?
ভরা চোখের মতো যখন নদী
করবে ছল ছল,
ঘনিয়ে যখন আসবে মেঘের ভার
বহুকালের পরে,
না যেতে দিন সজল অন্ধকার
নামবে তোমার ঘরে;
যখন তোমার কাজ কিছু নেই হাতে,
তবুও বেলা আছে,
সাথি তোমার আসত যারা রাতে
আসে নি কেউ কাছে;
তখন আমায় মনে পড়ে যদি,
গাইতে যদি বল,—
নবমেঘের ছায়ায় যখন নদী
করবে ছল ছল।

ম্লান আলোয় দখিন বাতায়নে
বসবে তুমি একা—
আমি গাব বসে ঘরের কোণে
যাবে না মুখ দেখা।

ফুরাবে দিন আঁধার ঘন হবে,
বৃষ্টি হবে শুরু,
উঠবে বেজে মৃদুগভীর রবে
মেঘের গুরু গুরু।
ভিজে পাতার গন্ধ আসবে ঘরে,
ভিজে মাটির বাস,
মিলিয়ে যাবে বৃষ্টির ঝর্ঝরে
বনের নিশ্বাস।
বাদল-সাঁঝে আঁধার বাতায়নে
বসবে তুমি একা,
আমি গেয়ে যাব আপন মনে
যাবে না মুখ দেখা।

জলের ধারা ঝরবে দ্বিগুণ বেগে,
বাড়বে অন্ধকার,
নদীর ধারে বনের সঙ্গে মেঘে
ভেদ রবে না আর ;
কাঁসরঘণ্টা দূরে দেউল হতে
জলের শব্দে মিশে
আঁধার পথে ঝ'ড়ো হাওয়ার স্রোতে
ফিরবে দিশে দিশে।
শিরীষ ফুলের গন্ধ থেকে থেকে
আসবে জলের ছাঁটে,
উচ্চরবে পাইক যাবে হেঁকে
গ্রামের শূন্য বাটে।
জলের ধারা ঝরবে বাঁশের বনে,
বাড়বে অন্ধকার,
গানের সাথে বাদলা রাতের সনে
ভেদ রবে না আর।

ও-ঘর হতে যবে প্রদীপ জ্বেলে
আনবে আচম্বিত,
সেতারখানি মাটির 'পরে ফেলে
থামাব মোর গীত।
হঠাৎ যদি মুখ ফিরিয়ে তবে
চাহ আমার পানে
এক নিমিষে হয়তো বুঝে লবে
কী আছে মোর গানে।
নামায়ে মুখ নয়ন করে নিচু
বাহির হয়ে যাব
একলা ঘরে যদি কোনো কিছু
আপন মনে ভাব।
থামায়ে গান আমি চলে গেলে,
যদি আচম্বিত
বাদল-রাতে আঁধারে চোখ মেলে
শোন আমার গীত।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩
বোলপুর

জাগরণ

কৃষ্ণপক্ষে আধখানা চাঁদ
উঠল অনেক রাতে,
খানিক কালো খানিক আলো
পড়ল আঙিনাতে।
ওরে আমার নয়ন আমার
নয়ন নিদ্রাহারা,
আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে
কত গুনবি তারা ?

সাড়া কারো নাই রে সবাই
ঘুমায় অকাতরে।

প্রদীপগুলি নিবে গেল
দুয়ার দেওয়া ঘরে।
তুই কেন আজ বেড়াস ফিরি
আলোয় অন্ধকারে?
তুই কেন আজ দেখিস চেয়ে
বনপথের পারে?

শব্দ কোথাও শুনতে কি পাস
মাঠে তেপান্তরে?
মাটি কোথাও উঠছে কেঁপে
ঘোড়ার পদভরে?
কোথাও ধুলো উড়ছে কি রে
কোনো আকাশকোণে?
আগুনশিখা যায় কি দেখা
দূরের আম্রবনে?

সন্ধ্যাবেলা তুই কি কারো
লিখন পেয়েছিলি?
বুকের কাছে লুকিয়ে রেখে
শান্তি হারাইলি?
নাচে রে তাই রক্ত নাচে
সকল দেহমাঝে,
বাজে রে তাই কী কথা তোর
পাঁজর জুড়ে বাজে।

আজিকে এই খণ্ড চাঁদের
ক্ষীণ আলোকের 'পরে
ব্যাকুল হয়ে অশান্ত প্রাণ
আঘাত করে মরে।

কী লুকিয়ে আছে ওরে,
কী রেখেছে ঢেকে,
কিসের কাঁপন কিসের আভাস
পাই যে থেকে থেকে?

ওরে কোথাও নাই রে হাওয়া,
স্তব্ধ বাঁশের শাখা;
বালুতটের পাশে নদী
কালির বর্ণে আঁকা।
বনের 'পরে চেপে আছে
কাহার অভিশাপ,—
ধরণীতল মূর্ছা গেছে
লয়ে আপন তাপ।

ওরে হেথায় আনন্দ নেই
পুরানো তোর বাড়ি।
ভাঙা দুয়ার বাদুড়কে ওই
দিয়েছে পথ ছাড়ি।
সন্ধ্যা হতে ঘুমিয়ে পড়ে
যে যেথা পায় স্থান।
জাগে না কেউ বীণা হাতে,
গাহে না কেউ গান।

হেথা কি তোর দুয়ারে কেউ
পৌঁছোবে আজ রাতে?
এক হাতে তার ধ্বজা তুলে
আলো আরেক হাতে।
হঠাৎ কিসের চঞ্চলতা
ছুটে আসবে বেগে,
গ্রামের পথে পাখিরা সব
গেয়ে উঠবে জেগে।

উঠবে মৃদঙ বেজে বেজে
গর্জি গুরু গুরু
অঙ্গে হঠাৎ দেবে কাঁটা,
বক্ষ দুরু দুরু।
ওরে নিদ্রাবিহীন আঁখি,
ওরে শান্তিহারা,
আঁধার পথে চেয়ে চেয়ে
কার পেয়েছিস সাড়া?

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩
বোলপুর

হারাধন

বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন
সৃষ্টি করার কাজে
সকল তারা উঠল ফুটে
নীল আকাশের মাঝে;
নবীন সৃষ্টি সামনে রেখে
সুরসভার তলে
ছায়াপথে দেবতা সবাই
বসেন দলে দলে।
গাহেন তাঁরা, "কী আনন্দ।
এ কী পূর্ণ ছবি।
এ কী মন্ত্র, এ কী ছন্দ,
গ্রহ চন্দ্র রবি।"

হেনকালে সভায় কে গো
হঠাৎ বলি উঠে—
"জ্যোতির মালায় একটি তারা
কোথায় গেছে টুটে।"

ছিঁড়ে গেল বীণার তন্ত্রী,
থেমে গেল গান,
হারা তারা কোথায় গেল
পড়িল সন্ধান।
সবাই বলে, "সেই তারাতেই
স্বর্গ হতে আলো--
সেই তারাটাই সবার বড়ো,
সবার চেয়ে ভালো।"

সেদিন হতে জগৎ আছে
সেই তারাটির খোজে,
তৃপ্তি নাহি দিনে, রাত্রে
চক্ষু নাহি বোজে।
সবাই বলে, "সকল চেয়ে
তারেই পাওয়া চাই।"
সবাই বলে, "সে গিয়েছে
ভুবন কানা তাই।"
শুধু গভীর রাত্রিবেলায়
স্তব্ধ তারার দলে—
"মিথ্যা খোজা, সবাই আছে"
নীরব হেসে বলে।

চাঞ্চল্য

নিশ্বাস রুধে দু-চক্ষু মুদে
তাপসের মতো যেন
স্তব্ধ ছিলি যে ওরে বনভূমি
চঞ্চল হলি কেন?

হঠাৎ কেন রে দুলে ওঠে শাখা,
যাবে না ধরায় আর ধরে রাখা,
ঝটপট করে হানে যেন পাখা
খাঁচায় বনের পাখি।
ওরে আমলকী, ওরে কদম্ব,
কে তোদের গেল ডাকি ?

"ঐ যে ঈশানে উড়েছে নিশান,
বেজেছে বিষাণ বেগে—
আমার বরষা কালো বরষা যে
ছুটে আসে কালো মেঘে।"

ওরে নীলজল অতল অটল
ভরা ছিলি কূলে কূলে,
হঠাৎ এমন শিহরি শিহরি
উঠিলি কেন রে দুলে ?
তালতরুছায়া করে টলমল,
কেন কলকল কেন ছলছল,
কী কথা বলিতে হলি চঞ্চল,
ফুটিতে চাহে না বাক,—
কাঁদিয়া হাসিয়া সাড়া দিতে চাস
কার শুনেছিস ডাক ?

"ঐ যে আকাশে পুবের বাতাসে
উতলা উঠেছে জেগে,—
আজি মোর বর মোর কালো ঝড়
ছুটে আসে কালো মেঘে।"

পরান আমার রুধিয়া দুয়ার
আপনার গৃহমাঝে

ছিলি এতদিন বিশ্রামহীন,
কী জানি কত কী কাজে।

আজিকে হঠাৎ কী হল রে তোর,
ভেঙে যেতে চায় বুকের পাঁজর,
অকারণে বহে নয়নের লোর,
কোথা যেতে চাস ছুটে?
কে রে সে পাগল ভাঙিল আগল
কে দিল দুয়ার টুটে?

"জানি না তো আমি কোথা হতে নামি,
কী ঝড়ে আঘাত লেগে,
জীবন ভরিয়া মরণ হরিয়া
কে আসিছে কালো মেঘে।"

প্রচ্ছন্ন

কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি কিসের প্রতীক্ষায়
কেন আছ সবার পিছে?
যারা ধুলাপায়ে ধায় গো পথে তোমায় ঠেলে যায়
তারা তোমায় ভাবে মিছে।
আমি তোমার লাগি কুসুম তুলি, বসি তরুর মূলে,
আমি সাজিয়ে রাখি ডালি—
ওগো যে আসে সেই একটি-দুটি নিয়ে যে যায় তুলে
আমার সাজি হয় যে খালি।

ওগো সকাল গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যা হয়ে আসে,
চোখে লাগছে ঘুমঘোর;
সবাই ঘরের পানে যাবার বেলা আমায় দেখে হাসে
মনে লজ্জা লাগে মোর।

আমি বসে আছি বসনখানি টেনে মুখের 'পরে
যেন ভিখারিনীর মতো
কেহ শুধায় যদি "কী চাও তুমি", থাকি নিরুত্তরে
করি দুটি নয়ন নত।

আজি কোন্ লাজে বা বলব আমি তোমায় শুধু চাহি,—
আমি বলব কেমন করে—
শুধু তোমারি পথ চেয়ে আমি রজনীদিন বাহি,—
তুমি আসবে আমার তরে?
আমার দৈন্যখানি যত্নে রাখি, রাজৈশ্বর্যে তব
তারে দিব বিসর্জন,
ওগো অভাগিনীর এ অভিমান কাহার কাছে কব,
তাহা রৈল সংগোপন।

আমি সুদূরপানে চেয়ে চেয়ে ভাবি আপন মনে
হেথা তৃণে আসন মেলে—
তুমি হঠাৎ কখন আসবে হেথায় বিপুল আয়োজনে
তোমার সকল আলো জেলে।
তোমার রথের 'পরে সোনার ধ্বজা ঝলবে ঝলমল
সাথে বাজবে বাঁশির তান,—
তোমার প্রতাপভরে বসুন্ধরা করবে টলমল
আমার উঠবে নেচে প্রাণ।

তখন পথের লোকে অবাক হয়ে সবাই চেয়ে রবে,
তুমি নেমে আসবে পথে।
হেসে দু-হাত ধরে ধুলা হতে আমায় তুলে লবে—
তুমি লবে তোমার রথে।
আমার ভূষণবিহীন মলিনবেশে ভিখারিনীর সাজে
তোমার দাঁড়াব বামপাশে,
তখন লতার মতো কাঁপব আমি গর্বে সুখে লাজে
সকল বিশ্বের সকাশে।

ওগো সময় বয়ে যাচ্ছে চলে রয়েছি কান পেতে
কোথা কই গো চাকার ধ্বনি।
তোমার এ-পথ দিয়ে কত না লোক গর্বে গেল মেতে
কতই জাগিয়ে রনরনি।
তবে তুমিই কি গো নীরব হয়ে রবে ছায়ার তলে
তুমি রবে সবার শেষে—
হেথায় ভিখারিনীর লজ্জা কি গো ঝরবে নয়নজলে
তারে রাখবে মলিন বেশে?

অনুমান

পাছে দেখি তুমি আস নি, তাই
আধেক আঁখি মুদিয়ে চাই,
ভয়ে চাই নে ফিরে।
আমি দেখি যেন আপন মনে
পথের শেষে দূরের বনে
আসছ তুমি ধীরে।
যেন চিনতে পারি সেই অশান্ত
তোমার উত্তরীয়ের প্রান্ত
ওড়ে হাওয়ার 'পরে।
আমি একলা বসে মনে গনি
শুনছি তোমার পদধ্বনি
মর্মরে মর্মরে।
ভোরে নয়ন মেলে অরুণরাগে
যখন আমার প্রাণে জাগে
অকারণের হাসি,
যখন নবীন তৃণে লতায় গাছে
কোন্ জোয়ারের স্রোতে নাচে
সবুজ সুধারাশি,—

যখন	নব মেঘের সজল ছায়া
যেন রে কার মিলন-মায়া
ঘনায় বিশ্ব জুড়ে,
যখন	পুলকে নীল শৈল ঘেরি
বেজে ওঠে কাহার ভেরী,
ধ্বজা কাহার উড়ে,—

তখন	মিথ্যা সত্য কেই বা জানে,
সন্দেহ আর কেই বা মানে,
ভুল যদি হয় হ'ক।
ওগো	জানি না কি আমার হিয়া
কে ভুলাল পরশ দিয়া,
কে জুড়াল চোখ।
সে কি	তখন আমি ছিলেম একা,
কেউ কি মোরে দেয় নি দেখা?
কেউ আসে নাই পিছে?
তখন	আড়াল হতে সহাস আঁখি
আমার মুখে চায় নি নাকি?
এ কি এমন মিছে?

বর্ষাপ্রভাত

ওগো	এমন সোনার মায়াখানি
কে যে গড়েছে।
মেঘ টুটে আজ প্রভাত-আলো
ফুটে পড়েছে।
বাতাস কাহার সোহাগ মাগে,
গাছে পালায় চমক লাগে,
হৃদয় আমার বিভাসরাগে
কী গান ধরেছে।

আজ বিশ্বদেবীর দ্বারের কাছে
কোন্ সে ভিখারি
ভোরের বেলা দাঁড়িয়েছিল
দু-হাত বিথারি',—
আঁজল ভরে সোনা দিতে
ছাপিয়ে পড়ে চারি ভিতে,
লুটিয়ে গেল পৃথিবীতে,
এ কী নেহারি।

ওগো পারিজাতের কুঞ্জবনে
স্বর্গপুরীতে
মৌমাছিরা লেগেছিল
মধু চুরিতে।
আজ প্রভাতে একেবারে
ভেঙেছে চাক সুধার ভারে,
সোনার মধু লক্ষধারে
লাগে ঝুরিতে।

আজ সকাল হতেই খবর এল,—
লক্ষ্মী একেলা
অরুণরাগে পাতবে আসন
প্রভাত বেলা।
শুনে দিগ্‌বিদিকে টুটে
আলোর পদ্ম উঠল ফুটে,
বিশ্বহৃদয়মধুপ জুটে
করেছে মেলা।

ও কি সুরপুরীর পর্দাখানি
নীরবে খুলে
ইন্দ্রাণী আজ দাঁড়িয়ে আছেন
জানালা-মূলে ?

কে জানে গো কী উল্লাসে
হেসেন ধরা মধুর হাসে,
আঁচলখানি নীলাকাশে
পড়েছে দুলে।

ওগো কাহারে আজ জানাই, আমি—
—কী আছে ভাষা—
আকাশপানে চেয়ে আমার
মিটেছে আশা।
হৃদয় আমার গেছে ভেসে
চাই নে-কিছুর স্বর্গ-শেষে,
ঘুচে গেছে এক নিমেষে
সকল পিপাসা।

বর্ষা-সন্ধ্যা

আমায় অমনি খুশি করে রাখো
কিছুই না দিয়ে,—
শুধু তোমার বাহুর ডোরে
বাহু বাঁধিয়ে।
এমনি ধূসর মাঠের পারে,
এমনি সাঁঝের অন্ধকারে,
বাজাও আমার প্রাণের তারে
গভীর ঘা দিয়ে।
আমায় অমনি রাখো বন্দী করে
কিছুই না দিয়ে।

আমি আপনাকে আজ বিছিয়ে দেব
কিছুই না করি',
দু-হাত মেলে দিয়ে, তোমার
চরণ পাকড়ি।

আষাঢ়-রাতের সভায় তব
কোনো কথাই নাহি কব,
বুক দিয়ে সব চেপে লব
নিখিল আঁকড়ি।
আমি রাতের সাথে মিশিয়ে রব
কিছুই না করি'।

আজ বাদল হাওয়ায় কোথা রে জুঁই
গন্ধে মেতেছে?
লুপ্ত তারার মালা কে আজ
লুকিয়ে গেঁথেছে?
আজি নীরব অভিসারে
কে চলেছে আকাশপারে,
কে আজি এই অন্ধকারে
শয়ন পেতেছে?
আজ বাদল হাওয়ায় জুঁই আপনার
গন্ধে মেতেছে।

ওগো আজকে আমি সুখে রব
কিছুই না নিয়ে
আপন হতে আপন মনে
সুধা ছানিয়ে।
বনে হতে বনান্তরে
ঘনধারায় বৃষ্টি ঝরে,
নিদ্রাবিহীন নয়ন 'পরে
স্বপন বানিয়ে।
ওগো আজকে পরান ভরে লব
কিছুই না নিয়ে।

"সব-পেয়েছি"র দেশ

সব-পেয়েছির দেশে কারো
নাই রে কোঠাবাড়ি,
দুয়ার খোলা পড়ে আছে,
কোথায় গেল দ্বারী?
অশ্বশালায় অশ্ব কোথায়
হস্তিশালায় হাতি,
স্ফটিকদীপে গন্ধতৈলে
জ্বালায় না কেউ বাতি।
রমণীরা মোতির সিঁথি
পরে না কেউ কেশে,
দেউলে নেই সোনার চূড়া
সব-পেয়েছির দেশে।

পথের ধারে ঘাস উঠেছে
গাছের ছায়াতলে,
স্বচ্ছতরল স্রোতের ধারা
পাশ দিয়ে তার চলে।
কুটিরেতে বেড়ার 'পরে
দোলে ঝুমকা লতা;
সকাল হতে মৌমাছিদের
ব্যস্ত ব্যাকুলতা।
ভোরের বেলা পথিকেরা
কী কাজে যায় হেসে—
সাঁজে ফেরে বিনা-বেতন
সব-পেয়েছির দেশে।

আঙিনাতে দুপুর বেলা
মৃদুকরুণ গেয়ে

বকুলতলার ছায়ায় বসে
চরকা কাটে মেয়ে।
মাঠে মাঠে ঢেউ দিয়েছে
নতুন কচি ধানে,
কিসের গন্ধ কাহার বাঁশি
হঠাৎ আসে প্রাণে।
নীল আকাশের হৃদয়খানি
সবুজ বনে মেশে,
যে চলে সেই গান গেয়ে যায়
সব-পেয়েছির দেশে।

সদাগরের নৌকা যত
চলে নদীর 'পরে—
হেথায় ঘাটে বাঁধে না কেউ
কেনাবেচার তরে।
সৈন্যদলে উড়িয়ে ধ্বজা
কাঁপিয়ে চলে পথ ;
হেথায় কভু নাহি থামে
মহারাজের রথ।
এক রজনীর তরে হেথা
দূরের পান্থ এসে
দেখতে না পায় কী আছে এই
সব-পেয়েছির দেশে।

নাইকো পথে ঠেলাঠেলি,
নাইকো ঘাটে গোল,
ওরে কবি এইখানে তোর
কুটিরখানি তোল।
ধুয়ে ফেল রে পথের ধুলো,
নামিয়ে দে রে বোঝা,

বেঁধে নে তোর সেতারখানা
রেখে দে তোর খোজা।
পা ছড়িয়ে ব'স্‌ রে হেথায়
সারাদিনের শেষে,
তারায়-ভরা আকাশতলে
সব-পেয়েছির দেশে।

সার্থক নৈরাশ্য

তখন ছিল যে গভীর রাত্রিবেলা
নিদ্রা ছিল না চোখের কোণে;
আষাঢ় আঁধারে আকাশে মেঘের মেলা,
কোথাও বাতাস ছিল না বনে।
বিরাম ছিল না তপ্ত শয়ন তলে,
কাঙাল ছিল বসে মোর প্রাণে;
দু-হাত বাড়ায়ে কী জানি কী কথা বলে,
কাঙাল চায় যে কারে কে জানে।
দিল আঁধারের সকল রন্ধ্র ভরি
তাহার ক্ষুব্ধ ক্ষুধিত ভাষা;
মনে হল যেন বর্ষার বিভাবরী
আজি হারাল রে সব আশা।

অনাথ জগতে যেন এক সুখ আছে,
তাও জগৎ খুঁজে না মেলে;
আঁধারে কখন সে এসে যায় গো পাছে
বুকে রেখেছে আগুন জেলে।
দাও দাও বলে হাঁকিনু সুদূরে চেয়ে
আমি ফুকারি ডাকিনু কারে।
এমন সময়ে অরুণ-তরণী বেয়ে
প্রভাত নামিল গগনপারে।

পেয়েছি পেয়েছি নিবাও নিশার বাতি,
আমি কিছুই চাহি নে আর।
ওগো নিষ্ঠুর শূন্য নীরব রাতি
তোমায় করি গো নমস্কার।
বাঁচালে, বাঁচালে,—বধির আঁধার তব
আমায় পৌঁছিয়া দিল কূলে।
বঞ্চিত করি যা দিয়েছ কারে কব,
আমায় জগতে দিয়েছ তুলে।

ধন্য প্রভাতরবি,
আমার লহ গো নমস্কার।
ধন্য মধুর বায়ু
তোমায় নমি হে বারম্বার।
ওগো প্রভাতের পাখি
তোমার কল-নির্মল স্বরে
আমার প্রণাম লয়ে
বিছাও দূর গগনের 'পরে।
ধন্য ধরার মাটি
জগতে ধন্য জীবের মেলা।
ধুলায় নমিয়া মাথা
ধন্য আমি এ প্রভাতবেলা।

প্রার্থনা

আমি বিকাব না কিছুতে আর
আপনারে।
আমি দাঁড়াতে চাই সভার তলে
সবার সাথে এক-সারে।

সকালবেলার আলোর মাঝে
মলিন যেন না হই লাজে,
আলো যেন পশিতে পায়
মনের মধ্যে এক-বারে।
বিকাব না বিকাব না
আপনারে।

আমি বিশ্ব সাথে রব সহজ-
বিশ্বাসে।
আমি আকাশ হতে বাতাস নেব
প্রাণের মধ্যে নিশ্বাসে।
পেয়ে ধরার মাটির স্নেহ
পুণ্য হবে সর্ব দেহ,
গাছের শাখা উঠবে দুলে
আমার মনের উল্লাসে।
বিশ্বে রব সহজ সুখে
বিশ্বাসে।

আমি সবায় দেখে খুশি হব
অন্তরে।
কিছু বেসুর যেন বাজে না আর
আমার বীণাযন্তরে।
যাহাই আছে নয়ন ভরি
সবই যেন গ্রহণ করি,
চিত্তে নামে আকাশ-গলা
আনন্দিত মন্ত্র রে।
সবায় দেখে তৃপ্ত রব
অন্তরে।

খেয়া

তুমি এপার-ওপার কর কে গো
ওগো খেয়ার নেয়ে।
আমি ঘরের দ্বারে বসে বসে
দেখি যে তাই চেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।
ভাঙিলে হাট দলে দলে
সবাই যবে ঘাটে চলে,
আমি তখন মনে করি
আমিও যাই ধেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।

তুমি সন্ধ্যাবেলা ওপার-পানে
তরণী যাও বেয়ে,
দেখে মন আমার কেমন সুরে
ওঠে যে গান গেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।
কালো জলের কলকলে
আঁখি আমার ছলছলে,
ওপার হতে সোনার আভা
পরান ফেলে ছেয়ে,
ওগো খেয়ার নেয়ে।

দেখি তোমার মুখে কথাটি নেই
ওগো খেয়ার নেয়ে।
কী যে তোমার চোখে লেখা আছে
দেখি যে তাই চেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।

আমার মুখে ক্ষণতরে
যদি তোমার আঁখি পড়ে
আমি তখন মনে করি
আমিও যাই ধেয়ে,
ওগো খেয়ার নেয়ে।

১৫ শ্রাবণ ১৩১২

নাটক ও প্রহসন

রাজা

রাজা

১

অন্ধকার ঘর

রানী সুদর্শনা ও তাঁহার দাসী সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। আলো, আলো কই? এ-ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না?

সুরঙ্গমা। রানীমা, তোমার ঘরে ঘরেই তো আলো জ্বলছে—তার থেকে সরে আসবার জন্যে কি একটা ঘরেও অন্ধকার রাখবে না?

সুদর্শনা। কোথাও অন্ধকার কেন থাকবে?

সুরঙ্গমা। তা হলে যে আলোও চিনবে না অন্ধকারও চিনবে না।

সুদর্শনা। তুই যেমন এই অন্ধকার ঘরের দাসী তেমনি তোর অন্ধকারের মতো কথা, অর্থই বোঝা যায় না। বল্ তো এ-ঘরটা আছে কোথায়। কোথা দিয়ে এখানে আসি কোথা দিয়ে বেরোই প্রতিদিনই ধাঁদা লাগে।

সুরঙ্গমা। এ-ঘর মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরি। তোমার জন্যেই রাজা বিশেষ করে করেছেন।

সুদর্শনা। তাঁর ঘরের অভাব কী ছিল যে, এই অন্ধকার ঘরটা বিশেষ করে করেছেন।

সুরঙ্গমা। আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা—এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন।

সুদর্শনা। না, না, আমি আলো চাই—আলোর জন্যে অস্থির হয়ে আছি। তোকে আমি আমার গলার হার দেব যদি এখানে একদিন আলো আনতে পারিস।

সুরঙ্গমা। আমার সাধ্য কী মা। যেখানে তিনি অন্ধকার রাখেন আমি সেখানে আলো জ্বালব!

সুদর্শনা। এত ভক্তি তোর? অথচ শুনেছি তোর বাপকে রাজা শাস্তি দিয়েছেন। সে কি সত্যি?

সুরঙ্গমা। সত্যি। বাবা জুয়ো খেলত। রাজ্যের যত যুবক আমাদের ঘরে জুটত—মদ খেত আর জুয়ো খেলত।

সুদর্শনা। তুই কী করতিস ?

সুরঙ্গমা। মা, তবে সব শুনেছ। আমি নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম। বাবা ইচ্ছে করেই আমাকে সে-পথে দাঁড় করিয়েছিলেন। আমার মা ছিল না।

সুদর্শনা। রাজা যখন তোর বাপকে নির্বাসিত করে দিলেন তখন তোর রাগ হয় নি ?

সুরঙ্গমা। খুব রাগ হয়েছিল—ইচ্ছে হয়েছিল কেউ যদি রাজাকে মেরে ফেলে তো বেশ হয়।

সুদর্শনা। রাজা তোর বাপের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনে কোথায় রাখলেন ?

সুরঙ্গমা। কোথায় রাখলেন কে জানে। কিন্তু কী কষ্ট গেছে! আমাকে যেন ছুঁচ ফোটাত, আগুনে পোড়াত।

সুদর্শনা। কেন, তোর এত কষ্ট কিসের ছিল।

সুরঙ্গমা। আমি যে নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম—সে-পথ বন্ধ হতেই মনে হল আমার যেন কোনো আশ্রয়ই রইল না। আমি কেবল খাঁচায়-পোরা বুনো জন্তুর মত কেবল গর্জে বেড়াতুম এবং সবাইকে আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করত।

সুদর্শনা। রাজাকে তখন তোর কী মনে হত!

সুরঙ্গমা। উঃ কী নিষ্ঠুর! কী নিষ্ঠুর! কী অবিচলিত নিষ্ঠুরতা!

সুদর্শনা সেই রাজার 'পরে তোর এত ভক্তি হল কী করে ?

সুরঙ্গমা। কী জানি মা! এত অটল এত কঠোর বলেই এত নির্ভর এত ভরসা। নইলে আমার মতো নষ্ট আশ্রয় পেত কেমন করে ?

সুদর্শনা। তোর মন বদল হল কখন ?

সুরঙ্গমা। কী জানি কখন হয়ে গেল। সমস্ত দুরন্তপনা হার মেনে একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন দেখি যত ভয়ানক ততই সুন্দর। বেঁচে গেলুম, বেঁচে গেলুম, জন্মের মতো বেঁচে গেলুম।

সুদর্শনা। আচ্ছা সুরঙ্গমা, মাথা খা, সত্যি করে বল্ আমার রাজাকে দেখতে কেমন ? আমি একদিনও তাঁকে চোখে দেখলুম না। অন্ধকারেই আমার কাছে আসেন অন্ধকারেই যান। কতলোককে জিজ্ঞাসা করি কেউ স্পষ্ট করে জবাব দেয় না—সবাই যেন কী একটা লুকিয়ে রাখে।

সুরঙ্গমা। আমি সত্যি বলছি রানী, ভালো করে বলতে পারব না। তিনি কি সুন্দর ? না, লোকে যাকে সুন্দর বলে তিনি তা নন।

সুদর্শনা। বলিস কী? সুন্দর নন?

সুরঙ্গমা। না রানীমা। সুন্দর বললে তাঁকে ছোটো করে বলা হবে।

সুদর্শনা। তোর সব কথা ওই একরকম। কিছু বোঝা যায় না।

সুরঙ্গমা। কী করব মা, সব কথা তো বোঝানো যায় না। বাপের বাড়িতে অল্পবয়সে অনেক পুরুষ দেখেছি, তাদের সুন্দর বলতুম। তারা আমার দিনরাত্রিকে আমার সুখদুঃখকে কী নাচন নাচিয়ে বেড়িয়েছিল সে আজও ভুলতে পারি নি। আমার রাজা কি তাদের মতো? সুন্দর! কক্‌খনো না।

সুদর্শনা। সুন্দর নয়?

সুরঙ্গমা। হাঁ, তাই বলব—সুন্দর নয়। সুন্দর নয় বলেই এমন অদ্ভুত এমন আশ্চর্য! যখন বাপের কাছ থেকে কেড়ে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল তখন সে ভয়ানক দেখলুম। আমার সমস্ত মন এমন বিমুখ হল যে কটাক্ষেও তাঁর দিকে তাকাতে চাইতুম না। তার পরে এখন এমন হয়েছে যে যখন সকালবেলায় তাঁকে প্রণাম করি তখন কেবল তাঁর পায়ের তলার মাটির দিকেই তাকাই—আর মনে হয় এই আমার ঢের—আমার নয়ন সার্থক হয়ে গেছে।

সুদর্শনা। তোর সব কথা বুঝতে পারি নে তবু শুনতে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু যাই বলিস তাঁকে দেখবই। আমার কবে বিবাহ হয়েছিল মনেও নেই; তখন আমার জ্ঞান ছিল না। মার কাছে শুনেছি তাঁকে দৈবজ্ঞ বলেছিল তাঁর মেয়ে যাঁকে স্বামিরূপে পাবে পৃথিবীতে তাঁর মতো পুরুষ আর নেই। মাকে কতবার জিজ্ঞাসা করেছি আমার স্বামীকে দেখতে কেমন—তিনি ভালো করে উত্তর দিতেই চান না, বলেন, আমি কি দেখেছি—আমি ঘোমটার ভিতর থেকে ভালো করে দেখতেই পাই নি। যিনি সুপুরুষের শ্রেষ্ঠ তাঁকে দেখব এ লোভ কি ছাড়া যায়!

সুরঙ্গমা। ওই যে মা একটা হাওয়া আসছে।

সুদর্শনা। হাওয়া? কোথায় হাওয়া?

সুরঙ্গমা। ওই যে গন্ধ পাচ্ছ না।

সুদর্শনা। না, কই গন্ধ পাচ্ছি নে তো।

সুরঙ্গমা। বড়ো দরজাটা খুলেছে—তিনি আসছেন, ভিতরে আসছেন।

সুদর্শনা। তুই কেমন করে টের পাস?

সুরঙ্গমা। কী জানি মা। আমার মনে হয় যেন আমার বুকের ভিতরে পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আমি তাঁর এই অন্ধকার ঘরের সেবিকা কিনা তাই আমার একটা বোধ জন্মে গেছে—আমার বোঝবার জন্যে কিছুই দেখবার দরকার হয় না।

সুদর্শনা। আমার যদি তোর মতো হয় তাহলে যে বেঁচে যাই।

সুরঙ্গমা। হবে মা হবে। তুমি দেখব দেখব করে যে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে রয়েছ সেইজন্যে কেবল দেখবার দিকেই তোমার সমস্ত মন পড়ে রয়েছে। সেইটে যখন ছেড়ে দেবে তখন সব আপনি সহজ হয়ে যাবে।

সুদর্শনা। দাসী হয়ে তোর এত সহজ হল কী করে? রানী হয়ে আমার হয় না কেন?

সুরঙ্গমা। আমি যে দাসী সেইজন্যেই এত সহজ হল। আমাকে যেদিন তিনি এই অন্ধকার ঘরের ভার দিয়ে বললেন, সুরঙ্গমা, এই ঘরটা প্রতিদিন তুমি প্রস্তুত করে রেখো, এই তোমার কাজ, তখন আমি তাঁর আজ্ঞা মাথায় করে নিলুম—আমি মনে মনেও বলি নি যারা তোমার আলোর ঘরে আলো জ্বালে তাদের কাজটি আমাকে দাও। তাই যে-কাজটি নিলুম তার শক্তি আপনি জেগে উঠল, কোনো বাধা পেল না। ওই যে তিনি আসছেন—ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রভু!

বাহিরে গান

খোলো খোলো দ্বার রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও এই দিকে চাও
এস দুই বাহু বাড়ায়ে॥
কাজ হয়ে গেছে সারা,
উঠেছে সন্ধ্যাতারা,
আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া
অস্তসাগর পারায়ে॥
এসেছি দুয়ারে এসেছি, আমারে
বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে।
ভরি লয়ে ঝারি এনেছ কি বারি,
সেজেছ কি শুচি দুকূলে?
বেঁধেছ কি চুল, তুলেছ কি ফুল
গেঁথেছ কি মালা মুকুলে?
ধেনু এল গোঠে ফিরে,
পাখিরা এসেছে নীড়ে,

পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত,
আঁধারে গিয়েছে হারায়ে ॥
তোমারি দুয়ারে এসেছি, আমারে
বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে ॥

সুরঙ্গমা। তোমার দুয়োর কে বন্ধ রাখতে পারে রাজা? ও তো বন্ধ নেই কেবল ভেজানো আছে, একটু ছোঁও যদি আপনি খুলে যাবে। সেটুকুও করবে না? নিজে উঠে গিয়ে না খুলে দিলে ঢুকবে না?

গান

এ যে মোর আবরণ
ঘুচাতে কতক্ষণ?
নিশ্বাস-বায়ে উড়ে চলে যায়
তুমি কর যদি মন।
যদি পড়ে থাকি ভূমে
ধুলায় ধরণী চুমে,
তুমি তারি লাগি দ্বারে রবে জাগি
এ কেমন তব পণ?
রথের চাকার রবে
জাগাও জাগাও সবে,
আপনার ঘরে এস বলভরে
এস এস গৌরবে।
ঘুম টুটে যাক চলে,
চিনি যেন প্রভু বলে;
ছুটে এসে দ্বারে করি আপনারে
চরণে সমর্পণ ॥

রানী, যাও তবে, দরজাটা খুলে দাও, নইলে আসবেন না।

সুদর্শনা। আমি এ-ঘরের অন্ধকারে কিছুই ভালো করে দেখতে পাই নে—কোথায় দরজা কে জানে। তুই এখানকার সব জানিস—তুই আমার হয়ে খুলে দে।

[সুরঙ্গমার দ্বার উদ্‌ঘাটন, প্রণাম ও প্রস্থান[১]

[১] রাজাকে এ নাটকের কোথাও রঙ্গমঞ্চে দেখা যাইবে না।

তুমি আমাকে আলোয় দেখা দিচ্ছ না কেন ?

রাজা। আলোয় তুমি হাজার হাজার জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে দেখতে চাও ? এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকি না কেন ?

সুদর্শনা। সবাই তোমাকে দেখতে পায়, আমি রানী হয়ে দেখতে পাব না ?

রাজা। কে বললে দেখতে পায় ? মূঢ় যারা তারা মনে করে দেখতে পাচ্ছি।

সুদর্শনা। তা হ'ক, আমাকে দেখা দিতেই হবে।

রাজা। সহ্য করতে পারবে না—কষ্ট হবে।

সুদর্শনা। সহ্য হবে না—তুমি বল কী ! তুমি যে কত সুন্দর কত আশ্চর্য তা এই অন্ধকারেই বুঝতে পারি, আর আলোতে বুঝতে পারব না ? বাইরে যখন তোমার বীণা বাজে তখন আমার এমনি হয় যে, আমার নিজেকে সেই বীণার গান বলে মনে হয়। তোমার ওই সুগন্ধ উত্তরীয়টা যখন আমার গায়ে এসে ঠেকে তখন আমার মনে হয়, আমার সমস্ত অঙ্গটা বাতাসে ঘন আনন্দের সঙ্গে মিলে গেল। তোমাকে দেখলে আমি সইতে পারব না এ কী কথা !

রাজা। আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আসে না ?

সুদর্শনা। এক রকম করে আসে বই কি ! নইলে বাঁচব কী করে ?

রাজা। কী রকম দেখেছ ?

সুদর্শনা। সে তো একরকম নয় ! নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, তখন বসে বসে মনে করি আমার রাজার রূপটি বুঝি এইরকম—এমনি নেমে-আসা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়ামাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবে থাকা। আবার শরৎকালে আকাশের পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে যায় তখন মনে হয় তুমি স্নান করে তোমার শেফালিবনের পথ দিয়ে চলেছ, তোমার গলায় কুন্দ-ফুলের মালা, তোমার বুকে শ্বেত-চন্দনের ছাপ, তোমার মাথায় হালকা সাদা কাপড়ের উষ্ণীষ, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে—তখন মনে হয়, তুমি আমার পথিক বন্ধু ; তোমার সঙ্গে যদি চলতে পারি তাহলে দিগন্তে দিগন্তে সোনার সিংহদ্বার খুলে যাবে, শুভ্রতার ভিতরমহলে প্রবেশ করব। আর যদি না পারি তবে এই বাতায়নের ধারে বসে কোন্ এক অনেক-দূরের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস উঠতে থাকবে, কেবলই দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অজ্ঞাত বনের পথশ্রেণী আর অনাঘ্রাত ফুলের গন্ধের জন্যে বুকের ভিতরটা কেঁদে কেঁদে ঝুরে ঝুরে মরবে। আর বসন্তকালে এই যে সমস্ত বন রঙে রঙিন, এখন আমি তোমাকে দেখতে পাই কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ, গায়ে বসন্তী রঙের

উত্তরীয়, হাতে অশোকের মঞ্জরী, তানে তানে তোমার বীণার সব-কটি সোনার তার উতলা।

রাজা। এত বিচিত্ররূপ দেখছ তবে কেন সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ মূর্তি দেখতে চাচ্ছ? সেটা যদি তোমার মনের মতো না হয় তবে তো সমস্ত গেল।

সুদর্শনা। মনের মতো হবে নিশ্চয় জানি।

রাজা। মন যদি তার মতো হয় তবেই সে মনের মতো হবে। আগে তাই হ'ক।

সুদর্শনা। সত্য বলছি এই অন্ধকারের মধ্যে যখন তোমাকে দেখতে না পাই অথচ তুমি আছ বলে জানি তখন এক-একবার কেমন একটা ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

রাজা। সে-ভয়ে দোষ কী? প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে তার রস হালকা হয়ে যায়।

সুদর্শনা। আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও?

রাজা। পাই বইকি।

সুদর্শনা। কেমন করে দেখতে পাও? আচ্ছা, কী দেখ?

রাজা। দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার!

সুদর্শনা। আমার এত রূপ! তোমার কাছে যখন শুনি বুক ভরে ওঠে; কিন্তু ভালো করে প্রত্যয় হয় না; নিজের মধ্যে তো দেখতে পাই নে।

রাজা। নিজের আয়নায় দেখা যায় না—ছোটো হয়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি দেখতে পাও তো দেখবে সে কতবড়ো! আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়, তুমি সেখানে কি শুধু তুমি!

সুদর্শনা। বলো বলো এমনি করে বলো! আমার কাছে তোমার কথা গানের মতো বোধ হচ্ছে,—যেন অনাদিকালের গান, যেন জন্ম-জন্মান্তর শুনে এসেছি। সে কি তুমিই শুনিয়েছ, আর আমাকেই শুনিয়েছ? না, যাকে শুনিয়েছ সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক সুন্দর;—তোমার গানে সেই অলোক-সুন্দরীকে দেখতে পাই—সে কি আমার মধ্যে, না তোমার মধ্যে? তুমি আমাকে যেমন করে দেখছ তাই একবার এক নিমেষের জন্য আমাকে দেখিয়ে দাও না! তোমার কাছে অন্ধকার বলে কি কিছুই নেই? সেইজন্যেই তো তোমাকে কেমন আমার ভয় করে। এই যে কঠিন কালো লোহার

মতো অন্ধকার, যা আমার উপর ঘুমের মতো মূর্ছার মতো মৃত্যুর মতো, তোমার দিকে তার কিছুই নেই! তবে এ-জায়গায় তোমার সঙ্গে আমি কেমন করে মিলব? না, না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, এখানে নয়। যেখানে আমি গাছপালা পশুপাখি মাটিপাথর সমস্ত দেখছি সেইখানেই তোমাকে দেখব।

রাজা। আচ্ছা দেখো—কিন্তু তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে; কেউ তোমাকে বলে দেবে না—আর বলে দিলেই বা বিশ্বাস কী।

সুদর্শনা। আমি চিনে নেব, চিনে নেব—লক্ষ লোকের মধ্যে চিনে নেব। ভুল হবে না।

রাজা। আজ বসন্তপূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপরে দাঁড়িয়ো—চেয়ে দেখো—আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা ক'রো।

সুদর্শনা। তাদের মধ্যে দেখা দেবে তো?

রাজা। বার বার করে সকল দিক থেকেই দেখা দেব। সুরঙ্গমা!

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। কী প্রভু?

রাজা। আজ বসন্তপূর্ণিমার উৎসব।

সুরঙ্গমা। আমাকে কী কাজ করতে হবে?

রাজা। আজ তোমার সাজের দিন,—কাজের দিন নয়। আজ আমার পুষ্পবনের আনন্দে তোমাকে যোগ দিতে হবে।

সুরঙ্গমা। তাই হবে প্রভু।

রাজা। রানী আজ আমাকে চোখে দেখতে চান।

সুরঙ্গমা। কোথায় দেখবেন?

রাজা। যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, ফুলের কেশরের ফাগ উড়বে, জ্যোৎস্নায় ছায়ায় গলাগলি হবে সেই আমাদের দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

সুরঙ্গমা। সে-লুকোচুরির মধ্যে কি দেখা যাবে? সেখানে যে হাওয়া উতলা, সবই চঞ্চল, চোখে ধাঁদা লাগবে না?

রাজা। রানীর কৌতূহল হয়েছে।

সুরঙ্গমা। কৌতূহলের জিনিস হাজার হাজার আছে—তুমি কি তাদের সঙ্গে মিলে কৌতূহল মেটাবে? তুমি আমার তেমন রাজা নও! রানী, তোমার কৌতূহলকে শেষকালে কেঁদে ফিরে আসতে হবে।

গান

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
আজি হৃদয় মাঝে যদি গো বাজে প্রেমের বাঁশি
তবে আপনি সেধে আপনা বেঁধে পরে সে ফাঁসি,
তবে ঘুচে গো ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়—
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
চেয়ে দেখিস নারে হৃদয়-দ্বারে কে আসে যায়।
তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিন বায়!
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির- বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে।
তারে বাহিরে খুঁজি ঘুরিয়া বুঝি পাগল প্রায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।

২

পথ

প্রথম পথিক। ওগো মশায়!

প্রহরী। কেন গো?

দ্বিতীয়। রাস্তা কোথায়? আমরা বিদেশী, আমাদের রাস্তা বলে দাও।

প্রহরী। কিসের রাস্তা?

তৃতীয়। ওই যে শুনেছি আজ কোথায় উৎসব হবে। কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যাবে?

প্রহরী। এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যেদিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছোবে। সামনে চলে যাও। [প্রস্থান

প্রথম। শোনো একবার কথা শোনো। বলে সবই এক রাস্তা। তাই যদি হবে তবে এতগুলোর দরকার ছিল কী?

দ্বিতীয়। তা ভাই রাগ করিস কেন? যে-দেশের যেমন ব্যবস্থা! আমাদের দেশে তো রাস্তা নেই বললেই হয়—বাঁকাচোরা গলি, সে তো গোলকধাঁধা। আমাদের রাজা

বলে খোলা রাস্তা না থাকাই ভালো—রাস্তা পেলেই প্রজারা বেরিয়ে চলে যাবে। এ-দেশে উলটো, যেতেও কেউ ঠেকায় না, আসতেও কেউ মানা করে না—তবু মানুষও তো ঢের দেখছি—এমন খোলা পেলে আমাদের রাজ্য উজাড় হয়ে যেত!

প্রথম। ওহে জনার্দন, তোমার ওই একটা বড়ো দোষ।

জনার্দন। কী দোষ দেখলে?

প্রথম। নিজের দেশের তুমি বড়ো নিন্দে কর। খোলা রাস্তাটাই বুঝি ভালো হল? বলো তো ভাই কৌণ্ডিল্য, খোলা রাস্তাটাকে বলে কিনা ভালো।

কৌণ্ডিল্য। ভাই ভবদত্ত, বরাবরই তো দেখে আসছ জনার্দনের ওই একরকম ত্যাড়া বুদ্ধি। কোন্ দিন বিপদে পড়বেন—রাজার কানে যদি যায় তাহলে ম'লে ওঁকে শ্মশানে ফেলবার লোক খুঁজে পাবেন না।

ভবদত্ত। আমাদের তো ভাই এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি খেয়ে-শুয়ে সুখ নেই—দিনরাত গা-ঘিনঘিন করছে। কে আসছে কে যাচ্ছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই—রাম রাম!

কৌণ্ডিল্য। সে-ও তো ওই জনার্দনের পরামর্শ শুনেই এসেছি। আমাদের গুষ্টিতে এমন কখনো হয় নি। আমার বাবাকে তো জান—কতবড়ো মহাত্মালোক ছিল—শাস্ত্রমতে ঠিক উনপঞ্চাশ হাত মেপে গণ্ডি কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে—একদিনের জন্যে তার বাইরে পা ফেলে নি। মৃত্যুর পর কথা উঠল ওই উনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয়; সে এক বিষম মুশকিল; শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলে যে, উনপঞ্চাশে যে দুটো অঙ্ক আছে তার বাইরে যাবার জো নেই, অতএব ওই চার নয় উনপঞ্চাশকে উলটে নিয়ে নয় চার চুরানব্বই করে দাও—তবেই তো তাকে বাড়ির বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হত। বাবা, এত আঁটাআঁটি! এ কি যে-সে দেশ পেয়েছ।

ভবদত্ত। বটেই তো, মরতে গেলেও ভাবতে হবে, এ কি কম কথা!

কৌণ্ডিল্য। সেই দেশের মাটিতে শরীর, তবু জনার্দন বলে কিনা, খোলা রাস্তাই ভালো। [প্রস্থান

বালকগণকে লইয়া ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ওরে দক্ষিনে হাওয়ার সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে হবে—হার মানলে চলবে না—আজ সব রাস্তাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব।

গান

আজি দখিন দুয়ার খোলা—
এস হে, এস হে, এস হে, আমার
বসন্ত এস।
দিব হৃদয়-দোলায় দোলা,
এস হে, এস হে, এস হে, আমার
বসন্ত এস।
নব শ্যামল শোভন রথে
এস বকুল-বিছানো পথে,
এস বাজায়ে ব্যাকুল বেণু,
মেখে পিয়াল ফুলের রেণু
এস হে, এস হে, এস হে, আমার
বসন্ত এস।
এস ঘন পল্লবপুঞ্জে
এস হে, এস হে, এস হে।
এস বনমল্লিকাকুঞ্জে
এস হে, এস হে, এস হে।
মৃদু মধুর মদির হেসে
এস পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো,
এস হে, এস হে, এস হে, আমার
বসন্ত এস ॥ [প্রস্থান

নাগরিকদল

প্রথম। যা বলিস ভাই, আজকের দিনটাতে আমাদের রাজার দেখা দেওয়া উচিত ছিল। তার রাজ্যে বাস করছি একদিনও তাকে দেখলুম না এ কি কম দুঃখের কথা।

দ্বিতীয়। ওর ভিতরকার কথাটা তোরা কেউ জানিস নে। কাউকে যদি না বলিস তো বলি।

প্রথম। এক পাড়াতেই তো বসত করছি কবে কার কথা কাকে বলেছি। ওই

যে তোমাদের রাহক দাদা কুয়ো খুঁড়তে খুঁড়তে গুপ্তধন পেলে সে কি আমি সাধ করে ফাঁস করেছি ? সব তো জান।

দ্বিতীয়। জানি বই কি, সেইজন্যেই তো বলছি—কথাটা যদি চেপে রাখতে পার তো বলি—নইলে বিপদ ঘটতে পারে।

তৃতীয়। তুমিও তো আচ্ছা লোক হে বিরূপাক্ষ। বিপদই যদি ঘটতে পারে তবে ঘটাবার জন্যে অত ব্যস্ত হও কেন ? কে তোমার কথাটা নিয়ে দিনরাত্রি সামলে বেড়ায় ?

বিরূপাক্ষ। কথাটা উঠে পড়ল নাকি সেইজন্যেই—তা বেশ নাই বললেম। আমি বাজে কথা বলবার লোকই নই। রাজা দেখা দেন না সে-কথাটা তোমরাই তুললে—তাই তো আমি বললেম, সাধে দেখা দেন না।

প্রথম। ওহে বিরূপাক্ষ, বলেই ফেলো না।

বিরূপাক্ষ। তা তোমাদের কাছে বলতে দোষ নেই—তোমরা হলে বন্ধু মানুষ। (মৃদুস্বরে) রাজাকে দেখতে বড়ো বিকট, সেইজন্যে পণ করেছে কাউকে দেখা দেবে না।

প্রথম। তাই তো বটে। আমরা বলি, ভালোরে ভালো, সকল দেশেই রাজাকে দেখে দেশসুদ্ধ লোকের আত্মাপুরুষ বাঁশপাতার মতো হী হী করে কাঁপতে থাকে, আর আমাদেরই রাজাকে দেখা যায় না কেন। কিছু না হ'ক একবার যদি চোখ পাকিয়ে বলে, বেটার শির লেও, তাহলেও যে বুঝি রাজা বলে একটা কিছু আছে। বিরূপাক্ষর কথাটা মনে নিচ্ছে হে।

তৃতীয়। কিচ্ছু মনে নিচ্ছে না—ওর সিকি পয়সাও বিশ্বাস করি নে।

বিরূপাক্ষ। কী বললে হে, বিশু, তুমি বলতে চাও আমি মিছে কথা বলেছি ?

বিশ্ববসু। তা বলতে চাই নে কিন্তু কথাটা তাই বলে মানতে পারব না—এতে রাগই কর আর যাই কর।

বিরূপাক্ষ। তুমি মানবে কেন ? তুমি তোমার বাপখুড়োকেই মান না—এত বুদ্ধি তোমার। এ রাজত্বে রাজা যদি গা ঢাকা দিয়ে না বেড়াত তাহলে কি এখানে তোমার ঠাঁই হত ? তুমি তো নাস্তিক বললেই হয়।

বিশ্ববসু। ওহে আস্তিক, অন্য রাজার দেশ হলে তোমার জিভ কেটে কুকুরকে দিয়ে খাওয়াত, তুমি বল কিনা আমাদের রাজাকে বিকট দেখতে।

বিরূপাক্ষ। দেখো বিশু, মুখ সামলে কথা কও।

বিশ্ববসু। মুখ যে কার সামলানো দরকার সে আর বলে কাজ নেই।

প্রথম। চুপ চুপ এ-সব ভালো হচ্ছে না। আমাকে সুদ্ধ বিপদে ফেলবে দেখছি। আমি এ-সব কথার মধ্যে নেই। [প্রস্থান

ঠাকুরদাকে একদল লোকের টানাটানি করিয়া লইয়া প্রবেশ

প্রথম। ঠাকুরদা, তোমাকে আজ এমন করে সাজালে কে? মালাটি কোন্ নিপুণ হাতের গাঁথা?

ঠাকুরদা। ওরে বোকারা, সব কথাই কি খোলসা করে বলতে হবে নাকি? কিছু ঢাকা থাকবে না?

দ্বিতীয়। দরকার নেই দাদা, তোমার তো সব ফাঁস হয়েই আছে। আমাদের কবিকেশরী তোমার নামে যে গান বেঁধেছে শোন নি বুঝি? সে যে ঘরে ঘরে রটে গেছে।

ঠাকুরদা। একটা ঘরই যথেষ্ট, ঘরে ঘরে শুনে বেড়াবার কি সময় আছে?

তৃতীয়। ওটা তোমার নেহাত ফাঁকা বড়াই। ঠাকরুনদিদি তোমাকে আঁচলে বেঁধে রাখে বটে! পাড়ার যেখানে যাই সেখানেই তুমি, ঘরে থাক কখন?

ঠাকুরদা। ওরে তোদের ঠাকরুনদিদির আঁচল লম্বা আছে। পাড়ার যেখানে যাই সে-আঁচল ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। তা কবি কী বলছেন শুনি।

তৃতীয়। তিনি বলছেন,

গান

যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা,
সেখানে তোমার মতন ভোলা কে। (ঠাকুরদাদা)
যেখানে রসিক-সভা পরম শোভা
সেখানে এমন রসের ঝোলা কে। (ঠাকুরদাদা)

ঠাকুরদা। আরে চুপ চুপ। এমন বসন্তের দিনে তোরা এ কী গান ধরলি রে?

প্রথম। কেন ধরলুম জান না?

গান

যেথানে গলাগলি কোলাকুলি
তোমারি বেচাকেনা সেই হাটে,
পড়ে না পদধূলি পথ ভুলি
যেখানে ঝগড়া করে ঝগড়াটে,
যেখানে ভোলাভুলি খোলাখুলি
সেখানে তোমার মতন খোলা কে—
ঠাকুরদাদা।

ঠাকুরদা। যদি তোরা তোদের সেই কবির কাছে বিধান নিতিস তাহলে শুনতে পেতিস এই ফাল্গুন মাসের দিনে ঠাকুরদা প্রভৃতি পুরোনো জিনিসমাত্রই একেবারে বর্জনীয়। আমার নামে গান বেঁধে আজ রাগরাগিণীর অপব্যয় করিস নে, তোরা সরস্বতীর বীণার তারে মরচে ধরিয়ে দিবি যে।

দ্বিতীয়। ঠাকুরদা, তুমি তো রাস্তাতেই সভা জমালে, উৎসবে যাবে কখন? চলো আমাদের দক্ষিণ বনে।

ঠাকুরদা। ভাই আমার ওই দশা, আমি রাস্তা থেকেই চাখতে চাখতে চলি, তার পরে ভোজটা তো আছেই। আদাবন্তে চ মধ্যে চ।

দ্বিতীয়। দেখো দাদা, আজকের দিনে মনে একটা কথা বড়ো লাগছে।

ঠাকুরদা। কী বল্ দেখি।

দ্বিতীয়। এবার দেশবিদেশের লোক এসেছে, সবাই বলছে, সবই দেখছি ভালো কিন্তু রাজা দেখি নে কেন? কাউকে জবাব দিতে পারি নে। আমাদের দেশে ওইটে একটা বড়ো ফাঁকা রয়ে গেছে।

ঠাকুরদা। ফাঁকা! আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে—তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে! এই যে অন্য রাজাগুলো তারা তো উৎসবটাকে দলে মলে ছারখার করে দিলে—তাদের হাতিঘোড়া-লোকলশকরের তাড়ায় দক্ষিণ-হাওয়ার দাক্ষিণ্য আর রইল না, বসন্তর যেন দম আটকাবার জো হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজা নিজে জায়গা জোড়ে না, সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেয়। কবিকেশরীর সেই গানটা তো জানিস।

গান

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
(আমরা সবাই রাজা)

আমরা যা খুশি তাই করি
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
(আমরা সবাই রাজা)

রাজা সবারে দেন মান
সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো করে রাখে নি কেউ কোনো অসত্যে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
(আমরা সবাই রাজা)

আমরা চলব আপন মতে
শেষে মিলব তাঁরি পথে
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
(আমরা সবাই রাজা)

তৃতীয়। কিন্তু দাদা, যা বল তাঁকে দেখতে পায় না বলে লোকে অনায়াসে তাঁর নামে যা খুশি বলে সেইটে অসহ্য হয়।

প্রথম। এই দেখো না, আমাকে গাল দিলে শাস্তি আছে কিন্তু রাজাকে গাল দিলে কেউ তার মুখ বন্ধ করবারই নেই।

ঠাকুরদা। ওর মানে আছে ; প্রজার মধ্যে যে রাজাটুকু আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তার বাইরে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। সূর্যের যে তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সূর্যে ফুঁ দিলে সূর্য অম্লান-হয়েই থাকেন।

বিশ্ববসু ও বিরূপাক্ষের প্রবেশ

বিশ্ববসু। এই যে ঠাকুরদা, এই দেখো, এই লোকটা রটিয়ে বেড়াচ্ছে আমাদের রাজাকে কুৎসিত দেখতে, তাই তিনি দেখা দেন না।

ঠাকুরদা। এতে রাগ কর কেন বিশু। ওর রাজা কুৎসিত বই কী, নইলে তার রাজ্যে বিরূপাক্ষের মতো অমন চেহারা থাকে কেন? স্বয়ং ওর বাপ-মাও তো ওকে কার্তিক নাম দেন নি। ও আয়নাতে যেমন আপনার মুখটি দেখে আর রাজার চেহারা তেমনি ধ্যান করে।

বিরূপাক্ষ। ঠাকুরদা, আমি নাম করব না কিন্তু এমন লোকের কাছে খবরটা শুনেছি যাকে বিশ্বাস না করে থাকবার জো নেই।

ঠাকুরদা। নিজের চেয়ে কাকে বেশি বিশ্বাস করবে বলো।

বিরূপাক্ষ। না, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিতে পারি।

প্রথম। লোকটার লজ্জা নেই হে। একে তো যা না বলবার তাই বলে, তার পরে আবার সেটা প্রমাণ করে দিতে চায়!

দ্বিতীয়। ওহে, দাও না ওকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে মাটি-প্রমাণ করে দাও না।

ঠাকুরদা। আরে ভাই, রাগ ক'রো না। ওর রাজা কুৎসিত এই বলে বেড়িয়েই ও-বেচারা আজ উৎসব করতে বেরিয়েছিল। যাও ভাই বিরূপাক্ষ, ঢের লোক পাবে যারা তোমার কথা বিশ্বাস করবে, তাদের নিয়ে দল বেঁধে আজ আমোদ করো গে।

[প্রস্থান

বিদেশী দলের পুনঃপ্রবেশ

কৌণ্ডিল্য। সত্যি বলছি ভাই, রাজা আমাদের এমনি অভ্যেস হয়ে গেছে যে, এখানে কোথাও রাজা না দেখে মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু পায়ের তলায় যেন মাটি নেই!

ভবদত্ত। দেখো ভাই কৌণ্ডিল্য, আসল কথাটা হচ্ছে এদের মূলেই রাজা নেই। সকলে মিলে একটা গুজব রটিয়ে রেখেছে।

কৌণ্ডিল্য। আমারও তো তাই মনে হয়েছে। আমরা তো জানি, দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে রাজা—নিজেকে খুব কষে না দেখিয়ে সে তো ছাড়ে না।

জনার্দন। কিন্তু এ-রাজ্যে আগাগোড়া যেমন নিয়ম দেখছি রাজা না থাকলে তো এমন হয় না।

ভবদত্ত। এতকাল রাজার দেশে বাস করে এই বুদ্ধি হল তোমার? নিয়মই যদি থাকবে তাহলে রাজা থাকবার আর দরকার কী?

জনার্দন। এই দেখো না আজ এত লোক মিলে আনন্দ করছে, রাজা না থাকলে এরা এমন করে মিলতেই পারত না।

ভবদত্ত। ওহে জনার্দন, আসল কথাটাই যে তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। একটা নিয়ম আছে সেটা তো দেখছি, উৎসব হচ্ছে সেটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেখানে তো কোনো গোল বাধছে না—কিন্তু রাজা কোথায়, তাকে দেখলে কোথায় সেইটে বলো।

জনার্দন। আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমরা তো এমন রাজ্য জান যেখানে রাজা কেবল চোখেই দেখা যায় কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই, সেখানে কেবল ভূতের কীর্তন—কিন্তু এখানে দেখো—

কৌণ্ডিল্য। আবার ঘুরে ফিরে সেই একই কথা। তুমি ভবদত্তর আসল কথাটার উত্তর দাও না হে—হাঁ, কি, না? রাজাকে দেখেছ, কি দেখ নি?

ভবদত্ত। রেখে দাও ভাই কৌণ্ডিল্য। ওর সঙ্গে মিথ্যে বকাবকি করা। ওর ন্যায়শাস্ত্রটা পর্যন্ত এ-দেশী রকমের হয়ে উঠছে। বিনা-চক্ষে ও যখন দেখতে শুরু করেছে তখন আর ভরসা নেই। বিনা অন্নে কিছুদিন ওকে আহার করতে দিলে আবার বুদ্ধিটা সাধারণ লোকের মতো পরিষ্কার হয়ে আসতে পারে। [প্রস্থান

বাউলের দল

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।
আছে সে নয়ন-তারায় আলোক-ধারায়, তাই না হারায়,
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে॥
আমি তার মুখের কথা
শুনব বলে গেলাম কোথা,
শোনা হল না, শোনা হল না,
আজ ফিরে এসে নিজের দেশে
এই যে শুনি,
শুনি তাহার বাণী আপন গানে॥
কে তোরা খুঁজিস তারে
কাঙাল-বেশে দ্বারে দ্বারে,
দেখা মেলে না মেলে না,—
ও তোরা আয় রে ধেয়ে দেখ্ রে চেয়ে
আমার বুকে—
ওরে দেখ্ রে আমার দুই নয়ানে॥ [প্রস্থান

একদল পদাতিক

প্রথম পদাতিক। সরে যাও সব সরে যাও। তফাত যাও।

প্রথম পথিক। ইস, তাই তো। মস্তলোক বটে। লম্বা পা ফেলে চলছেন। কেন রে বাপু, সরব কেন? আমরা সব পথের কুকুর না কি?

দ্বিতীয় পদাতিক। আমাদের রাজা আসছেন।

দ্বিতীয় পথিক। রাজা? কোথাকার রাজা?

প্রথম পদাতিক। আমাদের এই দেশের রাজা।

প্রথম পথিক। লোকটা পাগল হল নাকি? আমাদের দেশের রাজা পাইক নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে আবার রাস্তায় কবে বেরোয়?

দ্বিতীয় পদাতিক। মহারাজ আজ আর গোপন থাকবেন না, তিনি স্বয়ং আজ উৎসব করবেন।

দ্বিতীয় পথিক। সত্যি না কি ভাই?

দ্বিতীয় পদাতিক। ওই দেখো না নিশেন উড়ছে।

দ্বিতীয় পথিক। তাই তো রে, ওটা নিশেনই তো বটে।

দ্বিতীয় পদাতিক। নিশেনে কিংশুক ফুল আঁকা আছে দেখছ না?

দ্বিতীয় পথিক। ওরে কিংশুক ফুলই তো বটে, মিথ্যে বলে নি—একেবারে লাল টকটক করছে।

প্রথম পদাতিক। তবে! কথাটা যে বড়ো বিশ্বাস হল না!

দ্বিতীয় পথিক। না দাদা, আমি তো অবিশ্বাস করি নি। ওই কুম্ভই গোলমাল করেছিল। আমি একটি কথাও বলি নি।

প্রথম পদাতিক। বেটা বোধ হয় শূন্যকুম্ভ, তাই আওয়াজ বেশি।

দ্বিতীয় পদাতিক। লোকটা কে হে? তোমাদের কে হয়?

দ্বিতীয় পথিক। কেউ না, কেউ না। আমাদের গ্রামের যে মোড়ল ও তার খুড়শ্বশুর—অন্য পাড়ায় বাড়ি।

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হাঁ খুড়শ্বশুর গোছের চেহারা বটে, বুদ্ধিটাও নেহাত খুড়শ্বশুরে ধাঁচার।

কুম্ভ। অনেক দুঃখে বুদ্ধিটা এই রকম হয়েছে। এই যে সেদিন কোথা থেকে এক রাজা বেরোল, নামের গোড়ায় তিন-শ পঁয়তাল্লিশটা শ্রী লাগিয়ে ঢাক পিটতে পিটতে শহর ঘুরে বেড়াল—আমি তার পিছনে কি কম ফিরেছি? কত ভোগ দিলেম, কত সেবা করলেম, ভিটেমাটি বিকিয়ে যাবার জো হল। শেষকালে তার রাজাগিরি রইল কোথায়? লোকে যখন তার কাছে তালুক চায়, মুলুক চায় সে তখন পাঁজিপুঁথি খুলে শুভদিন কিছুতেই খুঁজে পায় না। কিন্তু আমাদের কাছে খাজনা নেবার বেলায় মঘা অশ্লেষা ত্র্যস্পর্শ কিছুই তো বাধত না!

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হে কুম্ভ, আমাদের রাজাকে তুমি সেই রকম মেকি রাজা বলতে চাও!

প্রথম পদাতিক। ওহে খুড়শ্বশুর, এবার খুড়শাশুড়ীর কাছে থেকে বিদায় নিয়ে এস গে, আর দেরি নেই।

কুম্ভ। না বাবা, রাগ ক'রো না। আমি কান মলছি, নাকে খত দিচ্ছি—যতদূর সরতে বল ততদূরই সরে দাঁড়াতে রাজি আছি।

দ্বিতীয় পদাতিক। আচ্ছা বেশ, এইখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকো। রাজা এলেন বলে—আমরা এগিয়ে গিয়ে রাস্তা ঠিক করে রাখি। [পদাতিকদের প্রস্থান

দ্বিতীয় পথিক। কুম্ভ, তোমার ওই মুখের দোষেই তুমি মরবে।

কুম্ভ। না ভাই মাধব, ও মুখের দোষ নয়, ও কপালের দোষ। যেবারে মিছে রাজা বেরোল একটি কথাও কই নি—অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো নিজের সর্বনাশ করেছি—আর এবার হয়তো বা সত্যি রাজা বেরিয়েছে তাই বেফাঁস কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওটা কপাল।

মাধব। আমি এই বুঝি, রাজা সত্যি হ'ক মিথ্যে হ'ক মেনে চলতেই হবে। আমরা কি রাজা চিনি যে বিচার করব! অন্ধকারে ঢেলা মারা—যত বেশি মারবে একটা-না-একটা লেগে যাবে। আমি ভাই একধার থেকে গড় করে যাই—সত্যি হলে লাভ; মিথ্যে হলেই বা লোকসান কী।

কুম্ভ। ঢেলাগুলো নেহাত ঢেলা হলে ভাবনা ছিল না—দামি জিনিস—বাজে খরচ করতে গিয়ে ফতুর হতে হয়।

মাধব। ওই যে আসছেন রাজা। আহা রাজার মতো রাজা বটে! কী চেহারা। যেন ননির পুতুল। কেমন হে কুম্ভ, এখন কী মনে হচ্ছে।

কুম্ভ। দেখাচ্ছে ভালো—কী জানি ভাই হতে পারে।

মাধব। ঠিক যেন রাজাটি গড়ে রেখেছে। ভয় হয় পাছে রোদ্দুর লাগলে গলে যায়।

রাজবেশধারীর প্রবেশ

মাধব। জয় মহারাজের! দর্শনের জন্যে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে। দয়া রাখবেন।

কুম্ভ। বড়ো ধাঁদা ঠেকছে, ঠাকুরদাকে ডেকে আনি। [প্রস্থান

আর একদল পথিক

প্রথম পথিক। ওরে রাজা রে রাজা। দেখবি আয়।

দ্বিতীয় পথিক। মনে রেখো রাজা, আমি কুশলীবস্তুর উদয়দত্তর নাতি। আমার নাম বিরাজ দত্ত। রাজা বেরিয়েছে শুনেই ছুটেছি, লোকের কারও কথায় কান দিই নি—আমি সকলের আগে তোমাকে মেনেছি।

তৃতীয় পথিক। শোনো একবার, আমি যে ভোর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে—তখনও কাক ডাকে নি—এতক্ষণ ছিলে কোথায়? রাজা, আমি বিক্রমস্থলীর ভদ্রসেন; ভক্তকে স্মরণ রেখো।

রাজবেশী। তোমাদের ভক্তিতে বড়ো প্রীত হলেম।

বিরাজ দত্ত। মহারাজ, আমাদের অভাব বিস্তর—এতদিন দর্শন পাই নি জানাব কাকে?

রাজবেশী। তোমাদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে দেব। [প্রস্থান

প্রথম পথিক। ওরে পিছিয়ে থাকলে চলবে না—ভিড়ে মিশে গেলে রাজার চোখে পড়ব না।

দ্বিতীয় পথিক। দেখ্ দেখ্ একবার নরোত্তমের কাণ্ডখানা দেখ্! আমরা এত লোক আছি সবাইকে ঠেলেঠুলে কোথা থেকে এক তালপাতার পাখা নিয়ে রাজাকে বাতাস করতে লেগে গেছে।

মাধব। তাই তো হে লোকটার আস্পর্ধা তো কম নয়।

দ্বিতীয় পথিক। ওকে জোর করে ধরে সরিয়ে দিতে হচ্ছে—ও কি রাজার পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি।

মাধব। ওহে রাজা কি আর একটু বুঝবে না? এ যে অতিভক্তি।

প্রথম পথিক। না হে না—রাজারা বোঝে না কিছু—হয়তো ওই তালপাখার হাওয়া খেয়েই ভুলবে। [সকলের প্রস্থান

ঠাকুরদাকে লইয়া কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ। এখনই এই রাস্তা দিয়েই যে গেল।

ঠাকুরদা। রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় নাকি রে।

কুম্ভ। না দাদা, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখা গেল—একজন না দুজন না, রাস্তার দুধারের লোক তাকে দেখে নিয়েছে।

ঠাকুরদা। সেইজন্যেই তো সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোখ ধাঁদিয়ে বেড়ায়। এমন উৎপাত তো কোনোদিন করে না!

কুম্ভ। তা আজকে যদি মর্জি হয়ে থাকে বলা যায় কী।

ঠাকুরদা। বলা যায় রে বলা যায়—আমার রাজার মর্জি বরাবর ঠিক আছে—ঘড়ি-ঘড়ি বদলায় না।

কুম্ভ। কিন্তু কী বলব দাদা—একেবারে ননির পুতুলটি। ইচ্ছে করে সর্বাঙ্গ দিয়ে তাকে ছায়া করে রাখি!

ঠাকুরদা। তোর এমন বুদ্ধি কবে হল? আমার রাজা ননির পুতুল, আর তুই তাকে ছায়া করে রাখবি!

কুম্ভ। যা বল দাদা, দেখতে বড়ো সুন্দর—আজ তো এত লোক জুটেছে অমনটি কাউকে দেখলুম না।

ঠাকুরদা। আমার রাজা যদি বা দেখা দিত তোদের চোখেই পড়ত না। দশের সঙ্গে তাকে আলাদা বলে চেনাই যায় না—সে সকলের সঙ্গেই মিশে যায় যে।

কুম্ভ। ধ্বজা দেখতে পেলুম যে গো।

ঠাকুরদা। ধ্বজায় কী দেখলি।

কুম্ভ। কিংশুক ফুল আঁকা—একেবারে চোখ ঠিকরে যায়।

ঠাকুরদা। আমার রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা।

কুম্ভ। লোকে বলে, এই উৎসবে রাজা বেরিয়েছে।

ঠাকুরদা। বেরিয়েছে বই কি। কিন্তু সঙ্গে পাইক নেই, বাদ্যি নেই, আলো নেই, কিছু না।

কুম্ভ। কেউ বুঝি ধরতেই পারে না।

ঠাকুরদা। হয়তো কেউ কেউ পারে।

কুম্ভ। যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তাই পায়।

ঠাকুরদা। সে যে কিছু চায় না। ভিক্ষুকের কর্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোটো ভিক্ষুক বড়ো ভিক্ষুককেই রাজা বলে মনে করে বসে। আজ যে লোকটা গা-ভরা গয়না পরে রাস্তার দুই ধারের লোকের দুই চক্ষুর কাছে ভিক্ষে চেয়ে বেড়িয়েছে তোরা লোভীরা তাকেই রাজা বলে ঠাউরে বসে আছিস!—ওই যে আমার পাগলা আসছে। আয় ভাই আয়—আর তো বাজে বকতে পারি নে—একটু মাতামাতি করে নেওয়া যাক।

পাগলের প্রবেশ ও গান

তোরা যে যা বলিস ভাই
আমার সোনার হরিণ চাই।
সেই মনোহরণ চপল চরণ
সোনার হরিণ চাই॥
সে যে চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়
যায় না তারে বাঁধা,

তার নাগাল পেলে পালায় ঠেলে
লাগায় চোখে ধাঁদা,
তবু ছুটব পিছে মিছে মিছে
পাই বা নাহি পাই
আমি আপন মনে মাঠে বনে
উধাও হয়ে ধাই ॥
তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিস
রাখিস ঘরে ভরে,
যাহা যায় না পাওয়া তারি হাওয়া
লাগল কেন মোরে ?
আমার যা ছিল তা দিলেম কোথা
যা নেই তারি ঝোঁকে,
আমার ফুরোয় পুঁজি, ভাবিস বুঝি
মরি তাহার শোকে !
ওরে আছি সুখে হাস্যমুখে
দুঃখ আমার নাই।
আমি আপনমনে মাঠে বনে
উধাও হয়ে ধাই ॥

৩

কুঞ্জবনের দ্বারে

ঠাকুরদা ও উৎসববালকগণ

ঠাকুরদা। ওরে দরজার কাছে এসেছি, এবার খুব কষে দরজায় ঘা লাগা।

গান

আজি কমলমুকুলদল খুলিল !
দুলিল রে দুলিল
মানস-সরসে রস-পুলকে
পলকে পলকে ঢেউ তুলিল।

গগন মগন হল গন্ধে,
সমীরণ মূর্ছে আনন্দে,
গুন গুন গুঞ্জন ছন্দে
মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে ;—
নিখিল ভুবন মন ভুলিল—
মন ভুলিল রে
মন ভুলিল !

[প্রস্থান

অবন্তী কোশল কাঞ্চী প্রভৃতি রাজগণ

অবন্তী। এখানকার রাজা কি আমাদেরও দেখা দেবে না ?

কাঞ্চী। এর রাজত্ব করবার প্রণালী কী-রকম ? রাজার বনে উৎসব, সেখানেও সাধারণ লোকের কারও কোনো বাধা নেই ?

কোশল। আমাদের জন্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করে রাখা উচিত ছিল।

কাঞ্চী। জোর করে নিজেরা তৈরি করে নেব।

কোশল। এই সব দেখেই সন্দেহ হয় এখানে রাজা নেই একটা ফাঁকি চলে আসছে।

অবন্তী। ওহে তা হতে পারে কিন্তু এখানকার মহিষী সুদর্শনা নিতান্ত ফাঁকি নয়।

কোশল। সেই লোভেই তো এসেছি। যিনি দেখা দেন না তাঁর জন্যে আমার বিশেষ ঔৎসুক্য নেই, কিন্তু যিনি দেখবার যোগ্য তাঁকে না দেখে ফিরে গেলে ঠকতে হবে।

কাঞ্চী। একটা ফন্দি দেখাই যাক না।

অবন্তী। ফন্দি জিনিসটা খুব ভালো, যদি তার মধ্যে নিজে আটকা না পড়া যায়।

কাঞ্চী। এ কী ব্যাপার। নিশেন উড়িয়ে এদিকে কে আসে ? এ কোথাকার রাজা ?

পদাতিকগণের প্রবেশ

কাঞ্চী। তোমাদের রাজা কোথাকার ?

প্রথম পদাতিক। এই দেশের। তিনি আজ উৎসব করতে বেরিয়েছেন।

[প্রস্থান

কোশল। এ কী কথা। এখানকার রাজা বেরিয়েছে !

অবন্তী। তাই তো তাহলে এঁকে দেখেই ফিরতে হবে—অন্য দর্শনীয়টা রইল।

কাঞ্চী। শোন কেন? এখানে রাজা নেই বলেই যে-খুশি নির্ভাবনায় আপনাকে রাজা বলে পরিচয় দেয়। দেখছ না, যেন সেজে এসেছে—অত্যন্ত বেশি সাজ।

অবন্তী। কিন্তু লোকটাকে দেখাচ্ছে ভালো, চোখ ভোলাবার মতো চেহারাটা আছে।

কাঞ্চী। চোখ ভুলতে পারে কিন্তু ভালো করে তাকালেই ভুল থাকে না। আমি তোমাদের সামনেই ওর ফাঁকি ধরে দিচ্ছি।

রাজবেশীর প্রবেশ

রাজবেশী। রাজগণ, স্বাগত। এখানে তোমাদের অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হয় নি তো?

রাজগণ। (কপট বিনয়ে নমস্কার করিয়া) কিছু না।

কাঞ্চী। যে অভাব ছিল তা মহারাজের দর্শনেই পূর্ণ হয়েছে।

রাজবেশী। আমি সাধারণের দর্শনীয় নই কিন্তু তোমরা আমার অনুগত এই জন্য একবার দেখা দিতে এলুম।

কাঞ্চী। অনুগ্রহের এত আতিশয্য সহ্য করা কঠিন।

রাজবেশী। আমি অধিকক্ষণ থাকব না।

কাঞ্চী। সেটা অনুভবেই বুঝেছি—বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার ভাব দেখছি নে।

রাজবেশী। ইতিমধ্যে যদি কোনো প্রার্থনা থাকে—

কাঞ্চী। আছে বই কি। কিন্তু অনুচরদের সামনে জানাতে লজ্জা বোধ করি।

রাজবেশী। (অনুবর্তীদের প্রতি) ক্ষণকালের জন্য তোমরা দূরে যাও। এইবার তোমাদের প্রার্থনা অসংকোচে জানাতে পার।

কাঞ্চী। অসংকোচেই জানাব—তোমারও যেন লেশমাত্র সংকোচ না হয়।

রাজবেশী। না, সে আশঙ্কা ক'রো না।

কাঞ্চী। এস তবে—মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের প্রত্যেককে প্রণাম করো।

রাজবেশী। বোধ হচ্ছে আমার ভৃত্যগণ বারুণী মদ্যটা রাজশিবিরে কিছু মুক্ত হস্তেই বিতরণ করেছে।

কাঞ্চী। ভণ্ডরাজ, মদ যাকে বলে সেটা তোমার ভাগেই অতিমাত্রায় পড়েছে, সেই-জন্যেই এখন ধুলোয় লোটাবার অবস্থা হয়েছে।

রাজবেশী। রাজগণ, পরিহাসটা রাজোচিত নয়।

কাঞ্চী। পরিহাসের অধিকার যাদের আছে তারা নিকটেই প্রস্তুত আছে। সেনাপতি।

রাজবেশী। আর প্রয়োজন নেই। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আপনারা আমার প্রণম্য। মাথা আপনিই নত হচ্ছে, কোনো তীক্ষ্ণ উপায়ে তাকে ধুলায় টানবার দরকার হবে না। আপনারা যখন আমাকে চিনেছেন তখন আমিও আপনাদের চিনে নিলুম। অতএব এই আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। যদি দয়া করে পালাতে দেন তাহলে বিলম্ব করব না।

কাঞ্চী। পালাবে কেন? তোমাকেই আমরা এখানকার রাজা করে দিচ্ছি—পরিহাসটা শেষ করেই যাওয়া যাক। দলবল কিছু আছে?

রাজবেশী। আছে। রাস্তার লোক যে দেখছে আমার পিছনে ছুটে আসছে। আরম্ভে যখন আমার দল বেশি ছিল না তখন সবাই আমাকে সন্দেহ করছিল—লোক যত বেড়ে গেল সন্দেহ ততই দূর হল। এখন ভিড়ের লোক নিজেদের ভিড় দেখেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে কোনো কষ্ট পেতে হচ্ছে না।

কাঞ্চী। বেশ কথা। এখন থেকে আমরা তোমার সাহায্য করব। কিন্তু তোমাকে আমাদেরও একটা কাজ করে দিতে হবে।

রাজবেশী। আপনাদের দত্ত আদেশ এবং মুকুট আমি মাথায় করে রাখব।

কাঞ্চী। আপাতত আর কিছু চাই নে, রানী সুদর্শনাকে দেখতে চাই—সেইটে তোমাকে করে দিতে হবে।

রাজবেশী। যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

কাঞ্চী। তোমার সাধ্যের উপর ভরসা নেই, আমাদের বুদ্ধিমতো চলতে হবে। আচ্ছা এখন তুমি কুঞ্জে প্রবেশ করে রাজ-আড়ম্বরে উৎসব করো গে।

[রাজগণ ও রাজবেশীর প্রস্থান

ঠাকুরদা ও কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ। ঠাকুরদা, তোমার কথা আমি তেমন বুঝি নে কিন্তু তোমাকে বুঝি। তা আমার রাজায় কাজ নেই, তোমার পাছেই রয়ে গেলুম, কিন্তু ঠকলুম না তো?

ঠাকুরদা। আমাকে নিয়েই যদি সম্পূর্ণ চলে তাহলে ঠকলি নে, আমার চেয়ে বেশি যদি কিছু দরকার থাকে তাহলে ঠকলি বই কি।

কুম্ভ। ঠাকুরদা, উৎসব শুরু হয়েছে, এবার ভিতরে চলো।

ঠাকুরদা। না রে, আগে দ্বারের কাজটা সেরে নিই, তার পরে ভিতরে। এখানে

সকল আগন্তুকের সঙ্গে একবার মিলে নিতে হবে। ওই আমার অকিঞ্চনের দল আসছে।

অকিঞ্চনের দল। ঠাকুরদা, তোমাকে খুঁজে আজ আমাদের দেরি হয়ে গেল।

ঠাকুরদা। আজ আমি দ্বারে, আজ আমাকে অন্য জায়গায় খুঁজলে মিলবে কেন?

প্রথম। তুমি যে আমাদের উৎসবের সূত্রধর।

ঠাকুরদা। তাই তো আমি দ্বারে।

দ্বিতীয়। আজ তুমি বুঝি এই কুম্ভ সুধন মুষল তোবল এদের নিয়েই আছ? দেশবিদেশের কত রাজা এল তাদের সঙ্গে পরিচয় করে নেবে না?

ঠাকুরদা। ভাই এরা সব সরল লোক—চুপ করে কেবল এদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও এরা ভাবে এদের যেন কত সেবা করলুম, আর যারা মস্তলোক তাদের কাছে মুণ্ডটাও যদি খসিয়ে দেওয়া যায় তারা মনে করে লোকটা বাজে জিনিস দিয়ে ঠকিয়ে গেল।

প্রথম। এখন চলো দাদা!

ঠাকুরদা। না ভাই, আজ আমার এইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলা। সকলের চলাচলেই আমার মন ছুটছে। তবে আর কি ; এইবারে শুরু করা যাক।

সকলের গান

মোদের কিছু নাই রে নাই,
আমরা ঘরে-বাইরে গাই
তাই রে নাই রে নাই রে না।
যতই দিবস যায় রে যায়
গাই রে সুখে হায় রে হায়
তাই রে নাই রে নাই রে না।
যারা সোনার চোরাবালির 'পরে
পাকা ঘরের ভিত্তি গড়ে
তাদের সামনে মোরা গান গেয়ে যাই
তাই রে নাই রে নাই রে না।
যখন থেকে থেকে গাঁঠের পানে
গাঁঠকাটারা দৃষ্টি হানে,
তখন শূন্য ঝুলি দেখায়ে গাই
তাই রে নাই রে নাই রে না।

যখন দ্বারে আসে মরণ বুড়ি,
মুখে তাহার বাজাই তুড়ি,
তখন তান দিয়ে গান জুড়ি রে ভাই
তাই রে নাই রে নাই রে না।

এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ,
ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়
তাই রে নাই রে নাই রে না।

সে যে উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে
ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়ে
দুই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়
তাই রে নাই রে নাই রে না॥ [প্রস্থান

একদল স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্রথমা। ঠাকুরদা।

ঠাকুরদা। কী ভাই।

প্রথমা। আজ বসন্ত-পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে মালা বদল করব এই পণ করে ঘর থেকে বেরিয়েছি।

ঠাকুরদা। কিন্তু পণ রক্ষা হওয়া কঠিন দেখছি।

দ্বিতীয়া। কেন বলো তো?

ঠাকুরদা। তোমাদের ঠাকরুনদিদি কেবল একখানিমাত্র মালা আমার গলায় পরিয়েছেন।

তৃতীয়া। দেখেছ, দেখেছ, ঠাকুরদার বিনয়টা একবার দেখেছ?

দ্বিতীয়া। হায় রে হায়, আকাশের চাঁদের এতদূর অধঃপতন হল?

ঠাকুরদা। যে ফাঁদ তোমরা পেতেছ, ধরা না দিয়ে বাঁচে কি করে?

প্রথমা। তবে তাই বলো, আমাদের ফাঁদের গুণ।

ঠাকুরদা। চাঁদেরও গুণ আছে, উপযুক্ত ফাঁদ দেখলে সে আপনি ধরা দেয়।

তৃতীয়া। আচ্ছা ঠাকরুনদিদির হিসেবটা কী রকম? আজ উৎসবের দিনে না হয় দুটো বেশি করেই মালা দিতেন।

ঠাকুরদা। যতই দিতেন কুলোত না, সেইজন্যে আজ একটিমাত্র দিয়েছেন। একটির কোনো বালাই নেই।

দ্বিতীয়া। ঠাকুরদা, তুমি দরজা ছেড়ে নড়বে না ?

ঠাকুরদা। হাঁ ভাই, সকলকে এগিয়ে দেব, তার পর সব-শেষে আমি।

[স্ত্রীলোকদের প্রস্থান

নাচের দলের প্রবেশ

ঠাকুরদা। আরে, এস এস।

প্রথম। আমাদের নটরাজ তুমি, তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম।

ঠাকুরদা। আমি দরজার কাছে খাড়া আছি, জানি এইখান দিয়েই সবাইকে যেতে হবে। তোমাদের দেখলেই পাদুটো ছটফট করে। একবার নাচিয়ে দিয়ে যাও।

নৃত্য ও গীত

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥

ঠাকুরদা। যাও যাও ভাই, তোমরা নেচে বেড়াও গে, নাচিয়ে বেড়াও গে যাও।

[নাচের দলের প্রস্থান

নাগরিকদল

প্রথম। ঠাকুরদা, আমাদের রাজা নেই এ-কথা দু-শবার বলব।

ঠাকুরদা। কেবলমাত্র দু-শবার। এত কঠিন সংযমের দরকার কী—পাঁচ-শবার বলো না।

দ্বিতীয়। ফাঁকি দিয়ে কতদিন তোমরা মানুষকে ভুলিয়ে রাখবে।

ঠাকুরদা। নিজেও ভুলেছি ভাই।

তৃতীয়। আমরা চারিদিকে প্রচার করে বেড়াব আমাদের রাজা নেই।

ঠাকুরদা। কার সঙ্গে ঝগড়া করবে বলো? তোমাদের রাজা তো কারও কানে ধরে বলছেন না আমি আছি। তিনি তো বলেন তোমরাই আছ, তাঁর সবই তো তোমাদেরই জন্যে।

প্রথম। এই তো আমরা রাস্তা দিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছি রাজা নেই—যদি রাজা থাকে সে কী করতে পারে করুক না।

ঠাকুরদা। কিচ্ছু করবে না।

দ্বিতীয়। আমার পঁচিশ বছরের ছেলেটা সাত দিনের জ্বরে মারা গেল। দেশে যদি ধর্মের রাজা থাকবে তবে কি এমন অকালমৃত্যু ঘটে।

ঠাকুরদা। ওরে তবু তো এখনো তোর দু ছেলে আছে—আমার যে একে একে পাঁচ ছেলে মারা গেল একটি বাকি রইল না।

তৃতীয়। তবে?

ঠাকুরদা। তবে কী রে? ছেলে তো গেলই তাই বলে কি ঝগড়া করে রাজাকেও হারাব? এমনি বোকা!

প্রথম। ঘরে যাদের অন্ন জোটে না তাদের আবার রাজা কিসের!

ঠাকুরদা। ঠিক বলেছিস ভাই। তা সেই অন্নরাজাকেই খুঁজে বের কর! ঘরে বসে হাহাকার করলেই তো তিনি দর্শন দেবেন না।

দ্বিতীয়। আমাদের রাজার বিচারটা কী রকম দেখো না। ওই আমাদের ভদ্রসেন, রাজা বলতে সে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে কিন্তু তার ঘরের এমন দশা যে চামচিকে-গুলোরও থাকবার কষ্ট হয়।

ঠাকুরদা। আমার দশাটাই দেখ্ না। রাজার দরজায় সমস্ত দিনই তো খাটছি আজ পর্যন্ত দুটো পয়সা পুরস্কার মিলল না।

তৃতীয়। তবে?

ঠাকুরদা। তবে কী রে? তাই নিয়েই তো আমার অহংকার। বন্ধুকে কি কেউ কোনো দিন পুরস্কার দেয়? তা যা ভাই আনন্দ করে বলে বেড়া গে রাজা নেই। আজ আমাদের নানা সুরের উৎসব—সব সুরই ঠিক একতানে মিলবে।

গান

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে ?
দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে।
যে ঢেউ ওঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে ?
যে ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগছে সারা বেলা রে।
বসন্তে আজ দেখ্ রে তোরা ঝরা ফুলের খেলা রে।
আমার প্রভুর পায়ের তলে,
শুধুই কি রে মানিক জ্বলে ?
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে।
আমার গুরুর আসন কাছে
সুবোধ ছেলে ক-জন আছে,
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন তাই আমি তাঁর চেলা রে।
উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরা ফুলের খেলা রে।

৪

প্রাসাদ-শিখর

সুদর্শনা ও সখী রোহিণী

সুদর্শনা। ওলো রোহিণী, তুই আমার রাজাকে কি কখনো দেখিস নি ?

রোহিণী। শুনেছি প্রজারা সবাই দেখেছে কিন্তু চিনেছে খুব অল্প লোকে। সেইজন্যে যখনই কাউকে দেখে মনটা চমকে ওঠে তখনই মনে করি, এই বুঝি হবে রাজা। আবার দুদিন পরে ভুল ভাঙে।

সুদর্শনা। ভুল তোরা করতে পারিস কিন্তু আমার ভুল হতে পারে না। আমি হলুম রানী। ওই তো আমার রাজাই বটে।

রোহিণী। তোমাকে তিনি কত মান দিয়েছেন, তিনি কি তোমাকে চেনাতে দেরি করতে পারেন ?

সুদর্শনা। ওই মূর্তি দেখলেই চিত্ত যে আপনি খাঁচার পাখির মতো চঞ্চল হয়ে ওঠে। ওর কথা ভালো করে জিজ্ঞাসা করে এসেছিস তো ?

রোহিণী। এসেছি বই কি। যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই তো বলে রাজা।

সুদর্শনা। কোথাকার রাজা ?

রোহিণী। আমাদেরই রাজা।

সুদর্শনা। ওই যার মাথায় ফুলের ছাতা ধরে আছে তার কথাই তো বলছিস ?

রোহিণী। হাঁ ওই যাঁর পতাকায় কিংশুক আঁকা।

সুদর্শনা। আমি তো দেখবামাত্রই চিনেছি বরঞ্চ তোর মনে সন্দেহ এসেছিল।

রোহিণী। আমাদের যে সাহস অল্প তাই ভয় হয় কী জানি যদি ভুল করি তবে অপরাধ হবে।

সুদর্শনা। আহা যদি সুরঙ্গমা থাকত তা হলে কোনো সংশয় থাকত না।

রোহিণী। সুরঙ্গমাই আমাদের সকলের চেয়ে সেয়ানা হল বুঝি !

সুদর্শনা। তা যা বলিস সে তাঁকে ঠিক চেনে।

রোহিণী। এ-কথা আমি কক্‌খনো মানব না। ও তার ভান। বললেই হল চিনি, কেউ তো পরীক্ষা করে নিতে পারবে না। আমরা যদি ওর মতো নির্লজ্জ হতুম তাহলে অমন কথা আমাদেরও মুখে আটকাত না।

সুদর্শনা। না, না, সে তো বলে না কিছু।

রোহিণী। ভাব দেখায়। সে যে বলার চেয়ে আরও বেশি। কত ছলই যে জানে। ওইজন্যই তো আমাদের কেউ তাকে দেখতে পারে না।

সুদর্শনা। যাই হ'ক সে থাকলে একবার তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখতুম।

রোহিণী। সে তো কখনো কোথাও বেরোয় না,—আজ দেখি সে সাজসজ্জা করে উৎসব করতে বেরিয়েছে। তার রঙ্গ দেখে হেসে বাঁচি নে।

সুদর্শনা। আজ যে প্রভুর হুকুম তাই সে সেজেছে।

রোহিণী। তা বেশ মহারানী, আমাদের কথায় কাজ কী ? যদি ইচ্ছা করেন তাকেই ডেকে আনি, তার মুখ থেকেই সন্দেহ ভঞ্জন হ'ক। তার ভাগ্য ভালো, রানীর কাছে রাজার পরিচয় সে-ই করিয়ে দেবে।

সুদর্শনা। না, না, পরিচয় কাউকে করাতে হবে না—তবু কথাটা সকলেরই মুখে শুনতে ইচ্ছে করে।

রোহিণী। সকলেই তো বলছে—ওই দেখো না তাঁর জয়ধ্বনি এখান থেকে শোনা যাচ্ছে।

সুদর্শনা। তবে এক কাজ কর্। পদ্মপাতায় করে এই ফুলগুলি তাঁর হাতে দিয়ে আয় গে।

রোহিণী। যদি জিজ্ঞাসা করেন কে দিলে ?

সুদর্শনা। তার কোনো উত্তর দিতে হবে না—তিনি ঠিক বুঝতে পারবেন। তাঁর মনে ছিল আমি চিনতেই পারব না—ধরা পড়েছেন সেটা না জানিয়ে ছাড়ছি নে। (ফুল লইয়া রোহিণীর প্রস্থান) আমার মন আজ এমনি চঞ্চল হয়েছে—এমন তো কোনোদিন হয় না। এই পূর্ণিমার আলো মদের ফেনার মতো চারিদিকে উপচিয়ে পড়ছে, আমাকে যেন মাতাল করে তুলেছে। ওগো বসন্ত, যে-সব ভীরু লাজুক ফুল পাতার আড়ালে গভীর রাত্রে ফোটে, যেমন করে তাদের গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে চলেছ তেমনি তুমি আমার মনকে হঠাৎ কোথায় উদাস করে দিলে, তাকে মাটিতে পা ফেলতে দিলে না !—ওরে প্রতিহারী।

প্রতিহারী (প্রবেশ করিয়া)। কী মহারানী।

সুদর্শনা। ওই যে আম্রবনের বীথিকার ভিতর দিয়ে উৎসব-বালকেরা আজ গান গেয়ে যাচ্ছে—ডাক ডাক ওদের ডেকে নিয়ে আয়—একটু গান শুনি। (প্রতিহারীর প্রস্থান) ভগবান চন্দ্রমা, আজ আমার এই চঞ্চলতার উপরে তুমি যেন কেবলই কটাক্ষপাত করছ ! তোমার স্মিত কৌতুকে সমস্ত আকাশ যেন ভরে গেছে—কোথাও আমার আর লুকোবার জায়গা নেই—আমি কেমন আপনার দিকে চেয়ে আপনি লজ্জা পাচ্ছি ! ভয় লজ্জা সুখ দুঃখ সব মিলে আমার বুকের মধ্যে আজ নৃত্য করছে। শরীরের রক্ত নাচছে, চারিদিকের জগৎ নাচছে, সমস্ত ঝাপসা ঠেকছে।

বালকগণের প্রবেশ

এস, এস, তোমরা সব মূর্তিমান কিশোর বসন্ত, ধরো তোমাদের গান ধরো। আমার সমস্ত শরীর মন গান গাইছে অথচ আমার কণ্ঠে সুর আসছে না। তোমরা আমার হয়ে গান গেয়ে যাও।

বালকগণের গান

বিরহ মধুর হল আজি
মধুরাতে।
গভীর রাগিণী উঠে বাজি
বেদনাতে।
ভরি দিয়া পূর্ণিমা নিশা
অধীর অদর্শন-তৃষা

কী করুণ মরীচিকা আনে
আঁখিপাতে!
সুদূরের সুগন্ধ ধারা
বায়ুভরে
পরানে আমার পথহারা
ঘুরে মরে!
কার বাণী কোন্ সুরে তালে
মর্মরে পল্লবজালে,
বাজে মম মঞ্জীররাজি
সাথে সাথে॥

সুদর্শনা। হয়েছে হয়েছে আর না। তোমাদের এই গান শুনে চোখে জল ভরে আসছে। আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই—তাকে হাতে পাবার দরকার নেই। এমনি করে খোঁজার মধ্যেই সমস্ত পাওয়া যেন সুধাময় হয়ে আছে। কোন্ মাধুর্যের সন্ন্যাসী তোমাদের এই গান শিখিয়ে দিয়েছে গো—ইচ্ছে করছে চোখে-দেখা কানে-শোনা ঘুচিয়ে দিই— হৃদয়ের ভিতরটাতে যে গহনপথের কুঞ্জবন আছে সেইখানকার ছায়ার মধ্যে উদাস হয়ে চলে যাই। ওগো কুমার তাপসগণ, তোমাদের আমি কী দেব বলো। আমার গলায় এ কেবল রত্নের মালা—এ কঠিন হার তোমাদের কণ্ঠে পীড়া দেবে—তোমরা যে ফুলের মালা পরেছ ওর মতো কিছুই আমার কাছে নেই।

[প্রণাম করিয়া বালকগণের প্রস্থান

রোহিণীর প্রবেশ

সুদর্শনা। ভালো করি নি, ভালো করি নি রোহিণী। তোর কাছে সমস্ত বিবরণ শুনতে আমার লজ্জা করছে। এইমাত্র হঠাৎ বুঝতে পেরেছি, যা সকলের চেয়ে বড়ো পাওয়া তা ছুঁয়ে পাওয়া নয়, তেমনি যা সকলের চেয়ে বড়ো দেওয়া তা হাতে করে দেওয়া নয়। তবু বল্ কী হল বল্!

রোহিণী। আমি তো রাজার হাতে ফুল দিলুম কিন্তু তিনি যে কিছু বুঝলেন এমন তো মনে হল না।

সুদর্শনা। বলিস কী? তিনি বুঝতে পারলেন না?

রোহিণী। না, তিনি অবাক হয়ে চেয়ে পুতুলটির মতো বসে রইলেন। কিছু বুঝলেন না এইটে পাছে ধরা পড়ে সেইজন্যে একটি কথা কইলেন না।

সুদর্শনা। ছি ছি ছি আমার যেমন প্রগল্‌ভতা তেমনি শাস্তি হয়েছে। তুই আমার ফুল ফিরিয়ে আনলি নে কেন?

রোহিণী। ফিরিয়ে আনব কী করে? পাশে ছিলেন কাঞ্চীর রাজা, তিনি খুব চতুর—চকিতে সমস্ত বুঝতে পারলেন—মুচকে হেসে বললেন, মহারাজ, মহিষী সুদর্শনা আজ বসন্ত-সখার পূজার পুষ্পে মহারাজের অভ্যর্থনা করছেন। শুনে হঠাৎ তিনি সচেতন হয়ে উঠে বললেন, আমার রাজসম্মান পরিপূর্ণ হল। আমি লজ্জিত হয়ে ফিরে আসছিলুম এমন সময়ে কাঞ্চীর রাজা মহারাজের গলা থেকে স্বহস্তে এই মুক্তার মালাটি খুলে নিয়ে আমাকে বললেন, সখী, তুমি যে সৌভাগ্য বহন করে এনেছ তার কাছে পরাভব স্বীকার করে মহারাজের কণ্ঠের মালা তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করছে।

সুদর্শনা। কাঞ্চীর রাজাকে বুঝিয়ে দিতে হল? আজকের পূর্ণিমার উৎসব আমার অপমান একেবারে উদ্‌ঘাটিত করে দিলে। তা হ'ক, যা তুই যা, আমি একটু একলা থাকতে চাই। (রোহিণীর প্রস্থান) আজ এমন করে আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে তবু সেই মোহন রূপের কাছ থেকে মন ফেরাতে পারছি নে। অভিমান আর রইল না—পরাভব, সর্বত্রই পরাভব—বিমুখ হয়ে থাকব সে-শক্তিটুকুও নেই। কেবল ইচ্ছে করছে ওই মালাটা রোহিণীর কাছ থেকে চেয়ে নিই। কিন্তু ও কী মনে করবে। রোহিণী।

রোহিণী। (প্রবেশ করিয়া) কী মহারানী।

সুদর্শনা। আজকের ব্যাপারে তুই কি পুরস্কার পাবার যোগ্য?

রোহিণী। তোমার কাছে না হ'ক যিনি দিয়েছেন তাঁর কাছ থেকে পেতে পারি।

সুদর্শনা। না, না, ওকে দেওয়া বলে না ও জোর করে নেওয়া।

রোহিণী। তবু, রাজকণ্ঠের অনাদরের মালাকেও অনাদর করি এমন স্পর্ধা আমার নয়।

সুদর্শনা। এ অবজ্ঞার মালা তোর গলায় দেখতে আমার ভালো লাগছে না। দে ওটা খুলে দে। ওর বদলে আমার হাতের কঙ্কণটা তোকে দিলুম—এই নিয়ে তুই চলে যা। (রোহিণীর প্রস্থান) হার হল, আমার হার হল। এ মালা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল—পারলুম না। এ যে কাঁটার মালার মতো আমার আঙুলে বিঁধছে তবু ত্যাগ করতে পারলুম না। উৎসব-দেবতার হাত থেকে এই কি আমি পেলুম—এই অগৌরবের মালা।

৫

কুঞ্জদ্বার

ঠাকুরদা ও একদল লোক

ঠাকুরদা। কী ভাই, হল তোমাদের?

প্রথম। খুব হল ঠাকুরদা। এই দেখো না একেবারে লালে লাল করে দিয়েছে। কেউ বাকি নেই।

ঠাকুরদা। বলিস কী। রাজাগুলোকে সুদ্ধ রাঙিয়েছে না কি?

দ্বিতীয়। ওরে বাস রে। কাছে ঘেঁষে কে। তারা সব বেড়ার মধ্যে খাড়া হয়ে রইল।

ঠাকুরদা। হায় হায় বড়ো ফাঁকিতে পড়েছে। একটুও রং ধরাতে পারলি নে? জোর করে ঢুকে পড়তে হয়।

তৃতীয়। ও দাদা, তাদের রাঙা, সে আর এক রঙের। তাদের চক্ষু রাঙা, তাদের পাইকগুলোর পাগড়ি রাঙা, তার উপরে খোলা তলোয়ারের যে রকম ভঙ্গি দেখলুম একটু কাছে ঘেঁষলেই একেবারে চরম রাঙা রাঙিয়ে দিত।

ঠাকুরদা। বেশ করেছিস ঘেঁষিস নি। পৃথিবীতে ওদের নির্বাসনদণ্ড—ওদের তফাতে রেখে চলতেই হবে। এখন বাড়ি চলেছিস বুঝি?

দ্বিতীয়। হাঁ দাদা, রাত তো আড়াই পহর হয়ে গেল। তুমি যে ভিতরে গেলে না?

ঠাকুরদা। এখনও ডাক পড়ল না—দ্বারেই আছি।

তৃতীয়। তোমার শম্ভু-সুধনরা সব গেল কোথায়?

ঠাকুরদা। তাদের ঘুম পেয়ে গেল—শুতে গেছে।

প্রথম। তারা কি তোমার সঙ্গে অমন খাড়া জাগতে পারে? [প্রস্থান

বাউলের দল

যা ছিল কালো ধলো
তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।
যেমন রাঙাবরন তোমার চরণ
তার সনে আর ভেদ না র'ল।

রাঙা হল বসন ভূষণ,
রাঙা হল শয়ন স্বপন,
মন হ'ল কেমন দেখ্‌ রে, যেমন
রাঙা কমল টলমল।

ঠাকুরদা। বেশ ভাই বেশ—খুব খেলা জমেছিল ?

বাউল। খুব খুব। সব লালে লাল। কেবল আকাশের চাঁদটাই ফাঁকি দিয়েছে—সাদাই রয়ে গেল।

ঠাকুরদা। বাইরে থেকে দেখাচ্ছে যেন বড়ো ভালোমানুষ। ওর সাদা চাদরটা খুলে দেখতিস যদি তাহলে ওর বিদ্যে ধরা পড়ত। চুপি চুপি ও যে আজ কত রং ছড়িয়েছে এখানে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। অথচ ও নিজে কি এমনি সাদাই থেকে যাবে ?

গান

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
প্রিয় আমার ওগো প্রিয়।
বড়ো উতলা আজ পরান আমার
খেলাতে হার মানবে কি ও ?
কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে
রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে ?
তুমি সাধ করে নাথ ধরা দিয়ে
আমারো রং বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু
রাঙাবে ঐ উত্তরীয়। [প্রস্থান

স্ত্রীলোকদের প্রবেশ

প্রথমা। ওমা, ওমা, যেখানে দেখে গিয়েছিলুম সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে গো।

দ্বিতীয়া। আমাদের বসন্তপূর্ণিমার চাঁদ, এত রাত হল তবু একটুও পশ্চিমের দিকে হেলল না।

প্রথমা। আমাদের অচঞ্চল চাঁদটি কার জন্যে পথ চেয়ে আছে ভাই ?

ঠাকুরদা। যে তাকে পথে বের করবে তারই জন্যে।

তৃতীয়া। ঘর ছেড়ে এবার পথের মানুষ খুঁজবে বুঝি ?

ঠাকুরদা। হাঁ ভাই, সর্বনাশের জন্যে মন-কেমন করছে।

গান

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে-জন ভাসায়।

দ্বিতীয়া। আমাদের তো পথে ভাসাবার শক্তি নেই, পথ ছেড়ে দিয়ে যাওয়াই ভালো। ধরা যে দেবে না তার কাছে ধরা দিয়ে লাভ কী।

ঠাকুরদা। তার কাছে ধরা দিলে ধরা-দেওয়াও যা, ছাড়া-পাওয়াও তা।

যে জন দেয় না দেখা যায় যে দেখে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়॥ [স্ত্রীলোকদের প্রস্থান

নাচের দলের প্রবেশ

ঠাকুরদা। ও ভাই, রাত তো অর্ধেকের বেশি পার হয়ে এল কিন্তু মনের মাতন এখনও যে থামতে চাইছে না—তোরা তো বাড়ি চলেছিস তোদের শেষ নাচটা নাচিয়ে দিয়ে যা।

গান

আমার ঘুর লেগেছে— তাধিন তাধিন
তোমার পিছন পিছন নেচে নেচে
ঘুর লেগেছে তাধিন তাধিন।
তোমার তালে আমার চরণ চলে
শুনতে না পাই কে কী বলে
তাধিন তাধিন—
তোমার গানে আমার প্রাণে যে কোন্
পাগল ছিল সেই জেগেছে
তাধিন তাধিন।
আমার লাজের বাঁধন সাজের বাঁধন
খসে গেল ভজন সাধন,
তাধিন তাধিন—

বিষম নাচের বেগে দোলা লেগে
ভাবনা যত সব ভেগেছে
তাধিন তাধিন।

[নাচের দলের প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। এতক্ষণ কী করছিলে ঠাকুরদা?

ঠাকুরদা। দ্বারের কাজে ছিলুম।

সুরঙ্গমা। সে কাজ তো শেষ হল। একটি মানুষও নেই—সবাই চলে গেছে।

ঠাকুরদা। এবার তবে ভিতরে চলি।

সুরঙ্গমা। কোন্‌খানে বাঁশি বাজছে এবার বাতাসে কান দিলে বোঝা যাবে।

ঠাকুরদা। সবাই যখন নিজের তালপাতার ভেঁপু বাজাচ্ছিল তখন বিষম গোল।

সুরঙ্গমা। উৎসবে ভেঁপুর ব্যবস্থা তিনিই করে রেখেছেন।

ঠাকুরদা। তাঁর বাঁশি কারও বাজনা ছাপিয়ে ওঠে না, তা না হলে লজ্জায় আর সকলের তান বন্ধ হয়ে যেত।

সুরঙ্গমা। দেখো ঠাকুরদা, আজ এই উৎসবের ভিতরে ভিতরে কেবলই আমার মনে হচ্ছে রাজা আমাকে এবার দুঃখ দেবেন।

ঠাকুরদা। দুঃখ দেবেন!

সুরঙ্গমা। হাঁ ঠাকুরদা। এবার আমাকে দূরে পাঠিয়ে দেবেন, অনেক দিন কাছে আছি সে তাঁর সইছে না।

ঠাকুরদা। এবার তবে কাঁটাবনের পার থেকে তোমাকে দিয়ে পারিজাত তুলিয়ে আনাবেন। সেই দুর্গমের খবরটা আমরা যেন পাই ভাই।

সুরঙ্গমা। তোমার নাকি কোনো খবর পেতে বাকি আছে? রাজার কাজে কোন্ পথটাতেই বা তুমি না চলেছ? হঠাৎ নতুন হুকুম এলে আমাদেরই পথ খুঁজে বেড়াতে হয়।

গান

পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে।
মাতিল আকুল দক্ষিণ বায়ু
সৌরভ-চঞ্চল সঞ্চরণে
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে॥

কাটিল ক্লান্ত বসন্ত-নিশা
বাহির-অঙ্গন-সঙ্গী সনে।
উৎসবরাজ কোথায় বিরাজে
কে লয়ে যাবে সে ভবনে—
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে ॥ [সুরঙ্গমার প্রস্থান

রাজবেশী ও কাঞ্চীরাজের প্রবেশ

কাঞ্চী। তোমাকে যেমন পরামর্শ দিয়েছি ঠিক সেইরকম ক'রো। ভুল না হয়।

রাজবেশী। ভুল হবে না।

কাঞ্চী। করভোদ্যানের মধ্যেই রানীর প্রাসাদ।

রাজবেশী। হাঁ মহারাজ, সে আমি দেখে নিয়েছি।

কাঞ্চী। সেই উদ্যানে আগুন লাগিয়ে দেবে—তার পরে অগ্নিদাহের গোলমালের মধ্যে কার্যসিদ্ধি করতে হবে।

রাজবেশী। কিছু অন্যথা হবে না।

কাঞ্চী। দেখো হে ভণ্ডরাজ, আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমরা মিথ্যে ভয়ে ভয়ে চলছি, এ-দেশে রাজা নেই।

রাজবেশী। সেই অরাজকতা দূর করবার জন্যেই তো আমার চেষ্টা। সাধারণ লোকের জন্যে সত্য হ'ক মিথ্যে হ'ক একটা রাজা চাই-ই, নইলে অনিষ্ট ঘটে।

কাঞ্চী। হে সাধু, লোকহিতের জন্যে তোমার এই আশ্চর্য ত্যাগস্বীকার আমাদের সকলেরই পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত। ভাবছি যে এই হিতকার্যটা নিজেই করব। (সহসা ঠাকুরদাকে দেখিয়া) কে হে কে তুমি ? কোথায় লুকিয়ে ছিলে ?

ঠাকুরদা। লুকিয়ে থাকি নি। অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে আপনাদের চোখে পড়ি নি।

রাজবেশী। ইনি এ-দেশের রাজাকে নিজের বন্ধু বলে পরিচয় দেন, নির্বোধেরা বিশ্বাস করে।

ঠাকুরদা। বুদ্ধিমানদের কিছুতেই সন্দেহ ঘোচে না, তাই নির্বোধ নিয়েই আমাদের কারবার।

কাঞ্চী। তুমি আমাদের সব কথা শুনেছ ?

ঠাকুরদা। আপনারা আগুন লাগাবার পরামর্শ করছিলেন।

কাঞ্চী। তুমি আমাদের বন্দী, চলো শিবিরে।

ঠাকুরদা। আজ তবে বুঝি এমনি করেই তলব পড়ল ?

কাঞ্চী। বিড় বিড় করে বকছ কী ?

ঠাকুরদা। আমি বলছি, দেশের টান কাটিয়ে কিছুতেই নড়তে পারছিলেম না, তাই বুঝি ভিতর-মহলে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে মনিবের পেয়াদা এল।

কাঞ্চী। লোকটা পাগল না কি ?

রাজবেশী। ওর কথা ভারি এলোমেলো—বোঝাই যায় না।

কাঞ্চী। কথা যত কম বোঝা যায় অবুঝরা ততই ভক্তি করে। কিন্তু আমাদের কাছে যে ফন্দি খাটবে না। আমরা স্পষ্ট কথার কারবারি।

ঠাকুরদা। যে আজ্ঞে মহারাজ, চুপ করলুম।

৬

করভোদ্যান

রোহিণী। ব্যাপারখানা কী। কিছু তো বুঝতে পারছি নে। (মালীদের প্রতি) তোরা সব তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছিস ?

প্রথম মালী। আমরা বাইরে যাচ্ছি।

রোহিণী। বাইরে কোথায় যাচ্ছিস ?

দ্বিতীয় মালী। তা জানি নে, আমাদের রাজা ডেকেছে।

রোহিণী। রাজা তো বাগানেই আছে। কোন্ রাজা ?

প্রথম মালী। বলতে পারি নে।

দ্বিতীয় মালী। চিরদিন যে-রাজার কাজ করছি সেই রাজা।

রোহিণী। তোরা সবাই চলে যাবি ?

প্রথম মালী। হাঁ সবাই যাব, এখনই যেতে হবে। নইলে বিপদে পড়ব। [প্রস্থান

রোহিণী। এরা কী বলে বুঝতে পারি নে—ভয় করছে। যে নদীর পাড়ি ভেঙে পড়বে সেই পাড়ি ছেড়ে যেমন জন্তুরা পালায় এই বাগান ছেড়ে তেমনি সবাই পালিয়ে যাচ্ছে।

কোশলরাজের প্রবেশ

কোশল। রোহিণী, তোমাদের রাজা এবং কাঞ্চীরাজ কোথায় গেল জান ?

রোহিণী। তাঁরা এই বাগানেই আছেন কিন্তু কোথায় কিছুই জানি নে।

কোশল। তাদের মন্ত্রণাটা ঠিক বুঝতে পারছি নে। কাঞ্চীরাজকে বিশ্বাস করে ভালো করি নি। [প্রস্থান

রোহিণী। রাজাদের মধ্যে কী একটা ব্যাপার চলছে! শীঘ্র একটা দুর্দৈব ঘটবে। আমাকে সুদ্ধ জড়াবে না তো?

অবন্তীরাজ (প্রবেশ করিয়া)। রোহিণী, রাজারা সব কোথায় গেল জান?

রোহিণী। তাঁরা কে কোথায় তার ঠিকানা করা শক্ত। এইমাত্র কোশলরাজ এখানে ছিলেন।

অবন্তী। কোশলরাজের জন্যে ভাবনা নেই। তোমাদের রাজা এবং কাঞ্চীরাজ কোথায়?

রোহিণী। অনেকক্ষণ তাঁদের দেখি নি।

অবন্তী। কাঞ্চীরাজ কেবলই আমাদের এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয় ফাঁকি দেবে। এর মধ্যে থেকে ভালো করি নি। সখী, এ বাগান থেকে বেরোবার পথটা কোথায় জান?

রোহিণী। আমি তো জানি নে।

অবন্তী। দেখিয়ে দিতে পারে এমন কোনো লোক নেই?

রোহিণী। মালীরা সব বাগান ছেড়ে গেছে।

অবন্তী। কেন গেল?

রোহিণী। তাদের কথা ভালো বুঝতে পারলুম না। তারা বললে রাজা তাদের শীঘ্র বাগান ছেড়ে যেতে বলেছেন।

অবন্তী। রাজা! কোন্ রাজা!

রোহিণী। তারা স্পষ্ট করে বলতে পারলে না।

অবন্তী। এ তো ভালো কথা নয়। যেমন করেই হ'ক এখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজে বের করতেই হবে। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। [দ্রুত প্রস্থান

রোহিণী। চিরদিন তো এই বাগানেই আছি কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যেন বাঁধা পড়ে গেছি, বেরিয়ে পড়তে না পারলে নিষ্কৃতি নেই। রাজাকে দেখতে পেলে যে বাঁচি। পরশু যখন তাঁকে রানীর ফুল দিলুম তখন তিনি তো একরকম আত্মবিস্মৃত ছিলেন—তার পর থেকে তিনি আমাকে কেবলই পুরস্কার দিচ্ছেন। এই অকারণ পুরস্কারে আমার ভয় আরও বাড়ছে। এত রাতে পাখিরা সব কোথায় উড়ে চলেছে? এরা হঠাৎ এমন ভয় পেল কেন? এখন তো এদের ওড়বার সময় নয়। রানীর পোষা হরিণী ওদিকে দৌড়ল কোথায়? চপলা, চপলা। আমার ডাক শুনলই না। এমন তো কখনোই হয়

না। চারদিকের দিগন্ত মাতালের চোখের মত হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছে। যেন চারদিকেই অকালে সূর্যাস্ত হচ্ছে। বিধাতার এ কী উন্মত্ততা আজ। ভয় হচ্ছে। রাজার দেখা কোথায় পাই।

৭

রানীর প্রাসাদদ্বার

রাজবেশী। এ কী কাণ্ড করেছ কাঞ্চীরাজ ?

কাঞ্চী। আমি কেবল এই প্রাসাদের কাছটাতেই আগুন ধরাতে চেয়েছিলুম, সে আগুন যে এত শীঘ্র এমন চারদিকে ধরে উঠবে সে তো আমি মনেও করি নি। এ বাগান থেকে বেরোবার পথ কোথায় শীঘ্র বলে দাও।

রাজবেশী। পথ কোথায় আমি তো কিছুই জানি নে। যারা আমাদের এখানে এনেছিল তাদের একজনকেও দেখছি নে।

কাঞ্চী। তুমি তো এ-দেশের লোক—পথ নিশ্চয় জান।

রাজবেশী। অন্তঃপুরের বাগানে কোনোদিনই প্রবেশ করি নি।

কাঞ্চী। সে আমি বুঝি নে, তোমাকে পথ বলতেই হবে, নইলে তোমাকে দু-টুকরো করে কেটে ফেলব।

রাজবেশী। তাতে প্রাণ বেরোবে, পথ বেরোবার কোনো উপায় হবে না।

কাঞ্চী। তবে কেন বলে বেড়াচ্ছিলে তুমিই এখানকার রাজা ?

রাজবেশী। আমি রাজা না, রাজা না। (মাটিতে পড়িয়া জোড়করে) কোথায় আমার রাজা, রক্ষা করো। আমি পাপিষ্ঠ, আমাকে রক্ষা করো। আমি বিদ্রোহী, আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু রক্ষা করো।

কাঞ্চী। অমন শূন্যতার কাছে চীৎকার করে লাভ কী। ততক্ষণ পথ বের করবার চেষ্টা করা যাক।

রাজবেশী। আমি এইখানেই পড়ে রইলুম—আমার যা হবার তাই হবে।

কাঞ্চী। সে হবে না। পুড়ে মরি তো একলা মরব না—তোমাকে সঙ্গী নেব।

নেপথ্য হইতে। রক্ষা করো রাজা রক্ষা করো। চারদিকে আগুন।

কাঞ্চী। মূঢ় ওঠ্‌, আর দেরি না।

সুদর্শনা (প্রবেশ করিয়া)। রাজা, রক্ষা করো। আগুনে ঘিরেছে।

রাজবেশী। কোথায় রাজা? আমি রাজা নই।

সুদর্শনা। তুমি রাজা নও?

রাজবেশী। আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড। (মুকুট মাটিতে ফেলিয়া) আমার ছলনা ধূলিসাৎ হ'ক। [কাঞ্চীরাজের সহিত প্রস্থান

সুদর্শনা। রাজা নয়? এ রাজা নয়? তবে ভগবান হুতাশন, দগ্ধ করো আমাকে; আমি তোমারই হাতে আত্মসমর্পণ করব—হে পাবন, আমার লজ্জা, আমার বাসনা, পুড়িয়ে ছাই করে ফেলো।

রোহিণী (প্রবেশ করিয়া)। রানী, ওদিকে কোথায় যাও। তোমার অন্তঃপুরের চারদিকে আগুন ধরে গেছে, ওর মধ্যে প্রবেশ ক'রো না।

সুদর্শনা। আমি তারই মধ্যে প্রবেশ করব। এ আমারই মরবারই আগুন।

[প্রাসাদে প্রবেশ

৮

অন্ধকার কক্ষ

রাজা। ভয় নেই তোমার ভয় নেই। আগুন এ-ঘরে এসে পৌঁছোবে না।

সুদর্শনা। ভয় আমার নেই—কিন্তু লজ্জা! লজ্জা যে আগুনের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। আমার মুখ-চোখ আমার সমস্ত হৃদয়টাকে রাঙা করে রেখেছে।

রাজা। এ দাহ মিটতে সময় লাগবে।

সুদর্শনা। কোনোদিন মিটবে না, কোনোদিন মিটবে না।

রাজা। হতাশ হ'য়ো না রানী।

সুদর্শনা। তোমার কাছে মিথ্যা বলব না রাজা—আমি আর-এক জনের মালা গলায় পরেছি।

রাজা। ও মালাও যে আমার, নইলে সে পাবে কোথা থেকে? সে আমার ঘর থেকে চুরি করে এনেছে।

সুদর্শনা। কিন্তু এ যে তারই হাতের দেওয়া। তবু তো ত্যাগ করতে পারলুম না। যখন চারদিকে আগুন আমার কাছে এগিয়ে এল তখন একবার মনে করলুম এই মালাটা আগুনে ফেলে দিই। কিন্তু পারলুম না। আমার পাপিষ্ঠ মন বললে,

ওই হার গলায় নিয়ে পুড়ে মরব। আমি তোমাকে বাইরে দেখব বলে পতঙ্গের মতো এ কোন্‌ আগুনে ঝাঁপ দিলুম। আমিও মরি নে, আগুনও নেবে না, এ কী জ্বালা।

রাজা। তোমার সাধ তো মিটেছে, আমাকে তো আজ দেখে নিলে।

সুদর্শনা। আমি কি তোমাকে এমন সর্বনাশের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলুম? কী দেখলুম জানি নে, কিন্তু বুকের মধ্যে এখনও কাঁপছে।

রাজা। কেমন দেখলে রানী?

সুদর্শনা। ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো, তুমি কালো। আমি কেবল মুহূর্তের জন্যে চেয়েছিলুম। তোমার মুখের উপর আগুনের আভা লেগেছিল—আমার মনে হল ধূমকেতু যে-আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো তুমি কালো—তখনই চোখ বুজে ফেললুম, আর চাইতে পারলুম না। ঝড়ের মেঘের মতো কালো—কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো, তারই তুফানের উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা।

রাজা। আমি তো তোমাকে পূর্বেই বলেছি যে-লোক আগে থাকতে প্রস্তুত না হয়েছে সে যখন আমাকে হঠাৎ দেখে সইতে পারে না—আমাকে বিপদ বলে মনে করে আমার কাছ থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে চায়। এমন কতবার দেখেছি। সেইজন্যে সেই দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে ক্রমে ক্রমে তোমার কাছে পরিচয় দিতে চেয়েছিলুম।

সুদর্শনা। কিন্তু পাপ এসে সমস্ত ভেঙে দিলে—এখন আর যে তোমার সঙ্গে তেমন করে পরিচয় হতে পারবে তা মনে করতেও পারি নে।

রাজা। হবে রানী হবে। যে-কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে আমার ভালোবাসা কিসের?

গান

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।
ভরাব না ভূষণ-ভারে
সাজাব না ফুলের হারে
সোহাগ আমার মালা করে
গলায় তোমার পরাব।

জানবে না কেউ কোন্ তুফানে
তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে,
চাঁদের মত অলখ টানে
জোয়ারে ঢেউ তোলাব ॥

সুদর্শনা। হবে না, হবে না, শুধু তোমার ভালোবাসায় কী হবে। আমার ভালোবাসা যে মুখ ফিরিয়েছে। রূপের নেশা আমাকে লেগেছে—সে নেশা আমাকে ছাড়বে না, সে যেন আমার দুই চক্ষে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমার স্বপনসুদ্ধ ঝলমল করছে। এই আমি তোমাকে সব কথা বললুম এখন আমাকে শাস্তি দাও।

রাজা। শাস্তি শুরু হয়েছে।

সুদর্শনা। কিন্তু তুমি যদি আমাকে ত্যাগ না কর আমি তোমাকে ত্যাগ করব।

রাজা। যতদূর সাধ্য চেষ্টা করে দেখো।

সুদর্শনা। কিছু চেষ্টা করতে হবে না—তোমাকে আমি সইতে পারছি নে। ভিতরে ভিতরে তোমার উপর রাগ হচ্ছে। কেন তুমি আমাকে—জানি নে আমাকে তুমি কী করেছ। কিন্তু কেন তুমি এমনতরো? কেন আমাকে লোকে বলেছিল তুমি সুন্দর? তুমি যে কালো, কালো, তোমাকে আমার কখনো ভালো লাগবে না। আমি যা ভালোবাসি তা আমি দেখেছি—তা ননির মতো কোমল, শিরীষ ফুলের মতো সুকুমার, তা প্রজাপতির মতো সুন্দর।

রাজা। তা মরীচিকার মতো মিথ্যা এবং বুদ্‌বুদের মতো শূন্য।

সুদর্শনা। তা হ'ক কিন্তু আমি পারছি নে, তোমার কাছে দাঁড়াতে পারছি নে! আমাকে এখান থেকে যেতেই হবে। তোমার সঙ্গে মিলন সে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সে-মিলন মিথ্যা হবে, আমার মন অন্যদিকে যাবে।

রাজা। একটুও চেষ্টা করবে না?

সুদর্শনা। কাল থেকে চেষ্টা করছি—কিন্তু যতই চেষ্টা করছি ততই মন আরও বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি অশুচি, আমি অসতী, তোমার কাছে থাকলে এই ঘৃণা কেবলই আমাকে আঘাত করবে। তাই আমার ইচ্ছে করছে দূরে চলে যাই—এত দূরে যাই যেখানে তোমাকে আমার আর মনে আনতে হবে না।

রাজা। আচ্ছা তুমি যতদূরে পার ততদূরেই চলে যাও।

সুদর্শনা। তুমি হাত দিয়ে পথ আটকাও না বলেই তোমার কাছ থেকে পালাতে মনে এত দ্বিধা হয়। তুমি কেশের গুচ্ছ ধরে জোর করে আমাকে টেনে রেখে দাও না

কেন ? তুমি আমাকে মার না কেন ? মারো, মারো, আমাকে মারো। তুমি আমাকে কিছু বলছ না সেইজন্যেই আরও অসহ্য বোধ হচ্ছে।

রাজা। কিছু বলছি নে কে তোমাকে বললে ?

সুদর্শনা। অমন করে নয়, অমন করে নয়, চীৎকার করে বলো, বজ্রগর্জনে বলো—আমার কান থেকে অন্য সকল কথা ডুবিয়ে দিয়ে বলো—আমাকে এত সহজে ছেড়ে দিয়ো না, যেতে দিয়ো না।

রাজা। ছেড়ে দেব কিন্তু যেতে দেব কেন ?

সুদর্শনা। যেতে দেবে না ? আমি যাবই।

রাজা। আচ্ছা যাও।

সুদর্শনা। দেখো তাহলে আমার দোষ নেই। তুমি আমাকে জোর করে ধরে রাখতে পারতে কিন্তু রাখলে না। আমাকে বাঁধলে না—আমি চললুম। তোমার প্রহরীদের হুকুম দাও আমাকে ঠেকাক।

রাজা। কেউ ঠেকাবে না। ঝড়ের মুখে ছিন্ন মেঘ যেমন অবাধে চলে তেমনি তুমি অবাধে চলে যাও।

সুদর্শনা। ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠছে—এবার নোঙর ছিঁড়ল। হয়তো ডুবব কিন্তু আর ফিরব না। [দ্রুত প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ ও গান

ভয়েরে মোর আঘাত করো
ভীষণ, হে ভীষণ !
কঠিন করে চরণ 'পরে
প্রণত করো মন।
বেঁধেছ মোরে নিত্যকাজে
প্রাচীরে ঘেরা ঘরের মাঝে
নিত্য মোরে বেঁধেছে সাজে
সাজের আভরণ।
এস হে, ওহে আকস্মিক
ঘিরিয়া ফেলো সকল দিক
মুক্ত পথে উড়ায়ে নিক
নিমেষে এ জীবন।

তাহার পরে প্রকাশ হ'ক
উদার তব সহাস চোখ
তব অভয় শান্তিময়
স্বরূপ পুরাতন ॥

সুদর্শনা (পুনঃপ্রবেশ করিয়া)। রাজা, রাজা।

সুরঙ্গমা। তিনি চলে গেছেন।

সুদর্শনা। চলে গেছেন? আচ্ছা বেশ, তাহলে তিনি আমাকে একেবারে ছেড়েই দিলেন। আমি ফিরে এলুম কিন্তু তিনি অপেক্ষা করলেন না। আচ্ছা ভালোই হল—তাহলে আমি মুক্ত। সুরঙ্গমা আমাকে ধরে রাখবার জন্যে তিনি কি তোকে বলেছেন?

সুরঙ্গমা। না, তিনি কিছুই বলেন নি।

সুদর্শনা। কেনই বা বলবেন? বলবার তো কথা নয়। তাহলে আমি মুক্ত। আচ্ছা সুরঙ্গমা, একটা কথা রাজাকে জিজ্ঞাসা করব মনে করেছিলুম কিন্তু মুখে বেধে গেল। বল দেখি বন্দীদের তিনি কি প্রাণদণ্ড দিয়েছেন?

সুরঙ্গমা। প্রাণদণ্ড? আমার রাজা তো কোনোদিন বিনাশ করে শাস্তি দেন না।

সুদর্শনা। তাহলে ওদের কী হল?

সুরঙ্গমা। ওদের তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। কাঞ্চীরাজ পরাভব স্বীকার করে দেশে ফিরে গেছেন।

সুদর্শনা। শুনে বাঁচলুম।

সুরঙ্গমা। রানীমা তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

সুদর্শনা। প্রার্থনা কি মুখে জানাতে হবে মনে করেছিস? রাজার কাছ থেকে এ-পর্যন্ত আমি যত আভরণ পেয়েছি সব তোকেই দিয়ে যাব—এ অলংকার আমাকে আর শোভা পায় না।

সুরঙ্গমা। মা, আমি যাঁর দাসী তিনি আমাকে নিরাভরণ করেই সাজিয়েছেন। সেই আমার অলংকার। লোকের কাছে গর্ব করতে পারি এমন কিছুই তিনি আমাকে দেন নি।

সুদর্শনা। তবে তুই কী চাস?

সুরঙ্গমা। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

সুদর্শনা। কী বলিস তুই? তোর প্রভুকে ছেড়ে দূরে যাবি, এ কী রকম প্রার্থনা?

সুরঙ্গমা। দূরে নয় মা, তুমি যখন বিপদের মুখে চলেছ তিনি কাছেই থাকবেন।

সুদর্শনা। পাগলের মতো বকিস নে। আমি রোহিণীকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলুম সে গেল না। তুই কোন্ সাহসে যেতে চাস?

সুরঙ্গমা। সাহস আমার নেই, শক্তিও আমার নেই। কিন্তু আমি যাব—সাহস আপনি আসবে, শক্তিও হবে।

সুদর্শনা। না, তোকে আমি নিতে পারব না—তোর কাছে থাকলে আমার বড়ো গ্লানি হবে—সে আমি সইতে পারব না।

সুরঙ্গমা। মা, তোমার সমস্ত ভালোমন্দ আমি নিজের গায়ে মেখে নিয়েছি—আমাকে পর করে রাখতে পারবে না—আমি যাবই।

গান

আমি তোমার প্রেমে হব সবার
কলঙ্কভাগী।
আমি সকল দাগে হব দাগি।
তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন ;
যেথা তোমার ধুলার শয়ন
সেথা আঁচল পাতব আমার
তোমার রাগে অনুরাগী।
আমি শুচি আসন টেনে টেনে
বেড়াব না বিধান মেনে,
যে পঙ্কে ঐ চরণ পড়ে
তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি॥

৯

সুদর্শনার পিতা কান্যকুব্জরাজ ও মন্ত্রী

কান্যকুব্জ। সে আসবার পূর্বেই আমি সমস্ত খবর পেয়েছি।

মন্ত্রী। রাজকন্যা নগরের বাহিরে নদীকূলে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে লোকজন পাঠিয়ে দিই?

কান্যকুব্জ। হতভাগিনী স্বামীকে ত্যাগ করে আসছে, অভ্যর্থনা করে তার সেই লজ্জা ঘোষণা করে দেবে? অন্ধকার হ'ক, রাস্তায় যখন লোক থাকবে না তখন সে গোপনে আসবে।

মন্ত্রী। প্রাসাদে তাঁর বাসের ব্যবস্থা করে দিই?

কান্যকুব্জ। কিছু করতে হবে না। ইচ্ছা করে সে আপনার একেশ্বরী রানীর পদ ত্যাগ করে এসেছে—এখানে রাজগৃহে তাকে দাসীর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে।

মন্ত্রী। মনে বড়ো কষ্ট পাবেন।

কান্যকুব্জ। যদি তাকে কষ্ট থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি তাহলে পিতা নামের যোগ্য নই।

মন্ত্রী। যেমন আদেশ করেন তাই হবে।

কান্যকুব্জ। সে যে আমার কন্যা এ-কথা যেন প্রকাশ না হয়—তাহলে বিষম অনর্থপাত ঘটবে।

মন্ত্রী। অনর্থের আশঙ্কা কেন করেন মহারাজ?

কান্যকুব্জ। নারী যখন আপন প্রতিষ্ঠা থেকে ভ্রষ্ট হয় তখন সংসারে সে ভয়ংকর বিপদ হয়ে দেখা দেয়। তুমি জান না আমার এই কন্যাকে আমি আজ কী রকম ভয় করছি—সে আমার ঘরের মধ্যে শনিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে।

১০

অন্তঃপুর

সুদর্শনা। যা যা সুরঙ্গমা, তুই যা! আমার মধ্যে একটা রাগের আগুন জ্বলছে—আমি কাউকে সহ্য করতে পারছি নে—তুই অমন শান্ত হয়ে থাকিস ওতে আমার আরও রাগ হয়।

সুরঙ্গমা। কার উপর রাগ করছ মা?

সুদর্শনা। সে আমি জানি নে—কিন্তু আমার ইচ্ছে করছে সমস্ত ছারখার হয়ে যাক! অতবড়ো রানীর পদ একমুহূর্তে বিসর্জন দিয়ে এলুম সে কি এমনি কোণে লুকিয়ে ঘর ঝাঁট দেবার জন্যে? মশাল জ্বলে উঠবে না? ধরণী কেঁপে উঠবে না? আমার পতন কি শিউলি ফুলের খসে পড়া? সে কি নক্ষত্রের পতনের মতো অগ্নিময় হয়ে দিগন্তকে বিদীর্ণ করে দেবে না?

সুরঙ্গমা। দাবানল জ্বলে ওঠবার আগে গুমরে গুমরে ধোঁয়ায়—এখনও সময় যায় নি।

সুদর্শনা। রানীর মহিমা ধূলিসাৎ করে দিয়ে বাইরে চলে এলুম এখানে আর কেউ

নেই যে আমার সঙ্গে মিলবে? একলা—একলা আমি। আমার এতবড়ো ত্যাগ গ্রহণ করে নেবার জন্যে কেউ এক পাও বাড়াবে না?

সুরঙ্গমা। একলা তুমি না—একলা না।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা তোর কাছে সত্যি করে বলছি, আমাকে পাবার জন্যে প্রাসাদে আগুন লাগিয়েছিল এতেও আমি রাগ করতে পারি নি—ভিতরে ভিতরে আনন্দে আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছিল। এতবড়ো অপরাধ! এতবড়ো সাহস! সেই সাহসেই আমার সাহস জাগিয়ে দিলে, সেই আনন্দেই আমার সমস্ত ফেলে দিয়ে আসতে পারলুম। কিন্তু সে কি কেবল আমার কল্পনা? আজ কোথাও তার চিহ্ন দেখি না কেন?

সুরঙ্গমা। তুমি যার কথা মনে ভাবছ সে তো আগুন লাগায় নি—আগুন লাগিয়েছিল কাঞ্চীরাজ।

সুদর্শনা। ভীরু! ভীরু! অমন মনোমোহন রূপ—তার ভিতরে মানুষ নেই। এমন অপদার্থের জন্যে নিজেকে এতবড়ো বঞ্চনা করেছি? লজ্জা! লজ্জা! কিন্তু সুরঙ্গমা, তোর রাজার কি উচিত ছিল না আমাকে এখনও ফেরাবার জন্যে আসে? (সুরঙ্গমা নিরুত্তর) তুই ভাবছিস ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি! কখনো না! রাজা এলেও আমি ফিরতুম না। কিন্তু সে একবার বারণও করলে না। চলে যাবার দ্বার একেবারে খোলা রইল। বাইরের নিরাবরণ রাস্তা রানী বলে আমার জন্যে একটু বেদনা বোধ করলে না? সেও তোর রাজার মতোই কঠিন? দীনতম পথের ভিক্ষুকও তার কাছে যেমন আমিও তেমনি। চুপ করে রইলি যে। বল না তোর রাজার এ কী রকম ব্যবহার।

সুরঙ্গমা। সে তো সবাই জানে—আমার রাজা নিষ্ঠুর, কঠিন, তাকে কি কেউ কোনোদিন টলাতে পারে?

সুদর্শনা। তবে তুই তাকে দিনরাত্রি এমন ডাকিস কেন?

সুরঙ্গমা। সে যেন এইরকম পর্বতের মতোই চিরদিন কঠিন থাকে—আমার কান্নায় আমার ভাবনায় সে যেন টলমল না করে। আমার দুঃখ আমারই থাক সেই কঠিনেরই জয় হ'ক।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, দেখ্ তো ওই মাঠের পারে পূর্বদিগন্তে যেন ধুলো উড়ছে।

সুরঙ্গমা। হাঁ তাই তো দেখছি।

সুদর্শনা। ওই যে, রথের ধ্বজার মতো দেখাচ্ছে না।

সুরঙ্গমা। হাঁ, ধ্বজাই তো বটে।

সুদর্শনা। তবে তো আসছে। তবে তো এল।

সুরঙ্গমা। কে আসছে।

সুদর্শনা। আবার কে ? তোর রাজা। থাকতে পারবে কেন। এতদিন চুপ করে আছে এই আশ্চর্য।

সুরঙ্গমা। না, এ আমার রাজা নয়।

সুদর্শনা। না বই কি। তুমি তো সব জান। ভারি কঠিন তোমার রাজা! কিছুতেই টলেন না! দেখি কেমন না টলেন। আমি জানতুম সে ছুটে আসবে। কিন্তু মনে রাখিস সুরঙ্গমা আমি তাকে একদিনের জন্যেও ডাকি নি। আমার কাছে তোমার রাজা কেমন করে হার মানে এবার দেখে নিয়ো। সুরঙ্গমা যা একবার বেরিয়ে গিয়ে দেখে আয় গে। (সুরঙ্গমার প্রস্থান) রাজা এসে আমাকে ডাকলেই বুঝি যাব ? কখনো না। আমি যাব না। যাব না।

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। মা, এ আমার রাজা নয়।

সুদর্শনা। নয় ? তুই সত্যি বলছিস ? এখনও আমাকে নিতে এল না ?

সুরঙ্গমা। না, আমার রাজা এমন করে ধুলো উড়িয়ে আসে না। সে কখন আসে কেউ টেরই পায় না।

সুদর্শনা। এ বুঝি তবে—

সুরঙ্গমা। কাঞ্চীরাজের সঙ্গে সেই আসছে।

সুদর্শনা। তার নাম কী জানিস ?

সুরঙ্গমা। তার নাম সুবর্ণ।

সুদর্শনা। তবে তো সে আসছে। ভেবেছিলুম আবর্জনার মতো বুঝি বাইরে এসে পড়েছি, কেউ নেবে না—কিন্তু আমার বীর তো আমাকে উদ্ধার করতে আসছে। সুবর্ণকে তুই জানতিস ?

সুরঙ্গমা। যখন বাপের বাড়ি ছিলুম তখন সে জুয়োখেলার দলে—

সুদর্শনা। না না, তোর মুখে আমি তার কোনো কথা শুনতে চাই নে। সে আমার বীর, সে আমার পরিত্রাণকর্তা। তার পরিচয় আমি নিজেই পাব। কিন্তু সুরঙ্গমা, তোর রাজা কেমন বল তো। এত হীনতা থেকেও আমাকে উদ্ধার করতে এল না ? আমার আর দোষ দিতে পারবি নে। আমি এখানে দিনরাত্রি দাসীগিরি করে তার জন্যে চিরজীবন অপেক্ষা করে থাকতে পারব না। তোর মতো দীনতা করা আমার দ্বারা হবে না! আচ্ছা সত্যি বল, তুই তোর রাজাকে খুব ভালোবাসিস ?

সুরঙ্গমার গান

আমি কেবল তোমার দাসী।
কেমন করে আনব মুখে তোমায় ভালোবাসি!
গুণ যদি মোর থাকত তবে
অনেক আদর মিলত ভবে,
বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী॥

১১

শিবির

কাঞ্চী। (কান্যকুব্জের দূতের প্রতি) তোমাদের রাজাকে গিয়ে বলো গে আমরা তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসি নি। রাজ্যে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি, কেবল সুদর্শনাকে এখানকার দাসীশালা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্যেই অপেক্ষা।

দূত। মহারাজ স্মরণ রাখবেন রাজকন্যা তাঁর পিতৃগৃহে আছেন।

কাঞ্চী। কন্যা যতদিন কুমারী থাকে ততদিনই পিতৃগৃহে তার আশ্রয়।

দূত। কিন্তু পতিকুলের সঙ্গেও তাঁর সম্বন্ধ আছে।

কাঞ্চী। সে-সম্বন্ধ তিনি ত্যাগ করেই এসেছেন।

দূত। জীবন থাকতে সে-সম্বন্ধ ত্যাগ করা যায় না—মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে কিন্তু অবসান ঘটতেই পারে না।

কাঞ্চী। সেজন্য কোনো সংকোচ বোধ করতে হবে না, কারণ তাঁর স্বামীই স্বয়ং তাঁকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। রাজন্।

সুবর্ণ। কী মহারাজ।

কাঞ্চী। তোমার মহিষীকে কি পিতৃগৃহে দাসীত্বে নিযুক্ত রেখে তুমি স্থির থাকবে?

সুবর্ণ। এমন কাপুরুষ আমি না।

দূত। এ যদি আপনাদের পরিহাস-বাক্য না হয় তাহলে রাজভবনে আতিথ্য নিতে দ্বিধা কিসের?

কাঞ্চী। রাজন্।

সুবর্ণ। কী মহারাজ।

কাঞ্চী। তুমি কি তোমার মহিষীকে ভিক্ষা করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?

সুবর্ণ। এ-ও কি কখনো হয়?

দূত। তবে কী ইচ্ছা করেন?

কাঞ্চী। সে-ও কি বলতে হবে?

সুবর্ণ। তা তো বটেই। সে তো বুঝতেই পারছেন।

কাঞ্চী। মহারাজ যদি সহজে তাঁর কন্যাকে আমাদের হাতে সমর্পণ না করেন ক্ষত্রিয়ধর্ম-অনুসারে বলপূর্বক নিয়ে যাব এই আমার শেষ কথা।

দূত। মহারাজ, আমাদের রাজাকেও ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করতে হবে। তিনি তো কেবল স্পর্ধাবাক্য শুনেই আপনার হাতে কন্যা দিয়ে যেতে পারেন না।

কাঞ্চী। এইরকম উত্তর শোনবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছি এই কথা রাজাকে জানাও গে। [দূতের প্রস্থান

সুবর্ণ। কাঞ্চীরাজ, দুঃসাহসিকতা হচ্ছে।

কাঞ্চী। তাই যদি না হবে তবে এমন কাজে প্রবৃত্ত হয়ে সুখ কী।

সুবর্ণ। কান্যকুব্জরাজকে ভয় না করলেও চলে—কিন্তু—

কাঞ্চী। কিন্তুকে ভয় করতে আরম্ভ করলে জগতে নিরাপদ জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুবর্ণ। সত্য বলি, মহারাজ, ওই কিন্তুটি দেখা দেন না কিন্তু ওঁর কাছ থেকে নিরাপদে পালাবার জায়গা জগতে কোথাও নেই।

কাঞ্চী। নিজের মনে ভয় থাকলেই ওই কিন্তুর জোর বেড়ে ওঠে।

সুবর্ণ। ভেবে দেখুন না, বাগানে কী কাণ্ডটা হল। আপনি আটঘাট বেঁধেই তো কাজ করেছিলেন, তার মধ্যেও কোথা দিয়ে কিন্তু এসে ঢুকে পড়ল। তিনিই তো রাজা, তাঁকে মানব না ভেবেছিলুম, আর না মেনে থাকবার জো রইল না।

কাঞ্চী। ভয়ে মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়, তখন মানুষ যা-তা মেনে বসে। সেদিন যা ঘটেছিল সেটা অকস্মাৎ ঘটেছিল।

সুবর্ণ। আপনি যাঁকে অকস্মাৎ বলছেন আমি তাঁকেই কিন্তু বললেম—কোনোমতে তাঁকে বাঁচিয়ে চললেই তবে বাঁচন।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। মহারাজ, কোশলরাজ অবন্তীরাজ ও কলিঙ্গের রাজা সসৈন্যে আসছেন সংবাদ পেলুম। [প্রস্থান

কাঞ্চী। যা ভয় করছিলুম তাই হল। সুদর্শনার পলায়নসংবাদ রটে গিয়েছে—এখন সকলে মিলে কাড়াকাড়ি করে সকলকেই ব্যর্থ হতে হবে।

সুবর্ণ। কাজ নেই মহারাজ! এ-সমস্ত ভালো লক্ষণ নয়। আমি নিশ্চয় বলছি আমাদের রাজাই এই গোপন সংবাদটা রটিয়ে দিয়েছেন।

কাঞ্চী। কেন? তাতে তাঁর লাভ কী?

সুবর্ণ। লোভীরা পরস্পর কাটাকাটি ছেঁড়াছিঁড়ি করে মরবে—মাঝের থেকে যার ধন তিনিই নিয়ে যাবেন।

কাঞ্চী। এখন বেশ বুঝছি কেন তোমাদের রাজা দেখা দেন না। ভয়ে তাঁকে সর্বত্রই দেখা যাবে এই তাঁর কৌশল। কিন্তু এখনও আমি বলছি তোমাদের রাজা আগাগোড়াই ফাঁকি।

সুবর্ণ। কিন্তু মহারাজ আমাকে ছেড়ে দিন।

কাঞ্চী। তোমাকে ছাড়তে পারছি নে—তোমাকে এই কাজে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। বিরাট পাঞ্চাল ও বিদর্ভরাজও এসেছেন। তাঁদের শিবির নদীর ওপারে। [প্রস্থান

কাঞ্চী। আরম্ভে আমাদের সকলকে মিলে কাজ করতে হবে। কান্যকুব্জের সঙ্গে যুদ্ধটা আগে হয়ে যাক তার পরে একটা উপায় করা যাবে।

সুবর্ণ। আমাকে ওই উপায়টার মধ্যে যদি না টানেন তাহলে নিশ্চিন্ত হতে পারি—আমি অতি হীনব্যক্তি—আমার দ্বারা—

কাঞ্চী। দেখো হে ভণ্ড, উপায় জিনিসটাই হচ্ছে হীন। সিঁড়ি বল রাস্তা বল পায়ের তলাতেই থাকে। উপায় যদি উচ্চশ্রেণীর হয় তাকে ব্যবহারে লাগাতে অনেক চিন্তার দরকার করে। তোমার মতো লোককে নিয়ে কাজ চালাবার সুবিধে এই যে কোনোপ্রকার ভণ্ডামি করতে হয় না। কিন্তু আমার মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেও চুরিকে লোকহিত নাম না দিলে শুনতে খারাপ লাগে।

সুবর্ণ। কিন্তু দেখেছি মন্ত্রীমশায় কথাটার আসল অর্থ টাই বুঝে নেন।

কাঞ্চী। এই ভাষাতত্ত্বটুকু তার জানা না থাকলে তাকে মন্ত্রী না করে গোয়ালঘরের ভার দিতুম। যাই, রাজাগুলোকে একবার বোড়ের মতো চেলে দিয়ে আসি গে—সকলেরই যদি রাজার চাল হয় তাহলে চতুরঙ্গ খেলা চলে না।

১২

অন্তঃপুর

সুদর্শনা। যুদ্ধ এখনও চলছে ?

সুরঙ্গমা। হাঁ, এখনও চলছে।

সুদর্শনা। যুদ্ধে যাবার পূর্বে বাবা এসে বললেন, তুই একজনের হাত থেকে ছেড়ে এসে আজ সাতজনকে টেনে আনলি—ইচ্ছে করছে তোকে সাত টুকরো করে ওদের সাত জনের মধ্যে ভাগ করে দিই। সত্যিই যদি তাই করতেন ভালো হত। সুরঙ্গমা।

সুরঙ্গমা। কী মা।

সুদর্শনা। তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত তাহলে আজ তিনি কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতেন ?

সুরঙ্গমা। মা, আমাকে কেন বলছ ? আমার রাজার হয়ে উত্তর দেবার শক্তি কি আমার আছে ? উত্তর যদি দেন তো নিজেই এমনি করে দেবেন যে কারও বুঝতে কিছু বাকি থাকবে না। যদি না দেন তাহলে সকলকেই নির্বাক হয়ে থাকতে হবে। আমি কিছুই বুঝি নে জানি, সেইজন্যে কোনোদিন তাঁর বিচার করি নে।

সুদর্শনা। যুদ্ধে কে কে যোগ দিয়েছে বল্ তো।

সুরঙ্গমা। সাতজন রাজাই যোগ দিয়েছে।

সুদর্শনা। আর কেউ না ?

সুরঙ্গমা। সুবর্ণ যুদ্ধের পূর্বেই গোপনে পালাবার চেষ্টা করছিল—কাঞ্চীরাজ তাকে শিবিরে বন্দী করে রেখেছেন।

সুদর্শনা। আমার মৃত্যুই ভালো ছিল। কিন্তু রাজা, রাজা, আমার পিতাকে রক্ষা করবার জন্যে যদি আসতে তাহলে তোমার যশ বাড়ত বই কমত না। আমার অপরাধে তিনি শাস্তি পান কেন ?

সুরঙ্গমা। সংসারে আমরা তো কেউ একলা নই মা,—ভালোমন্দ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়—সেইজন্যেই ভয়, নইলে একলার জন্যে ভয় কিসের ?

সুদর্শনা। দেখ্ সুরঙ্গমা, আমি যখন থেকে এখানে এসেছি কতবার হঠাৎ মনে হয়েছে আমার জানলার নিচে থেকে যেন বীণা বাজছে।

সুরঙ্গমা। তা হবে, কেউ হয়তো বাজায়।

সুদর্শনা। সেখানটা ঘন বন, অন্ধকার, মাথা বাড়িয়ে কতবার দেখতে চেষ্টা করি, ভালো করে কিছু দেখতে পাই নে।

সুরঙ্গমা। হয়তো কোনো পথিক ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে, আর বাজায়।

সুদর্শনা। তা হবে, কিন্তু আমার মনে পড়ে আমার সেই বাতায়নটি। সন্ধ্যার সময় সেজে এসে আমি সেখানে দাঁড়াতুম আর আমাদের সেই দীপ-নেবানো বাসর-ঘরের অন্ধকার থেকে গানের পর গান তানের পর তান ফোয়ারার মুখের ধারার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার সামনে এসে যেন নানা লীলায় ঝরে ঝরে পড়ত। সেই গানই তো কোন্ অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কোন্ অন্ধকারের দিকে আমাকে ডেকে নিয়ে যেত।

সুরঙ্গমা। আহা মা, সে কী অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দাসী আমি।

সুদর্শনা। আমার জন্যে সেখান থেকে তুই কেন এলি ?

সুরঙ্গমা। আমার রাজা আবার হাতে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন এই আদরটুকু পাবার জন্যে।

সুদর্শনা। না না তিনি আসবেন না—তিনি আমাদের একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। কেনই বা না ছাড়বেন ? অপরাধ তো কম করি নি।

সুরঙ্গমা। যদি ছেড়ে দিতেই পারেন তাহলে তাঁকে আর দরকার নেই। তাহলে তিনি নেই। তাহলে আমার সেই অন্ধকার একেবারে শূন্য—তার মধ্যে থেকে বীণা বাজে নি—কেউ ডাকে নি—সমস্ত বঞ্চনা।

দ্বারীর প্রবেশ

সুদর্শনা। কে তুমি ?

দ্বারী। আমি এই প্রাসাদের দ্বারী।

সুদর্শনা। কী খবর শীঘ্র বলো।

দ্বারী। আমাদের মহারাজ বন্দী হয়েছেন।

সুদর্শনা। বন্দী হয়েছেন ? মাগো বসুন্ধরা। [মূর্ছা

১৩

বন্দী কান্যকুব্জরাজ, অন্যান্য রাজগণ ও সুবর্ণ

কাঞ্চী। রাজগণ, রণক্ষেত্রের কাজ শেষ হল ?

কলিঙ্গ। কই শেষ হল ? বীরত্বের পুরস্কারটি গ্রহণ করবার পূর্বেই আর-একবার তো বীরত্বের পরিচয় দিতে হবে।

কাঞ্চী। মহারাজ, এখানে তো আমরা জয়মাল্য নিতে আসি নি, বরমাল্য নিতে এসেছি।

বিদর্ভ। সেই মালা কি জয়লক্ষ্মীর হাত থেকে নিতে হবে না?

কাঞ্চী। না মহারাজ, পুষ্পধনুর অন্তঃপুরেই সে মালা গাঁথা হচ্ছে। রক্তমাখা হাতে সেটা ছিন্ন করতে গেলে ফুল ধুলায় লুটিয়ে পড়বে।

কলিঙ্গ। কিন্তু মহারাজ, পঞ্চশর আমাদের সাতজনের দাবি মেটাবেন কি করে।

কাঞ্চী। তা যদি বলেন, সাতজনের দাবি তো রণচণ্ডীও মেটাতে পারেন না।

কোশল। কাঞ্চীরাজ, তোমার প্রস্তাবটি কি পরিষ্কার করেই বলো।

কাঞ্চী। আমার প্রস্তাব এই, স্বয়ংবরসভায় রাজকন্যা স্বয়ং যাঁর গলায় মালা দেবেন এই বসন্তের সফলতা তিনিই লাভ করবেন।

বিদর্ভ। এ প্রস্তাব উত্তম, আমার এতে সম্মতি আছে।

সকলে। আমাদেরও আছে।

কান্যকুব্জ। রাজগণ, আমাকে বধ করুন, অথবা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি, আপনারা আসুন—আমাকে জীবিত মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করবেন না।

কাঞ্চী। আপনার কন্যা পতিকুল ত্যাগ করে এসেছেন। তার অধিক দুঃখ আমরা আপনাকে দিচ্ছি নে। এখন যে-প্রস্তাব করলেম তাতে তিনি সম্মান লাভ করবেন।

কোশল। শুভলগ্নে কালই স্বয়ংবরের দিনস্থির হ'ক।

কাঞ্চী। সেই ভালো।

বিদর্ভ। আমরা আয়োজনে প্রবৃত্ত হই গে।

কাঞ্চী। কলিঙ্গরাজ, বন্দী এখন আপনার আশ্রয়েই রইলেন।

[কাঞ্চী ব্যতীত অন্য রাজগণের প্রস্থান

কাঞ্চী। ওহে ভণ্ডরাজ।

সুবর্ণ। কী আদেশ।

কাঞ্চী। এখন মহারথীরা সরবেন। এবার শিখণ্ডীকে সামনে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

সুবর্ণ। মহারাজের কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি নে।

কাঞ্চী। সেখানে তোমাকে আমার ছত্রধর হয়ে বসতে হবে।

সুবর্ণ। কিংকর প্রস্তুত আছে কিন্তু তাতে মহারাজের উপকারটা কী হবে।

কাঞ্চী। ওহে সুবর্ণ, দেখতে পাচ্ছি তোমার বুদ্ধিটা কম বলেই অহংকারটাও কম। রানী সুদর্শনা তোমাকে কী চক্ষে দেখেছেন সেটা এখনও তোমার ধারণার মধ্যে প্রবেশ

করে নি দেখছি। যাই হ'ক তিনি তো রাজসভায় ছত্রধরের গলায় মালা দিতে পারবেন না অথচ অধিক দূরে যেতেও মন সরবে না অতএব যেমন করেই হ'ক এ মালা আমারই রাজছত্রের ছায়ায় এসে পড়বে।

সুবর্ণ। মহারাজ, আমার সম্বন্ধে এই যে-সব অমূলক কল্পনা করছেন এ অতি ভয়ানক কল্পনা—দোহাই আপনার, আমাকে এই মিথ্যা বিপত্তিজালের মধ্যে জড়াবেন না—আমাকে মুক্তি দিন।

কাঞ্চী। কাজটি শেষ হয়ে গেলেই তোমাকে মুক্তি দিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করব না। উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়ে গেলেই উপায়টাকে কেউ আর চিরস্মরণীয় করে রাখে না।

১৪

বাতায়ন

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। তাহলে স্বয়ংবরসভায় আমাকে যেতেই হবে? নইলে পিতার প্রাণরক্ষা হবে না?

সুরঙ্গমা। কাঞ্চীরাজ তো এইরকম বলেছেন।

সুদর্শনা। এই কি রাজার উচিত কথা? তিনি কি নিজের মুখে বলেছেন?

সুরঙ্গমা। না, তাঁর দূত সুবর্ণ এসে জানিয়ে গেছে।

সুদর্শনা। ধিক, ধিক আমাকে।

সুরঙ্গমা। সেই সঙ্গে কতকগুলি শুকনো ফুল দিয়ে আমাকে বললে, তোমার রানীকে ব'লো বসন্ত-উৎসবের এই স্মৃতিচিহ্ন বাইরে যত মলিন হয়ে আসছে অন্তরে ততই নবীন হয়ে বিকশিত হচ্ছে।

সুদর্শনা। চুপ কর, চুপ কর, আমাকে আর দগ্ধ করিস নে।

সুরঙ্গমা। ওই দেখো, সভায় রাজারা সব বসেছেন। ওই যাঁর গায়ে কোনো আভরণ নেই কেবল মুকুটে একটি ফুলের মালা জড়ানো উনিই হচ্ছেন কাঞ্চীর রাজা। সুবর্ণ তাঁর পিছনে ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

সুদর্শনা। ওই সুবর্ণ! তুই সত্যি বলছিস।

সুরঙ্গমা। হাঁ মা, আমি সত্যি বলছি।

সুদর্শনা। ওকেই আমি সেদিন দেখেছিলুম? না, না। সে আমি আলোতে অন্ধকারে বাতাসে গন্ধেতে মিলে আর একটা কী দেখেছিলুম, ও নয়, ও নয়।

সুরঙ্গমা। সকলে তো বলে ওকে চোখে দেখতে সুন্দর।

সুদর্শনা। ওই সুন্দরেও মন ভোলে! আমার এ পাপ-চোখকে কী দিয়ে ধুলে এর গ্লানি চলে যাবে?

সুরঙ্গমা। সেই কালোর মধ্যে ডুবিয়ে ধুতে হবে। সেই আমার রাজার সকল-রূপ-ডোবানো রূপের মধ্যে। রূপের কালি যা-কিছু চোখে লেগেছে সব যাবে।

সুদর্শনা। কিন্তু সুরঙ্গমা, এমন ভুলেও মানুষ ভোলে কেন?

সুরঙ্গমা। ভুল ভাঙবে বলে ভোলে।

প্রতিহারী (প্রবেশ করিয়া)। স্বয়ংবরসভায় রাজারা অপেক্ষা করে আছেন।

[প্রস্থান

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, আমার অবগুণ্ঠনের চাদরখানা নিয়ে আয় গে। (সুরঙ্গমার প্রস্থান) রাজা, আমার রাজা। তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ উচিত বিচারই করেছ। কিন্তু আমার অন্তরের কথা কি তুমি জানবে না? (বুকের বসনের ভিতর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া) দেহে আমার কলুষ লেগেছে—এ-দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধুলোয় লুটিয়ে যাব—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগে নি বুক চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না? তোমার সেই মিলনের অন্ধকার ঘরটি আমার হৃদয়ের ভিতরে আজ শূন্য হয়ে রয়েছে—সেখানকার দরজা কেউ খোলে নি প্রভু। সে কি খুলতে তুমি আর আসবে না? তবে দ্বারের কাছে তোমার বীণা আর বাজবে না? তবে আসুক মৃত্যু আসুক,—সে তোমার মতোই কালো, তোমার মতোই সুন্দর—তোমার মতোই সে মন হরণ করতে জানে—সে তুমিই সে তুমি।

গান

এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে,
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
এস নিবিড়, এস গভীর, এস জীবনপারে
আমার চিত্তে এস নামি।
এ দেহমন মিলায়ে যাক হইয়া যাক হারা
ওহে অন্ধকারের স্বামী।

বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা
ঐ চরণে যাক থামি।
নির্বাসনে বাঁধা আছি দুর্বাসনার ডোরে
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
সব বাঁধনে তোমার সাথে বন্দী করো মোরে
ওহে আমি বাঁধনকামী।
আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম,
ওহে অন্ধকারের স্বামী—
সকল ঝরে সকল ভরে আসুক সে চরম
ওগো মরুক না এই আমি॥

১৫

স্বয়ংবরসভা

রাজগণ

বিদর্ভ। ওহে কাঞ্চীরাজ, তোমার অঙ্গে যে কোনো আভরণ রাখ নি।

কাঞ্চী। কোনো আশা নেই বলে। আভরণে যে পরাভবকে দ্বিগুণ লজ্জা দেবে।

কলিঙ্গ। যত আভরণ সমস্তই ছত্রধরের অঙ্গে দেখছি।

বিরাট। এর দ্বারা কাঞ্চীরাজ বাহ্যশোভার হীনতা প্রচার করতে চান। নিজের দেহে ওঁর পৌরুষের অভিমান অন্য কোনো আভরণ রাখতেই দেয় নি।

কোশল। ওঁর কৌশল জানি, সমস্ত আভরণধারীদের মাঝখানে উনি আভরণ বর্জনের দ্বারাই নিজের মহিমা প্রমাণ করতে চান।

পাঞ্চাল। সেটা কি উনি ভালো করছেন? সকলেই জানে রমণীর চোখ পতঙ্গের মতো—আভরণের দীপ্তিতে সকলের আগে ছুটে এসে পড়ে।

কলিঙ্গ। কিন্তু আর কত বিলম্ব হবে?

কাঞ্চী। অধীর হবেন না কলিঙ্গরাজ, বিলম্বেই ফল মধুর হয়ে দেখা দেয়।

কলিঙ্গ। ফল নিশ্চয় পাব জানলে বিলম্ব সইত। ভোগের আশা অনিশ্চিত, তাই দর্শনের আশায় উৎসুক আছি।

কাঞ্চী। আপনার নবীন যৌবন, এ-বয়সে বারংবার আশাকে ত্যাগ করলেও সে প্রগল্‌ভা নারীর মতো ফিরে ফিরে আসে—আমাদের আর সেদিন নেই।

কলিঙ্গ। কিন্তু শুভলগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

কাঞ্চী। ভয় নেই, শুভগ্রহও দুর্লভ দর্শনের জন্যে অপেক্ষা করবে। যদি নির্বোধ না-ও করে তবে প্রিয়দর্শনে অশুভগ্রহেরও দৃষ্টি প্রসন্ন হয়ে উঠবে।

বিদর্ভ। বিরাটরাজ, আপনি যাত্রা করেছিলেন কবে?

বিরাট। সুসময় দেখেই বেরিয়েছিলুম, দৈবজ্ঞ বলেছিল যাত্রা সফল হবেই।

পাঞ্চাল। আমরা সকলেই তো শুভযোগ দেখে বেরিয়েছি, কিন্তু কৃপণ বিধাতা তো একটি বই ফল রাখেন নি।

কোশল। এই ফলটি ত্যাগ করানোই হয়তো শুভগ্রহের কাজ।

কাঞ্চী। এ কী উদাসীনের মতো কথা বলছ কোশলরাজ? ফল ত্যাগ করাবার জন্যে এত আয়োজনের কী দরকার ছিল?

কোশল। ছিল বই কি। কামনা না করে তো ত্যাগ করা যায় না। কাঞ্চীরাজ, আমাদের আসনগুলো যেন কেঁপে উঠল। এ কি ভূমিকম্প না কি?

কাঞ্চী। ভূমিকম্প? তা হবে।

বিদর্ভ। কিংবা হয়তো আর কোনো রাজার সৈন্যদল এসে পড়ল।

কলিঙ্গ। তা হতে পারে কিন্তু তাহলে তো দূতের মুখে সংবাদ পাওয়া যেত।

বিদর্ভ। আমার কাছে এটা কিন্তু দুর্লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে।

কাঞ্চী। ভয়ের চক্ষে সব লক্ষণই দুর্লক্ষণ।

বিদর্ভ। অদৃষ্টপুরুষকে ভয় করি, সেখানে বীরত্ব খাটে না।

পাঞ্চাল। বিদর্ভরাজ, আজকেকার শুভকার্যে দ্বিধা জন্মিয়ে দিয়ো না।

কাঞ্চী। অদৃষ্ট যখন দৃষ্ট হবেন তখন তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে।

বিদর্ভ। তখন হয়তো সময় থাকবে না। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যেন একটা—

কাঞ্চী। ওই যেন-একটার কথা ভুলবেন না—ওটা আমাদেরই সৃষ্টি অথচ আমাদেরই বিনাশ করে।

কলিঙ্গ। বাইরে বাজনা বাজছে নাকি?

পাঞ্চাল। বাজনা বলেই বোধ হচ্ছে।

কাঞ্চী। তবে আর কি—নিশ্চয়ই রানী সুদর্শনা। বিধাতা এতক্ষণ পরে আমাদের ভাগ্যফল নিয়ে আসছেন—এ তাঁরই পায়ের শব্দ। (জনান্তিকে) সুবর্ণ

অমনতরো সংকুচিত হয়ে আমার আড়ালে আপনাকে লুকিয়ে রেখো না। তোমার হাতে আমার রাজছত্র কাঁপছে যে।

যোদ্ধবেশে ঠাকুরদার প্রবেশ

কলিঙ্গ। ও কী ও? ও কে?

পাঞ্চাল। বিনা আহ্বানে প্রবেশ করে লোকটা কে হে।

বিরাট। স্পর্ধা তো কম নয়। কলিঙ্গরাজ তুমি একে রোধ করো।

কলিঙ্গ। আপনারা বয়োজ্যেষ্ঠ থাকতে আমার অগ্রসর হওয়া অশোভন হবে।

বিদর্ভ। শোনা যাক না কী বলে।

ঠাকুরদা। রাজা এসেছেন।

বিদর্ভ। (সচকিত হইয়া) রাজা?

পাঞ্চাল। কোন্ রাজা?

কলিঙ্গ। কোথাকার রাজা?

ঠাকুরদা। আমার রাজা।

বিরাট। তোমার রাজা?

কলিঙ্গ। কে?

কোশল। কে সে?

ঠাকুরদা। আপনারা সকলেই জানেন তিনি কে। তিনি এসেছেন।

বিদর্ভ। এসেছেন?

কোশল। কী তাঁর অভিপ্রায়?

ঠাকুরদা। তিনি আপনাদের আহ্বান করেছেন।

কাঞ্চী। ইস। আহ্বান! কী-ভাবে আহ্বান করেছেন?

ঠাকুরদা। তাঁর আহ্বান যিনি যে-ভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন বাধা নেই—সকল প্রকার অভ্যর্থনাই প্রস্তুত আছে।

বিরাট। তুমি কে?

ঠাকুরদা। আমি তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে একজন।

কাঞ্চী। সেনাপতি? মিথ্যে কথা। ভয় দেখাতে এসেছ? তুমি মনে করেছ তোমার ছদ্মবেশ আমার কাছে ধরা পড়ে নি? তোমাকে বিলক্ষণ চিনি—তুমি আবার সেনাপতি?

ঠাকুরদা। আপনি আমাকে ঠিক চিনেছেন। আমার মতো অক্ষম কে আছে?

তবু আমাকেই আজ তিনি সেনাপতির বেশ পরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন—বড়ো বড়ো বীরদের ঘরে বসিয়ে রেখেছেন।

কাঞ্চী। আচ্ছা, উপযুক্ত সমারোহে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব—কিন্তু উপস্থিত একটা কাজ আছে সেটা শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে।

ঠাকুরদা। যখন তিনি আহ্বান করেন তখন তিনি আর অপেক্ষা করেন না।

কোশল। আমি তাঁর আহ্বান স্বীকার করছি। এখনই যাব।

বিদর্ভ। কাঞ্চীরাজ, অপেক্ষা করার কথাটা ভালো ঠেকছে না। আমি চললুম।

কলিঙ্গ। আপনি প্রবীণ আমরা আপনারই অনুসরণ করব।

পাঞ্চাল। ওহে কাঞ্চীরাজ, পিছনে চেয়ে দেখো তোমার রাজছত্র ধুলায় লুটোচ্ছে; তোমার ছত্রধর কখন পালিয়েছে জানতেও পার নি।

কাঞ্চী। আচ্ছা আমিও যাচ্ছি, রাজদূত—কিন্তু সভায় নয়, রণক্ষেত্রে।

ঠাকুরদা। রণক্ষেত্রেই আমার প্রভুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে, সে-ও অতি উত্তম প্রশস্ত স্থান।

বিরাট। ওহে, আমরা সকলে হয়তো কাল্পনিক ভয়ে ভঙ্গ দিচ্ছি—শেষকালে দেখছি একা কাঞ্চীরাজেরই জিত হবে।

পাঞ্চাল। তা হতে পারে। ফলটা প্রায় হাতের কাছে এসেছে এখন ভীরুতা করে সেটা ফেলে যাওয়া ভালো হচ্ছে না।

কলিঙ্গ। কাঞ্চীর সঙ্গে যোগ দেওয়াই শ্রেয়। ও যখন এতটা সাহস করছে তখন ও কি কিছু বিবেচনা না করেই করছে?

১৬

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল। এখন আমার রাজা আসবেন কখন?

সুরঙ্গমা। তা তো বলতে পারি নে—পথ চেয়ে বসে আছি।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, বুকের ভিতরটাতে আনন্দে এমন কাঁপছে যে বেদনা বোধ হচ্ছে। লজ্জাতেও মরে যাচ্ছি—মুখ দেখাব কেমন করে?

সুরঙ্গমা। এবার একেবারে হার মেনে তাঁর কাছে যাও তাহলে আর লজ্জা থাকবে না।

সুদর্শনা। স্বীকার তো করতেই হবে চিরদিনের মতো আমার হার হয়ে গেছে—কিন্তু এতদিন গর্ব করে তাঁর কাছে সকলের চেয়ে বেশি আদরের দাবি করে এসেছি কি না, সেটা একেবারে ছেড়ে দিতে পারছি নে। সবাই যে বলত আমার অনেক রূপ, অনেক গুণ, সবাই যে বলত আমার উপরে রাজার অনুগ্রহের অন্ত নেই—সেইজন্যেই তো সকলের সামনে আমার হৃদয় নত হতে এত লজ্জা বোধ করছে।

সুরঙ্গমা। অভিমান না ঘুচলে তো লজ্জাও ঘুচবে না।

সুদর্শনা। তাঁর কাছ থেকে আদর পাবার ইচ্ছা যে কিছুতে মন থেকে ঘুচতে চায় না।

সুরঙ্গমা। সব ঘুচবে রানীমা। কেবল একটি ইচ্ছা থাকবে, নিজেকে নিবেদন করবার ইচ্ছা।

সুদর্শনা। সেই আঁধার ঘরের ইচ্ছা—দেখা নয়, শোনা নয়, চাওয়া নয়, কেবল গভীরের মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া! সুরঙ্গমা, সেই আশীর্বাদ কর যেন—

সুরঙ্গমা। কী বল তুমি। আমি আশীর্বাদ করব কিসের?

সুদর্শনা। সকলের কাছে নত হয়ে আমি আশীর্বাদ নেব। সবাই বলত এত প্রসাদ রাজা আর কাউকে দেন নি। তাই শুনে হৃদয় এত শক্ত হয়েছে যে আমার রাজাকেও আঘাত করতে পেরেছি। এত শক্ত হয়েছে যে নুইতে লজ্জা করছে। এ লজ্জা কাটাতে হবে—সমস্ত পৃথিবীর কাছে নিচু হবার দিন আমার এসেছে। কিন্তু, কই রাজা এখনও কেন আমাকে নিতে আসছেন না? আরও কিসের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন?

সুরঙ্গমা। আমি তো বলেছি আমার রাজা নিষ্ঠুর—বড়ো নিষ্ঠুর।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা তুই যা, একবার তাঁর খবর নিয়ে আয় গে।

সুরঙ্গমা। কোথায় তাঁর খবর নেব তা তো কিছুই জানি নে। ঠাকুরদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি—তিনি এলে হয়তো তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া যাবে।

ঠাকুরদার প্রবেশ

সুদর্শনা। শুনেছি তুমি আমার রাজার বন্ধু—আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমাকে আশীর্বাদ করো।

ঠাকুরদা। কর কী কর কী রানী! আমি কারও প্রণাম গ্রহণ করি নে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।

সুদর্শনা। তোমার সেই হাসি দেখিয়ে দাও—আমাকে সুসংবাদ দিয়ে যাও। বলো আমার রাজা কখন আমাকে নিতে আসবেন?

ঠাকুরদা। ওই তো বড়ো শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করলে। আমার বন্ধুর ভাবগতিক কিছুই বুঝি নে তার আর বলব কী। যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল তিনি যে কোথায় তার সন্ধান নেই।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন?

ঠাকুরদা। সাড়া শব্দ তো কিছুই পাই নে।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন? তোমার বন্ধু এমনি বন্ধু!

ঠাকুরদা। সেইজন্যে লোকে তাকে নিন্দেও করে সন্দেহও করে। কিন্তু আমার রাজা তাতে খেয়ালও করে না।

সুদর্শনা। চলে গেলেন? ওরে, ওরে, কী কঠিন, কী কঠিন। একেবারে পাথর, একেবারে বজ্র। সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলছি—বুক ফেটে গেল—কিন্তু নড়ল না। ঠাকুরদা, এমন বন্ধুকে নিয়ে তোমার চলে কী করে?

ঠাকুরদা। চিনে নিয়েছি যে—সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি—এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।

সুদর্শনা। আমাকেও সে কি চিনতে দেবে না?

ঠাকুরদা। দেবে বই কি—নইলে এত দুঃখ দিচ্ছে কেন? ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে, সে তো সহজ লোক নয়।

সুদর্শনা। আচ্ছা আচ্ছা দেখব তার কতবড়ো নিষ্ঠুরতা। এই জানালার কাছে আমি চুপ করে পড়ে থাকব—এক পা নড়ব না—দেখি সে কেমন না আসে।

ঠাকুরদা। দিদি তোমার বয়স অল্প—জেদ করে অনেক দিন পড়ে থাকতে পার—কিন্তু আমার যে এক মুহূর্ত গেলেও লোকসান বোধ হয়। পাই না-পাই একবার খুঁজতে বেরোব। [প্রস্থান

সুদর্শনা। চাই নে তাকে চাই নে। সুরঙ্গমা, তোর রাজাকে আমি চাই নে। কিসের জন্যে সে যুদ্ধ করতে এল? আমার জন্যে একেবারেই না? কেবল বীরত্ব দেখাবার জন্যে?

সুরঙ্গমা। দেখাবার ইচ্ছে তাঁর যদি থাকত তাহলে এমন করে দেখাতেন কারও আর সন্দেহ থাকত না। দেখালেন আর কই?

সুদর্শনা। যা যা চলে যা—তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্ছে। এত নত করলে তবু সাধ মিটল না? বিশ্বসুদ্ধ লোকের সামনে আমাকে এইখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে গেল?

১৭

নাগরিকদল

প্রথম। ওহে এতগুলো রাজা একত্র হয়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে, ভাবলুম খুব তামাশা হবে—কিন্তু দেখতে দেখতে কী যে হয়ে গেল ভালো বোঝাই গেল না।

দ্বিতীয়। দেখলে না, ওদের নিজেদের মধ্যেই গোলমাল বেধে গেল—কেউ যে কাউকে বিশ্বাস করে না।

তৃতীয়। পরামর্শ ঠিক রইল না যে। কেউ এগোতে চায় কেউ পিছোতে চায়—কেউ এদিকে যায় কেউ ওদিকে যায়, একে কি আর যুদ্ধ বলে?

প্রথম। ওরা তো লড়াইয়ের দিকে চোখ রাখে নি—ওরা পরস্পরের দিকেই চোখ রেখেছিল।

দ্বিতীয়। কেবলই ভাবছিল লড়াই করে মরব আমি আর তার ফল ভোগ করবে আর কেউ।

তৃতীয়। কিন্তু লড়েছিল কাঞ্চীরাজ সে-কথা বলতেই হবে।

প্রথম। সে যে হেরেও হারতে চায় না।

দ্বিতীয়। শেষকালে অস্ত্রটা একেবারে তার বুকে এসে লাগল।

তৃতীয়। তার আগে সে যে পদে পদেই হারছিল তা যেন টেরও পাচ্ছিল না।

প্রথম। অন্য রাজারা তো তাকে ফেলে কে কোথায় পালাল তার ঠিক নেই।

দ্বিতীয়। কিন্তু শুনেছি কাঞ্চীরাজ মরে নি।

তৃতীয়। না, চিকিৎসায় বেঁচে গেল কিন্তু তার বুকের মধ্যে যে হারের চিহ্নটা আঁকা রইল সে তো আর এজন্মে মুছবে না।

প্রথম। রাজারা কেউ পালিয়ে রক্ষা পায় নি—সবাই ধরা পড়েছে। কিন্তু বিচারটা কী রকম হল?

দ্বিতীয়। আমি শুনেছি সকল রাজারই দণ্ড হয়েছে কেবল কাঞ্চীর রাজাকে বিচার-কর্তা নিজের সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়ে স্বহস্তে তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয়। এটা কিন্তু একেবারেই বোঝা গেল না।

দ্বিতীয়। বিচারটা যেন কেমন বেখাপ রকম শোনাচ্ছে।

প্রথম। তা তো বটেই। অপরাধ যা-কিছু করেছে সে তো ওই কাঞ্চীর রাজা। এরা তো একবার লোভে একবার ভয়ে কেবল এগোচ্ছিল আর পিছোচ্ছিল।

তৃতীয়। এ কেমন হল। যেন বাঘটা গেল বেঁচে আর তার লেজটা গেল কাটা।

দ্বিতীয়। আমি যদি বিচারক হতুম তাহলে কাঞ্চীকে কি আর আস্ত রাখতুম? ওর আর চিহ্ন দেখাই যেত না।

তৃতীয়। কী জানি ভাই মস্ত মস্ত বিচারকর্তা—ওদের বুদ্ধি একরকমের।

প্রথম। ওদের বুদ্ধি বলে কিছু আছে কি। ওদের সবই মর্জি। কেউ তো বলবার লোক নেই।

দ্বিতীয়। যা বলিস ভাই, আমাদের হাতে শাসনের ভার যদি পড়ত তাহলে এর চেয়ে ঢের ভালো করে চালাতে পারতুম।

তৃতীয়। সে কি একবার করে বলতে?

১৮

পথ

ঠাকুরদা ও কাঞ্চীরাজ

ঠাকুরদা। এ কী কাঞ্চীরাজ তুমি পথে যে।

কাঞ্চী। তোমার রাজা আমায় পথেই বের করেছে।

ঠাকুরদা। ওই তো তার স্বভাব।

কাঞ্চী। তার পরে আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুরদা। সেও তার এক কৌতুক।

কাঞ্চী। কিন্তু আমাকে এমন করে আর কতদিন এড়াবে? যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে, আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি তার আর দেখাই নেই।

ঠাকুরদা। তা হ'ক সে যত বড়ো রাজাই হ'ক হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে। কিন্তু রাজন্, রাত্রে বেরিয়েছ যে।

কাঞ্চী। ওই লজ্জাটুকু এখনও ছাড়তে পারি নি। কাঞ্চীর রাজা থালায় মুকুট সাজিয়ে তোমার রাজার মন্দির খুঁজে বেড়াচ্ছে এই যদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তাহলে যে তারা হাসবে।

ঠাকুরদা। লোকের ওই দশা বটে। যা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায় তাই দেখেই বাঁদররা হাসে।

কাঞ্চী। কিন্তু ঠাকুরদা, তোমার এ কী কাণ্ড! সেই উৎসবের ছেলেদের এখানেও জুটিয়ে এনেছ? কিন্তু সেখানে যারা তোমার পিছে পিছে ঘুরত তাদের দেখছি নে বড়ো।

ঠাকুরদা। আমার শম্ভু-সুধনের দল? তারা এবার লড়াইয়ে মরেছে।

কাঞ্চী। মরেছে?

ঠাকুরদা। হাঁ, তারা আমাকে বললে, ঠাকুরদা, পণ্ডিতরা যা বলে আমরা কিছুই বুঝতে পারি নে, তুমি যে গান গাও তার সঙ্গেও গলা মেলাতে পারি নে, কিন্তু একটা কাজ আমরা করতে পারি, আমরা মরতে পারি—আমাদের যুদ্ধে নিয়ে যাও, জীবনটা সার্থক করে আসি। তা যেমন কথা তেমন কাজ। সকলের আগে গিয়ে তারা দাঁড়াল, সকলের আগেই তারা প্রাণ দিয়ে বসে আছে।

কাঞ্চী। সিধে রাস্তা ধরে সব বুদ্ধিমানদের চেয়ে এগিয়ে গেল আর কি, এখন এই ছেলের দল নিয়ে কী বাল্যলীলাটা চলছে?

ঠাকুরদা। এবারকার বসন্ত-উৎসবটা নানাক্ষেত্রে নানারকম হয়ে গেল, তাই সকল পালার মধ্যে দিয়ে এদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। সেদিন বাগানের মধ্যে দিয়ে দিব্যি লাল হয়ে উঠেছিল—রণক্ষেত্রেও মন্দ জমে নি। সে তো চুকল, আজ আবার আমাদের বড়ো রাস্তার বড়োদিন। আজ ঘরের মানুষদের পথে বের করবার জন্যে দক্ষিণ হাওয়ার মতো দলবল নিয়ে বেরিয়েছি। ধর তো রে ভাই; তোদের সেই দরজায় ঘা দেবার গানটা ধর।

গান

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুন্ঠিত কুন্ঠিত জীবনে,
ক'রো না বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়-দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,
এই সংগীত-মুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।

অতি নিবিড় বেদনা বনমাঝে রে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে।
মোর পরানে দখিন বায়ু লাগিছে
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে,
এই সৌরভবিহ্বলা রজনী
কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে?
ওগো সুন্দর বল্লভ-কান্ত,
তব গম্ভীর আহ্বান কারে।

১৯

পথ

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। বেঁচেছি, বেঁচেছি সুরঙ্গমা। হার মেনে তবে বেঁচেছি। ওরে বাস রে। কী কঠিন অভিমান। কিছুতেই গলতে চায় না। আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে—আমিই তাঁর কাছে যাব এই কথাটা কোনোমতেই মনকে বলাতে পারছিলুম না। সমস্ত রাতটা সেই জানালায় পড়ে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদেছি—দক্ষিনে হাওয়া বুকের বেদনার মত হুহু করে বয়েছে, আর কৃষ্ণচতুর্দশীর অন্ধকারে বউকথাকও চার পহর রাত কেবলই ডেকেছে—সে যেন অন্ধকারের কান্না।

সুরঙ্গমা। আহা কালকের রাতটা মনে হয়েছিল যেন কিছুতেই আর পোহাতে চায় না।

সুদর্শনা। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবি নে তারই মধ্যে বার বার আমার মনে হচ্ছিল কোথায় তার বীণা বাজছিল। যে নিষ্ঠুর, তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির সুর বাজে। বাইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল—কিন্তু গোপন রাত্রের সেই সুরটা কেবল আমার হৃদয় ছাড়া আর তো কেউ শুনল না। সে-বীণা তুই কি শুনেছিলি সুরঙ্গমা? না, সে আমার স্বপ্ন?

সুরঙ্গমা। সেই বীণা শুনব বলেই তো তোমার কাছে কাছে আছি। অভিমান-গলানো সুর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়ে ছিলুম।

সুদর্শনা। তার পণটাই রইল—পথে বের করলে তবে ছাড়লে। মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করি নি। বলব চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি—কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ-গর্ব আমি ছাড়ব না।

সুরঙ্গমা। কিন্তু সে-গর্বও তোমার টিঁকবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল নইলে তোমাকে বের করে কার সাধ্য।

সুদর্শনা। তা হয়তো এসেছিল—আভাস পেয়েছিলুম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি। যতক্ষণ অভিমান করে বসেছিলুম ততক্ষণ মনে হয়েছিল সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে—অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম তখনই মনে হল সেও বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া শুরু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই। তার জন্যে এত যে দুঃখ এই দুঃখই আমাকে তার সঙ্গে দিচ্ছে— এত কষ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন সুরে সুরে বেজে উঠছে—এ যেন আমার বীণা, আমার দুঃখের বীণা—এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে এই শুকনো ধুলোয় আপনি বেরিয়ে এসেছেন—আমার হাত ধরেছেন—সেই আমার অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন—হঠাৎ চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত—এও সেইরকম। কে বললে, তিনি নেই? সুরঙ্গমা তুই কি বুঝতে পারছিস নে তিনি লুকিয়ে এসেছেন?

সুরঙ্গমার গান

অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে।
কখন তুমি এলে, হে নাথ, মৃদু-চরণপাতে?
ভেবেছিলেম জীবনস্বামী,
তোমায় বুঝি হারাই আমি,
আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে।
যে নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো,
তারই মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জ্বালো।
তোমার পথে চলা যখন
ঘুচে গেল, দেখি তখন
আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চল সাথে॥

সুদর্শনা। ও কে ও! চেয়ে দেখ্ সুরঙ্গমা, এত রাত্রে এই আঁধার পথে আরও একজন পথিক বেরিয়েছে যে।

সুরঙ্গমা। মা, এ যে কাঞ্চীর রাজা দেখছি।

সুদর্শনা। কাঞ্চীর রাজা?

সুরঙ্গমা। ভয় ক'রো না মা।

সুদর্শনা। ভয়। ভয় কেন করব? ভয়ের দিন আমার আর নেই।

কাঞ্চীরাজ (প্রবেশ করিয়া)। মা, তুমিও চলেছ বুঝি। আমিও এই এক পথেরই পথিক। আমাকে কিছুমাত্র ভয় ক'রো না।

সুদর্শনা। ভালোই হয়েছে কাঞ্চীরাজ—আমরা দুজনে তাঁর কাছে পাশাপাশি চলেছি এ ঠিক হয়েছে। ঘর ছেড়ে বেরোবার মুখেই তোমার সঙ্গে আমার যোগ হয়েছিল—আজ ঘরে ফেরবার পথে সেই যোগই যে এমন শুভযোগ হয়ে উঠবে তা আগে কে মনে করতে পারত।

কাঞ্চী। কিন্তু, মা, তুমি যে হেঁটে চলেছ এ তো তোমাকে শোভা পায় না। যদি অনুমতি কর তাহলে এখনই রথ আনিয়ে দিতে পারি।

সুদর্শনা। না না, অমন কথা ব'লো না—যে-পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে এসেছি সেই পথের সমস্ত ধুলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

সুরঙ্গমা। মহারাজ, তুমিও তো আজ ধুলোয়। এ-পথে তো হাতিঘোড়া রথ কারও দেখি নি।

সুদর্শনা। যখন রানী ছিলুম তখন কেবল সোনারুপোর মধ্যেই পা ফেলেছি—আজ তাঁর ধুলোর মধ্যে চলে আমার সেই ভাগ্যদোষ খণ্ডিয়ে নেব। আজ আমার সেই ধুলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধুলোমাটিতে মিলন হচ্ছে এ সুখের খবর কে জানত।

সুরঙ্গমা। রানীমা, ওই দেখো, পূর্বদিকে চেয়ে দেখো ভোর হয়ে আসছে। আর দেরি নেই মা—তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা যাচ্ছে।

গান

ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান।
শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরি গান।

ধন্য হলি ওরে পান্থ,
রজনী-জাগরক্লান্ত,
ধন্য হল মরি মরি ধুলায় ধূসর প্রাণ।
বনের কোলের কাছে
সমীরণ জাগিয়াছে।
মধুভিক্ষু সারে সারে
আগত কুঞ্জের দ্বারে।
হল তব যাত্রা সারা,
মোছো মোছো অশ্রুধারা,
লজ্জাভয় গেল ঝরি ঘুচিল রে অভিমান॥

ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ভোর হল, দিদি, ভোর হল।

সুদর্শনা। তোমাদের আশীর্বাদে পৌঁছেছি, ঠাকুরদা, পৌঁছেছি।

ঠাকুরদা। কিন্তু আমাদের রাজার রকম দেখেছ? রথ নেই, বাদ্য নেই, সমারোহ নেই।

সুদর্শনা। বল কী, সমারোহ নেই? ওই যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ।

ঠাকুরদা। তা হ'ক, আমাদের রাজা যত নিষ্ঠুর হ'ক আমরা তো তেমন কঠিন হতে পারি নে—আমাদের যে ব্যথা লাগে। এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্ছ এ কি আমরা সহ্য করতে পারি? একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে তোমার রানীর বেশটা নিয়ে আসি।

সুদর্শনা। না না না। সে রানীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মতো ছাড়িয়েছেন—সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন—বেঁচেছি বেঁচেছি—আমি আজ তাঁর দাসী—যে-কেউ তাঁর আছে আমি আজ সকলের নিচে।

ঠাকুরদা। শত্রুপক্ষ তোমার এ দশা দেখে পরিহাস করবে সেইটে আমাদের অসহ্য হয়।

সুদর্শনা। শত্রুপক্ষের পরিহাস অক্ষয় হ'ক—তারা আমার গায়ে ধুলো দিক। আজকের দিনের অভিসারে সেই ধুলোই যে আমার অঙ্গরাগ।

ঠাকুরদা। এর উপরে আর কথা নেই। এখন আমাদের বসন্ত-উৎসবের শেষ খেলাটাই চলুক—ফুলের রেণু এখন থাক, দক্ষিনে হাওয়ায় এবার ধুলো উড়িয়ে দিক। সকলে মিলে আজ ধূসর হয়ে প্রভুর কাছে যাব। গিয়ে দেখব তার গায়েও ধুলো মাখা। তাকে বুঝি কেউ ছাড়ে মনে করছ? যে পায় তার গায়ে মুঠো মুঠো ধুলো দেয় যে—সে-ধুলো সে ঝেড়েও ফেলে না।

কাঞ্চী। ঠাকুরদা, তোমাদের এই ধুলোর খেলায় আমাকেও ভুলো না। আমার এই রাজবেশটাকে এমনি মাটি করে নিয়ে যেতে হবে যাতে একে আর চেনা না যায়।

ঠাকুরদা। সে আর দেরি হবে না ভাই। যেখানে নেবে এসেছ এখানে যত তোমার মিথ্যে মান সব ঘুচে গেছে—এখন দেখতে দেখতে রং ফিরে যাবে।—আর এই আমাদের রানীকে দেখো—ও নিজের উপর ভারি রাগ করেছিল—মনে করেছিল গয়না ফেলে দিয়ে নিজের ভুবনমোহন রূপকে লাঞ্ছনা দেবে—কিন্তু সে-রূপ অপমানের আঘাতে আরও ফুটে পড়েছে—সে যেন কোথাও আর কিছু ঢাকা নেই। আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই তাই তো এই বিচিত্র রূপ সে এত ভালোবাসে, এই রূপই তো তার বক্ষের অলংকার। সেই রূপ আপনার গর্বের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়েছে—আজ আমার রাজার ঘরে কী সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে তাই শোনবার জন্যে প্রাণটা ছটফট করছে।

সুরঙ্গমা। ওই যে সূর্য উঠল।

২০

অন্ধকার ঘর

সুরঙ্গমা। প্রভু, যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে-আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না; আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।

রাজা। আমাকে সইতে পারবে?

সুদর্শনা। পারব রাজা পারব। আমার প্রমোদবনে আমার রানীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম—সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে—তুমি সুন্দর নও প্রভু সুন্দর নও, তুমি অনুপম।

রাজা। তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।

সুদর্শনা। যদি থাকে তো সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও— সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।

রাজা। আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম--এখানকার লীলা শেষ হল! এস, এবার আমার সঙ্গে এস, বাইরে চলে এস—আলোয়।

সুদর্শনা। যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে আমার নিষ্ঠুরকে আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।

উপন্যাস ও গল্প

শেষের কবিতা

শেষের কবিতা

১

অমিত-চরিত

অমিত রায় ব্যারিস্টার। ইংরেজি ছাঁদে রায় পদবী "রয়" ও "রে" রূপান্তর যখন ধারণ করলে তখন তার শ্রী গেল ঘুচে কিন্তু সংখ্যা হল বৃদ্ধি। এই কারণে, নামের অসামান্যতা কামনা করে অমিত এমন একটি বানান বানালে, যাতে ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুনীদের মুখে তার উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেল— অমিট রায়ে।

অমিতর বাপ ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী ব্যারিস্টার। যে-পরিমাণ টাকা তিনি জমিয়ে গেছেন সেটা অধস্তন তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাতেও অমিত বিনা বিপত্তিতে এ-যাত্রা টিঁকে গেল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এর কোঠায় পা দেবার পূর্বেই অমিত অক্সফোর্ডে ভরতি হয়; সেখানে পরীক্ষা দিতে দিতে এবং না দিতে দিতে ওর সাত বছর গেল কেটে। বুদ্ধি বেশি থাকাতে পড়াশুনো বেশি করে নি, অথচ বিদ্যেতে কমতি আছে বলে ঠাহর হয় না। ওর বাপ ওর কাছ থেকে অসাধারণ কিছু প্রত্যাশা করেন নি। তাঁর ইচ্ছে ছিল তাঁর একমাত্র ছেলের মনে অক্সফোর্ডের রং এমন পাকা করে ধরে যাতে দেশে এসেও ধোপ সয়।

অমিতকে আমি পছন্দ করি। খাসা ছেলে। আমি নবীন লেখক, সংখ্যায় আমার পাঠক স্বল্প, যোগ্যতায় তাদের সকলের সেরা অমিত। আমার লেখার ঠাট-ঠমকটা ওর চোখে খুব লেগেছে। ওর বিশ্বাস, আমাদের দেশের সাহিত্য-বাজারে যাদের নাম আছে তাদের স্টাইল নেই। জীবসৃষ্টিতে উট জন্তুটা যেমন, এই লেখকদের রচনাও তেমনি, ঘাড়ে-গর্দানে, সামনে-পিছনে পিঠে-পেটে বেখাপ, চালটা ঢিলে নড়বড়ে, বাংলা-সাহিত্যের মতো ন্যাড়া ফ্যাকাশে মরুভূমিতেই তার চলন।—সমালোচকদের কাছে সময় থাকতে বলে রাখা ভালো, মতটা আমার নয়।

অমিত বলে, ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী। ওর মতে, যারা সাহিত্যের ওমরাও দলের, যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা দলের, দশের মন রাখা যাদের ব্যবসা, ফ্যাশান তাদেরই। বঙ্কিমি স্টাইল

বঙ্কিমের লেখা 'বিষবৃক্ষে,' বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন,—বঙ্কিমি ফ্যাশান নসিরামের লেখা "মনোমোহনের মোহনবাগানে," নসিরাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েছে মাটি করে। বারোয়ারি তাঁবুর কানাতের নিচে ব্যবসাদার নাচওআলীর দর্শন মেলে, কিন্তু শুভদৃষ্টিকালে বধূর মুখ দেখবার বেলায় বেনারসি ওড়নার ঘোমটা চাই। কানাত হল ফ্যাশানের, আর বেনারসি হল স্টাইলের, বিশেষের মুখ বিশেষ রঙের ছায়ায় দেখবার জন্যে। অমিত বলে, হাটের লোকের পায়ে-চলা রাস্তার বাইরে আমাদের পা সরতে ভরসা পায় না বলেই আমাদের দেশে স্টাইলের এত অনাদর। দক্ষযজ্ঞের গল্পে এই কথাটির পৌরাণিক ব্যাখ্যা মেলে। ইন্দ্রচন্দ্রবরুণ একেবারে স্বর্গের ফ্যাশান-দুরস্ত দেবতা, যাজ্ঞিকমহলে তাঁদের নিমন্ত্রণও জুটত। শিবের ছিল স্টাইল, এত ওরিজিন্যাল যে, মন্ত্রপড়া যজমানেরা তাঁকে হব্যকব্য দেওয়াটা বে-দস্তুর বলে জানত। অক্সফোর্ডের বি এ র মুখে এ-সব কথা শুনতে আমার ভালো লাগে। কেননা, আমার বিশ্বাস, আমার লেখায় স্টাইল আছে—সেইজন্যেই আমার সকল বইয়েরই এক সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি, তারা "ন পুনরাবর্তন্তে।"

আমার শ্যালক নবকৃষ্ণ অমিতর এ-সব কথা একেবারে সইতে পারত না—বলত, "রেখে দাও তোমার অক্সফোর্ডের পাস।" সে ছিল ইংরেজি সাহিত্যে রোমহর্ষক এম এ; তাকে পড়তে হয়েছে বিস্তর, বুঝতে হয়েছে অল্প। সেদিন সে আমাকে বললে, "অমিত কেবলই ছোটো লেখককে বড়ো করে, বড়ো লেখককে খাটো করবার জন্যেই। অবজ্ঞার ঢাক পিটোবার কাজে তার শখ, তোমাকে সে করেছে তার ঢাকের কাঠি।" দুঃখের বিষয়, এই আলোচনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন আমার স্ত্রী, স্বয়ং ওর সহোদরা। কিন্তু পরম সন্তোষের বিষয় এই যে, আমার শ্যালকের কথা তাঁর একটুও ভালো লাগে নি। দেখলুম, অমিতর সঙ্গেই তাঁর রুচির মিল, অথচ পড়াশুনো বেশি করেন নি। স্ত্রীলোকের আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি।

অনেক সময় আমার মনেও খটকা লাগে যখন দেখি, কত কত নামজাদা ইংরেজ লেখকদেরকেও নগণ্য করতে অমিতর বুক দমে না। তারা হল, যাদের বলা যেতে পারে, বহুবাজারে চলতি লেখক, বড়োবাজারের ছাপমারা; প্রশংসা করবার জন্যে যাদের লেখা পড়ে দেখবার দরকারই হয় না, চোখ বুজে গুণগান করলেই পাসমার্ক পাওয়া যায়। অমিতর পক্ষেও এদের লেখা পড়ে দেখা অনাবশ্যক, চোখ বুজে নিন্দে করতে ওর বাধে না। আসলে, যারা নামজাদা তারা ওর কাছে বড়ো বেশি সরকারি, বর্ধমানের ওয়েটিংরুমের মতো; আর যাদেরকে ও নিজে আবিষ্কার করেছে তাদের উপর ওর খাসদখল, যেন স্পেশাল ট্রেনের সেলুন কামরা।

অমিতর নেশাই হল স্টাইলে। কেবল সাহিত্য-বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে,—পাঁচজনের মধ্যে ও যে-কোনো একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম। অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়িগোঁফ-কামানো চাঁচা-মাজা চিকন শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্তিভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না; মনটা এমন একরকমের চকমকি যে, ঠুন করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে। দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা পরে না। ধুতি সাদা থানের, যত্নে কোঁচানো, কেননা ওর বয়সে এ-রকম ধুতি চলতি নয়। পাঞ্জাবি পরে, তার বাঁ কাঁধ থেকে বোতাম ডান-দিকের কোমর অবধি, আস্তিনের সামনের দিকটা কনুই পর্যন্ত দু-ভাগ করা; কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জরি-দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে, তারই বাঁ দিকে ঝুলছে বৃন্দাবনী ছিটের এক ছোটো থলি, তার মধ্যে ওর ট্যাঁকঘড়ি; পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ-করা কটকি জুতো। বাইরে যখন যায়, একটা পাট-করা পাড়ওআলা মাদ্রাজি চাদর বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুলতে থাকে, বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানি লক্ষ্ণৌ টুপি, সাদার উপর সাদা কাজ-করা। একে ঠিক সাজ বলব না, এ হচ্ছে ওর একরকমের উচ্চ হাসি। ওর বিলিতি সাজের মর্ম আমি বুঝি নে, যারা বোঝে তারা বলে—কিছু আলুথালু গোছের বটে, কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে ডিসটিঙ্গুইশড। নিজেকে অপরূপ করবার শখ ওর নেই, কিন্তু ফ্যাশানকে বিদ্রূপ করবার কৌতুক ওর অপর্যাপ্ত। কোনোমতে বয়স মিলিয়ে যারা কুষ্ঠির প্রমাণে যুবক তাদের দর্শন মেলে পথে ঘাটে; অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জলা যৌবনের জোরেই, একেবারে বেহিসেবি, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে, সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে না।

এদিকে ওর দুই বোন, যাদের ডাকনাম সিসি এবং লিসি, যেন নতুনবাজারে অত্যন্ত হালের আমদানি,—ফ্যাশানের পসরায় আপাদমস্তক যত্নে মোড়ক-করা পয়লা নম্বরের প্যাকেট বিশেষ। উঁচুখুরওআলা জুতো, লেসওআলা বুককাটা জ্যাকেটের ফাঁকে প্রবালে অ্যাম্বারে মেশানো মালা, শাড়িটা গায়ে তির্যগ্‌ভঙ্গীতে আঁট করে ল্যাপটানো। এরা খুটখুট করে দ্রুত লয়ে চলে; উচ্চৈঃস্বরে বলে; স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি; মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষে চায়, জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি; গোলাপি রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর্ ফুর্ করে সঞ্চালন করে, এবং পুরুষবন্ধুর চৌকির হাতার উপরে বসে সেই পাখার আঘাতে তাদের কৃত্রিম স্পর্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জন প্রকাশ করে থাকে।

আপন দলের মেয়েদের সঙ্গে অমিতর ব্যবহার দেখে তার দলের পুরুষদের মনে ঈর্ষার উদয় হয়। নির্বিশেষ ভাবে মেয়েদের প্রতি অমিতর ঔদাসীন্য নেই, বিশেষ ভাবে কারও প্রতি আসক্তিও দেখা যায় না, অথচ সাধারণভাবে কোনোখানে মধুর রসেরও অভাব ঘটে না। এক কথায় বলতে গেলে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর আগ্রহ নেই, উৎসাহ আছে। অমিত পার্টিতেও যায়, তাসও খেলে ইচ্ছে করেই বাজিতে হারে, যে-রমণীর গলা বেসুরো তাকে দ্বিতীয়বার গাইতে পীড়াপীড়ি করে, কাউকে বদ-রঙের কাপড় পরতে দেখলে জিজ্ঞাসা করে কাপড়টা কোন্ দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। যে-কোনো আলাপিতার সঙ্গেই কথা ব'লে বিশেষ পক্ষপাতের সুর লাগায়; অথচ সবাই জানে ওর পক্ষপাতটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যে-মানুষ অনেক দেবতার পূজারি, আড়ালে সব দেবতাকেই সে সব দেবতার চেয়ে বড়ো বলে স্তব করে, দেবতাদের বুঝতে বাকি থাকে না, অথচ খুশিও হন। কন্যার মাতাদের আশা কিছুতেই কমে না, কিন্তু কন্যারা বুঝে নিয়েছে, অমিত সোনার রঙের দিগন্তরেখা, ধরা দিয়েই আছে তবু কিছুতেই ধরা দেবে না। মেয়েদের সম্বন্ধে ওর মন তর্কই করে, মীমাংসায় আসে না। সেইজন্যেই গম্যবিহীন আলাপের পথে ওর এত দুঃসাহস। তাই অতি সহজেই সকলের সঙ্গে ও ভাব করতে পারে,—নিকটে দাহ্যবস্তু থাকলেও ওর তরফে আগ্নেয়তা নিরাপদে সুরক্ষিত।

সেদিন পিকনিকে গঙ্গার ধারে যখন ওপারের ঘন কালো পুঞ্জীভূত স্তব্ধতার উপরে চাঁদ উঠল ওর পাশে ছিল লিলি গাঙ্গুলি। তাকে ও মৃদুস্বরে বললে, "গঙ্গার ওপারে ওই নতুন চাঁদ, আর এপারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্তকালের মধ্যে কোনোদিনই আর হবে না।"

প্রথমটা লিলি গাঙ্গুলির মন এক মুহূর্তে ছলছলিয়ে উঠেছিল,—কিন্তু সে জানত এ-কথাটায় যতখানি সত্য সে কেবল ওই বলার কায়দাটুকুর মধ্যেই। তার বেশি দাবি করতে গেলে বুদ্‌বুদের উপরকার বর্ণচ্ছটাকে দাবি করা হয়। তাই নিজেকে ক্ষণকালের ঘোর-লাগা থেকে ঠেলা দিয়ে লিলি হেসে উঠল, বললে, "অমিট, তুমি যা বললে সেটা এত বেশি সত্য যে, না বললেও চলত। এইমাত্র যে-ব্যাঙটা টপ করে জলে লাফিয়ে পড়ল এটাও তো অনন্তকালের মধ্যে আর কোনোদিন ঘটবে না।"

অমিত হেসে উঠে বললে, "তফাত আছে, লিলি, একেবারে অসীম তফাত। আজকের সন্ধ্যাবেলায় ওই ব্যাঙের লাফানোটা একটা খাপছাড়া ছেঁড়া জিনিস। কিন্তু তোমাতে আমাতে চাঁদেতে, গঙ্গার ধারায়, আকাশের তারায়, একটা সম্পূর্ণ ঐকতানিক সৃষ্টি,—বেটোফেনের চন্দ্রালোক-গীতিকা। আমার মনে হয় যেন বিশ্বকর্মার কারখানায় একটা পাগলা স্বর্গীয় স্যাকরা আছে সে যেমনি একটি নিখুঁত সুগোল সোনার চক্রে

নীলার সঙ্গে হীরে এবং হীরের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এক প্রহরের আঙটি সম্পূর্ণ করলে অমনি দিলে সেটা সমুদ্রের জলে ফেলে, আর তাকে খুঁজে পাবে না কেউ।"

"ভালোই হল, তোমার ভাবনা রইল না, অমিট, বিশ্বকর্মার স্যাকরার বিল তোমাকে শুধতে হবে না।"

"কিন্তু, লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো-একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই জেলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপরূপ সোনার মুহূর্তটিকে আমাদের সামনে এনে ধরে, চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করব, তার পরে কী হবে ভেবে দেখো।"

লিলি অমিতকে পাখার বাড়ি তাড়না করে বললে, "তার পরে সোনার মুহূর্তটি অন্যমনে খসে পড়বে সমুদ্রের জলে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। পাগলা স্যাকরার গড়া এমন তোমার কত মুহূর্ত খসে পড়ে গেছে, ভুলে গেছ বলে তার হিসেব নেই।"

এই বলে লিলি তাড়াতাড়ি উঠে তার সখীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলে। অনেক ঘটনার মধ্যে এই একটা ঘটনার নমুনা দেওয়া গেল।

অমিতর বোন সিসি-লিসিরা ওকে বলে, "অমি, তুমি বিয়ে কর না কেন?"

অমিত বলে, "বিয়ে ব্যাপারটায় সকলের চেয়ে জরুরি হচ্ছে পাত্রী, তার নিচেই পাত্র।"

সিসি বলে, "অবাক করলে, মেয়ে এত আছে।"

অমিত বলে, "মেয়ে বিয়ে করত সেই পুরাকালে, লক্ষণ মিলিয়ে। আমি চাই পাত্রী, আপন পরিচয়েই যার পরিচয়, জগতে যে অদ্বিতীয়।"

সিসি বলে, "তোমার ঘরে এলেই তুমি হবে প্রথম, সে হবে দ্বিতীয়, তোমার পরিচয়েই হবে তার পরিচয়।"

অমিত বলে, "আমি মনে-মনে যে-মেয়ের ব্যর্থ প্রত্যাশায় ঘটকালি করি সে গরঠিকানা মেয়ে। প্রায়ই সে ঘর পর্যন্ত এসে পৌঁছোয় না। সে আকাশ থেকে পড়ন্ত তারা, হৃদয়ের বায়ুমণ্ডল ছুঁতে-না-ছুঁতেই জ্বলে ওঠে, বাতাসে যায় মিলিয়ে, বাস্তুঘরের মাটি পর্যন্ত আসা ঘটেই ওঠে না।"

সিসি বলে, "অর্থাৎ, সে তোমার বোনেদের মতো একটুও না।"

অমিত বলে, "অর্থাৎ সে ঘরে এসে কেবল ঘরের লোকেরই সংখ্যা বৃদ্ধি করে না।"

লিসি বলে, "আচ্ছা ভাই সিসি, বিমি বোস তো অমির জন্যে পথ চেয়ে তাকিয়ে আছে, ইশারা করলেই ছুটে এসে পড়ে, তাকে ওর পছন্দ নয় কেন? বলে,

তার কালচার নেই। কেন, ভাই, সে তো এম.এ.তে বটানিতে ফার্স্ট। বিদ্যেকেই তো বলে কালচার।"

অমিত বলে, "কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে-আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।"

লিসি রেগে উঠে বলে, "ইস, বিমি বোসের আদর নেই ওঁর কাছে! উনি নিজেই না কি তার যোগ্য! অমি যদি বিমি বোসকে বিয়ে করতে পাগল হয়েও ওঠে আমি তাকে সাবধান করে দেব সে যেন ওর দিকে ফিরেও না তাকায়।"

অমিত বললে, "পাগল না হলে বিমি বোসকে বিয়ে করতে চাইবই বা কেন? সে-সময়ে আমার বিয়ের কথা না ভেবে উপযুক্ত চিকিৎসার কথা ভেবো।"

আত্মীয়স্বজন অমিতর বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছে। তারা ঠিক করেছে, বিয়ের দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা ওর নেই, তাই ও কেবল অসম্ভবের স্বপ্ন দেখে আর উলটো কথা বলে মানুষকে চমক লাগিয়ে বেড়ায়। ওর মনটা আলেয়ার আলো, মাঠে বাটে ধাঁধা লাগাতেই আছে, ঘরের মধ্যে তাকে ধরে আনবার জো নেই।

ইতিমধ্যে অমিত যেখানে-সেখানে হো হো করে বেড়াচ্ছে,— ফিরপোর দোকানে যাকে-তাকে চা খাওয়াচ্ছে, যখন-তখন মোটরে চড়িয়ে বন্ধুদের অনাবশ্যক ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে; এখান-ওখান থেকে যা-তা কিনছে আর একে-ওকে বিলিয়ে দিচ্ছে, ইংরেজি বই সদ্য কিনে এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে ফেলে আসছে, আর ফিরিয়ে আনছে না।

ওর বোনেরা ওর যে-অভ্যাসটা নিয়ে ভারি বিরক্ত সে হচ্ছে ওর উলটো কথা বলা। সজ্জনসভায় যা-কিছু সর্বজনের অনুমোদিত ও তার বিপরীত কিছু একটা বলে বসবেই।

একদা কোন্ একজন রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ডিমোক্রাসির গুণ বর্ণনা করছিল, ও বলে উঠল "বিষ্ণু যখন সতীর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করলেন তখন দেশ জুড়ে যেখানে-সেখানে তাঁর এক-শর অধিক পীঠস্থান তৈরি হয়ে গেল। ডিমোক্রাসি আজ যেখানে-সেখানে যত টুকরো অ্যারিস্টক্রেসির পুজো বসিয়েছে,—খুদে খুদে অ্যারিস্টক্র্যাটে পৃথিবী ছেয়ে গেল, কেউ পলিটিক্সে, কেউ সাহিত্যে, কেউ সমাজে। তাদের কারও গাম্ভীর্য নেই, কেননা তাদের নিজের 'পরে বিশ্বাস নেই।"

একদা মেয়েদের 'পরে পুরুষের আধিপত্যের অত্যাচার নিয়ে কোনো সমাজহিতৈষী অবলাবান্ধব নিন্দা করছিল পুরুষদের। অমিত মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে ফস করে বললে, "পুরুষ আধিপত্য ছেড়ে দিলেই মেয়ে আধিপত্য শুরু করবে। দুর্বলের আধিপত্য অতি ভয়ংকর।"

সভাস্থ অবলা ও অবলাবান্ধবেরা চটে উঠে বললে, "মানে কী হল ?"

অমিত বললে, "যে-পক্ষের দখলে শিকল আছে সে শিকল দিয়েই পাখিকে বাঁধে, অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার সে বাঁধে আফিম খাইয়ে, অর্থাৎ মায়া দিয়ে। শিকলওআলা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না, আফিমওআলী বাঁধেও বটে ভোলায়ও। মেয়েদের কৌটো আফিমে ভরা, প্রকৃতি শয়তানী তার জোগান দেয়।"

একদিন ওদের বালিগঞ্জের এক সাহিত্যসভায় রবি ঠাকুরের কবিতা ছিল আলোচনার বিষয়। অমিতর জীবনে এই সে প্রথম সভাপতি হতে রাজি হয়েছিল; গিয়েছিল মনে-মনে যুদ্ধসাজ পরে। একজন সেকেলে গোছের অতি ভালোমানুষ ছিল বক্তা। রবি ঠাকুরের কবিতা যে কবিতাই এইটে প্রমাণ করাই তার উদ্দেশ্য। দুই-একজন কলেজের অধ্যাপক ছাড়া অধিকাংশ সভ্যই স্বীকার করলে, প্রমাণটা একরকম সন্তোষজনক।

সভাপতি উঠে বললে, "কবিমাত্রের উচিত পাঁচ বছর মেয়াদে কবিত্ব করা; পঁচিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত। এ-কথা বলব না যে, পরবর্তীদের কাছ থেকে আরও ভালো কিছু চাই, বলব অন্য কিছু চাই। ফজলি আম ফুরোলে বলব না, 'আনো ফজলিতর আম।' বলব, 'নতুনবাজার থেকে বড়ো দেখে আতা নিয়ে এস তো হে।' ডাব-নারকেলের মেয়াদ অল্প, সে রসের মেয়াদ, ঝুনো নারকেলের মেয়াদ বেশি, সে শাঁসের মেয়াদ। কবিরা হল ক্ষণজীবী, ফিলজফরের বয়সের গাছপাথর নেই।...রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায়-রকম বেঁচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে-থেকে ফরাশ পাঠায়, তবু লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও চৌকির হাতা আঁকড়িয়ে থাকে। ও যদি মানে মানে নিজেই সরে না পড়ে আমাদের কর্তব্য ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা। পরবর্তী যিনি আসবেন, তিনিও তাল ঠুকেই গর্জাতে গর্জাতে আসবেন যে, তাঁর রাজত্বের অবসান নেই। অমরাবতী বাঁধা থাকবে মর্ত্যে তাঁরই দরজায়। কিছুকাল ভক্তরা দেবে মালাচন্দন, খাওয়াবে পেট ভরিয়ে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে, তার পরে আসবে তাকে বলি দেবার পুণ্য দিন,—ভক্তিবন্ধন থেকে ভক্তদের পরিত্রাণের শুভলগ্ন। আফ্রিকায় চতুষ্পদ দেবতার পুজোর প্রণালী এইরকমই। দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদী চতুর্দশপদী দেবতাদের পুজোও এই নিয়মে। পূজা জিনিসটাকে একঘেয়ে করে তোলার মতো অপবিত্র অধার্মিকতা আর কিছু হতে পারে না।...ভালো-লাগার এভোল্যুশন আছে। পাঁচ বছর পূর্বেকার ভালো-লাগা পাঁচ বছর পরেও যদি একই জায়গায় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে বেচারা জানতে পারে নি যে, সে মরে গেছে। একটু ঠেলা

মারলেই তার নিজের কাছে প্রমাণ হবে যে, সেন্টিমেণ্টাল আত্মীয়েরা তার অন্ত্যেষ্টিসংকার করতে বিলম্ব করেছিল, বোধ করি উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে চিরকাল ফাঁকি দেবার মতলবে। রবি ঠাকুরের দলের এই অবৈধ ষড়যন্ত্র আমি পাব্লিকের কাছে প্রকাশ করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।"

আমাদের মণিভূষণ চশমার ঝলক লাগিয়ে প্রশ্ন করলে, "সাহিত্য থেকে লয়ালটি উঠিয়ে দিতে চান।"

"একেবারেই। এখন থেকে কবি-প্রেসিডেন্টের দ্রুত নিঃশেষিত যুগ। রবি ঠাকুর সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো— গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে। ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মক্‌শো-করা। নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে চাই কড়া লাইনের খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো, ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো, ন্যুর‍্যালজিয়ার ব্যথার মতো, খোঁচাওআলা, কোণওআলা, গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়, এমন কি, যদি চটকল, পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিলডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।... এখন থেকে ফেলে দাও মন ভোলাবার ছলাকলা ছন্দোবন্ধ, মন কেড়ে নিতে হবে, যেমন করে রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। মন যদি কাঁদতে কাঁদতে আপত্তি করতে করতে যায় তবুও তাকে যেতেই হবে—অতিবৃদ্ধ জটায়ুটা বারণ করতে আসবে, তাই করতে গিয়েই তার হবে মরণ। তার পরে কিছু দিন যেতেই কিষ্কিন্ধ্যা জেগে উঠবে, কোন্‌ হনুমান হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে লঙ্কায় আগুন লাগিয়ে মনটাকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবে। তখন আবার হবে টেনিসনের সঙ্গে পুনর্মিলন, বায়রনের গলা জড়িয়ে করব অশ্রুবর্ষণ, ডিকেন্‌সকে বলব, মাপ করো, মোহ থেকে আরোগ্য লাভের জন্যে তোমাকে গাল দিয়েছি।... মোগল বাদশাদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের যত মুগ্ধ মিস্ত্রি মিলে যদি যেখানে-সেখানে ভারত জুড়ে কেবলই গম্বুজওআলা পাথরের বুদ্‌বুদ বানিয়ে চলত তাহলে ভদ্রলোক মাত্রই যেদিন বিশ বছর বয়স পেরোত সেইদিনই বানপ্রস্থ নিতে দেরি করত না। তাজমহলকে ভালো-লাগাবার জন্যেই তাজমহলের নেশা ছুটিয়ে দেওয়া দরকার।"

(এইখানে বলে রাখা দরকার, কথার তোড় সামলাতে না পেরে সভার রিপোর্টারের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, সে যা রিপোর্ট লিখেছিল সেটা অমিতর বক্তৃতার চেয়েও অবোধ্য হয়ে উঠেছিল। তারই থেকে যে-কটা টুকরো উদ্ধার করতে পারলুম তাই আমরা উপরে সাজিয়ে দিয়েছি।)

তাজমহলের পুনরাবৃত্তির প্রসঙ্গে রবি ঠাকুরের ভক্ত আরক্তমুখে বলে উঠল, "ভালো জিনিস যতো বেশি হয় ততই ভালো।"

অমিত বললে, "ঠিক তার উলটো। বিধাতার রাজ্যে ভালো জিনিস অল্প হয় বলেই তা ভালো, নইলে সে নিজেরই ভিড়ের ঠেলায় হয়ে যেত মাঝারি।··· যে-সব কবি ষাট-সত্তর পর্যন্ত বাঁচতে একটুও লজ্জা করে না, তারা নিজেকে শাস্তি দেয় নিজেকে সস্তা করে দিয়ে। শেষকালটায় অনুকরণের দল চারিদিকে ব্যূহ বেঁধে তাদেরকে মুখ ভ্যাঙচাতে থাকে। তাদের লেখার চরিত্র বিগড়ে যায়, পূর্বের লেখা থেকে চুরি শুরু করে হয়ে পড়ে পূর্বের লেখার রিসীভর্স অফ স্টোল্‌ন প্রপার্টি। সে-স্থলে লোকহিতের খাতিরে পাঠকদের কর্তব্য হচ্ছে, কিছুতেই এই সব অতিপ্রবীণ কবিদের বাঁচতে না দেওয়া,—শারীরিক বাঁচার কথা বলছি নে, কাব্যিক বাঁচা। এদের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক প্রবীণ অধ্যাপক, প্রবীণ পোলিটিশন, প্রবীণ সমালোচক।"

সেদিনকার বক্তা বলে উঠল, "জানতে পারি কি, কাকে আপনি প্রেসিডেন্ট করতে চান? তার নাম করুন।"

অমিত ফস করে বললে, "নিবারণ চক্রবর্তী।"

সভার নানা চৌকি থেকে বিস্মিত রব উঠল—"নিবারণ চক্রবর্তী? সে লোকটা কে?"

"আজকের দিনে এই যে প্রশ্নের অঙ্কুর মাত্র, আগামী দিনে এর থেকে উত্তরের বনস্পতি জেগে উঠবে।"

"ইতিমধ্যে আমরা একটা নমুনা চাই।"

"তবে শুনুন।" বলে পকেট থেকে একটা সরু লম্বা ক্যাম্বিসে-বাঁধা খাতা বের করে তার থেকে পড়ে গেল

আনিলাম

অপরিচিতের নাম

ধরণীতে,

পরিচিত জনতার সরণীতে।

আমি আগন্তুক,

আমি জন-গণেশের প্রচণ্ড কৌতুক।

খোলো দ্বার,

বার্তা আনিয়াছি বিধাতার;

মহাকালেশ্বর
পাঠায়েছে দুর্লক্ষ্য অক্ষর,
বল্ দুঃসাহসী কে কে
মৃত্যু পণ রেখে
দিবি তার দুরূহ উত্তর।

শুনিবে না।
মূঢ়তার সেনা
করে পথরোধ।
ব্যর্থ ক্রোধ
হুংকারিয়া পড়ে বুকে :
তরঙ্গের নিষ্ফলতা
নিত্য যথা
মরে মাথা ঠুকে
শৈলতট 'পরে
আত্মঘাতী দম্ভভরে।

পুষ্পমাল্য নাহি মোর, রিক্ত বক্ষতল,
নাহি বর্ম অঙ্গদ কুণ্ডল।
শূন্য এ ললাটপট্টে লিখা
গূঢ় জয়টিকা।
ছিন্ন কন্থা দরিদ্রের বেশ।
করিব নিঃশেষ
তোমার ভাণ্ডার।
খোলো খোলো দ্বার।
অকস্মাৎ
বাড়ায়েছি হাত,
যা দিবার দাও অচিরাৎ!
বক্ষ তব কেঁপে উঠে, কম্পিত অর্গল,
পৃথ্বী টলমল।

ভয়ে আর্ত উঠিছে চীৎকারি
দিগন্ত বিদারি,
"ফিরে যা এখনি,
রে দুর্দান্ত দুরন্ত ভিখারি,
তোর কণ্ঠধ্বনি,
ঘুরি ঘুরি
নিশীথ নিদ্রার বক্ষে হানে তীব্র ছুরি।"

অস্ত্র আনো।
ঝঞ্ঝনিয়া আমার পঞ্জরে হানো।
মৃত্যুরে মারুক মৃত্যু, অক্ষয় এ প্রাণ
করি যাব দান।
শৃঙ্খল জড়াও তবে,
বাঁধো মোরে, খণ্ড খণ্ড হবে
মুহূর্তে চকিতে,
মুক্তি তব আমারি মুক্তিতে।

শাস্ত্র আনো।
হানো মোরে, হানো।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে
ঊর্ধ্বস্বরে চাহিব খণ্ডিতে
দিব্য বাণী।
জানি জানি
তর্কবাণ
হয়ে যাবে খান খান।
মুক্ত হবে জীর্ণ বাক্যে আচ্ছন্ন দু-চোখ,
হেরিবে আলোক।

অগ্নি জ্বালো।
আজিকার যাহা ভালো
কল্য যদি হয় তাহা কালো,

যদি তাহা ভস্ম হয়
বিশ্বময়,
ভস্ম হ'ক।
দূর করো শোক।
মোর অগ্নিপরীক্ষায়
ধন্য হ'ক বিশ্বলোক অপূর্ব দীক্ষায়।

আমার দুর্বোধ বাণী
বিরুদ্ধ বুদ্ধির 'পরে মুষ্টি হানি,
করিবে তাহারে উচ্চকিত,
আতঙ্কিত।
উন্মাদ আমার ছন্দ
দিবে ধন্দ
শান্তিলুব্ধ মুমুক্ষুরে,
ভিক্ষাজীর্ণ বুভুক্ষুরে।
শিরে হস্ত হেনে
একে একে নিবে মেনে
ক্রোধে ক্ষোভে ভয়ে
লোকালয়ে
অপরিচিতের জয়,
অপরিচিতের পরিচয়,—
যে অপরিচিত
বৈশাখের রুদ্র ঝড়ে বসুন্ধরা করে আন্দোলিত,
হানি বজ্র-মুঠি
মেঘের কার্পণ্য টুটি
সংগোপন বর্ষণ-সঞ্চয়
ছিন্ন করে মুক্ত করে সর্বজগন্ময়॥

রবি ঠাকুরের দল সেদিন চুপ করে গেল। শাসিয়ে গেল, লিখে জবাব দেবে। সভাটাকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে মোটরে করে অমিত যখন বাড়ি আসছিল, সিসি তাকে

বললে, "একখানা আস্ত নিবারণ চক্রবর্তী তুমি নিশ্চয় আগে থাকতে গড়ে তুলে পকেটে করে নিয়ে এসেছ, কেবলমাত্র ভালোমানুষদের বোকা বানাবার জন্যে।"

অমিত বললে, "অনাগতকে যে-মানুষ এগিয়ে নিয়ে আসে তাকেই বলে অনাগত-বিধাতা। আমি তাই। নিবারণ চক্রবর্তী আজ মর্ত্যে এসে পড়ল, কেউ তাকে আর ঠেকাতে পারবে না।"

সিসি অমিতকে নিয়ে মনে-মনে খুব একটা গর্ব বোধ করে। সে বললে, "আচ্ছা অমিত, তুমি কি সকালবেলা উঠেই সেদিনকার মতো তোমার যত শানিয়ে-বলা কথা বানিয়ে রেখে দাও?"

অমিত বললে, "সম্ভবপরের জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত থাকাই সভ্যতা; বর্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত। এ-কথাটাও আমার নোট বইয়ে লেখা আছে।"

"কিন্তু তোমার নিজের মত বলে কোনো পদার্থই নেই; যখন যেটা বেশ ভালো শোনায় সেইটেই তুমি বলে বস।"

"আমার মনটা আয়না, নিজের বাঁধা মতগুলো দিয়েই চিরদিনের মতো যদি তাকে আগাগোড়া লেপে রেখে দিতুম তাহলে তার উপরে প্রত্যেক চলতি মুহূর্তের প্রতিবিম্ব পড়ত না।"

সিসি বললে, "অমি, প্রতিবিম্ব নিয়েই তোমার জীবন কাটবে।"

২

সংঘাত

অমিত বেছে বেছে শিলঙ পাহাড়ে গেল। তার কারণ, সেখানে ওর দলের লোক কেউ যায় না। আরও একটা কারণ, ওখানে কন্যাদায়ের বন্যা তেমন প্রবল নয়। অমিতর হৃদয়টার 'পরে যে-দেবতা সর্বদা শরসন্ধান করে ফেরেন, তাঁর আনাগোনা ফ্যাশানেবল পাড়ায়। দেশের পাহাড়-পর্বতে যত বিলাসী বসতি আছে তার মধ্যে শিলঙে এদের মহলে তাঁর টার্গেট প্র্যাকটিসের জায়গা সব-চেয়ে সংকীর্ণ। বোনেরা মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "যেতে হয় একলা যাও, আমরা যাচ্ছি নে।"

বাঁ হাতে হাল কায়দার বেঁটে ছাতা, ডান হাতে টেনিস ব্যাট, গায়ে নকল পারসিক শালের ক্লোক পরে বোনরা গেল চলে দার্জিলিঙে। বিমি বোস আগেভাগেই সেখানে গিয়েছে। যখন ভাইকে বাদ দিয়ে বোনদের সমাগম হল তখন সে চারদিক চেয়ে আবিষ্কার করলে দার্জিলিঙে জনতা আছে মানুষ নেই।

অমিত সবাইকে বলে গিয়েছিল, সে শিলঙে যাচ্ছে নির্জনতা ভোগের জন্যে— দুদিন না যেতেই বুঝলে, জনতা না থাকলে নির্জনতার স্বাদ মরে যায়। ক্যামেরা হাতে দৃশ্য দেখে বেড়াবার শখ অমিতর নেই। সে বলে, আমি টুরিস্ট না, মন দিয়ে চেখে খাবার ধাত আমার, চোখ দিয়ে গিলে খাবার ধাত একেবারেই নয়।

কিছুদিন ওর কাটল পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় বই পড়ে পড়ে। গল্পের বই ছুঁলে না, কেননা, ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের দস্তুর। ও পড়তে লাগল সুনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব, লেখকের সঙ্গে মনান্তর ঘটবে এই একান্ত আশা মনে নিয়ে। এখানকার পাহাড় পর্বত অরণ্য ওর শব্দতত্ত্ব এবং আলস্য-জড়তার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, কিন্তু সেটা মনের মধ্যে পুরোপুরি ঘনিয়ে ওঠে না; যেন কোনো রাগিণীর একঘেয়ে আলাপের মতো, ধুয়ো নেই, তাল নেই, সম নেই। অর্থাৎ ওর মধ্যে বিস্তর আছে, কিন্তু এক নেই,—তাই এলানো জিনিস ছড়িয়ে পড়ে, জমা হয় না। অমিতর আপন নিখিলের মাঝখানে একের অভাবে ও যে কেবলই চঞ্চলভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে, সে-দুঃখ ওর এখানেও যেমন শহরেও তেমনি। কিন্তু শহরে সেই চাঞ্চল্যটাকে সে নানাপ্রকারে ক্ষয় করে ফেলে, এখানে চাঞ্চল্যটাই স্থির হয়ে জমে জমে ওঠে। ঝরনা বাধা পেয়ে যেমন সরোবর হয়ে দাঁড়ায়। তাই ও যখন ভাবছে পালাই, পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে শিলেট শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুশি, এমন সময় আষাঢ় এল পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল, চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে; এইবার ঘন বর্ষণে গিরিনির্ঝরিণীগুলোকে খেপিয়ে কূলছাড়া করবে। স্থির করলে, এই সময়টাতে কিছুদিনের জন্যে চেরাপুঞ্জির ডাকবাংলায় এমন মেঘদূত জমিয়ে তুলবে যার অলক্ষ্য অলকার নায়িকা অশরীরী বিদ্যুতের মতো, চিত্ত-আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমক দেয়, নাম লেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না।

সেদিন সে পরল হাইলাণ্ডারি মোটা কম্বলের মোজা, পুরু স্তুকতলাওআলা মজবুত চামড়ার জুতো, খাকি নরফোক কোর্তা, হাঁটু পর্যন্ত হ্রস্ব অধোবাস, মাথায় সোলা-টুপি। অবনী ঠাকুরের আঁকা যক্ষের মতো দেখতে হল না,—মনে হতে পারত রাস্তা তদারক করতে বেরিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু পকেটে ছিল গোটা পাঁচ-সাত পাতলা এডিশনের নানা ভাষার কাব্যের বই।

আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা, ডান দিকে জঙ্গলে-ঢাকা খদ। এ রাস্তার শেষ লক্ষ্য অমিতর বাসা। সেখানে যাত্রী-সম্ভাবনা নেই, তাই সে আওয়াজ না করে অসতর্কভাবে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে। ঠিক সেই সময়টা ভাবছিল, আধুনিক কালে দূরবর্তিনী প্রেয়সীর

জন্যে মোটর-দূতটাই প্রশস্ত—তার মধ্যে "ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ" বেশ ঠিক পরিমাণেই আছে—আর চালকের হাতে একখানি চিঠি দিলে কিছুই অস্পষ্ট থাকে না। ও ঠিক করে নিলে আগামী বৎসরে আষাঢ়ের প্রথম দিনেই মেঘদূতবর্ণিত রাস্তা দিয়েই মোটরে করে যাত্রা করবে, হয়তো বা অদৃষ্ট ওর পথ চেয়ে "দেহলীদত্তপুষ্পা" যে-পথিকবধূকে এতকাল বসিয়ে রেখেছে সেই অবন্তিকা হ'ক বা মালবিকাই হ'ক, বা হিমালয়ের কোনো দেবদারুবনচারিণীই হ'ক ওকে হয়তো কোনো একটা অভাবনীয় উপলক্ষ্যে দেখা দিতেও পারে। এমন সময়ে হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে এসেই দেখলে আর-একটা গাড়ি উপরে উঠে আসছে। পাশ-কাটাবার জায়গা নেই। ব্রেক কষতে কষতে গিয়ে পড়ল তার উপরে—পরস্পর আঘাত লাগল, কিন্তু অপঘাত ঘটল না। অন্য গাড়িটা খানিকটা গড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে আটকে থেমে গেল।

একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। সদ্য মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখানা তার পিছনে, তারই উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুৎরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি—চারিদিকের সমস্ত হতে স্বতন্ত্র। মন্দারপর্বতের নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী, সমস্ত আন্দোলনের উপরে—মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছে। দুর্লভ অবসরে অমিত তাকে দেখলে। ড্রয়িংরুমে এ-মেয়ে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে দেখা দিত না। পৃথিবীতে হয়তো দেখবার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখবার যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না।

মেয়েটির পরনে সরু-পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। তনু দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকন শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষ্মচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অবারিত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁট করে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ক ফলের মতো রমণীয়। জ্যাকেটের হাত কবজি পর্যন্ত, দু-হাতে দুটি সরু প্লেন বালা। ব্রোচের বন্ধনহীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠেছে, কটকি-কাজ-করা রুপোর কাঁটা দিয়ে খোঁপার সঙ্গে বদ্ধ।

অমিত গাড়িতে টুপিটা খুলে রেখে তার সামনে চুপ করে এসে দাঁড়াল। যেন একটা পাওনা শাস্তির অপেক্ষায়। তাই দেখে মেয়েটির বুঝি দয়া হল, একটু কৌতুকও বোধ করলে। অমিত মৃদুস্বরে বললে, "অপরাধ করেছি।"

মেয়েটি হেসে বললে, "অপরাধ নয়, ভুল। সেই ভুলের শুরু আমার থেকেই।"

উৎসজলের যে-উচ্ছলতা ফুলে ওঠে, মেয়েটির কণ্ঠস্বর তারই মতো নিটোল। অল্প-বয়সের বালকের গলার মতো মসৃণ এবং প্রশস্ত। সেদিন ঘরে ফিরে এসে অমিত

অনেকক্ষণ ভেবেছিল, এর গলার সুরে যে-একটি স্বাদ আছে, স্পর্শ আছে তাকে বর্ণনা করা যায় কী করে। নোটবইখানা খুলে লিখলে, "এ যেন অম্বুরি তামাকের হালকা ধোঁয়া, জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আসছে,—নিকোটিনের ঝাঁজ নেই, আছে গোলাপজলের স্নিগ্ধ গন্ধ।"

মেয়েটি নিজের ত্রুটি ব্যাখ্যা করে বললে, "একজন বন্ধু আসার খবর পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। এই রাস্তায় খানিকটা উঠতেই শোফার বলেছিল এ রাস্তা হতে পারে না। তখন শেষ পর্যন্ত না গিয়ে ফেরবার উপায় ছিল না। তাই উপরে চলেছিলেম। এমন সময় উপরওআলার ধাক্কা খেতে হল।"

অমিত বললে, "উপরওআলার উপরেও উপরওআলা আছে—একটা অতি কুশ্রী কুটিল গ্রহ, এ তারই কুকীর্তি।"

অপর পক্ষের ড্রাইভার জানালে, "লোকসান বেশি হয় নি, কিন্তু গাড়ি সেরে নিতে দেরি হবে।"

অমিত বললে, "আমার অপরাধী গাড়িটাকে যদি ক্ষমা করেন, তবে আপনি যেখানে অনুমতি করবেন সেইখানেই পৌঁছিয়ে দিতে পারি।"

"দরকার হবে না, পাহাড়ে হেঁটে চলা আমার অভ্যেস।"

"দরকার আমারই, মাপ করলেন তার প্রমাণ।"

মেয়েটি ঈষৎ দ্বিধায় নীরব রইল। অমিত বললে, "আমার তরফে আরও একটু কথা আছে। গাড়ি হাঁকাই,—বিশেষ একটা মহৎ কর্ম নয়—এ-গাড়ি চালিয়ে পর্স্টারিটি পর্যন্ত পৌঁছোবার পথ নেই। তবু আরম্ভে এই একটিমাত্র পরিচয়ই পেয়েছেন। অথচ এমনি কপাল, সেটুকুর মধ্যেও গলদ। উপসংহারে এটুকু দেখাতে দিন যে, জগতে অন্তত আপনার শোফারের চেয়ে আমি অযোগ্য নই।"

অপরিচিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে অজানা বিপদের আশঙ্কায় মেয়েরা সংকোচ সরাতে চায় না। কিন্তু বিপদের এক ধাক্কায় উপক্রমণিকার অনেকখানি বিস্তৃত বেড়া একদমে গেল ভেঙে। কোন্ দৈব নির্জন পাহাড়ের পথে হঠাৎ মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দুজনের মনে দেখাদেখির গাঁঠ বেঁধে দিলে; সবুর করলে না। আকস্মিকের বিদ্যুৎ-আলোতে এমন করে যা চোখে পড়ল, প্রায় মাঝে মাঝে এ যে রাত্রে জেগে উঠে অন্ধকারের পটে দেখা যাবে। চৈতন্যের মাঝখানটাতে তার গভীর ছাপ পড়ে গেল, নীল আকাশের উপরে সৃষ্টির কোন্ এক প্রচণ্ড ধাক্কায় যেমন সূর্য-নক্ষত্রের আগুন-জ্বলা ছাপ।

মুখে কথা না বলে মেয়েটি গাড়িতে উঠে বসল। তার নির্দেশমতো গাড়ি পৌঁছোল

যথাস্থানে। মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমে বললে, "কাল যদি আপনার সময় থাকে একবার এখানে আসবেন, আমাদের কর্তা-মার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।"

অমিতর ইচ্ছে হল বলে, "আমার সময়ের অভাব নেই, এখনই আসতে পারি।" সংকোচে বলতে পারলে না।

বাড়ি ফিরে এসে ওর নোট-বই নিয়ে লিখতে লাগল: "পথ আজ হঠাৎ এ কী পাগলামি করলে। দুজনকে দু-জায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে আজ থেকে হয়তো এক রাস্তায় চালান করে দিলে। অ্যাস্ট্রনমার ভুল বলেছে। অজানা আকাশ থেকে চাঁদ এসে পড়েছিল পৃথিবীর কক্ষপথে,—লাগল তাদের মোটরে মোটরে ধাক্কা, সেই মরণের তাড়নার পর থেকে যুগে যুগে দুজনে একসঙ্গেই চলেছে, এর আলো ওর মুখে পড়ে, ওর আলো এর মুখে। চলার বাঁধন আর ছেড়ে না। মনের ভিতরটা বলছে, আমাদের শুরু হল যুগলচলন, আমরা চলার সূত্রে গাঁথব ক্ষণে ক্ষণে কুড়িয়ে-পাওয়া উজ্জ্বল নিমেষ-গুলির মালা। বাঁধা মাইনের বাঁধা খোরাকিতে ভাগ্যের দ্বারে পড়ে থাকবার জো রইল না: আমাদের দেনাপাওনা সবই হবে হঠাৎ।"

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দায় ঘন ঘন পায়চারি করতে করতে অমিত মনে মনে বলে উঠল, "কোথায় আছ নিবারণ চক্রবর্তী। এইবার ভর করো আমার 'পরে, বাণী দাও, বাণী দাও!" বেরোল লম্বা সরু খাতাটা, নিবারণ চক্রবর্তী বলে গেল:

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।

নাই আমাদের কনক-চাঁপার কুঞ্জ,
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন সন্ধ্যেবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,

প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ,
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেনড্রনগুচ্ছ।

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালন-ললিত যত্ন।
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত।

এইখানে একবার পিছন ফেরা চাই। পশ্চাতের কথাটা সেরে নিতে পারলে গল্পটার সামনে এগোবার বাধা হবে না।

পূর্ব ভূমিকা

বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে চণ্ডীমণ্ডপের হাওয়ার সঙ্গে স্কুলকলেজের হাওয়ার তাপের বৈষম্য ঘটাতে সমাজবিদ্রোহের যে-ঝড় উঠেছিল সেই ঝড়ের চাঞ্চল্যে ধরা দিয়েছিলেন জ্ঞানদাশংকর। তিনি সেকালের লোক, কিন্তু তাঁর তারিখটা হঠাৎ পিছলিয়ে সরে এসেছিল অনেকখানি একালে। তিনি আগাম জন্মেছিলেন। বুদ্ধিতে বাক্যে ব্যবহারে তিনি ছিলেন তাঁর বয়সের লোকদের অসমসাময়িক। সমুদ্রের ঢেউ-বিলাসী পাখির মতো লোকনিন্দার ঝাপট বুক পেতে নিতেই তাঁর আনন্দ ছিল।

এমন সকল পিতামহের নাতিরা যখন এই রকম তারিখের বিপর্যয় সংশোধন করতে চেষ্টা করে তখন তারা এক দৌড়ে পৌঁছোয় পঞ্জিকার একেবারে উলটো দিকের টার্মিনসে। এ-ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। জ্ঞানদাশংকরের নাতি বরদাশংকর বাপের মৃত্যুর পর যুগ-হিসাবে বাপ-পিতামহের প্রায় আদিম পূর্বপুরুষ হয়ে উঠলেন। মনসাকেও হাত জোড় করেন, শীতলাকেও মা বলে ঠাণ্ডা করতে চান। মাদুলি ধুয়ে জল খাওয়া শুরু হল; সহস্র দুর্গানাম লিখতে লিখতে দিনের পূর্বাহ্ণ যায় কেটে; তাঁর এলেকায় যে-বৈষ্ণদল নিজেদের

দ্বিজত্ব প্রমাণ করতে মাথা ঝাঁকা দিয়ে উঠেছিল অন্তরে বাহিরে সকল দিক থেকেই তাদের বিচলিত করা হল, হিন্দুত্বরক্ষার উপায়গুলিকে বিজ্ঞানের স্পর্শদোষ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ভাটপাড়ার সাহায্যে অসংখ্য প্যাম্ফলেট ছাপিয়ে আধুনিক বুদ্ধির কপালে বিনামূল্যে ঋষিবাক্যবর্ষণ করতে কার্পণ্য করলেন না। অতি অল্পকালের মধ্যেই ক্রিয়াকর্মে, জপে তপে, আসনে আচমনে, ধ্যানে স্নানে, ধূপে ধুনোয়, গোব্রাহ্মণ সেবায় শুদ্ধাচারের অচল দুর্গ নিশ্ছিদ্র করে বানালেন। অবশেষে গোদান, স্বর্ণদান, ভূমিদান, কন্যাদায় পিতৃদায় মাতৃদায় হরণ প্রভৃতির পরিবর্তে অসংখ্য ব্রাহ্মণের অজস্র আশীর্বাদ বহন করে তিনি লোকান্তরে যখন গেলেন তখন তাঁর সাতাশ বছর বয়স।

এঁরই পিতার পরম বন্ধু, তাঁরই সঙ্গে এক কলেজে-পড়া, একই হোটেলে চপ-কাটলেট-খাওয়া, রামলোচন বাঁড়ুজ্যের কন্যা যোগমায়ার সঙ্গে বরদার বিবাহ হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে যোগমায়ার পিতৃকুলের সঙ্গে পতিকুলের ব্যবহারগত বর্ণভেদ ছিল না। এঁর বাপের ঘরে মেয়েরা পড়াশুনো করেন, বাইরে বেরোন, এমন কি, তাঁদের কেউ-কেউ মাসিকপত্রে সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান্তও লিখেছেন। সেই বাড়ির মেয়ের শুচি সংস্করণে যাতে অনুস্বার-বিসর্গের ভুল-চুক না থাকে সেই চেষ্টায় লাগলেন তাঁর স্বামী। সনাতন সীমান্ত-রক্ষা নীতির অটল শাসনে যোগমায়ার গতিবিধি বিবিধ পাসপোর্ট প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হল। চোখের উপরে তাঁর ঘোমটা নামল, মনের উপরেও। দেবী সরস্বতী যখন কোনো অবকাশে এঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেন তখন পাহারায় তাঁকেও কাপড়ঝাড়া দিয়ে আসতে হত। তাঁর হাতের ইংরেজি বইগুলো বাইরেই হত বাজেয়াপ্ত,—প্রাগ্‌বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী রচনা ধরা পড়লে চৌকাঠ পার হতে পেত না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উৎকৃষ্ট বাঁধাই বাংলা অনুবাদ যোগমায়ার শেলফে অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করে আছে। অবসর-বিনোদন উপলক্ষ্যে সেটা তিনি আলোচনা করবেন এমন একটা আগ্রহ এ-বাড়ির কর্তৃপক্ষের মনে অন্তিমকাল পর্যন্তই ছিল। এই পৌরাণিক লোহার সিন্দুকের মধ্যে নিজেকে সেফ ডিপজিটের মতো ভাঁজ করে রাখা যোগমায়ার পক্ষে সহজ ছিল না, তবু বিদ্রোহী মনকে শাসনে রেখেছিলেন। এই মানসিক অবরোধের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন দীনশরণ বেদান্তরত্ন। এঁদের সভাপণ্ডিত। যোগমায়ার স্বাভাবিক স্বচ্ছ বুদ্ধি তাঁকে অত্যন্ত ভালো লেগেছিল। তিনি স্পষ্টই বলতেন, "মা, এ সমস্ত ক্রিয়াকর্মের জঞ্জাল তোমার জন্যে নয়। যারা মূঢ়, তারা কেবল যে নিজেদেরকে নিজেরাই ঠকায় তা নয়, পৃথিবী সুদ্ধ সমস্ত কিছুই তাদের ঠকাতে থাকে। তুমি কি মনে কর আমরা এ-সমস্ত বিশ্বাস করি? দেখ নি কি, বিধান দেবার বেলায় আমরা প্রয়োজন বুঝে শাস্ত্রকে ব্যাকরণের প্যাঁচে উলটপালট করতে

দুঃখ বোধ করি না—তার মানে, মনের মধ্যে আমরা বাঁধন মানি নে, বাইরে আমাদের মূঢ় সাজতে হয় মূঢ়দের খাতিরে। তুমি নিজে যখন ভুলতে চাও না, তখন তোমাকে ভোলাবার কাজ আমার দ্বারা হবে না। যখন ইচ্ছা করবে, মা, আমাকে ডেকে পাঠিয়ো, আমি যা সত্য বলে জানি তাই তোমাকে শাস্ত্র থেকে শুনিয়ে যাব।"

এক-একদিন তিনি এসে যোগমায়াকে কখনো গীতা কখনো ব্রহ্মভাষ্য থেকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে যেতেন। যোগমায়া তাঁকে এমন বুদ্ধিপূর্বক প্রশ্ন করতেন যে, বেদান্তরত্ন-মশায় পুলকিত হয়ে উঠতেন, এঁর কাছে আলোচনায় তাঁর উৎসাহের অন্ত থাকত না। বরদাশংকর তাঁর চারিদিকে ছোটোবড়ো যে-সব গুরু ও গুরুতরদের জুটিয়েছিলেন, তাদের প্রতি বেদান্তরত্নমশায়ের বিপুল অবজ্ঞা ছিল; তিনি যোগমায়াকে বলতেন, "মা, সমস্ত শহরে একমাত্র এই তোমার ঘরে কথা কয়ে আমি সুখ পাই। তুমি আমাকে আত্মধিক্কার থেকে বাঁচিয়েছ।" এমনি করে কিছুকাল নিরবকাশ ব্রত-উপবাসের মধ্যে পঞ্জিকার শিকলি-বাঁধা দিনগুলো কোনোমতে কেটে গেল। জীবনটা আগাগোড়াই হয়ে উঠল আজকালকার খবরের কাগজি কিম্ভূত ভাষায় যাকে বলে "বাধ্যতামূলক।" স্বামীর মৃত্যুর পরেই তাঁর ছেলে যতিশংকর ও মেয়ে সুরমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শীতের সময় থাকেন কলকাতায়, গরমের সময়ে কোনো একটা পাহাড়ে। যতিশংকর এখন পড়ছে কলেজে; কিন্তু সুরমাকে পড়াবার মতো কোনো মেয়ে-বিদ্যালয় তাঁর পছন্দ না হওয়াতে বহুসন্ধানে তার শিক্ষার জন্যে লাবণ্যলতাকে পেয়েছেন। তারই সঙ্গে আজ সকালে আচমকা অমিতর দেখা।

৪

লাবণ্য-পুরাবৃত্ত

লাবণ্যের বাপ অবনীশ দত্ত এক পশ্চিমি কালেজের অধ্যক্ষ। মাতৃহীন মেয়েকে এমন করে মানুষ করেছেন যে, বহু পরীক্ষা পাসের ঘষাঘষিতেও তার বিদ্যাবুদ্ধিতে লোকসান ঘটাতে পারে নি। এমন কি, এখনও তার পাঠানুরাগ রয়েছে প্রবল।

বাপের একমাত্র শখ ছিল বিদ্যায়, মেয়েটির মধ্যে তাঁর সেই শখটির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়েছিল। নিজের লাইব্রেরির চেয়েও তাকে ভালোবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল জ্ঞানের চর্চায় যার মনটা নিরেট হয়ে ওঠে, সেখানে উড়ো ভাবনার গ্যাস নিচে থেকে ঠেলে ওঠবার মতো সমস্ত ফাটল মরে যায়, সে-মানুষের পক্ষে বিয়ে করবার দরকার হয় না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর মেয়ের মনে স্বামী-সেবা আবাদের যোগ্য যে নরম

জমিটুকু বাকি থাকতে পারত সেটা গণিতে ইতিহাসে সিমেন্ট করে গাঁথা হয়েছে—খুব মজবুত পাকা মন যাকে বলা যেতে পারে—বাইরে থেকে আঁচড় লাগলে দাগ পড়ে না। তিনি এতদূর পর্যন্ত ভেবে রেখেছিলেন যে, লাবণ্যের নাই বা হল বিয়ে, পাণ্ডিত্যের সঙ্গেই চিরদিন নয় গাঁঠবাঁধা হয়ে থাকল।

তাঁর আর একটি স্নেহের পাত্র ছিল। তার নাম শোভনলাল। অল্প বয়সে পড়ার প্রতি এত মনোযোগ আর কারও দেখা যায় না। প্রশস্ত কপালে, চোখের ভাবের স্বচ্ছতায়, ঠোঁটের ভাবের সৌজন্যে, হাসির ভাবের সরলতায়, মুখের ভাবের সৌকুমার্যে তার চেহারাটি দেখবামাত্র মনকে টানে। মানুষটি নেহাত মুখচোরা, তার প্রতি একটু মনোযোগ দিলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

গরিবের ছেলে, ছাত্রবৃত্তির সোপানে সোপানে দুর্গম পরীক্ষার শিখরে শিখরে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে শোভন যে নাম করতে পারবে, আর সেই খ্যাতি গড়ে তোলবার প্রধান কারিগরদের ফর্দে অবনীশের নামটা সকলের উপরে থাকবে এই গর্ব অধ্যাপকের মনে ছিল। শোভন আসত তাঁর বাড়িতে পড়া নিতে, তাঁর লাইব্রেরিতে ছিল তার অবাধ সঞ্চরণ। লাবণ্যকে দেখলে সে সংকোচে নত হয়ে যেত। এই সংকোচের অতিদূরত্ববশত শোভনলালের চেয়ে নিজের মাপটাকে বড়ো করে দেখতে লাবণ্যর বাধা ছিল না। দ্বিধা করে নিজেকে যে-পুরুষ যথেষ্ট জোরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না করায় মেয়েরা তাকে যথেষ্ট স্পষ্ট করে প্রত্যক্ষ করে না।

এমন সময় একদিন শোভনলালের বাপ ননিগোপাল অবনীশের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে খুব একচোট গাল পেড়ে গেল। নালিশ এই যে, অবনীশ নিজের ঘরে অধ্যাপনার ছুতোয় বিবাহের ছেলে-ধরা ফাঁদ পেতেছেন, বৈদ্যর ছেলে শোভনলালের জাত মেরে সমাজ-সংস্কারের শখ মেটাতে চান। এই অভিযোগের প্রমাণ স্বরূপে পেনসিলে-আঁকা লাবণ্যলতার এক ছবি দাখিল করলে। ছবিটা আবিষ্কৃত হয়েছে শোভনলালের টিনের প্যাটরার ভিতর থেকে, গোলাপফুলের পাপড়ি দিয়ে আচ্ছন্ন। ননিগোপালের সন্দেহ ছিল না, এই ছবিটি লাবণ্যেরই প্রণয়ের দান। পাত্র হিসাবে শোভনলালের বাজার দর যে কত বেশি, এবং আর কিছুদিন সবুর করে থাকলে সে-দাম যে কত বেড়ে যাবে ননিগোপালের হিসাবি বুদ্ধিতে সেটা কড়ায়-গণ্ডায় মেলানো ছিল। এমন মূল্যবান জিনিসকে অবনীশ বিনামূল্যে দখল করবার ফন্দি করছেন এটাকে সিঁধ কেটে চুরি ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যেতে পারে? টাকা চুরির থেকে এর লেশমাত্র তফাত কোথায়?

এতদিন লাবণ্য জানতেই পারে নি, কোনো প্রচ্ছন্ন বেদীতে শ্রদ্ধাহীন লোকচক্ষুর

অগোচরে তার মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছে। অবনীশের লাইব্রেরির এক কোণে নানাবিধ প্যাম্ফলেট ম্যাগাজিন প্রভৃতি আবর্জনার মধ্যে লাবণ্যর একটি অযত্নম্লান ফোটোগ্রাফ দৈবাৎ শোভনের হাতে পড়েছিল, সেইটে নিয়ে ওর কোনো আর্টিস্ট বন্ধুকে দিয়ে ছবি করিয়ে ফোটোগ্রাফটি আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে রেখেছে। গোলাপফুলগুলিও ওর তরুণ মনের সলজ্জ গোপন ভালোবাসারই মতো সহজে ফুটেছিল একটি বন্ধুর বাগানে, তার মধ্যে কোনো অনধিকার ঔদ্ধত্যের ইতিহাস নেই। অথচ শাস্তি পেতে হল। লাজুক ছেলেটি মাথা হেঁট করে, মুখ লাল করে, গোপনে চোখের জল মুছে এই বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে গেল। দূর থেকে শোভনলাল তার আত্মনিবেদনের একটি শেষ পরিচয় দিলে, সেই বিবরণটা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ জানত না। বি. এ পরীক্ষায় সে যখন পেয়েছিল প্রথম স্থান, লাবণ্য পেয়েছিল তৃতীয়। সেটাতে লাবণ্যকে বড়ো বেশি আত্মলাঘব-দুঃখ দিয়েছিল। তার দুটো কারণ ছিল, এক হচ্ছে শোভনের বুদ্ধির 'পরে অবনীশের অত্যন্ত শ্রদ্ধা নিয়ে লাবণ্যকে অনেকদিন আঘাত করেছে। এই শ্রদ্ধার সঙ্গে অবনীশের বিশেষ স্নেহ মিশে থাকাতে পীড়াটা আরও হয়েছিল বেশি। শোভনকে পরীক্ষার ফলে ছাড়িয়ে যাবার জন্যে সে চেষ্টা করেছিল খুব প্রাণপণেই। তবুও শোভন যখন তাকে ছাড়িয়ে গেল তখন এই স্পর্ধার জন্যে তাকে ক্ষমা করাই শক্ত হয়ে উঠল। তার মনে কেমন একটা সন্দেহ লেগে রইল যে, বাবা তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করাতেই উভয় পরীক্ষিতের মধ্যে ফলবৈষম্য ঘটল, অথচ পরীক্ষার পড়া সম্বন্ধে শোভনলাল কোনো দিন অবনীশের কাছে এগোয় নি। কিছুদিন পর্যন্ত শোভনলালকে দেখলেই লাবণ্য মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। এম এ-পরীক্ষাতেও শোভনের প্রতিযোগিতায় লাবণ্যর জেতবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবু হল জিত। স্বয়ং অবনীশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। শোভনলাল যদি কবি হত তাহলে হয়তো সে খাতা ভরে কবিতা লিখত—তার বদলে আপন পরীক্ষা পাসের অনেকগুলো মোটা মার্কা সে লাবণ্যর উদ্দেশে উৎসর্গ করে দিলে।

তার পরে এদের ছাত্রদশা গেল কেটে। এমন সময় অবনীশ হঠাৎ প্রচণ্ড পীড়ায় নিজের মধ্যেই প্রমাণ পেলেন যে, জ্ঞানের চর্চায় মনটা ঠাসবোঝাই থাকলেও মনসিজ তার মধ্যেই কোথা থেকে বাধা ঠেলে উঠে পড়েন, একটুও স্থানাভাব হয় না। তখন অবনীশ সাতচল্লিশ,—সেই নিরতিশয় দুর্বল নিরুপায় বয়সে একটি বিধবা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলে, একেবারে তাঁর লাইব্রেরির গ্রন্থব্যূহ ভেদ করে, তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রাকার ডিঙিয়ে। বিবাহে আর কোনো বাধা ছিল না, একমাত্র বাধা লাবণ্যর প্রতি অবনীশের স্নেহ। ইচ্ছার সঙ্গে বিষম লড়াই বাধল। পড়াশুনো করতে যান খুবই

জোরের সঙ্গে, কিন্তু তার চেয়ে জোর আছে এমন কোনো একটা চমৎকারা চিন্তা পড়াশুনোর কাঁধে চেপে বসে। সমালোচনার জন্যে মডার্নরিভিয়ু থেকে তাঁকে লোভনীয় বই পাঠানো হয় বৌদ্ধধ্বংসাবশেষের পুরাবৃত্ত নিয়ে,—অনুদ্‌ঘাটিত বইয়ের সামনে স্থির হয়ে বসে থাকেন, এক ভাঙা বৌদ্ধস্তূপেরই মতো যার উপরে চেপে আছে বহুশত বৎসরের মৌন। সম্পাদক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, কিন্তু জ্ঞানীর স্তূপাকার জ্ঞান যখন একবার টলে তখন তার দশা এইরকমই হয়ে থাকে। হাতি যখন চোরাবালিতে পা দেয় তখন তার বাঁচবার উপায় কী?

এতদিন পরে অবনীশের মনে একটা পরিতাপ ব্যথা দিতে লাগল। তাঁর মনে হল, তিনি হয়তো পুঁথির পাতা থেকে চোখ তুলে দেখবার অবকাশ না পাওয়াতে দেখেন নি যে, শোভনলালকে তাঁর মেয়ে ভালোবেসেছে, কারণ শোভনের মতো ছেলেকে না ভালোবাসতে পারাটাই অস্বাভাবিক। সাধারণভাবে বাপ-জাতটার 'পরেই রাগ ধরল, নিজের উপরে, ননিগোপালের 'পরে।

এমন সময় শোভনের কাছ থেকে এক চিঠি এল। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্যে গুপ্তরাজবংশের ইতিহাস আশ্রয় করে পরীক্ষার প্রবন্ধ লিখবে বলে সে তাঁর লাইব্রেরি থেকে গুটিকতক বই ধার চায়। তখনই তিনি তাকে বিশেষ আদর করে চিঠি লিখলেন, বললেন, "পূর্বের মতোই আমার লাইব্রেরিতে বসেই তুমি কাজ করবে, কিছুমাত্র সংকোচ করবে না।"

শোভনলালের মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সে ধরে নিলে, এমন উৎসাহপূর্ণ চিঠির পিছনে হয়তো লাবণ্যর সম্মতি প্রচ্ছন্ন আছে। সে লাইব্রেরিতে আসতে আরম্ভ করলে। ঘরের মধ্যে যাওয়া-আসার পথে দৈবাৎ কখনো ক্ষণকালের জন্যে লাবণ্যর সঙ্গে দেখা হয়। তখন শোভন গতিটাকে একটু মন্দ করে আনে। ওর একান্ত ইচ্ছে, লাবণ্য তাকে একটা কোনো কথা বলে, জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছ; যে-প্রবন্ধ নিয়ে ও ব্যাপৃত, সে-সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল প্রকাশ করে। যদি করত তবে খাতা খুলে এক সময় লাবণ্যর সঙ্গে আলোচনা করতে পারলে ও বেঁচে যেত। ওর কতকগুলি নিজের উদ্‌ভাবিত বিশেষ মত সম্বন্ধে লাবণ্যর মত কী, জানবার জন্যে ওর অত্যন্ত ঔৎসুক্য। কিন্তু এ-পর্যন্ত কোনো কথাই হল না, গায়ে-পড়ে কিছু বলতে পারে এমন সাহসও ওর নেই।

এমন কয়েক দিন যায়। সেদিন রবিবার। শোভনলাল তার খাতাপত্র টেবিলের উপর সাজিয়ে একখানা বই নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছে, মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে। তখন দুপুরবেলা, ঘরে কেউ নেই। ছুটির দিনের সুযোগ নিয়ে অবনীশ কোন্ এক বাড়িতে যাচ্ছেন তার নাম করলেন না,—বলে গেলেন, আজ আর চা খেতে আসবেন না।

হঠাৎ একসময় ভেজানো দরজা জোরে খুলে গেল। শোভনলালের বুকটা ধড়াস করে উঠল কেঁপে। লাবণ্য ঘরে ঢুকল। শোভন শশব্যস্ত হয়ে উঠে কী করবে ভেবে পেল না। লাবণ্য অগ্নিমূর্তি ধরে বললে, "আপনি কেন এ-বাড়িতে আসেন?"

শোভনলাল চমকে উঠল, মুখে কোনো উত্তর এল না।

"আপনি জানেন, এখানে আসা নিয়ে আপনার বাবা কী বলেছেন? আমার অপমান ঘটাতে আপনার সংকোচ নেই?"

শোভনলাল চোখ নিচু করে বললে, "আমাকে মাপ করবেন, আমি এখনই যাচ্ছি।"

এমন উত্তর পর্যন্ত দিলে না যে, লাবণ্যর পিতা তাকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করে এনেছেন। সে তার খাতাপত্র সমস্ত সংগ্রহ করে নিলে। হাত থর থর করে কাঁপছে; বোবা একটা ব্যথা বুকের পাঁজরগুলোকে ঠেলা দিয়ে উঠতে চায়, রাস্তা পায় না। মাথা হেঁট করে বাড়ি থেকে সে চলে গেল।

যাকে খুবই ভালোবাসা যেতে পারত, তাকে ভালোবাসবার অবসর যদি কোনো একটা বাধায় ঠেকে ফসকে যায়, তখন সেটা না-ভালোবাসায় দাঁড়ায় না, সেটা দাঁড়ায় একটা অন্ধ বিদ্বেষে, ভালোবাসারই উলটো পিঠে। একদিন শোভনলালকে বরদান করবে বলেই বুঝি লাবণ্য নিজের অগোচরেই অপেক্ষা করে বসে ছিল। শোভনলাল তেমন করে ডাক দিলে না। তার পরে যা-কিছু হল সবই গেল তার বিরুদ্ধে। সকলের চেয়ে বেশি আঘাত দিলে এই শেষকালটায়। লাবণ্য মনের ক্ষোভে বাপের প্রতি নিতান্ত অন্যায় বিচার করলে। তার মনে হল, নিজে নিষ্কৃতি পাবেন ইচ্ছে করেই শোভনলালকে তিনি আবার নিজে থেকে ডেকে এনেছেন, ওদের দুজনের মিলন ঘটাবার কামনায়। তাই এমন দারুণ ক্রোধ হল সেই নিরপরাধের উপরে।

তার পর থেকে লাবণ্য ক্রমাগতই জেদ করে করে অবনীশের বিবাহ ঘটাল। অবনীশ তাঁর সঞ্চিত টাকার প্রায় অর্ধাংশ তাঁর মেয়ের জন্যে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন। তাঁর বিবাহের পরে লাবণ্য বলে বসল, সে তার পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই নেবে না, স্বাধীন উপার্জন করে চালাবে। অবনীশ মর্মাহত হয়ে বললেন, "আমি তো বিয়ে করতে চাই নি, লাবণ্য, তুমিই তো জেদ করে বিয়ে দিইয়েছ। তবে কেন আজ আমাকে তুমি এমন করে ত্যাগ করছ?"

লাবণ্য বললে, "আমাদের সম্বন্ধ কোনোকালে যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেইজন্যেই আমি এই সংকল্প করেছি। তুমি কিছু ভেবো না, বাবা। যে-পথে আমি যথার্থ সুখী হব, সেই পথে তোমার আশীর্বাদ চিরদিন রেখো।"

কাজ তার জুটে গেল। সুরমাকে পড়াবার সম্পূর্ণ ভার তার উপরে। যতিকেও

অনায়াসে পড়াতে পারত, কিন্তু মেয়ে-শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়বার অপমান স্বীকার করতে যতি কিছুতেই রাজি হল না।

প্রতিদিনের বাঁধা কাজে জীবন একরকম চলে যাচ্ছিল। উদ্‌বৃত্ত সময়টা ঠাসা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে, প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে হালের বার্নার্ড শ'র আমল পর্যন্ত, এবং বিশেষভাবে গ্রীক ও রোমান যুগের ইতিহাসে, গ্রোট, গিবন ও গিলবার্ট মারের রচনায়। কোনো কোনো অবকাশে একটা চঞ্চল হাওয়া এসে মনের ভিতরটা যে একটু এলোমেলো করে যেত না তা বলতে পারি নে, কিন্তু হাওয়ার চেয়ে স্থূল ব্যাঘাত হঠাৎ ঢুকে পড়তে পারে ওর জীবনযাত্রার মধ্যে এমন প্রশস্ত ফাঁক ছিল না। এমন সময় ব্যাঘাত এসে পড়ল মোটরগাড়িতে চড়ে, পথের মাঝখানে, কোনো আওয়াজমাত্র না করে। হঠাৎ গ্রীস-রোমের বিরাট ইতিহাসটা হালকা হয়ে গেল :—আর-সমস্ত-কিছুকে সরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত নিকটের একটা নিবিড় বর্তমান ওকে নাড়া দিয়ে বললে, "জাগো"। লাবণ্য এক মুহূর্তে জেগে উঠে এতদিন পরে আপনাকে বাস্তবরূপে দেখতে পেলে, জ্ঞানের মধ্যে নয়, বেদনার মধ্যে।

৫

আলাপের আরম্ভ

অতীতের ভগ্নাবশেষ থেকে এবার ফিরে আসা যাক বর্তমানের নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

লাবণ্য পড়বার ঘরে অমিতকে বসিয়ে রেখে যোগমায়াকে খবর দিতে গেল। সে-ঘরে অমিত বসল যেন পদ্মের মাঝখানটাতে ভ্রমরের মতো। চারিদিকে চায়, সকল জিনিস থেকেই কিসের ছোঁওয়া লাগে,ওর মনটাকে দেয় উদাস করে। শেলফে, পড়বার টেবিলে ইংরেজি সাহিত্যের বই দেখলে; সে-বইগুলো যেন বেঁচে উঠেছে। সব লাবণ্যর পড়া বই, তার আঙুলে পাতা-ওলটানো, তার দিনরাত্রির ভাবনা-লাগা, তার উৎসুক দৃষ্টির পথ-চলা, তার অন্যমনস্ক দিনে কোলের উপর পড়ে-থাকা বই। চমকে উঠল যখন টেবিলে দেখতে পেলে ইংরেজ কবি ডন-এর কাব্যসংগ্রহ। অক্‌সফোর্ডে থাকতে ডন এবং তাঁর সময়কার কবিদের গীতিকাব্য ছিল অমিতর প্রধান আলোচ্য, এইখানে এই কাব্যের উপর দৈবাৎ দুজনের মন এক জায়গায় এসে পরস্পরকে স্পর্শ করল।

এতদিনকার নিরুৎসুক দিনরাত্রির দাগ লেগে অমিতর জীবনটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল,

যেন মাস্টারের হাতে ইস্কুলের প্রতি বছরে পড়ানো একটা ঢিলে মলাটের টেক্সটবুক। আগামী দিনটার জন্য কোনো কৌতূহল ছিল না আর বর্তমান দিনটাকে পুরো মন দিয়ে অভ্যর্থনা করা ওর পক্ষে ছিল অনাবশ্যক। এখন সে এইমাত্র এসে পৌঁছোল একটা নতুন গ্রহে; এখানে বস্তুর ভার কম; পা মাটি ছাড়িয়ে যেন উপর দিয়ে চলে; প্রতিমুহূর্ত ব্যগ্র হয়ে অভাবনীয়ের দিকে এগোতে থাকে; গায়ে হাওয়া লাগে আর সমস্ত শরীরটা যেন বাঁশি হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে; আকাশের আলো রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে, আর ওর অন্তরে অন্তরে যে-উত্তেজনার সঞ্চার হয় সেটা গাছের সর্বাঙ্গপ্রবাহিত রসের মধ্যে ফুল-ফোটাবার উত্তেজনার মতো। মনের উপর থেকে কতদিনের ধুলো-পড়া পর্দা উঠে গেল, সামান্য জিনিসের থেকে ফুটে উঠছে অসামান্যতা। তাই যোগমায়া যখন ধীরে ধীরে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন সেই অতি সহজ ব্যাপারেও আজ অমিতকে বিস্ময় লাগল। সে মনে মনে বললে, "আহা, এ তো আগমন নয়, এ যে আবির্ভাব।"

চল্লিশের কাছাকাছি তাঁর বয়স, কিন্তু বয়সে তাঁকে শিথিল করে নি, কেবল তাঁকে গম্ভীর শুভ্রতা দিয়েছে। গৌরবর্ণ মুখ টস টস করছে। বৈধব্যরীতিতে চুল ছাঁটা; মাতৃভাবে পূর্ণ প্রসন্ন চোখ; হাসিটি স্নিগ্ধ। মোটা থান চাদরে মাথা বেষ্টন ক'রে সমস্ত দেহ সংবৃত। পায়ে জুতো নেই, দুটি পা নির্মল সুন্দর। অমিত তাঁর পায়ে হাত দিয়ে যখন প্রণাম করলে ওর শিরে শিরে যেন দেবীর প্রসাদের ধারা বয়ে গেল।

প্রথম পরিচয়ের পর যোগমায়া বললেন, "তোমার কাকা অমরেশ ছিলেন আমাদের জেলার সব-চেয়ে বড় উকিল। একবার এক সর্বনেশে মকদ্দমায় আমরা ফতুর হতে বসেছিলুম, তিনি আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমাকে ডাকতেন বউদিদি বলে।"

অমিত বললে, "আমি তাঁর অযোগ্য ভাইপো। কাকা লোকসান বাঁচিয়েছেন, আমি লোকসান ঘটিয়েছি। আপনি ছিলেন তাঁর লাভের বউদিদি, আমার হবেন লোকসানের মাসিমা।"

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মা আছেন?"

অমিত বললে, "ছিলেন। মাসি থাকাও খুব উচিত ছিল।"

"মাসির জন্যে খেদ কেন, বাবা?"

"ভেবে দেখুন না, আজ যদি ভাঙতুম মায়ের গাড়ি, বকুনির অন্ত থাকত না; বলতেন এটা বাঁদরামি। গাড়িটা যদি মাসির হয় তিনি আমার অপটুতা দেখে হাসেন, মনে-মনে বলেন, ছেলেমানুষি।"

যোগমায়া হেসে বললেন, "তাহলে না হয় গাড়িখানা মাসিরই হল।"

অমিত লাফিয়ে উঠে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "এইজন্যেই তো পূর্বজন্মের

কর্মফল মানতে হয়। মায়ের কোলে জন্মেছি, মাসির জন্যে কোনো তপস্যাই করি নি—গাড়ি ভাঙাটাকে সংকর্ম বলা চলে না, অথচ এক নিমেষে দেবতার বরের মতো মাসি জীবনে অবতীর্ণ হলেন,—এর পিছনে কত যুগের সূচনা আছে ভেবে দেখুন।"

যোগমায়া হেসে বললেন, "কর্মফল কার, বাবা? তোমার, না আমার, না যারা মোটর মেরামতের ব্যবসা করে তাদের?"

ঘন চুলের ভিতর দিয়ে পিছন দিকে আঙুল চালিয়ে অমিত বললে, "শক্ত প্রশ্ন। কর্ম একার নয়, সমস্ত বিশ্বের, নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে তারই সম্মিলিত ধারা যুগে যুগে চলে এসে শুক্রবার ঠিক বেলা নটা বেজে আটচল্লিশ মিনিটের সময় লাগালে এক ধাক্কা। তার পরে?"

যোগমায়া লাবণ্যর দিকে আড়চোখে চেয়ে একটু হাসলেন। অমিতর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হতে না হতেই তিনি ঠিক করে বসে আছেন এদের দুজনের বিয়ে হওয়া চাই। সেইটের প্রতি লক্ষ্য করেই বললেন, "বাবা, তোমরা দুজনে ততক্ষণ আলাপ করো, আমি এখানে তোমার খাওয়ার বন্দোবস্ত করে আসি গে।"

দ্রুততালে আলাপ জমাবার ক্ষমতা অমিতর। সে একেবারে শুরু করে দিলে, "মাসিমা আমাদের আলাপ করবার আদেশ করেছেন। আলাপের আদিতে হল নাম। প্রথমেই সেটা পাকা করে নেওয়া উচিত। আপনি আমার নাম জানেন তো? ইংরেজি ব্যাকরণে যাকে বলে প্রপার নেম।"

লাবণ্য বললে, "আমি তো জানি আপনার নাম অমিতবাবু।"

"ওটা সব ক্ষেত্রে চলে না।"

লাবণ্য হেসে বললে, "ক্ষেত্র অনেক থাকতে পারে, কিন্তু অধিকারীর নাম তো একই হওয়া চাই।"

"আপনি যে-কথাটা বলছেন ওটা একালের নয়। দেশে কালে পাত্রে ভেদ আছে অথচ নামে ভেদ নেই ওটা অবৈজ্ঞানিক। **Relativity of names** প্রচার করে আমি নামজাদা হব স্থির করেছি। তার গোড়াতেই জানাতে চাই আপনার মুখে আমার নাম অমিতবাবু নয়।"

"আপনি সাহেবি কায়দা ভালোবাসেন? মিস্টার রয়।"

"একেবারে সমুদ্রের ওপারের ওটা দূরের নাম। নামের দূরত্ব ঠিক করতে গেলে মেপে দেখতে হয় শব্দটা কানের সদর থেকে মনের অন্দরে পৌঁছোতে কতক্ষণ লাগে।"

"দ্রুতগামী নামটা কী শুনি।"

"বেগ দ্রুত করতে গেলে বস্তু কমাতে হবে। অমিতবাবুর বাবুটা বাদ দিন।"

লাবণ্য বললে, "সহজ নয়, সময় লাগবে।"

"সময়টা সকলের সমান লাগা উচিত নয়। একঘড়ি ব'লে কোনো পদার্থ নেই, ট্যাঁকঘড়ি আছে, ট্যাঁক অনুসারে তার চাল। আইনস্টাইনের এই মত।"

লাবণ্য উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আপনার কিন্তু স্নানের জল ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।"

"ঠাণ্ডা জল শিরোধার্য করে নেব, যদি আলাপটাকে আরও একটু সময় দেন।"

"সময় আর নেই, কাজ আছে" বলেই লাবণ্য চলে গেল।

অমিত তখনই স্নান করতে গেল না। স্মিতহাস্যমিশ্রিত প্রত্যেক কথাটি লাবণ্যর ঠোঁটদুটির উপর কী রকম একটি চেহারা ধরে উঠছিল, বসে বসে সেইটি ও মনে করতে লাগল। অমিত অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, তাদের সৌন্দর্য পূর্ণিমারাত্রির মতো উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন; লাবণ্যর সৌন্দর্য সকালবেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত। তাকে মেয়ে করে গড়বার সময় বিধাতা তার মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েছেন; তাকে দেখলেই বোঝা যায় তার মধ্যে কেবল বেদনার শক্তি নয় সেই সঙ্গে আছে মননের শক্তি। এইটেতেই অমিতকে এত করে আকর্ষণ করেছে। অমিতর নিজের মধ্যে বুদ্ধি আছে ক্ষমা নেই, বিচার আছে ধৈর্য নেই, ও অনেক জেনেছে শিখেছে কিন্তু শান্তি পায় নি—লাবণ্যর মুখে ও এমন একটি শান্তির রূপ দেখেছিল যে-শান্তি হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনাশক্তির গভীরতায় অচঞ্চল।

৬

নূতন পরিচয়

অমিত মিশুক মানুষ। প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে তার বেশিক্ষণ চলে না। সর্বদাই নিজে বকা-ঝকা করা অভ্যাস; গাছপালা-পাহাড়পর্বতের সঙ্গে হাসিতামাশা চলে না, তাদের সঙ্গে কোনোরকম উলটো ব্যবহার করতে গেলেই ঘা খেয়ে মরতে হয়, তারাও চলে নিয়মে, অন্যের ব্যবহারেও তারা নিয়ম প্রত্যাশা করে; এক কথায়, তারা অরসিক, সেই জন্যে শহরের বাইরে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ কী হল, শিলঙ পাহাড়টা চারদিক থেকে অমিতকে নিজের মধ্যে যেন রসিয়ে নিচ্ছে। আজ সে উঠেছে সূর্য ওঠবার আগেই; এটা ওর স্বধর্মবিরুদ্ধ। জানলা দিয়ে দেখলে, দেবদারু গাছের ঝালরগুলো কাঁপছে, আর তার পিছনে পাতলা মেঘের উপর পাহাড়ের ওপার থেকে সূর্য তার তুলির লম্বা লম্বা সোনালি টান লাগিয়েছে—

আগুনে-জ্বলা যে-সব রঙের আভা ফুটে উঠছে তার সম্বন্ধে চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা খেয়ে অমিত বেরিয়ে পড়ল। রাস্তা তখন নির্জন। একটা শ্যাওলাধরা অতি প্রাচীন পাইন গাছের তলায় স্তরে স্তরে ঝরা-পাতার সুগন্ধ-ঘন আস্তরণের উপর পা ছড়িয়ে বসল। সিগেরেট জ্বালিয়ে দুই আঙুলে অনেকক্ষণ চেপে রেখে দিলে, টান দিতে গেল ভুলে।

যোগমায়ার বাড়ির পথে এই বন। ভোজে বসবার পূর্বে রান্নাঘরটা থেকে যেমন আগাম গন্ধ পাওয়া যায়, এই জায়গা থেকে যোগমায়ার বাড়ির সৌরভটা অমিত সেই রকম ভোগ করে। সময়টা ঘড়ির ভদ্রদাগটাতে এসে পৌঁছোলেই সেখানে গিয়ে এক পেয়ালা চা দাবি করবে। প্রথমে সেখানে ওর যাবার সময় নির্দিষ্ট ছিল সন্ধ্যেবেলায়। অমিত সাহিত্যরসিক এই খ্যাতিটার সুযোগে আলাপ-আলোচনার জন্যে ও পেয়েছিল বাঁধা নিমন্ত্রণ। প্রথম দুই-চারি দিন যোগমায়া এই আলোচনায় উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু যোগমায়ার কাছে ধরা পড়ল যে, তাতে করেই এ-পক্ষের উৎসাহটাকে কিছু যেন কুণ্ঠিত করলে। বোঝা শক্ত নয় যে, তার কারণ দ্বিবচনের জায়গায় বহুবচন প্রয়োগ। তার পর থেকে যোগমায়ার অনুপস্থিত থাকবার উপলক্ষ্য ঘন ঘন ঘটত। একটু বিশ্লেষণ করতেই বোঝা গেল, সেগুলি অনিবার্য নয়, দৈবকৃত নয়, তাঁর ইচ্ছাকৃত। প্রমাণ হল, কর্তামা এই দুটি আলোচনাপরায়ণের যে-অনুরাগ লক্ষ্য করেছেন, সেটা সাহিত্যানুরাগের চেয়ে বিশেষ একটু গাঢ়তর। অমিত বুঝে নিলে যে, মাসির বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অথচ মনটি আছে কোমল। এতে করেই আলোচনা উৎসাহ তার আরও প্রবল হল। নির্দিষ্ট কালটাকে প্রশস্ততর করবার অভিপ্রায়ে যতিশংকরের সঙ্গে আপসে ব্যবস্থা করলে, তাকে সকালে এক ঘণ্টা এবং বিকেলে দু ঘণ্টা ইংরেজি সাহিত্য পড়ায় সাহায্য করবে। শুরু করলে সাহায্য,—এত বাহুল্যপরিমাণে যে, প্রায়ই সকাল গড়াত দুপুরে, সাহায্য গড়াত বাজে কথায়, অবশেষে যোগমায়ার এবং ভদ্রতার অনুরোধে মধ্যাহ্নভোজনটা অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়ত। এমনি করে দেখা গেল অবশ্যকর্তব্যতার পরিধি প্রহরে প্রহরে বেড়েই চলে।

যতিশংকরের অধ্যাপনায় ওর যোগ দেবার কথা সকাল আটটায়। ওর প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেটা ছিল অসময়। ও বলত, যে-জীবের গর্ভবাসের মেয়াদ দশ মাস তার ঘুমের মেয়াদ পশুপক্ষীদের মাপে সংগত হয় না। এতদিন অমিতর রাত্রিবেলাটা তার সকালবেলাকার অনেকগুলো ঘণ্টাকে পিলপেগাড়ি করে নিয়েছিল। ও বলত, এই চোরাই সময়টা অবৈধ বলেই ঘুমের পক্ষে সব-চেয়ে অনুকূল।

কিন্তু আজকাল ওর ঘুমটা আর অবিমিশ্র নয়। সকাল-সকাল জাগবার একটা আগ্রহ তার অন্তর্নিহিত। প্রয়োজনের আগেই ঘুম ভাঙে—তার পরে পাশ ফিরে শুতে সাহস হয় না, পাছে বেলা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিয়েছে; কিন্তু সময়-চুরির অপরাধ ধরা পড়বার ভয়ে সেটা বারবার করা সম্ভব হত না। আজ একবার ঘড়ির দিকে চাইলে, দেখলে বেলা এখনও সাতটার এপারেই। মনে হল ঘড়ি নিশ্চয় বন্ধ। কানের কাছে নিয়ে শুনলে টিকটিক শব্দ।

এমন সময় চমকে উঠে দেখে, ডান হাতে ছাতা দোলাতে দোলাতে উপরের রাস্তা দিয়ে আসছে লাবণ্য। সাদা শাড়ি, পিঠে কালো রঙের তিনকোণা শাল, তাতে কালো ঝালর। অমিতর বুঝতে বাকি নেই যে, লাবণ্যর অর্ধেক দৃষ্টিতে সে গোচর হয়েছে, কিন্তু পূর্ণদৃষ্টিতে সেটাকে মোকাবিলায় কবুল করতে লাবণ্য নারাজ। বাঁকের মুখ পর্যন্ত লাবণ্য যেই গেছে, অমিত আর থাকতে পারলে না, দৌড়োতে দৌড়োতে তার পাশে উপস্থিত।

বললে, "জানতেন এড়াতে পারবেন না, তবু দৌড় করিয়ে নিলেন। জানেন না কি, দূরে চলে গেলে কতটা অসুবিধা হয়?"

"কিসের অসুবিধা?"

অমিত বললে, "যে-হতভাগা পিছনে পড়ে থাকে তার প্রাণটা উর্ধ্বস্বরে ডাকতে চায়। কিন্তু ডাকি কী বলে? দেবদেবীদের নিয়ে সুবিধে এই যে, নাম ধরে ডাকলেই তাঁরা খুশি। দুর্গা দুর্গা বলে গর্জন করতে থাকলেও ভগবতী দশভুজা অসন্তুষ্ট হন না। আপনাদের নিয়ে যে মুশকিল।"

"না ডাকলেই চুকে যায়।"

"বিনা সম্বোধনেই চালাই যখন কাছে থাকেন। তাই তো বলি, দূরে যাবেন না। ডাকতে চাই অথচ ডাকতে পারি নে, এর চেয়ে দুঃখ আর নেই।"

"কেন, বিলিতি কায়দা তো আপনার অভ্যাস আছে।"

"মিস ডাট? সেটা চায়ের টেবিলে। দেখুন না, আজ এই আকাশের সঙ্গে পৃথিবী যখন সকালের আলোয় মিলল, সেই মিলনের লগ্নটি সার্থক করবার জন্যে উভয়ে মিলে একটি রূপ সৃষ্টি করলে, তারই মধ্যে রয়ে গেল স্বর্গমর্ত্যের ডাকনাম। মনে হচ্ছে না কি, একটা নাম ধরে ডাকা উপর থেকে নিচে আসছে, নিচে থেকে উপরে উঠে চলেছে? মানুষের জীবনেও কি ওই রকমের নাম সৃষ্টি করবার সময় উপস্থিত হয় না? কল্পনা করুন না, যেন এখনই প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে আপনাকে ডাক দিয়েছি, নামের ডাক বনে বনে ধ্বনিত হল, আকাশের ওই রঙিন মেঘের কাছ পর্যন্ত পৌঁছোল, সামনের ওই

পাহাড়টা তাই শুনে মাথায় মেঘ-মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, মনে ভাবতেও কি পারেন সেই ডাকটা মিস ডাট ?"

লাবণ্য কথাটাকে এড়িয়ে বললে, "নামকরণে সময় লাগে, আপাতত বেড়িয়ে আসি গে।"

অমিত তার সঙ্গ নিয়ে বললে, "চলতে শিখতেই মানুষের দেরি হয়, আমার হল উলটো, এতদিন পরে এখানে এসে তবে বসতে শিখেছি। ইংরেজিতে বলে, গড়ানে পাথরের কপালে শ্যাওলা জোটে না—সেই ভেবেই অন্ধকার থাকতে কখন থেকে পথের ধারে বসে আছি। তাই তো ভোরের আলো দেখলুম।"

লাবণ্য কথাটাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ওই সবুজ ডানাওআলা পাখিটার নাম জানেন ?"

অমিত বললে, "জীবজগতে পাখি আছে সেটা এতদিন সাধারণভাবেই জানতুম, বিশেষভাবে জানবার সময় পাই নি। এখানে এসে, আশ্চর্য এই যে, স্পষ্ট জানতে পেরেছি, পাখি আছে, এমন কি, তারা গানও গায়।"

লাবণ্য হেসে উঠে বললে, "আশ্চর্য।"

অমিত বললে, "হাসছেন ! আমার গভীর কথাতেও গাম্ভীর্য রাখতে পারি নে। ওটা মুদ্রাদোষ। আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, ওই গ্রহটি কৃষ্ণচতুর্দশীর সর্বনাশা রাত্রেও একটুখানি মুচকে না হেসে মরতেও জানে না।"

লাবণ্য বললে, "আমাকে দোষ দেবেন না। বোধ হয় পাখিও যদি আপনার কথা শুনত, হেসে উঠত।"

অমিত বললে, "দেখুন, আমার কথা লোকে হঠাৎ বুঝতে পারে না বলেই হাসে, বুঝতে পারলে চুপ করে বসে ভাবত। আজ পাখিকে নতুন করে জানছি এ-কথায় লোকে হাসছে। কিন্তু এর ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, আজ সমস্তই নতুন করে জানছি, নিজেকেও। এর উপরে তো হাসি চলে না। ওই দেখুন না, কথাটা একই, অথচ এইবার আপনি একেবারেই চুপ।"

লাবণ্য হেসে বললে, "আপনি তো বেশিদিনের মানুষ না, খুবই নতুন, আরও নতুনের ঝোঁক আপনার মধ্যে আসে কোথা থেকে ?"

"এর জবাবে খুব একটা গম্ভীর কথাই বলতে হল যা চায়ের টেবিলে বলা চলে না। আমার মধ্যে নতুন যেটা এসেছে সেটাই অনাদিকালের পুরোনো,—ভোরবেলাকার আলোর মতোই সে পুরোনো, নতুন-ফোটা ভুঁইচাঁপা ফুলেরই মতো, চিরকালের জিনিস, নতুন করে আবিষ্কার।"

কিছু না বলে লাবণ্য হাসলে।

অমিত বললে, "আপনার এবারকার এই হাসিটি পাহারাওআলার চোর-ধরা গোল লণ্ঠনের হাসি। বুঝেছি আপনি যে-কবির ভক্ত তার বই থেকে আমার মুখের এ-কথাটা আগেই পড়ে নিয়েছেন। দোহাই আপনার আমাকে দাগি চোর ঠাওরাবেন না,—এক-এক সময়ে এমন অবস্থা আসে, মনের ভিতরটা শংকরাচার্য হয়ে ওঠে, বলতে থাকে আমিই লিখেছি, কি আর কেউ লিখেছে এই ভেদজ্ঞানটা মায়া। এই দেখুন না, আজ সকালে বসে হঠাৎ খেয়াল গেল আমার জানা সাহিত্যের ভিতর থেকে এমন একটা লাইন বের করি, যেটা মনে হবে এইমাত্র স্বয়ং আমি লিখলুম, আর কোনো কবির লেখবার সাধ্যই ছিল না।"

লাবণ্য থাকতে পারলে না, প্রশ্ন করলে, "বের করতে পেরেছেন ?"

"হাঁ, পেরেছি।"

লাবণ্যর কৌতূহল আর বাধা মানল না, জিজ্ঞাসা করে ফেললে, "লাইনটা কী বলুন না।"

"For God's sake, hold your tongue
and let me love!"

লাবণ্যর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল।

অনেকক্ষণ পরে অমিত জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি নিশ্চয় জানেন লাইনটা কার।"

লাবণ্য একটু মাথা বেঁকিয়ে ইশারায় জানিয়ে দিলে, "হাঁ।"

অমিত বললে, "সেদিন আপনার টেবিলে ইংরেজ কবি ডন-এর বই আবিষ্কার করলুম, নইলে এ-লাইন আমার মাথায় আসত না।"

"আবিষ্কার করলেন ?"

"আবিষ্কার নয় তো কী ? বইয়ের দোকানে বই চোখে পড়ে, আপনার টেবিলে বই প্রকাশ পায়। পাব্লিক লাইব্রেরির টেবিল দেখেছি, সেটা তো বইগুলিকে বহন করে, আপনার টেবিল দেখলুম, সে যে বইগুলিকে বাসা দিয়েছে। সেদিন ডন-এর কবিতাকে প্রাণ দিয়ে দেখতে পেয়েছি। মনে হল, অন্য কবির দরজায় ঠেলাঠেলি ভিড়; বড়োলোকের শ্রাদ্ধে কাঙালি-বিদায়ের মতো। ডন-এর কাব্যমহল নির্জন, ওখানে দুটি মানুষ পাশাপাশি বসবার জায়গাটুকু আছে। তাই অমন স্পষ্ট করে শুনতে পেলুম আমার সকালবেলাকার মনের কথাটি—

দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর্।
ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।"

লাবণ্য বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি বাংলা কবিতা লেখেন না কি ?"

"ভয় হচ্ছে আজ থেকে লিখতে শুরু করব বা। নতুন অমিত রায় কী যে কাণ্ড করে বসবে পুরোনো অমিত রায়ের তা কিছু জানা নেই। হয়তো বা সে এখনই লড়াই করতে বেরোবে।"

"লড়াই ? কার সঙ্গে ?

"সেইটে ঠিক করতে পারছি নে। কেবলই মনে হচ্ছে খুব মস্ত কিছু একটার জন্যে এক্‌খুনি চোখ বুজে প্রাণ দিয়ে ফেলা উচিত, তার পরে অনুতাপ করতে হয় রয়ে বসে করা যাবে।"

লাবণ্য হেসে বললে, "প্রাণ যদি দিতেই হয় তো সাবধানে দেবেন।"

"সে-কথা আমাকে বলা অনাবশ্যক। কম্যুন্যাল রায়টের মধ্যে আমি যেতে নারাজ। মুসলমান বাঁচিয়ে ইংরেজ বাঁচিয়ে চলব। যদি দেখি বুড়োসুড়ো গোছের মানুষ, অহিংস্র মেজাজের ধার্মিক চেহারা, শিঙে বাজিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলেছে—তার সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকিয়ে বলব, যুদ্ধং দেহি। ওই যে-লোক অজীর্ণ রোগ সারবার জন্যে হাসপাতালে না গিয়ে এমন পাহাড়ে আসে, খিদে বাড়াবার জন্যে নির্লজ্জ হয়ে হাওয়া খেতে বেরোয়।"

লাবণ্য হেসে বললে, "লোকটা তবু যদি অমান্য করে চলে যায়।"

"তখন আমি পিছন থেকে দু-হাত আকাশে তুলে বলব—এবারকার মতো ক্ষমা করলুম, তুমি আমার ভ্রাতা, আমরা এক ভারতমাতার সন্তান।—বুঝতে পারছেন, মন যখন খুব বড়ো হয়ে ওঠে তখন মানুষ যুদ্ধও করে, ক্ষমাও করে।"

লাবণ্য হেসে বললে, "আপনি যখন যুদ্ধের প্রস্তাব করেছিলেন মনে ভয় হয়েছিল, কিন্তু ক্ষমার কথা যে-রকম বোঝালেন তাতে আশ্বস্ত হলুম যে, ভাবনা নেই।"

অমিত বললে, "আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ?"

"কী, বলুন।"

"আজ খিদে বাড়াবার জন্যে আর বেশি বেড়াবেন না।"

"আচ্ছা বেশ, তার পরে ?"

"ওই নিচে গাছতলায় যেখানে নানা রঙের ছ্যাতলাপড়া পাথরটার নিচে দিয়ে একটুখানি জল ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে ওইখানে বসবেন আসুন।"

লাবণ্য হাতে-বাঁধা ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে, "কিন্তু সময় যে অল্প।"

"জীবনে সেইটেই তো শোচনীয় সমস্যা, লাবণ্য দেবী, সময় অল্প। মরুপথে সঙ্গে আছে আধ মশক মাত্র জল, যাতে সেটা উছলে উছলে শুকনো ধুলোয় মারা না যায় সেটা

নিতান্তই করা চাই। সময় যাদের বিস্তর তাদেরই পাঙ্কচুয়াল হওয়া শোভা পায়, দেবতার হাতে সময় অসীম, তাই ঠিক সময়টিতে সূর্য ওঠে ঠিক সময়ে অস্ত যায়। আমাদের মেয়াদ অল্প, পাঙ্কচুয়াল হতে গিয়ে সময় নষ্ট করা আমাদের পক্ষে অমিতব্যয়িতা। অমরাবতীর কেউ যদি প্রশ্ন করে, 'ভবে এসে করলে কী', তখন কোন্ লজ্জায় বলব, 'ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে কাজ করতে করতে জীবনের যা-কিছু সকল সময়ের অতীত তার দিকে চোখ তোলবার সময় পাই নি।' তাই তো বলতে বাধ্য হলুম, চলুন ওই জায়গাটাতে।"

ওর যেটাতে আপত্তি নেই সেটাতে আর কারও যে আপত্তি থাকতে পারে অমিত সেই আশঙ্কাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে কথাবার্তা কয়। সেইজন্যে তার প্রস্তাবে আপত্তি করা শক্ত। লাবণ্য বললে, "চলুন।"

ঘনবনের ছায়া। সরু পথ নেমেছে নিচে একটা খাসিয়া গ্রামের দিকে। অর্ধপথে আর-এক পাশ দিয়ে ক্ষীণ ঝরনার ধারা একজায়গায় লোকালয়ের পথটাকে অস্বীকার করে তার উপর দিয়ে নিজের অধিকারচিহ্নস্বরূপ নুড়ি বিছিয়ে স্বতন্ত্র পথ চালিয়ে গেছে। সেইখানে পাথরের উপরে দুজনে বসল। ঠিক সেই জায়গায় খাদটা গভীর হয়ে খানিকটা জল জমে আছে, যেন সবুজ পর্দার ছায়ায় একটি পর্দানশীন মেয়ে, বাইরে পা বাড়াতে তার ভয়। এখানকার নির্জনতার আবরণটাই লাবণ্যকে নিরাবরণের মতো লজ্জা দিতে লাগল। সামান্য যা-তা একটা কিছু বলে এইটেকে ঢাকা দিতে ইচ্ছে করছে, কিছুতেই কোনো কথা মনে আসছে না,—স্বপ্নে যে-রকম কণ্ঠরোধ হয় সেই দশা।

অমিত বুঝতে পারলে, একটা-কিছু বলাই চাই। বললে, "দেখুন আর্যা, আমাদের দেশে দুটো ভাষা, একটা সাধু আর একটা চলতি। কিন্তু এ-ছাড়া আরও একটা ভাষা থাকা উচিত ছিল, সমাজের ভাষা নয়, ব্যবসায়ের ভাষা নয়, আড়ালের ভাষা, এই রকম জায়গার জন্যে। পাখির গানের মতো, কবির কাব্যের মতো,—সেই ভাষা অনায়াসেই কণ্ঠ দিয়ে বেরোনো উচিত ছিল, যেমন করে কান্না বেরোয়। সেজন্যে মানুষকে বইয়ের দোকানে ছুটতে হয় সেটা বড়ো লজ্জা। প্রত্যেকবার হাসির জন্যে যদি ডেন্টিস্টের দোকানে দৌড়াদৌড়ি করতে হত তা হলে কী হত ভেবে দেখুন। সত্যি বলুন, লাবণ্য দেবী, এখনই আপনার সুর করে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না?"

লাবণ্য মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে রইল।

অমিত বললে, "চায়ের টেবিলের ভাষায় কোন্‌টা ভদ্র, কোন্‌টা অভদ্র, তার হিসেব মিটতে চায় না। কিন্তু এ জায়গায় ভদ্রও নেই, অভদ্রও নেই। তাহলে কী উপায় বলুন। মনটাকে সহজ করবার জন্যে একটা কবিতা না আওড়ালে তো চলছে না।

গল্পে অনেক সময় নেয়, অত সময় তো হাতে নেই। যদি অনুমতি করেন তো আরম্ভ করি।"

দিতে হল অনুমতি, নইলে লজ্জা করতে গেলেই লজ্জা।

অমিত ভূমিকায় বললে, "রবি ঠাকুরের কবিতা বোধ হয় আপনার ভালো লাগে।"

"হাঁ, লাগে।"

"আমার লাগে না। অতএব আমাকে মাপ করবেন। আমার একজন বিশেষ কবি আছে, তার লেখা এত ভালো যে, খুব অল্প লোকেই পড়ে। এমন কি, তাকে কেউ গাল দেবার উপযুক্ত সম্মানও দেয় না। ইচ্ছে করছি আমি তার থেকে আবৃত্তি করি।"

"আপনি এত ভয় করছেন কেন?"

"এ-সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা শোকাবহ। কবিবরকে নিন্দে করলে আপনারা জাতে ঠেলেন, তাকে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে বাদ দিয়ে চললে তাতে করেও কঠোর ভাষার সৃষ্টি হয়। যা আমার ভালো লাগে তাই আর-একজনের ভালো লাগে না, এই নিয়েই পৃথিবীতে যত রক্তপাত।"

"আমার কাছ থেকে রক্তপাতের ভয় করবেন না। আপন রুচির জন্যে আমি পরের রুচির সমর্থন ভিক্ষে করি নে।"

"এটা বেশ বলেছেন, তাহলে নির্ভয়ে শুরু করা যাক।—

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে,
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে?

বিষয়টা দেখছেন? না-চেনার বন্ধন। সব-চেয়ে কড়া বন্ধন। না-চেনা জগতে বন্দী হয়েছি, চিনে নিয়ে তবে খালাস পাব, একেই বলে মুক্তিতত্ত্ব।

কোন্ অন্ধক্ষণে
বিজড়িত তন্দ্রা-জাগরণে
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর,
মুখ দেখিলাম তোর।
চক্ষু 'পরে চক্ষু রাখি' শুধালেম, "কোথা সংগোপনে
আছ আত্মবিস্মৃতির কোণে?"

নিজেকেই ভুলে-থাকার মতো কোনো এমন ঝাপসা কোণ আর নেই। সংসারে কত যে দেখবার ধন দেখা হল না, তারা আত্মবিস্মৃতির কোণে মিলিয়ে আছে। তাই বলে তো হাল ছেড়ে দিলে চলে না।

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না,
কানে কানে মৃদুকণ্ঠে নয়।
করে নেব জয়
সংশয়কুণ্ঠিত তোর বাণী ;
দৃপ্ত বলে লব টানি'
শঙ্কা হতে, লজ্জা হতে, দ্বিধা দ্বন্দ্ব হতে
নির্দয় আলোতে।

একেবারে নাছোড়বান্দা। কতবড়ো জোর। দেখেছেন রচনার পৌরুষ।

জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্তে চিনিবি আপনারে ;
ছিন্ন হবে ডোর,
তোরে মুক্তি দিয়ে তবে মুক্তি হবে মোর।

ঠিক এই তানটি আপনার নামজাদা লেখকের মধ্যে পাবেন না, সূর্যমণ্ডলে এ যেন আগুনের ঝড়। এ শুধু লিরিক নয়, এ নিষ্ঠুর জীবনতত্ত্ব।"—লাবণ্যর মুখের দিকে এক-দৃষ্টিতে চেয়ে বললে,—

"হে অচেনা,
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় রবে না,
তীব্র আকস্মিক
বাধা বন্ধ ছিন্ন করি দিক,
তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্ত শিখা উঠুক উজ্জ্বলি
দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।"

আবৃত্তি শেষ হতে না হতেই অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধরলে। লাবণ্য হাত ছাড়িয়ে নিলে না। অমিতর মুখের দিকে চাইলে, কিছু বললে না।

এর পরে কোনো কথা বলবার কোনো দরকার হল না। লাবণ্য ঘড়ির দিকে চাইতেও ভুলে গেল।

৭

ঘটকালি

অমিত যোগমায়ার কাছে এসে বললে, "মাসিমা, ঘটকালি করতে এলেম। বিদায়ের বেলা কৃপণতা করবেন না।"

"পছন্দ হলে তবে তো। আগে নাম-ধাম-বিবরণটা বলো।"

অমিত বললে, "নাম নিয়ে পাত্রটির দাম নয়।"

"তাহলে ঘটক-বিদায়ের হিসাব থেকে কিছু বাদ পড়বে দেখছি।"

"অন্যায় কথা বললেন। নাম যার বড়ো তার সংসারটা ঘরে অল্প, বাইরেই বেশি। ঘরের মন-রক্ষার চেয়ে বাইরে মান-রক্ষাতেই তার যত সময় যায়। মানুষটার অতি অল্প অংশই পড়ে স্ত্রীর ভাগে, পুরো বিবাহের পক্ষে সেটুকু যথেষ্ট নয়। নামজাদা মানুষের বিবাহ স্বল্পবিবাহ, বহুবিবাহের মতোই গর্হিত।"

"আচ্ছা, নামটা না হয় খাটো হল, রূপটা?"

"বলতে ইচ্ছে করি নে, পাছে অত্যুক্তি করে বসি।"

"অত্যুক্তির জোরেই বুঝি বাজারে চালাতে হবে?"

"পাত্র বাছাইয়ের বেলায় দুটি জিনিস লক্ষ্য করা চাই,—নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাড়িয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে।"

"আচ্ছা নামরূপ থাক, বাকিটা?"

"বাকি যেটা রইল সব-জড়িয়ে সেটাকে বলে পদার্থ। তা লোকটা অপদার্থ নয়।"

"বুদ্ধি?"

"লোকে যাতে ওকে বুদ্ধিমান বলে হঠাৎ ভ্রম করে সেটুকু বুদ্ধি ওর আছে।"

"বিদ্যে?"

"স্বয়ং নিউটনের মতো। ও জানে যে জ্ঞানসমুদ্রের কূলে সে নুড়ি কুড়িয়েছে মাত্র। তাঁর মতো সাহস করে বলতে পারে না, পাছে লোকে ফস করে বিশ্বাস করে বসে।"

"পাত্রের যোগ্যতার ফর্দটা তো দেখছি কিছু খাটো গোছের।"

"অন্নপূর্ণার পূর্ণতা প্রকাশ করতে হবে বলেই শিব নিজেকে ভিখারি কবুল করেন, একটুও লজ্জা নেই।"

"তাহলে পরিচয়টা আরও একটু স্পষ্ট করো।"

"জানা ঘর। পাত্রটির নাম অমিতকুমার রায়। হাসছেন কেন, মাসিমা? ভাবছেন কথাটা ঠাট্টা।"

"সে-ভয় মনে আছে, বাবা, পাছে শেষ পর্যন্ত ঠাট্টাই হয়ে ওঠে।"

"এ সন্দেহটা পাত্রের 'পরে দোষারোপ।"

"বাবা, সংসারটাকে হেসে হালকা করে রাখা কম ক্ষমতা নয়।"

"মাসি, দেবতাদের সেই ক্ষমতা আছে, তাই দেবতারা বিবাহের অযোগ্য, দময়ন্তী সে-কথা বুঝেছিলেন।"

"আমার লাবণ্যকে সত্যি কি তোমার পছন্দ হয়েছে?"

"কী রকম পরীক্ষা চান, বলুন।"

"একমাত্র পরীক্ষা হচ্ছে, লাবণ্য যে তোমার হাতেই আছে, এইটি তোমার নিশ্চিত জানা।"

"কথাটাকে আর-একটু ব্যাখ্যা করুন।"

"যে-রত্নকে সস্তায় পাওয়া গেল, তারও আসল মূল্য যে বোঝে সে-ই জানব জহুরি।"

"মাসিমা, কথাটাকে বড়ো বেশি সূক্ষ্ম করে তুলছেন। মনে হচ্ছে যেন একটা ছোটো গল্পের সাইকোলজিতে শান লাগিয়েছেন। কিন্তু কথাটা আসলে যথেষ্ট মোটা,— জাগতিক নিয়মে এক ভদ্রলোক, এক ভদ্ররমণীকে বিয়ে করবার জন্যে খেপেছে। দোষেগুণে ছেলেটি চলনসই, মেয়েটির কথা বলা বাহুল্য। এমন অবস্থায় সাধারণ মাসিমার দল স্বভাবের নিয়মেই খুশি হয়ে তখনই ঢেঁকিতে আনন্দনাড়ু কুটতে শুরু করেন।"

"ভয় নেই, বাবা, ঢেঁকিতে পা পড়েছে। ধরেই নাও, লাবণ্যকে তুমি পেয়েইছ। তার পরেও হাতে পেয়েও যদি তোমার পাবার ইচ্ছে প্রবল থেকেই যায় তবেই বুঝব লাবণ্যর মতো মেয়েকে বিয়ে করবার তুমি যোগ্য।"

"আমি যে এ-হেন আধুনিক আমাকে সুদ্ধ তাক লাগিয়ে দিলেন।"

"আধুনিকের লক্ষণটা কী দেখলে?

"দেখছি বিংশ শতাব্দীর মাসিমারা বিয়ে দিতেও ভয় পান।"

"তার কারণ আগেকার শতাব্দীর মাসিমারা যাদের বিয়ে দিতেন তারা ছিল খেলার পুতুল। এখন যারা বিয়ের উমেদার মাসিমাদের খেলার শখ মেটাবার দিকে তাদের মন নেই।"

"ভয় নেই আপনার। পেয়ে পাওয়া ফুরোয় না, বরঞ্চ চাওয়া বেড়েই ওঠে, লাবণ্যকে বিয়ে করে এই তত্ত্ব প্রমাণ করবে বলেই অমিত রায় মর্ত্যে অবতীর্ণ। নইলে, আমার মোটরগাড়িটা অচেতন পদার্থ হয়েও অস্থানে অসময়ে এমন অদ্ভুত অঘটন ঘটিয়ে বসবে কেন?"

"বাবা, বিবাহযোগ্য বয়সের সুর এখনও তোমার কথাবার্তায় লাগছে না, শেষে সমস্তটা বাল্যবিবাহ হয়ে না দাঁড়ায়।"

"মাসিমা, আমার মনের স্বকীয় একটা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আছে, তারই গুণে আমার হৃদয়ের ভারী কথাগুলোও মুখে খুব হালকা হয়ে ভেসে ওঠে, তাই বলে তার ওজন কমে না।"

যোগমায়া গেলেন ভোজের ব্যবস্থা করতে। অমিত এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে বেড়ালে, দর্শনীয় কাউকে দেখতে পেলে না। দেখা হল যতিশংকরের সঙ্গে। মনে পড়ল আজ তাকে অ্যান্টনি ক্লিয়োপ্যাট্রা পড়াবার কথা। অমিতর মুখের ভাব দেখেই যতি বুঝেছিল জীবের প্রতি দয়া করেই আজ তার ছুটি নেওয়া আশু কর্তব্য। সে বললে, "অমিতদা, কিছু যদি মনে না কর, আজ আমি ছুটি চাই, আপার শিলঙে বেড়াতে যাব।"

অমিত পুলকিত হয়ে বললে, "পড়ার সময় যারা ছুটি নিতে জানে না, তারা পড়ে, পড়া হজম করে না। তুমি ছুটি চাইলে আমি কিছু মনে করব এমন অসম্ভব ভয় করছ কেন?"

"কাল রবিবার ছুটি তো আছেই, পাছে তুমি তাই ভাব—"

"ইস্কুলমাস্টারি বুদ্ধি আমার নয় ভাই, বরাদ্দ ছুটিকে ছুটি বলিই নে। যে-ছুটি নিয়মিত, তাকে ভোগ করা, আর বাঁধা পশুকে শিকার করা একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়।"

হঠাৎ যে-উৎসাহে অমিতকুমার ছুটিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় মেতে উঠল তার মূল কারণটা অনুমান করে যতির খুব মজা লাগল। সে বললে, "কয়দিন থেকে ছুটিতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার মাথায় নতুন নতুন ভাব উঠছে। সেদিনও আমাকে উপদেশ দিয়েছিলে। এমন আর কিছুদিন চললেই ছুটি নিতে আমার হাত পেকে যাবে।"

"সেদিন কী উপদেশ দিয়েছিলুম?"

"বলেছিলে, 'অকর্তব্যবুদ্ধি মানুষের একটা মহদ্‌গুণ। তার ডাক পড়লেই একটুও বিলম্ব করা উচিত হয় না।' বলেই বই বন্ধ করে তখনই বাইরে দিলে ছুট। বাইরে হয়তো একটা অকর্তব্যের কোথাও আবির্ভাব হয়েছিল, লক্ষ্য করি নি।"

যতির বয়স বিশের কোঠায়। অমিতর মনে যে-চাঞ্চল্য উঠেছে ওর নিজের মনেও তার আন্দোলনটা এসে লাগছে। ও লাবণ্যকে এতদিন শিক্ষকজাতীয় বলেই ঠাউরেছিল, আজ অমিতর অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পেরেছে, সে নারীজাতীয়।

অমিত হেসে বললে, "কাজ উপস্থিত হলেই প্রস্তুত হওয়া চাই, এই উপদেশের বাজারদর বেশি, আকবরি মোহরের মতো,—কিন্তু ওর উলটো পিঠে খোদাই থাকা উচিত, অকাজ উপস্থিত হলেই সেটাকে বীরের মতো মেনে নেওয়া চাই।"

"তোমার বীরত্বের পরিচয় আজকাল প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে।"

যতির পিঠ চাপড়িয়ে অমিত বললে, "জরুরি কাজটাকে এক কোপে বলি দেবার পবিত্র অষ্টমী তিথি তোমার জীবনপঞ্জিকায় একদিন যখন আসবে দেবীপূজায় বিলম্ব ক'রো না, ভাই, তার পরে বিজয়াদশমী আসতে দেরি হয় না।"

যতি গেল চলে, অকর্তব্যবুদ্ধিও সজাগ, যাকে আশ্রয় করে অকাজ দেখা দেয় তারও দেখা নেই। অমিত ঘর ছেড়ে গেল বাইরে।

ফুলে আচ্ছন্ন গোলাপের লতা, একধারে সূর্যমুখীর ভিড়, আর-একধারে চৌকো কাঠের টবে চন্দ্রমল্লিকা। ঢালুঘাসের খেতের উপরপ্রান্তে এক মস্ত য়ুক্যালিপ্‌টস গাছ। তারই গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছে লাবণ্য। ছাই রঙের আলোয়ান গায়ে, পায়ের উপর পড়েছে সকালবেলাকার রোদ্দুর। কোলে রুমালের উপর কিছু রুটির টুকরো, কিছু ভাঙা আখরোট। আজ সকালটা জীবসেবায় কাটাবে ঠাউরেছিল, তাও গেছে ভুলে। অমিত কাছে এসে দাঁড়াল, লাবণ্য মাথা তুলে তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল, মৃদু হাসিতে মুখ গেল ছেয়ে। অমিত সামনা-সামনি বসে বললে, "সুখবর আছে। মাসিমার মত পেয়েছি।"

লাবণ্য তার কোনো উত্তর না করে অদূরে একটা নিষ্ফলা পিচগাছের দিকে একটা ভাঙা আখরোট ফেলে দিলে। দেখতে দেখতে তার গুঁড়ি বেয়ে একটা কাঠবিড়ালি নেমে এল। এই জীবটি লাবণ্যর মুষ্টিভিখারিদলের একজন।

অমিত বললে, "যদি আপত্তি না কর তোমার নামটা একটু ছেঁটে দেব।"

"তা দাও।"

"তোমাকে ডাকব বন্য বলে।"

"বন্য!"

"না না, এ-নামটাতে হয়তো বা তোমার বদনাম হল। এ-রকম নাম আমাকেই সাজে। তোমাকে ডাকব, বন্যা। কী বল?"

"তাই ডেকো, কিন্তু তোমার মাসিমার কাছে নয়।"

"কিছুতেই নয়। এ-সব নাম বীজমন্ত্রের মতো, কারও কাছে ফাঁস করতে নেই। এ রইল আমার মুখে আর তোমার কানে।"

"আচ্ছা বেশ।"

"আমারও ওইরকমের একটা বেসরকারি নাম চাই তো। ভাবছি ব্রহ্মপুত্র কেমন হয়? বন্যা হঠাৎ এল তারই কূল ভাসিয়ে দিয়ে।"

"নামটা সর্বদা ডাকবার পক্ষে ওজনে ভারি।"

"ঠিক বলেছ। কুলি ডাকতে হবে ডাকবার জন্যে। তুমিই তাহলে নামটা দাও। সেটা হবে তোমারই সৃষ্টি।"

"আচ্ছা, আমিও দেব তোমার নাম ছেঁটে। তোমাকে বলব মিতা।"

"চমৎকার! পদাবলীতে ওরই একটি দোসর আছে, বঁধু। বন্যা, মনে ভাবছি, ওই নামে না হয় আমাকে সবার সামনেই ডাকলে, তাতে দোষ কী?"

"ভয় হয় এক কানের ধন পাঁচ কানে পাছে সস্তা হয়ে যায়।"

"সে-কথা মিছে নয়। দুইয়ের কানে যেটা এক, পাঁচের কানে সেটা ভগ্নাংশ। বন্যা।"

"কী মিতা?"

"তোমার নামে যদি কবিতা লিখি তো কোন্ মিলটা লাগাব জান?—অনন্যা।"

"তাতে কী বোঝাবে?"

"বোঝাবে তুমি যা তুমি তাই-ই, তুমি আর কিছুই নও।"

"সেটা বিশেষ আশ্চর্যের কথা নয়।"

"বল কী, খুবই আশ্চর্যের কথা। দৈবাৎ এক-একজন মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় যাকে দেখেই চমকে বলে উঠি এ-মানুষটি একেবারে নিজের মতো। পাঁচজনের মতো নয়। সেই কথাটি আমি কবিতায় বলব—

হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা,
আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা।"

"তুমি কবিতা লিখবে না কি?"

"নিশ্চয়ই লিখব। কার সাধ্য রোধে তার গতি।"

"এমন মরিয়া হয়ে উঠলে কেন?"

"কারণ বলি। কাল রাত্তির আড়াইটা পর্যন্ত, ঘুম না হলে যেমন এ-পাশ ও-পাশ করতে হয়, তেমনি করেই কেবলই অক্সফোর্ড বুক অফ ভার্সেস-এর এ-পাত ও-পাত উলটেছি। ভালোবাসার কবিতা খুঁজেই পেলুম না, আগে সেগুলো পায়ে পায়ে ঠেকত। স্পষ্টই বুঝতে পারছি আমি লিখব বলেই সমস্ত পৃথিবী আজ অপেক্ষা করে আছে।"

এই বলেই লাবণ্যর বাঁ হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে চেপে ধরে বললে, "হাত

জোড়া পড়ল, কলম ধরব কী দিয়ে। সব-চেয়ে ভালো মিল হাতে-হাতে মিল। এই যে তোমার আঙুলগুলি আমার আঙুলে আঙুলে কথা কইছে কোনো কবিই এমন সহজ করে কিছু লিখতে পারলে না।"

"কিছুই তোমার সহজে পছন্দ হয় না, সেইজন্যে তোমাকে এত ভয় করি, মিতা।"

"কিন্তু আমার কথাটা বুঝে দেখো। রামচন্দ্র সীতার সত্য যাচাই করতে চেয়েছিলেন বাইরের আগুনে; তাতেই সীতাকে হারালেন। কবিতার সত্য যাচাই হয় অগ্নিপরীক্ষায়, সে আগুন অন্তরের। যার মনে নেই সেই আগুন, সে যাচাই করবে কী দিয়ে? তাকে পাঁচজনের মুখের কথা মেনে নিতে হয়, অনেক সময়ই সেটা দুর্মুখের কথা। আমার মনে আজ আগুন জ্বলেছে, সেই আগুনের ভিতর দিয়ে আমার পুরোনো সব পড়া আবার পড়ে নিচ্ছি, কত অল্পই টিকল। সব হু হু শব্দে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কবিদের হট্টগোলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আজ আমাকে বলতে হল, তোমরা অত চেঁচিয়ে কথা ক'য়ো না, ঠিক কথাটি আস্তে বলো—

For God's sake, hold your tongue

and let me love"

অনেকক্ষণ দু-জনে চুপ করে বসে রইল। তার পরে এক সময়ে লাবণ্যর হাতখানি তুলে ধরে অমিত নিজের মুখের উপর বুলিয়ে নিলে। বললে, "ভেবে দেখো বন্যা, আজ এই সকালে ঠিক এই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীতে কত অসংখ্য লোকই চাচ্ছে, আর কত অল্প লোকই পেলে। আমি সেই অতি অল্প লোকের মধ্যে একজন। সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই সেই সৌভাগ্যবান লোককে দেখতে পেলে শিলঙ পাহাড়ের কোণে এই য়ুক্যালিপটস গাছের তলায়। পৃথিবীতে পরমাশ্চর্য ব্যাপারগুলিই পরম নম্র, চোখে পড়তে চায় না। অথচ তোমাদের ওই তারিণী তলাপাত্র কলকাতার গোলদিঘি থেকে আরম্ভ করে নোয়াখালি চাটগাঁ পর্যন্ত চাংকার-শব্দে শূন্যের দিকে খুষি উঁচিয়ে বাঁকা পলিটিক্সের ফাঁকা আওয়াজ ছড়িয়ে এল, সেই দুর্দান্ত বাজে খবরটা বাংলা দেশের সর্বপ্রধান খবর হয়ে উঠল। কে জানে হয়তো এইটেই ভালো।"

"কোন্‌টা ভালো?"

"ভালো এই যে, সংসারের আসল জিনিসগুলো হাটেবাটেই চলাফেরা করে বেড়ায়, অথচ বাজে লোকের চোখের ঠোকর পেয়ে পেয়ে মরে না। তার গভীর জানাজানি বিশ্বজগতের অন্তরের নাড়ীতে নাড়ীতে।—আচ্ছা, বন্যা, আমি তো বকেই চলেছি, তুমি চুপ করে বসে কী ভাবছ বলো তো।"

লাবণ্য চোখ নিচু করে বসে রইল, জবাব করলে না।

অমিত বললে, "তোমার এই চুপ করে থাকা যেন মাইনে না দিয়ে আমার সব কথাকে বরখাস্ত করে দেওয়ার মতো।"

লাবণ্য চোখ নিচু করেই বললে, "তোমার কথা শুনে আমার ভয় হয়, মিতা।"

"ভয় কিসের?"

"তুমি আমার কাছে কী যে চাও আর আমি তোমাকে কতটুকুই বা দিতে পারি ভেবে পাই নে।"

"কিছু না ভেবেই তুমি দিতে পার এইটেতেই তো তোমার দানের দাম।"

"তুমি যখন বললে কর্তামা সম্মতি দিয়েছেন আমার মনটা কেমন করে উঠল। মনে হল এইবার আমার ধরা পড়বার দিন আসছে।"

"ধরাই তো পড়তে হবে।"

"মিতা, তোমার রুচি তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চলতে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহুদূরে পিছিয়ে পড়ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না। সেদিন আমি তোমাকে একটুও দোষ দেব না,—না না, কিছু ব'লো না, আমার কথাটা আগে শোনো। মিনতি করে বলছি, আমাকে বিয়ে করতে চেয়ো না। বিয়ে করে তখন গ্রন্থি খুলতে গেলে তাতে আরও জট পড়ে যাবে। তোমার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি সে আমার পক্ষে যথেষ্ট, জীবনের শেষ পর্যন্ত চলবে। তুমি কিন্তু নিজেকে ভুলিয়ো না।"

"বন্যা, তুমি আজকের দিনের ঔদার্যের মধ্যে কালকের দিনের কার্পণ্যের আশঙ্কা কেন তুলছ?"

"মিতা, তুমিই আমাকে সত্য বলবার জোর দিয়েছ। আজ তোমাকে যা বলছি তুমি নিজেও তা ভিতরে ভিতরে জান। মানতে চাও না, পাছে যে-রস এখন ভোগ করছ তাতে একটুও খটকা বাধে। তুমি তো সংসার ফাঁদবার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে ফের; সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছেও সেইজন্যেই তুমি এসেছ। বলব ঠিক কথাটা? বিয়েটাকে তুমি মনে-মনে জান, যাকে তুমি সর্বদাই বল, ভালগার। ওটা বড়ো রেসপেক্টেবল; ওটা শাস্ত্রের-দোহাই-পাড়া, সেই সব বিষয়ী লোকের পোষা জিনিস যারা সম্পত্তির সঙ্গে সহধর্মিণীকে মিলিয়ে নিয়ে খুব মোটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে।"

"বন্যা, তুমি আশ্চর্য নরম সুরে আশ্চর্য কঠিন কথা বলতে পার।"

"মিতা, ভালোবাসার জোরে চিরদিন যেন কঠিন থাকতেই পারি, তোমাকে ভোলাতে গিয়ে একটুও ফাঁকি যেন না দিই। তুমি যা আছ ঠিক তাই থাকো, তোমার রুচিতে

আমাকে যতটুকু ভালো লাগে ততটুকুই লাগুক, কিন্তু একটুও তুমি দায়িত্ব নিয়ো না,—তাতেই আমি খুশি থাকব।"

"বন্যা, এবার তবে আমার কথাটা বলতে দাও। কী আশ্চর্য করেই তুমি আমার চরিত্রের ব্যাখ্যা করেছ। তা নিয়ে কথা-কাটাকাটি করব না। কিন্তু একটা জায়গায় তোমার ভুল আছে। মানুষের চরিত্র জিনিসটাও চলে। ঘর-পোষা অবস্থায় তার একরকম শিকলি-বাঁধা স্থাবর পরিচয়। তার পরে একদিন ভাগ্যের হঠাৎ এক ঘায়ে তার শিকলি কাটে, সে ছুট দেয় অরণ্যে, তখন তার আর-এক মূর্তি।"

"আজ তুমি তার কোন্‌টা?"

"যেটা আমার বরাবরের সঙ্গে মেলে না, সেইটে। এর আগে অনেক মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, সমাজের কাটা খাল বেয়ে বাঁধা ঘাটে, রুচির ঢাকা-লণ্ঠন জ্বালিয়ে। তাতে দেখাশোনা হয়, চেনাশোনা হয় না। তুমি নিজেই বলো, বন্যা, তোমার সঙ্গেও কি আমার সেই আলাপ?"

লাবণ্য চুপ করে রইল।

অমিত বললে, "বাইরে বাইরে দুই নক্ষত্র পরস্পরকে সেলাম করতে করতে প্রদক্ষিণ করে চলে, কায়দাটা বেশ শোভন, নিরাপদ, সেটাতে যেন তাদের রুচির টান, মর্মের মিল নয়। হঠাৎ যদি মরণের ধাক্কা লাগে, নিবে যায় দুই তারার লণ্ঠন, দোঁহে এক হয়ে ওঠবার আগুন ওঠে জ্ব'লে। সেই আগুন জ্বলেছে, অমিত রায় বদলে গেল। মানুষের ইতিহাসটাই এইরকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে। তুমি আমার তাল বদলিয়ে দিয়েছ, বন্যা, সেই তালেই তো তোমার সুরে আমার সুরে গাঁথা পড়ল।"

লাবণ্যর চোখের পাতা ভিজে এল। তবু এ-কথা মনে না-করে থাকতে পারলে না যে, অমিতর মনের গড়নটা সাহিত্যিক, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় ওর মুখে কথার উচ্ছ্বাস তোলে। সেইটে ওর জীবনের ফসল, তাতেই ও পায় আনন্দ। আমাকে ওর প্রয়োজন সেইজন্যেই। যে-সব কথা ওর মনে বরফ হয়ে জমে আছে, ও নিজে যার ভার বোধ করে, কিন্তু আওয়াজ পায় না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে হবে।

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে লাবণ্য হঠাৎ এক সময়ে প্রশ্ন করলে, "আচ্ছা, মিতা, তুমি কি মনে কর না, যেদিন তাজমহল তৈরি শেষ হল, সেদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্যে শাজাহান খুশি হয়েছিলেন? তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্যে এই মৃত্যুর দরকার

ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সব-চেয়ে বড়ো প্রেমের দান। তাজমহলে শাজাহানের শোক প্রকাশ পায় নি, তাঁর আনন্দ রূপ ধরেছে।”

অমিত বললে, “তোমার কথায় তুমি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে চমক লাগিয়ে দিচ্ছ। তুমি নিশ্চয়ই কবি।”

“আমি চাই নে কবি হতে।”

“কেন চাও না ?”

“জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। জগতে যারা উৎসবসভা সাজাবার হুকুম পেয়েছে কথা তাদের পক্ষেই ভালো। আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যেই।”

“বন্যা, তুমি কথাকে অস্বীকার করছ? জান না, তোমার কথা আমাকে কেমন করে জাগিয়ে দেয়। তুমি কী করে জানবে তুমি কী বল, আর সে-বলার কী অর্থ। আবার দেখছি নিবারণ চক্রবর্তীকে ডাকতে হল। ওর নাম শুনে শুনে তুমি বিরক্ত হয়ে গেছ। কিন্তু কী করব বল, ওই লোকটা আমার মনের কথার ভাণ্ডারী। নিবারণ এখনও নিজের কাছে নিজে পুরোনো হয়ে যায় নি,—ও প্রত্যেক বারেই যে-কবিতা লেখে সে ওর প্রথম কবিতা। সেদিন ওর খাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে অল্পদিন আগেকার একটা লেখা পাওয়া গেল। ঝরনার উপরে কবিতা,—কী করে খবর পেয়েছে শিলঙ পাহাড়ে এসে আমার ঝরনা আমি খুঁজে পেয়েছি। ও লিখছে—

ঝরনা, তোমার স্ফটিক জলের
স্বচ্ছ ধারা,
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্যতারা।

আমি নিজে যদি লিখতুম, এর চেয়ে স্পষ্টতর করে তোমার বর্ণনা করতে পারতুম না। তোমার মনের মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে যে, আকাশের সমস্ত আলো সহজেই প্রতিবিম্বিত হয়। তোমার সব-কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া সেই আলো আমি দেখতে পাই। তোমার মুখে, তোমার হাসিতে, তোমার কথায়, তোমার স্থির হয়ে বসে থাকায়, তোমার রাস্তা দিয়ে চলায়।

আজি মাঝে মাঝে আমার ছায়ারে
দুলায়ে খেলায়ো তারি এক ধারে,
সে-ছায়ারি সাথে হাসিয়া মিলায়ো
কলধ্বনি ;

দিয়ো তারে বাণী যে-বাণী তোমার
চিরন্তনী।

তুমি ঝরনা, জীবনস্রোতে তুমি যে কেবল চলছ তা নয়, তোমার চলার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার বলা। সংসারের যে-সব কঠিন অচল পাথরগুলোর উপর দিয়ে চল তারাও তোমার সংঘাতে স্বরে বেজে ওঠে।

আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজি পরানে আমার
মেতেছে কবি।
পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি
নির্ঝরিণী,
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি।"

লাবণ্য একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, যতই আমার আলো থাক আর ধ্বনি থাক, তোমার ছায়া তবু ছায়াই, সে-ছায়াকে আমি ধরে রাখতে পারব না।"

অমিত বললে, "কিন্তু একদিন হয়তো দেখবে আর কিছু যদি না থাকে আমার বাণীরূপ রয়েছে।"

লাবণ্য হেসে বললে, "কোথায়? নিবারণ চক্রবর্তীর খাতায়?"

"আশ্চর্য কিছুই নেই। আমার মনের নিচের স্তরে যে-ধারা বয়, নিবারণের ফোয়ারায় কেমন করে সেটা বেরিয়ে আসে।"

"তা হলে কোনো একদিন হয়তো কেবল নিবারণ চক্রবর্তীর ফোয়ারার মধ্যেই তোমার মনটাকে পাব, আর কোথাও নয়।"

এমন সময় বাসা থেকে লোক এল ডাকতে,— খাবার তৈরি।

অমিত চলতে চলতে ভাবতে লাগল যে, লাবণ্য বুদ্ধির আলোতে সমস্তই স্পষ্ট করে জানতে চায়। মানুষ স্বভাবত যেখানে আপনাকে ভোলাতে ইচ্ছা করে ও সেখানেও নিজেকে ভোলাতে পারে না। লাবণ্য যে-কথাটা বললে, সেটার তো প্রতিবাদ করতে পারছি নে। অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি বাইরে প্রকাশ করতেই হয়, কেউ বা করে জীবনে, কেউ বা করে রচনায়,— জীবনকে ছুঁতে ছুঁতে, অথচ তার থেকে সরতে সরতে,

নদী যেমন কেবলই তীর থেকে সরতে সরতে চলে, তেমনি। আমি কি কেবলই রচনার স্রোত নিয়েই জীবন থেকে সরে সরে যাব? এইখানেই কি মেয়েপুরুষের ভেদ? পুরুষ তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে, সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে পদে পদে ভোলে। মেয়ে তার সমস্ত শক্তিকে খাটায় রক্ষা করতে, পুরোনোকে রক্ষা করবার জন্যেই নতুন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়। রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিঘ্ন। এমন কেন হল? এক জায়গায় এরা পরস্পরকে আঘাত করবেই। যেখানে খুব করে মিল, সেইখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা। তাই ভাবছি আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে-পাওনা, সে মিলন নয়, সে মুক্তি। এ-কথাটা ভাবতে অমিতকে পীড়া দিলে, কিন্তু ওর মন এটাকে অস্বীকার করতে পারলে না।

৮

লাবণ্য-তর্ক

যোগমায়া বললেন, "মা লাবণ্য, তুমি ঠিক বুঝেছ?"

"ঠিক বুঝেছি, মা।"

"অমিত ভারি চঞ্চল, সে-কথা মানি। সেইজন্যেই ওকে এত স্নেহ করি। দেখো না, ও কেমনতরো এলোমেলো। হাত থেকে সবই যেন পড়ে পড়ে যায়।"

লাবণ্য একটু হেসে বললে, "ওঁকে সবই যদি ধরে রাখতেই হত, হাত থেকে সবই যদি খসে খসে না পড়ত তাহলেই ওঁর ঘটত বিপদ। ওঁর নিয়ম হচ্ছে, হয় উনি পেয়েও পাবেন না, নয় উনি পেয়েই হারাবেন। যেটা পাবেন সেটা যে আবার রাখতে হবে এটা ওঁর ধাতের সঙ্গে মেলে না।"

"সত্যি করে বলি, বাছা, ওর ছেলেমানুষি আমার ভারি ভালো লাগে।"

"সেটা হল মায়ের ধর্ম। ছেলেমানুষিতে দায় যত-কিছু সব মায়ের। আর ছেলের যত-কিছু সব খেলা। কিন্তু আমাকে কেন বলছ, দায় নিতে যে পারে না তার উপরে দায় চাপাতে?"

"দেখছ না, লাবণ্য, ওর অমন দুরন্ত মন, আজকাল অনেকখানি যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দেখে আমার বড়ো মায়া করে। যাই বল, ও তোমাকে ভালোবাসে।"

"তা বাসেন।"

"তবে আর ভাবনা কিসের?"

"কর্তামা, ওঁর যেটা স্বভাব তার উপর আমি একটুও অত্যাচার করতে চাই নে।"

"আমি তো এই জানি, লাবণ্য, ভালোবাসা খানিকটা অত্যাচার চায়, অত্যাচার করেও।"

"কর্তামা, সে-অত্যাচারের ক্ষেত্র আছে; কিন্তু স্বভাবের উপর পীড়ন সয় না। সাহিত্যে ভালোবাসার বই যতই পড়লেম ততই এই কথাটা বার বার আমার মনে হয়েছে ভালোবাসার ট্রাজেডি ঘটে সেইখানেই যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি, নিজের ইচ্ছেকে অন্যের ইচ্ছে করবার জন্যে যেখানে জুলুম, যেখানে মনে করি আপন মনের মতো করে বদলিয়ে অন্যকে সৃষ্টি করব।"

"তা, মা, দুজনকে নিয়ে সংসার পাততে গেলে পরস্পর পরস্পরকে খানিকটা সৃষ্টি না করে নিলে চলেই না। ভালোবাসা যেখানে আছে সেখানে সেই সৃষ্টি সহজ,—যেখানে নেই সেখানে হাতুড়ি পিটোতে গিয়ে, তুমি যাকে ট্রাজেডি বল, তাই ঘটে।"

"সংসার পাতবার জন্যেই যে-মানুষ তৈরি, তার কথা ছেড়ে দাও। সে তো মাটির মানুষ, সংসারের প্রতিদিনের চাপেই তার গড়নপিটোন আপনিই ঘটতে থাকে। কিন্তু যে-মানুষ মাটির মানুষ একেবারেই নয়, সে আপনার স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই ছাড়তে পারে না। যে-মেয়ে তা না বোঝে সে যতই দাবি করে ততই হয় বঞ্চিত, যে-পুরুষ তা না বোঝে সে যতই টানাহেঁচড়া করে ততই আসল মানুষটাকে হারায়। আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ স্থলেই আমরা যাকে পাওয়া বলি সে, আর কিছু নয়, হাতকড়া হাতকে যে-রকম পায় সেই আর কি।"

"তুমি কী করতে চাও, লাবণ্য?"

"বিয়ে করে দুঃখ দিতে চাই নে। বিয়ে সকলের জন্যে নয়। জান, কর্তামা খুঁতখুঁতে মন যাদের, তারা মানুষকে খানিক-খানিক বাদ দিয়ে দিয়ে বেছে বেছে নেয়। কিন্তু বিয়ের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে স্ত্রীপুরুষ যে বড়ো বেশি কাছাকাছি এসে পড়ে—মাঝে ফাঁক থাকে না, তখন একেবারে গোটা মানুষকে নিয়েই কারবার করতে হয়, নিতান্ত নিকটে থেকে। কোনো একটা অংশ ঢাকা রাখবার জো থাকে না।"

"লাবণ্য, তুমি নিজেকে জান না। তোমাকে নিতে গেলে কিছুই বাদ দিয়ে নেবার দরকার হবে না।"

"কিন্তু উনি তো আমাকে চান না। যে-আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখতে পেয়েছেন বলে মনেই করি নে। আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেছি অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা কয়ে উঠেছে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলই আমাকে গড়ে তুলেছেন। ওঁর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা যদি ফুরোয়, তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে

ধরা পড়বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে-মেয়ে ওঁর নিজের সৃষ্টি নয়। বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।"

"তোমার মনে হয়, অমিত তোমার মতো মেয়েকেও সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারবে না?"

"স্বভাব যদি বদলায় তবে পারবেন। কিন্তু বদলাবেই বা কেন? আমি তো তা চাই না।"

"তুমি কী চাও?"

"যতদিন পারি, না হয় ওঁর কথার সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হয়েই থাকব। আর স্বপ্নই বা তাকে বলব কেন? সে আমার একটা বিশেষ জন্ম, একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। না হয় সে, গুটি থেকে বের-হয়ে-আসা দু-চারদিনের একটা রঙিন প্রজাপতিই হল, তাতে দোষ কী—জগতে প্রজাপতি আর-কিছুর চেয়ে যে কম সত্য তা তো নয়—না হয় সে সূর্যোদয়ের আলোতে দেখা দিলে, আর সূর্যাস্তের আলোতে মরেই গেল তাতেই বা কী? কেবল এইটুকুই দেখা চাই যে, সেটুকু সময় যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়।"

"সে যেন বুঝলুম, তুমি অমিতর কাছে না হয় ক্ষণকালের মায়ারূপেই থাকবে। আর নিজে? তুমিও কি বিয়ে করতে চাও না? তোমার কাছে অমিতও কি মায়া?"

লাবণ্য চুপ করে বসে রইল, কোনো জবাব করলে না।

যোগমায়া বললেন, "তুমি যখন তর্ক কর তখন বুঝতে পারি তুমি অনেক বই-পড়া মেয়ে, তোমার মতো করে ভাবতেও পারি নে, কথা কইতেও পারি নে; শুধু তাই নয়, হয়তো কাজের বেলাতেও এত শক্ত হতে পারি নে। কিন্তু তর্কের ফাঁকের মধ্যে দিয়েও যে তোমাকে দেখেছি, মা। সেদিন রাত তখন বারোটা হবে—দেখলুম তোমার ঘরে আলো জ্বলছে, ঘরে গিয়ে দেখি, তোমার টেবিলের উপর শুয়ে পড়ে দুই হাতের মধ্যে মুখ রেখে তুমি কাঁদছ। এ তো ফিলজফি-পড়া মেয়ে নয়। একবার ভাবলুম, সান্ত্বনা দিয়ে আসি, তার পরে ভাবলুম, সব মেয়েকেই কাঁদবার দিনে কেঁদে নিতে হবে, চাপা দিতে যাওয়া কিছু নয়। এ-কথা খুবই জানি, তুমি সৃষ্টি করতে চাও না, ভালোবাসতে চাও। মনপ্রাণ দিয়ে সেবা না করতে পারলে তুমি বাঁচবে কী করে? তাই তো বলি ওকে কাছে না পেলে তোমার চলবে না। বিয়ে করব না বলে হঠাৎ পণ করে ব'সো না। একবার তোমার মনে একটা জেদ চাপলে আর তোমাকে সোজা করা যায় না, তাই ভয় করি।"

লাবণ্য কিছু বললে না, নতমুখে কোলের উপর শাড়ির আঁচলটা চেপে চেপে

অনাবশ্যক ভাঁজ করতে লাগল। যোগমায়া বললেন, "তোমাকে দেখে আমার অনেকবার মনে হয়েছে, অনেক পড়ে, অনেক ভেবে তোমাদের মন বেশি সূক্ষ্ম হয়ে গেছে ; তোমরা ভিতরে ভিতরে যে-সব ভাব গড়ে তুলছ আমাদের সংসারটা তার উপযুক্ত নয়। আমাদের সময়ে মনের যে-সব আলো অদৃশ্য ছিল, তোমরা আজ যেন সেগুলোকেও ছাড়ান দিতে চাও না। তারা দেহের মোটা আবরণটাকে ভেদ করে দেহটাকে যেন অগোচর করে দিচ্ছে। আমাদের আমলে মনের মোটা মোটা ভাবগুলো নিয়ে সংসারে সুখদুঃখ যথেষ্ট ছিল—সমস্যা কিছু কম ছিল না। আজ তোমরা এতই বাড়িয়ে তুলছ, কিছুই আর সহজ রাখলে না।"

লাবণ্য একটুখানি হাসলে। এই সেদিন অমিত অদৃশ্য আলোর কথা যোগমায়াকে বোঝাচ্ছিল, তার থেকে এই যুক্তি তাঁর মাথায় এসেছে—এও তো সূক্ষ্ম : যোগমায়ার মাঠাকরুন এ-কথা এমন করে বুঝতেন না। বললে, "কর্তামা, কালের গতিকে মানুষের মন যতই স্পষ্ট করে সব কথা বুঝতে পারবে ততই শক্ত করে তার ধাক্কা সইতেও পারবে। অন্ধকারের ভয়, অন্ধকারের দুঃখ অসহ্য, কেননা সেটা অস্পষ্ট।"

যোগমায়া বললেন, "আজ আমার বোধ হচ্ছে কোনোকালে তোমাদের দুজনের দেখা না হলেই ভালো হত।"

"না না, তা ব'লো না। যা হয়েছে এ ছাড়া আর কিছু যে হতে পারত এ আমি মনেও করতে পারি নে। এক সময়ে আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, আমি নিতান্তই শুকনো,—কেবল বই পড়ব আর পাস করব এমনি করেই আমার জীবন কাটবে। আজ হঠাৎ দেখলুম আমিও ভালোবাসতে পারি। আমার জীবনে এমন অসম্ভব যে সম্ভব হল এই আমার ঢের হয়েছে। মনে হয় এতদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি। এর চেয়ে আর কী চাই। আমাকে বিয়ে করতে ব'লো না, কর্তামা।"

বলে চৌকি থেকে মেঝেতে নেমে যোগমায়ার কোলে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

১০

বাসা-বদল

গোড়ায় সবাই ঠিক করে রেখেছিল অমিত দিন পনেরোর মধ্যে কলকাতায় ফিরবে। নরেন মিত্তির খুব মোটা বাজি রেখেছিল যে, সাত দিন পেরোবে না। এক মাস যায়, দু-মাস যায়, ফেরবার নামও নেই। শিলঙের বাসার মেয়াদ ফুরিয়েছে,—রংপুরের কোন্ জমিদার এসে সেটা দখল করে বসল। অনেক খোঁজ করে যোগমায়াদের কাছাকাছি একটা বাসা পাওয়া গেছে। এক সময়ে ছিল গোয়ালার কি মালীর ঘর,—

তার পরে একজন কেরানির হাতে পড়ে তাতে গরিবি ভদ্রতার অল্প একটু আঁচ লেগেছিল। সে কেরানিও গেছে মরে, তারই বিধবা এটা ভাড়া দেয়। জানলা-দরজা প্রভৃতির কার্পণ্যে ঘরের মধ্যে তেজ মরুৎ ব্যোম এই তিন ভূতেরই অধিকার সংকীর্ণ, কেবল বৃষ্টির দিনে অপ্ অবতীর্ণ হয় আশাতীত প্রাচুর্যের সঙ্গে, অখ্যাত ছিদ্রপথ দিয়ে।

ঘরের অবস্থা দেখে যোগমায়া একদিন চমকে উঠলেন। বললেন, "বাবা, নিজেকে নিয়ে এ কী পরীক্ষা চলেছে?"

অমিত উত্তর করলে, "উমার ছিল নিরাহারের তপস্যা, শেষকালে পাতা পর্যন্ত খাওয়া ছেড়েছিলেন। আমার হল নিরাসবাবের তপস্যা,—খাট পালঙ টেবিল কেদারা ছাড়তে ছাড়তে প্রায় এসে ঠেকেছে শূন্য দেয়ালে। সেটা ঘটেছিল হিমালয় পর্বতে, এটা ঘটল শিলঙ পাহাড়ে। সেটাতে কন্যা চেয়েছিলেন বর, এটাতে বর চাচ্ছেন কন্যা। সেখানে নারদ ছিলেন ঘটক, এখানে স্বয়ং আছেন মাসিমা,—এখন শেষ পর্যন্ত যদি কোনো কারণে কালিদাস এসে না পৌঁছোতে পারেন অগত্যা আমাকেই তাঁর কাজটাও যথাসম্ভব সারতে হবে।"

অমিত হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে কিন্তু যোগমায়াকে ব্যথা দেয়। তিনি প্রায় বলতে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়িতেই এসে থাকো,—থেমে গেলেন। ভাবলেন, বিধাতা একটা কাণ্ড ঘটিয়ে তুলছেন তার মধ্যে আমাদের হাত পড়লে অসাধ্য জট পাকিয়ে উঠতে পারে। নিজের বাসা থেকে অল্প কিছু জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলেন, আর সেই সঙ্গে এই লক্ষ্মীছাড়াটার 'পরে তাঁর করুণা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। লাবণ্যকে বারবার বললেন, "মা লাবণ্য, মনটাকে পাষাণ ক'রো না।"

একদিন বিষম এক বর্ষণের অন্তে অমিত কেমন আছে খবর নিতে গিয়ে যোগমায়া দেখলেন, নড়বড়ে একটা চারপেয়ে টেবিলের নিচে কম্বল পেতে অমিত একলা বসে একখানা ইংরেজি বই পড়ছে। ঘরের মধ্যে যেখানে-সেখানে বৃষ্টিবিন্দুর অসংগত আবির্ভাব দেখে টেবিল দিয়ে একটা গুহা বানিয়ে তার নিচে অমিত পা ছড়িয়ে বসে গেল। প্রথমে নিজে নিজেই হেসে নিলে এক চোট, তার পরে চলল কাব্যালোচনা। মনটা ছুটেছিল যোগমায়ার বাড়ির দিকে। কিন্তু শরীরটা দিলে বাধা। কারণ, যেখানে কোনো প্রয়োজন হয় না সেই কলকাতায় অমিত কিনেছিল এক অনেক দামের বর্ষাতি, যেখানে সর্বদাই প্রয়োজন সেখানে আসবার সময় সেটা আনবার কথা মনে হয় নি। একটা ছাতা সঙ্গে ছিল, সেটা খুব সম্ভব কোনো একদিন সংকল্পিত গম্যস্থানেই ফেলে এসেছে, আর তা যদি না হয় তবে সেই বুড়ো দেওদারের তলে সেটা আছে পড়ে। যোগমায়া ঘরে ঢুকে বললেন, "এ কী কাণ্ড অমিত?"

অমিত তাড়াতাড়ি টেবিলের নিচে থেকে বেরিয়ে এসে বললে, "আমার ঘরটা আজ অসম্বদ্ধ প্রলাপে মেতেছে, দশা আমার চেয়ে ভালো নয়।"

"অসম্বদ্ধ প্রলাপ ?"

"অর্থাৎ বাড়ির চালটা প্রায় ভারতবর্ষ বললেই হয়। অংশগুলোর মধ্যে সম্বন্ধটা আলগা। এইজন্যে উপর থেকে উৎপাত ঘটলেই চারিদিকে এলোমেলো অশ্রুবর্ষণ হতে থাকে, আর বাইরের দিক থেকে যদি ঝড়ের দাপট লাগে, তবে সোঁ সোঁ ক'রে উঠতে থাকে দীর্ঘশ্বাস। আমি তো প্রটেস্ট স্বরূপে মাথার উপরে এক মঞ্চ খাড়া করেছি,— ঘরের মিসগভর্মেন্টের মাঝখানেই নিরুপদ্রব হোমরুলের দৃষ্টান্ত। পলিটিক্সের একটা মূলনীতি এখানে প্রত্যক্ষ।"

"মূলনীতিটা কী শুনি।"

"সেটা হচ্ছে এই যে, যে-ঘরওআলা ঘরে বাস করে না সে যতবড়ো ক্ষমতাশালীই হ'ক তার শাসনের চেয়ে যে-দরিদ্র বাসাড়ে ঘরে থাকে তার যেমন-তেমন ব্যবস্থাও ভালো।"

আজ লাবণ্যর 'পরে যোগমায়ার খুব রাগ হল। অমিতকে তিনি যতই গভীর ক'রে স্নেহ করছেন ততই মনে-মনে তার মূর্তিটা খুব উঁচু করেই গড়ে তুলছেন। "এত বিদ্যে, এত বুদ্ধি, এত পাস, অথচ এমন সাদা মন। গুছিয়ে কথা বলবার কী অসামান্য শক্তি। আর যদি চেহারার কথা বল আমার চোখে তো লাবণ্যর চেয়ে ওকে অনেক বেশি সুন্দর ঠেকে। লাবণ্যর কপাল ভালো, অমিত কোন্ গ্রহের চক্রান্তে ওকে এমন মুগ্ধ চোখে দেখেছে। সেই সোনার চাঁদ ছেলেকে লাবণ্য এত করে দুঃখ দিচ্ছে। খামকা বলে বসলেন কিনা, বিয়ে করবেন না। যেন কোন্ রাজরাজেশ্বরী। ধনুক-ভাঙা পণ। এত অহংকার সইবে কেন ? পোড়ারমুখীকে যে কেঁদে কেঁদে মরতে হবে।"

একবার যোগমায়া ভাবলেন অমিতকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যাবেন তাঁদের বাড়িতে। তার পরে কী ভেবে বললেন, "একটু বসো, বাবা, আমি এখনই আসছি।"

বাড়ি গিয়েই চোখে পড়ল লাবণ্য তার ঘরের সোফায় হেলান দিয়ে পায়ের উপর শাল মেলে গোর্কির "মা" বলে গল্পের বই পড়ছে। ওর এই আরামটা দেখে ওঁর মনে-মনে রাগ আরও বেড়ে উঠল।

বললেন, "চলো, একটু বেড়িয়ে আসবে।"

সে বললে, "কর্তামা, আজ বেরোতে ইচ্ছে করছে না।"

যোগমায়া ঠিক বুঝলেন না যে, লাবণ্য নিজের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে এই গল্পের

মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সমস্ত দুপুরবেলা, খাওয়ার পর থেকেই, তার মনের মধ্যে একটা অস্থির অপেক্ষা ছিল কখন আসবে অমিত। কেবলই মন বলেছে এল বুঝি। বাইরে দমকা হাওয়ার দৌরাত্ম্যে পাইন গাছগুলো থেকে থেকে ছটফট করে, আর দুর্দান্ত বৃষ্টিতে সদ্যোজাত ঝরনাগুলো এমনি ব্যতিব্যস্ত, যেন তাদের মেয়াদের সময়টার সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের পাল্লা চলেছে। লাবণ্যর মধ্যে একটা ইচ্ছে আজ অশান্ত হয়ে উঠল,—যাক সব বাধা ভেঙে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতর দুই হাত আজ চেপে ধরে বলে উঠি—জন্মে-জন্মান্তরে আমি তোমার। আজ বলা সহজ। আজ সমস্ত আকাশ যে মরিয়া হয়ে উঠল, হূহু করে কী যে হেঁকে উঠছে তার ঠিক নেই, তারই ভাষায় আজ বন-বনান্তর ভাষা পেয়েছে, বৃষ্টিধারায় আবিষ্ট গিরিশৃঙ্গগুলো আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। অমনি করেই কেউ শুনতে আসুক লাবণ্যর কথা, অমনি মস্ত করে, স্তব্ধ হয়ে, অমনি উদার মনোযোগে। কিন্তু প্রহরের পর প্রহর যায়, কেউ আসে না। ঠিক মনের কথাটি বলার লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এর পরে যখন কেউ আসবে তখন কথা জুটবে না, তখন সংশয় আসবে মনে, তখন তাণ্ডবনৃত্যোন্মত্ত দেবতার মাভৈঃ রব আকাশে মিলিয়ে যাবে। বৎসরের পর বৎসর নীরবে চলে যায়, তার মধ্যে বাণী একদিন বিশেষ প্রহরে হঠাৎ মানুষের দ্বারে এসে আঘাত করে। সেই সময়ে দ্বার খোলবার চাবিটি যদি না পাওয়া গেল, তবে কোনোদিনই ঠিক কথাটি অকুণ্ঠিত স্বরে বলবার দৈবশক্তি আর জোটে না। যেদিন সেই বাণী আসে সেদিন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে খবর দিতে ইচ্ছে করে—শোনো তোমরা, আমি ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি, এই কথাটি অপরিচিত-সিন্ধুপারগামী পাখির মতো কত দিন থেকে, কত দূর থেকে আসছে, সেই কথাটির জন্যেই আমার প্রাণে আমার ইষ্টদেবতা এত দিন অপেক্ষা করছিলেন। স্পর্শ করল আজ সেই কথাটি,—আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত জগৎ সত্য হয়ে উঠল। বালিশের মধ্যে মুখ লুকিয়ে লাবণ্য আজ কাকে এমন করে বলতে লাগল, সত্য, সত্য, এত সত্য আর কিছু নেই।

সময় চলে গেল, অতিথি এল না। অপেক্ষার গুরুভারে বুকের ভিতরটা টন টন করতে লাগল, বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে লাবণ্য খানিকটা ভিজে এল জলের ঝাপটা লাগিয়ে। তার পরে একটা গভীর অবসাদে তার মনটাকে ঢেকে ফেললে, নিবিড় একটা নৈরাশ্যে; মনে হল ওর জীবনে যা জ্বলবার তা একবার মাত্র দপ করে জ্বলে তার পরে গেল নিবে, সামনে কিছুই নেই। অমিতকে নিজের ভিতরকার সত্যের দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ করে স্বীকার করে নিতে ওর সাহস চলে গেল। এই কিছু আগেই ওর প্রবল যে একটা ভরসা জেগেছিল সেটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ

চুপ করে পড়ে থেকে অবশেষে টেবিল থেকে বইটা টেনে নিলে। কিছু সময় গেল মন দিতে, তার পরে গল্পের ধারার মধ্যে প্রবেশ করে কখন নিজেকে ভুলে গেল তা জানতে পারে নি।

এমন সময় যোগমায়া ডাকলেন বেড়াতে যেতে, ওর উৎসাহ হল না।

যোগমায়া একটা চৌকি টেনে লাবণ্যর সামনে বসলেন, দীপ্ত চোখ তার মুখে রেখে বললেন, "সত্যি করে বলো দেখি লাবণ্য, তুমি কি অমিতকে ভালোবাস ?"

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললে, "এমন কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ, কর্তামা ?"

"যদি না ভালোবাস ওকে স্পষ্ট করেই বল না কেন ? নিষ্ঠুর তুমি, ওকে যদি না চাও তবে ওকে ধরে রেখো না।"

লাবণ্যর বুকের ভিতরটা ফুলে ফুলে উঠল, মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

"এইমাত্র যে-দশা ওর দেখে এলুম বুক ফেটে যায়। এমন ভিক্ষুকের মতো কার জন্যে এখানে ও পড়ে আছে ? ওর মতো ছেলে যাকে চায় সে যে কতবড়ো ভাগ্যবতী তা কি একটুও বুঝতে পার না ?"

চেষ্টা করে রুদ্ধ কণ্ঠের বাধা কাটিয়ে লাবণ্য বলে উঠল, "আমার ভালোবাসার কথা জিজ্ঞাসা করছ, কর্তামা ? আমি তো ভেবে পাই নে আমার চেয়ে ভালোবাসতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আছে। ভালোবাসায় আমি যে মরতে পারি। এতদিন যা ছিলুম সব যে আমার লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন থেকে আমার আর-এক আরম্ভ, এ আরম্ভের শেষ নেই। আমার মধ্যে এ যে কত আশ্চর্য সে আমি কাউকে কেমন করে জানাব ? আর কেউ কি এমন করে জেনেছে ?"

যোগমায়া অবাক হয়ে গেলেন। চিরদিন দেখে এসেছেন লাবণ্যর মধ্যে গভীর শান্তি, এতবড়ো দুঃসহ আবেগ কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিল ? তাকে আস্তে আস্তে বললেন, "মা লাবণ্য, নিজেকে চাপা দিয়ে রেখো না। অমিত অন্ধকারে তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে,—সম্পূর্ণ করে তার কাছে তুমি আপনাকে জানাও,—একটুও ভয় ক'রো না। যে-আলো তোমার মধ্যে জ্বলেছে সে-আলো যদি তার কাছেও প্রকাশ পেত তাহলে তার কোনো অভাব থাকত না। চলো, মা, এখনই চলো আমার সঙ্গে।"

দুজনে গেলেন অমিতর বাসায়।

১০

দ্বিতীয় সাধনা

তখন অমিত ভিজে চৌকির উপরে এক তাড়া খবরের কাগজ চাপিয়ে তার উপর বসেছে। টেবিলে এক দিস্তে ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিয়ে তার চলছে লেখা। সেই সময়েই সে তার বিখ্যাত আত্মজীবনী শুরু করেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, সেই সময়েই তার জীবনটা অকস্মাৎ তার নিজের কাছে দেখা দিয়েছিল নানা রঙে, বাদলের পরদিনকার সকালবেলায় শিলঙ পাহাড়ের মতো—সেদিন নিজের অস্তিত্বের একটা মূল্য সে পেয়েছিল, সে-কথাটা প্রকাশ না করে সে থাকবে কী করে। অমিত বলে, মানুষের মৃত্যুর পরে তার জীবনী লেখা হয়, তার কারণ, একদিকে সংসারে সে মরে আর-একদিকে মানুষের মনে সে নিবিড় করে বেঁচে ওঠে। অমিতর ভাবখানা এই যে, শিলঙে সে যখন ছিল তখন একদিকে সে মরেছিল, তার অতীতটা গিয়েছিল মরীচিকার মতো মিলিয়ে, তেমনি আর-একদিকে সে উঠেছিল তীব্র করে বেঁচে; পিছনের অন্ধকারের উপরে উজ্জ্বল আলোর ছবি প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রকাশের খবরটা রেখে যাওয়া চাই। কেননা পৃথিবীতে খুব অল্প লোকের ভাগ্যে এটা ঘটতে পারে, তারা জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একটা প্রদোষচ্ছায়ার মধ্যেই কাটিয়ে যায়, যে-বাদুড় গুহার মধ্যে বাসা করেছে তারই মতো।

তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, ঝ'ড়ো হাওয়াটা গেছে থেমে, মেঘ এসেছে পাতলা হয়ে। অমিত চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এ কী অন্যায় মাসিমা।"

"কেন, বাবা, কী করেছি?"

"আমি যে একেবারে অপ্রস্তুত। শ্রীমতী লাবণ্য কী ভাববেন?"

"শ্রীমতী লাবণ্যকে একটু ভাবতে দেওয়াই তো দরকার। যা জানবার সবটাই যে জানা ভালো। এতে শ্রীযুক্ত অমিতের এত আশঙ্কা কেন?"

"শ্রীযুক্তের যা ঐশ্বর্য সেইটেই শ্রীমতীর কাছে জানাবার। আর শ্রীহীনের যা দৈন্য সেইটে জানাবার জন্যেই আছ তুমি, আমার মাসিমা।"

"এমন ভেদবুদ্ধি কেন, বাছা?"

"নিজের গরজেই। ঐশ্বর্য দিয়েই ঐশ্বর্য দাবি করতে হয়, আর অভাব দিয়ে চাই আশীর্বাদ। মানবসভ্যতায় লাবণ্য দেবীরা জাগিয়েছেন ঐশ্বর্য, আর মাসিমারা এনেছেন আশীর্বাদ।"

"দেবীকে আর মাসিমাকে একাধারেই পাওয়া যেতে পারে, অমিত; অভাব ঢাকবার দরকার হয় না।"

"এর জবাব কবির ভাষায় দিতে হয়। গদ্যে যা বলি সেটা স্পষ্ট বোঝাবার জন্যে ছন্দের ভাষ্য দরকার হয়ে পড়ে। ম্যাথ্যু আর্নল্‌ড কাব্যকে বলেছেন ক্রিটিসিজম্ অফ্ লাইফ, আমি কথাটাকে সংশোধন করে বলতে চাই লাইফ্‌স কমেণ্টারি ইন ভার্স। অতিথিবিশেষকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখি যেটা পড়তে যাচ্ছি সে-লেখাটা কোনো কবিসম্রাটের নয়—

পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা
রিক্ত হাতে চাস নে তারে,
সিক্ত চোখে যাস নে দ্বারে।

ভেবে দেখবেন, ভালোবাসাই হচ্ছে পূর্ণতা, তার যা আকাঙ্ক্ষা সে তো দরিদ্রের কাঙালপনা নয়। দেবতা যখন তাঁর ভক্তকে ভালোবাসেন তখনই আসেন ভক্তের দ্বারে ভিক্ষা চাইতে।

রত্নমালা আনবি যবে
মাল্য-বদল তখন হবে,
পাতবি কি তোর দেবীর আসন
শূন্য ধুলায় পথের ধারে ?

সেইজন্যেই তো সম্প্রতি দেবীকে একটু হিসেব করে ঘরে ঢুকতে বলেছিলুম। পাতবার কিছুই নেই তো পাতব কী। এই ভিজে খবরের কাগজগুলো? আজকাল সম্পাদকী কালির দাগকে সব-চেয়ে ভয় করি। কবি বলছেন, ডাকবার মানুষকে ডাকি, যখন জীবনের পেয়ালা উছলে পড়ে, তাকে তৃষ্ণার শরিক হতে ডাকি নে।

পুষ্প-উদার চৈত্রবনে
বক্ষে ধরিস নিত্য-ধনে,
লক্ষ শিখায় জ্বলবে যখন
দীপ্ত প্রদীপ অন্ধকারে।

মাসিদের কোলে জীবনের আরম্ভেই মানুষের প্রথম তপস্যা দারিদ্র্যের, নগ্ন সন্ন্যাসীর স্নেহসাধনা। এই কুটিরে তারই কঠোর আয়োজন। আমি তো ঠিক করে রেখেছি এই কুটিরের নাম দেব মাসতুত বাংলো।"

"বাবা, জীবনের দ্বিতীয় তপস্যা ঐশ্বর্যের, দেবীকে বাঁ পাশে নিয়ে প্রেমসাধনা।

এ-কুটিরেও তোমার সে-সাধনা ভিজে কাগজে চাপা পড়বে না। বর পাই নি বলে নিজেকে ভোলাচ্ছ? মনে-মনে নিশ্চয় জান পেয়েছ।"

এই বলে লাবণ্যকে অমিতর পাশে দাঁড় করিয়ে তার ডান হাত অমিতর ডান হাতের উপর রাখলেন। লাবণ্যর গলা থেকে সোনার হারগাছি খুলে তাই দিয়ে দুজনের হাত বেঁধে বললেন, "তোমাদের মিলন অক্ষয় হ'ক।"

অমিত লাবণ্য দুজনে মিলে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। তিনি বললেন, "তোমরা একটু বসো, আমি বাগান থেকে কিছু ফুল নিয়ে আসি গে।"

বলে গাড়ি করে ফুল আনতে গেলেন। অনেকক্ষণ দুইজনে পাটিয়াটার উপরে পাশাপাশি চুপ করে বসে রইল। একসময়ে অমিতর মুখের দিকে মুখ তুলে লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে, "আজ তুমি সমস্ত দিন গেলে না কেন?"

অমিত উত্তর দিলে, "কারণটা এত বেশি তুচ্ছ যে আজকের দিনে সে-কথাটা মুখে আনতে সাহসের দরকার। ইতিহাসে কোনোখানে লেখে না যে, হাতের কাছে বর্ষাতি ছিল না বলে বাদলার দিনে প্রেমিক তার প্রিয়ার কাছে যাওয়া মুলতবি রেখেছে। বরঞ্চ লেখা আছে সাঁতার দিয়ে অগাধ-জল পার হওয়ার কথা। কিন্তু সেটা অন্তরের ইতিহাস, সেখানকার সমুদ্রে আমিও কি সাঁতার কাটছি নে ভাবছ? সে-অকূল কোনোকালে কি পার হব?

For we are bound where mariner has not yet dared to go,
And we will risk the ship, ourselves and all.

আমরা যাব যেখানে কোনো
যায় নি নেয়ে সাহস করি,
ডুবি যদি তো ডুবি না কেন,
ডুবুক সবি, ডুবুক তরী।

বন্যা, আমার জন্যে আজ তুমি অপেক্ষা করে ছিলে?"

"হাঁ, মিতা, বৃষ্টির শব্দে সমস্ত দিন যেন তোমার পায়ের শব্দ শুনেছি। মনে হয়েছে কত অসম্ভব দূর থেকে যে আসছ তার ঠিক নেই। শেষকালে তো এসে পৌঁছোলে আমার জীবনে।"

"বন্যা, আমার জীবনের মাঝখানটিতে ছিল এতকাল তোমাকে না-জানার একটা প্রকাণ্ড কালো গর্ত। ওইখানটা ছিল সব-চেয়ে কুশ্রী। আজ সেটা কানা ছাপিয়ে ভরে উঠল—তারই উপরে আলো ঝলমল করে, সমস্ত আকাশের ছায়া পড়ে, আজ

সেইখানটাই হয়েছে সব-চেয়ে সুন্দর। এই যে আমি ক্রমাগতই কথা কয়ে যাচ্ছি এ হচ্ছে ওই পরিপূর্ণ প্রাণসরোবরের তরঙ্গধ্বনি, একে থামায় কে।"

"মিতা, তুমি আজ সমস্ত দিন কী করছিলে?"

"মনের মাঝখানটাতে তুমি ছিলে, একেবারে নিস্তব্ধ। তোমাকে কিছু বলতে চাচ্ছিলুম,—কোথায় সেই কথা। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে আর আমি কেবলই বলেছি, কথা দাও, কথা দাও!

O what is this?
Mysterious and uncapturable bliss
That I have known, yet seems to be
Simple as breath and easy as a smile,
And older than the earth.

এ কী রহস্য, এ কী আনন্দরাশি!
জেনেছি তাহারে, পাই নি তবুও পেয়ে।
তবু সে সহজে প্রাণে উঠে নিঃশ্বাসি',
তবু সে সরল যেন রে সরল হাসি,
পুরানো সে যেন এই ধরণীর চেয়ে।

বসে বসে ওই করি। পরের কথাকে নিজের কথা করে তুলি। সুর দিতে পারতুম যদি তবে সুর লাগিয়ে বিদ্যাপতির বর্ষার গানটাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতুম—

বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।

যাকে না হলে চলে না, তাকে না পেয়ে কী করে দিনের পর দিন কাটবে, ঠিক এই কথাটার সুর পাই কোথায়। উপরে চেয়ে কখনো বলি, কথা দাও, কখনো বলি সুর দাও। কথা নিয়ে সুর নিয়ে দেবতা নেমেও আসেন, কিন্তু পথের মধ্যে মানুষ-ভুল করেন, খামকা আর-কাউকে দিয়ে বসেন,—হয়তো বা তোমাদের ওই রবি ঠাকুরকে।"

লাবণ্য হেসে বললে, "রবি ঠাকুরকে যারা ভালোবাসে তারাও তোমার মতো এত বার বার করে তাঁকে স্মরণ করে না।"

"বন্যা, আজ আমি বড়ো বেশি বকছি, না? আমার মধ্যে বকুনির মনস্থন নেমেছে। ওয়েদার রিপোর্ট যদি রাখ তো দেখবে এক-একদিনে কত ইঞ্চি পাগলামি তার ঠিকানা নেই। কলকাতায় যদি থাকতুম তোমাকে নিয়ে টায়ার ফাটাতে ফাটাতে মোটরে

করে একেবারে মোরাদাবাদে দিতুম দৌড়। যদি জিজ্ঞাসা করতে মোরাদাবাদে কেন, তার কোনোই কারণ দেখাতে পারতুম না। বান যখন আসে তখন সে বকে, ছোটে, সময়টাকে হাসতে হাসতে ফেনার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।"

এমন সময় ডালিতে ভরে যোগমায়া সূর্যমুখী ফুল আনলেন। বললেন, "মা লাবণ্য, এই ফুল দিয়ে আজ তুমি ওকে প্রণাম করো।"

এটা আর কিছু নয়, একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রাণের ভিতরকার জিনিসকে বাইরে শরীর দেবার মেয়েলি চেষ্টা। দেহকে বানিয়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা ওদের রক্তে মাংসে।

আজ কোনো এক সময়ে অমিত লাবণ্যকে কানে কানে বললে, "বন্যা, একটি আংটি তোমাকে পরাতে চাই।"

লাবণ্য বললে, "কী দরকার, মিতা।"

"তুমি যে আমাকে তোমার এই হাতখানি দিয়েছ সে কতখানি দেওয়া তা ভেবে শেষ করতে পারি নে। কবিরা প্রিয়ার মুখ নিয়েই যত কথা কয়েছে। কিন্তু হাতের মধ্যে প্রাণের কত ইশারা ; ভালোবাসার যতকিছু আদর, যতকিছু সেবা, হৃদয়ের যত দরদ যত অনির্বচনীয় ভাষা, সব যে ওই হাতে। আংটি তোমার আঙুলটিকে জড়িয়ে থাকবে আমার মুখের ছোটো একটি কথার মতো ; সে-কথাটি শুধু এই, 'পেয়েছি'। আমার এই কথাটি সোনার ভাষায় মানিকের ভাষায় তোমার হাতে থেকে যাক না।"

লাবণ্য বললে, "আচ্ছা, তাই থাক।"

"কলকাতা থেকে আনতে দেব, বলো কোন্ পাথর তুমি ভালোবাস।"

"আমি কোনো পাথর চাই নে, একটিমাত্র মুক্তো থাকলেই হবে।"

"আচ্ছা, সেই ভালো। আমিও মুক্তো ভালোবাসি।"

১১

মিলন-তত্ত্ব

ঠিক হয়ে গেল আগামী অঘ্রান মাসে এদের বিয়ে। যোগমায়া কলকাতায় গিয়ে সমস্ত আয়োজন করবেন।

লাবণ্য অমিতকে বললে, "তোমার কলকাতায় ফেরবার দিন অনেককাল হল পেরিয়ে গেছে। অনিশ্চিতের মধ্যে বাঁধা পড়ে তোমার দিন কেটে যাচ্ছিল। এখন ছুটি। নিঃসংশয়ে চলে যাও। বিয়ের আগে আমাদের আর দেখা হবে না।"

"এমন কড়া শাসন কেন ?"

"সেদিন যে সহজ আনন্দের কথা বলেছিলে তাকে সহজ রাখবার জন্যে।"

"এটা একেবারে গভীর জ্ঞানের কথা। সেদিন তোমাকে কবি বলে সন্দেহ করেছিলুম, আজ সন্দেহ করছি ফিলজফার বলে। চমৎকার বলেছ। সহজকে সহজ রাখতে হলে শক্ত হতে হয়। ছন্দকে সহজ করতে চাও তো যতিকে ঠিক জায়গায় কষে আঁটতে হবে। লোভ বেশি, তাই জীবনের কাব্যে কোথাও যতি দিতে মন সরে না, ছন্দ ভেঙে গিয়ে জীবনটা হয় গীতহীন বন্ধন। আচ্ছা, কালই চলে যাব, একেবারে হঠাৎ এই ভরা-দিনগুলোর মাঝখানে। মনে হবে যেন মেঘনাদবধ কাব্যের সেই চমকে থেমে-যাওয়া লাইনটা—

চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে!

শিলঙ থেকে আমিই না হয় চল্লুম কিন্তু পাঞ্জি থেকে অঘ্রান মাস তো ফস করে পালাবে না। কলকাতায় গিয়ে কী করব জান ?"

"কী করবে ?"

"মাসিমা যতক্ষণ করবেন বিয়ের দিনের ব্যবস্থা, ততক্ষণ আমাকে করতে হবে তার পরের দিনগুলোর আয়োজন। লোকে ভুলে যায় দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নূতন করে সৃষ্টি করা চাই। মনে আছে, বন্যা, রঘুবংশে অজ মহারাজা ইন্দুমতীর কী বর্ণনা করেছিলেন ?"

লাবণ্য বললে, "প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।"

অমিত বললে, "সেই ললিত কলাবিধিটা দাম্পত্যেরই। অধিকাংশ বর্বর বিয়েটাকেই মনে করে মিলন, সেইজন্যে তার পর থেকে মিলনটাকে এত অবহেলা।"

"মিলনের আর্ট তোমার মনে কী রকম আছে বুঝিয়ে দাও। যদি আমাকে শিষ্যা করতে চাও আজই তার প্রথম পাঠ শুরু হ'ক।"

"আচ্ছা, তবে শোনো। ইচ্ছাকৃত বাধা দিয়েই কবি ছন্দের সৃষ্টি করে। মিলনকেও সুন্দর করতে হয় ইচ্ছাকৃত বাধায়। চাইলেই পাওয়া যায় দামি জিনিসকে এত সস্তা করা নিজেকেই ঠকানো। কেননা শক্ত করে দাম দেওয়ার আনন্দটা বড়ো কম নয়।"

"দামের হিসাবটা শুনি।"

"রসো, তার আগে আমার মনে যে-ছবিটা আছে বলি। গঙ্গার ধার, বাগানটা ডায়মণ্ড হারবারের ওই দিকটাতে। ছোটো একটি স্টীম লঞ্চ করে ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে কলকাতায় যাতায়াত করা যায়।"

"আবার কলকাতায় কী দরকার পড়ল ?"

"এখন কোনো দরকার নেই সে-কথা জান। যাই বটে বার-লাইব্রেরিতে,— ব্যবসা করি নে, দাবা খেলি। অ্যাটর্নিরা বুঝে নিয়েছে কাজে গরজ নেই তাই মন নেই। কোনো আপসের মকদ্দমা হলে তার ব্রীফ আমাকে দেয়, তার বেশি আর কিছুই দেয় না। কিন্তু বিয়ের পরেই দেখিয়ে দেব কাজ কাকে বলে,—জীবিকার দরকারে নয়, জীবনের দরকারে। আমের মাঝখানটাতে থাকে আঁঠি, সেটা মিষ্টিও নয়, নরমও নয়, খাদ্যও নয়—কিন্তু ওই শক্তটাই সমস্ত আমের আশ্রয়, ওইটেতেই সে আকার পায়। কলকাতার পাথুরে আঁঠিটাকে কিসের জন্য দরকার বুঝেছ তো? মধুরের মাঝখানে একটা কঠিনকে রাখবার জন্যে।"

"বুঝেছি। তাহলে দরকার তো আমারও আছে। আমাকেও কলকাতায় যেতে হবে—দশটা-পাঁচটা।"

"দোষ কী ? কিন্তু পাড়া-বেড়াতে নয়, কাজ করতে।"

"কিসের কাজ বলো। বিনা মাইনের ?"

"না না, বিনা মাইনের কাজ কাজও নয় ছুটিও নয়, বারো আনা ফাঁকি। ইচ্ছে করলেই তুমি মেয়ে-কলেজে প্রোফেসারি নিতে পারবে।"

"আচ্ছা, ইচ্ছে করব। তার পর ?"

"স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, গঙ্গার ধার ; পাড়ির নিচে তলা থেকে উঠেছে ঝুরি-নামা অতি পুরোনো বটগাছ। ধনপতি যখন গঙ্গা বেয়ে সিংহলে যাচ্ছিল তখন হয়তো এই বটগাছে নৌকো বেঁধে গাছতলায় রান্না চড়িয়েছিল। ওরই দক্ষিণ ধারে ছ্যাতলা-পড়া বাঁধানো ঘাট, অনেকখানি ফাটল-ধরা, কিছু কিছু ধসে-যাওয়া। সেই ঘাটে সবুজে সাদায় রঙ-করা আমাদের ছিপছিপে নৌকোখানি। তারই নীল নিশানে সাদা অক্ষরে নাম লেখা। কী নাম বলে দাও তুমি।"

"বলব ? মিতালি।"

"ঠিক নামটি হয়েছে, মিতালি। আমি ভেবেছিলুম, সাগরী, মনে একটু গর্বও হয়েছিল। কিন্তু তোমার কাছে হার মানতে হল।…বাগানের মাঝখান দিয়ে সরু একটি খাড়ি চলে গেছে, গঙ্গার হৃৎস্পন্দন বয়ে। তার ওপারে তোমার বাড়ি এপারে আমার।"

"রোজই কি সাঁতার দিয়ে পার হবে, আর জানলায় আমার আলো জ্বালিয়ে রাখব ?"

"দেব সাঁতার মনে-মনে, একটা কাঠের সাঁকোর উপর দিয়ে। তোমার বাড়িটির নাম মানসী, আমার বাড়ির একটা নাম তোমাকে দিতে হবে।"

"দীপক।"

"ঠিক নামটি হয়েছে। নামের উপযুক্ত একটি দীপ আমার বাড়ির চুড়োয় বসিয়ে দেব, মিলনের সন্ধ্যেবেলায় তাতে জ্বলবে লাল আলো, আর বিচ্ছেদের রাতে নীল। কলকাতা থেকে ফিরে এসে রোজ তোমার কাছ থেকে একটি চিঠি আশা করব। এমন হওয়া চাই সে-চিঠি পেতেও পারি, না-পেতেও পারি। সন্ধ্যে আটটার মধ্যে যদি না পাই তবে হতবিধিকে অভিসম্পাত দিয়ে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের লজিক পড়বার চেষ্টা করব। আমাদের নিয়ম হচ্ছে অনাহূত তোমার বাড়িতে কোনোমতেই যেতে পারব না।"

"আর তোমার বাড়িতে আমি?"

"ঠিক এক নিয়ম হলেই ভালো হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিয়মের ব্যতিক্রম হলে সেটা অসহ্য হবে না।"

"নিয়মের ব্যতিক্রমটাই যদি নিয়ম না হয়ে ওঠে তাহলে তোমার বাড়িটার দশা কী হবে ভেবে দেখো বরঞ্চ আমি বুরকা পরে যাব।"

"তা হ'ক, কিন্তু আমার নিমন্ত্রণ-চিঠি চাই। সে-চিঠিতে আর কিছু থাকবার দরকার নেই, কেবল কোনো-একটা কবিতা থেকে দুটি-চারটি লাইন মাত্র।"

"আর আমার নিমন্ত্রণ বুঝি বন্ধ? আমি একঘরে?"

"তোমার নিমন্ত্রণ মাসে একদিন, পূর্ণিমার রাতে; চোদ্দটা তিথির খণ্ডতা যেদিন চরম পূর্ণ হয়ে উঠবে।"

"এইবার তোমার প্রিয়শিষ্যাকে একটি চিঠির নমুনা দাও।"

"আচ্ছা, বেশ।" পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে তার পাতা ছিঁড়ে লিখলে—

"Blow gently over my garden
Wind of the southern sea
In the hour my love cometh
And calleth me.

চুমিয়া যেয়ো তুমি
আমার বনভূমি
দখিন সাগরের সমীরণ,
যে-শুভখনে মম
আসিবে প্রিয়তম,
ডাকিবে নাম ধ'রে অকারণ।"

লাবণ্য কাগজখানা ফিরিয়ে দিলে না।

অমিত বললে, "এবারে তোমার চিঠির নমুনা দাও, দেখি তোমার শিক্ষা কতদূর এগোল।"

লাবণ্য একটা টুকরো কাগজে লিখতে যাচ্ছিল। অমিত বললে, "না, আমার এই নোটবইয়ে লেখো।"

লাবণ্য লিখে দিলে—

"মিতা, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং,
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।"

অমিত বইটা পকেটে পুরে বললে, আশ্চর্য এই, আমি লিখেছি মেয়ের মুখের কথা, তুমি লিখেছ পুরুষের। কিছুই অসংগত হয় নি। শিমূলকাঠই হ'ক আর বকুলকাঠই হ'ক, যখন জ্বলে তখন আগুনের চেহারাটা একই।"

লাবণ্য বললে, "নিমন্ত্রণ তো করা গেল, তার পরে?"

অমিত বললে, "সন্ধ্যাতারা উঠেছে, জোয়ার এসেছে গঙ্গায়, হাওয়া উঠল ঝিরঝির করে ঝাউগাছগুলোর সার বেয়ে, বুড়ো বটগাছটার শিকড়ে শিকড়ে উঠল স্রোতের ছলছলানি। তোমার বাড়ির পিছনে পদ্মদিঘি, সেইখানে খিড়কির নির্জন ঘাটে গা ধুয়ে চুল বেঁধেছ। তোমার এক-একদিন এক-এক রঙের কাপড়, ভাবতে ভাবতে যাব আজকে সন্ধ্যেবেলার রঙটা কী। মিলনের জায়গারও ঠিক নেই, কোনোদিন শান-বাঁধানো চাঁপাতলায়, কোনোদিন বাড়ির ছাতে, কোনোদিন গঙ্গার ধারের চাতালে। আমি গঙ্গায় স্নান সেরে সাদা মলমলের ধুতি আর চাদর পরব, পায়ে থাকবে হাতির দাঁতে কাজ-করা খড়ম। গিয়ে দেখব, গালচে বিছিয়ে বসেছ, সামনে রুপোর রেকাবিতে মোটা গোড়ে মালা, চন্দনের বাটিতে চন্দন, এক কোণে জ্বলছে ধূপ। পুজোর সময় অন্তত দু-মাসের জন্যে দুজনে বেড়াতে বেরোব। কিন্তু দু-জনে দু-জায়গায়। তুমি যদি যাও পর্বতে আমি যাব সমুদ্রে।—এই তো আমার দাম্পত্য বৈরাজ্যের নিয়মাবলি তোমার কাছে দাখিল করা গেল। এখন তোমার কী মত?"

"মেনে নিতে রাজি আছি।"

"মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া, এই দুইয়ে যে তফাত আছে, বন্যা।"

"তোমার যাতে প্রয়োজন আমার তাতে প্রয়োজন না-ও যদি থাকে তবু আপত্তি করব না।"

"প্রয়োজন নেই তোমার?"

"না, নেই। তুমি আমার যতই কাছে থাক তবু আমার থেকে তুমি অনেক দূরে।

কোনো নিয়ম দিয়ে সেই দূরত্বটুকু বজায় রাখা আমার পক্ষে বাহুল্য। কিন্তু আমি জানি আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা তোমার কাছের দৃষ্টিকে বিনা লজ্জায় সইতে পারবে, সেইজন্যে দাম্পত্যে দুই পারে দুই মহল করে দেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ।”

অমিত চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “তোমার কাছে আমি হার মানতে পারব না, বন্যা, যাক গে আমার বাগানটা। কলকাতার বাইরে এক পা নড়ব না। নিরঞ্জনদের আপিসে উপরের তলায় পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নেব। সেইখানে থাকবে তুমি, আর থাকব আমি। চিদাকাশে কাছে-দূরে ভেদ নেই। সাড়ে তিন হাত চওড়া বিছানায় বাঁ পাশে তোমার মহল মানসী, ডান পাশে আমার মহল দীপক। ঘরের পুব দেওয়ালে একখানা আয়নাওআলা দেরাজ, তাতেই তোমারও মুখ দেখা আর আমারও। পশ্চিম দিকে থাকবে বইয়ের আলমারি, পিঠ দিয়ে সেটা রোদ্দুর ঠেকাবে আর সামনের দিকে সেটাতে থাকবে দুটি পাঠকের একটিমাত্র সার্ক্যুলেটিং লাইব্রেরি। ঘরের উত্তর দিকটাতে একখানি সোফা, তারই বাঁ পাশে একটু জায়গা খালি রেখে আমি বসব এক প্রান্তে, তোমার কাপড়ের আল্‌নার আড়ালে তুমি দাঁড়াবে, দুহাত তফাতে নিমন্ত্রণের চিঠিখানা উপরের দিকে তুলে ধরব কম্পিতহস্তে, তাতে লেখা থাকবে—

ছাদের উপরে বহিয়ো নীরবে
ওগো দক্ষিণ হাওয়া,
প্রেয়সীর সাথে যে-নিমেষে হবে
চারি চক্ষুতে চাওয়া।

এটা কি খারাপ শোনাচ্ছে বন্যা?”

“কিচ্ছু না, মিতা। কিন্তু এটা সংগ্রহ হল কোথা থেকে?”

“আমার বন্ধু নীলমাধবের খাতা থেকে। তার ভাবী বধূ তখন অনিশ্চিত ছিল। তাকে উদ্দেশ করে ওই ইংরেজি কবিতাটাকে কলকাতাই ছাঁচে ঢালাই করেছিল, আমিও সঙ্গে যোগ দিয়েছিলুম। ইকনমিকসে এম. এ. পাশ করে পনেরো হাজার টাকা নগদ পণ আর আশি ভরি গয়না সমেত নববধূকে লোকটা ঘরে আনলে, চার চক্ষে চাওয়াও হল, দক্ষিনে বাতাসও বয়, কিন্তু ওই কবিতাটাকে আর ব্যবহার করতে পারলে না। এখন তার অপর শরিককে কাব্যটির সর্বস্বত্ব সমর্পণ করতে বাধবে না।”

“তোমারও ছাতে দক্ষিনে বাতাস বইবে, কিন্তু তোমার নববধূ কি চিরদিনই নববধূ থাকবে?”

টেবিলে প্রবল চাপড় দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে অমিত বললে, “থাকবে, থাকবে, থাকবে।”

যোগমায়া পাশের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী থাকবে, অমিত? আমার টেবিলটা বোধ হচ্ছে থাকবে না।"

"জগতে যা-কিছু টেকসই সবই থাকবে। সংসারে নববধূ দুর্লভ, কিন্তু লাখের মধ্যে একটি যদি দৈবাৎ পাওয়া যায় সে চিরদিনই থাকবে নববধূ।"

"একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি।"

"একদিন সময় আসবে, দেখাব।"

"বোধ হচ্ছে তার কিছু দেরি আছে, ততক্ষণ খেতে চলো।"

১২

শেষ সন্ধ্যা

আহার শেষ হলে অমিত বললে, "কাল কলকাতায় যাচ্ছি মাসিমা। আমার আত্মীয়স্বজন সবাই সন্দেহ করছে আমি খাসিয়া হয়ে গেছি।"

"আত্মীয়স্বজনরা কি জানে কথায় কথায় তোমার এত বদল সম্ভব?"

"খুব জানে, নইলে আত্মীয়স্বজন কিসের? তাই বলে কথায় কথায় নয়, আর খাসিয়া হওয়া নয়। যে-বদল আজ আমার হল এ কি জাত-বদল, এ যে যুগ-বদল তার মাঝখানে একটা কল্পান্ত। প্রজাপতি জেগে উঠেছেন আমার মধ্যে এক নূতন সৃষ্টিতে। মাসিমা, অনুমতি দাও, লাবণ্যকে নিয়ে আজ একবার বেড়িয়ে আসি। যাবার আগে শিলঙ পাহাড়কে আমাদের যুগল প্রণাম জানিয়ে যেতে চাই।"

যোগমায়া সম্মতি দিলেন। কিছুদূরে যেতে যেতে দুজনের হাত মিলে গেল, ওরা কাছে কাছে এল ঘেঁষে। নির্জন পথের ধারে নিচের দিকে চলেছে ঘন বন। সেই বনের একটা জায়গায় পড়েছে ফাঁক, আকাশ সেখানে পাহাড়ের নজরবন্দি থেকে একটু-খানি ছুটি পেয়েছে; তার অঞ্জলি ভরিয়ে নিয়েছে অস্তসূর্যের শেষ আভায়। সেইখানে পশ্চিমের দিকে মুখ করে দুজনে দাঁড়াল। অমিত লাবণ্যর মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার মুখটি উপরে তুলে ধরলে। লাবণ্যর চোখ অর্ধেক বোজা, কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আকাশে সোনার রঙের উপর চুনি-গলানো পান্না-গলানো আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে, যেখানে দেহ নেই শুধু আনন্দ আছে সেই অমর্ত্যজগতের অব্যক্তধ্বনি আসছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হল ঘন। সেই খোলা আকাশটুকু, রাত্রিবেলায় ফুলের মতো, নানা রঙের পাপড়িগুলি বন্ধ করে দিলে।

অমিতর বুকের কাছ থেকে লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে, "চলো এবার।" কেমন তার মনে হল এইখানে শেষ করা ভালো।

অমিত সেটা বুঝলে, কিছু বললে না। লাবণ্যর মুখ বুকের উপর একবার চেপে ধরে ফেরবার পথে খুব ধীরে ধীরে চলল।

বললে, "কাল সকালেই আমাকে ছাড়তে হবে, তার আগে আর দেখা করতে আসব না।"

"কেন আসবে না?"

"আজ ঠিক জায়গায় আমাদের শিলঙ পাহাড়ের অধ্যায়টি এসে থামল—ইতি প্রথমঃ সর্গঃ, আমাদের সয়ে বয়ে স্বর্গ।"

লাবণ্য কিছু বললে না, অমিতর হাত ধরে চলল। বুকের ভিতর আনন্দ, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা কান্না স্তব্ধ হয়ে আছে। মনে হল জীবনে কোনোদিন এমন নিবিড় করে অভাবনীয়কে এত কাছে পাওয়া যাবে না। পরমক্ষণে শুভদৃষ্টি হল, এর পরে আর কি বাসরঘর আছে? রইল কেবল মিলন আর বিদায় একত্র মিশিয়ে একটি শেষ প্রণাম। ভারি ইচ্ছে করতে লাগল অমিতকে এখনই সেই প্রণামটি করে, বলে, তুমি আমাকে ধন্য করেছ। কিন্তু সে আর হল না।

বাসার কাছাকাছি আসতেই অমিত বললে, "বন্যা, আজ তোমার শেষ কথাটি একটি কবিতায় বলো, তাহলে সেটা মনে করে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে। তোমার নিজের যা মনে আছে এমন একটা কিছু আমাকে শুনিয়ে দাও।"

লাবণ্য একটুখানি ভেবে আবৃত্তি করলে—

> "তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি'
> রজনীর শুভ্র অবসানে। কিছু আর নাই বাকি,
> নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্তের দৈন্যরাশি,
> নাই অভিমান, নাই দীন কান্না, নাই গর্ব হাসি,
> নাই পিছু ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি,
> ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।"

"বন্যা, বড়ো অন্যায় করলে। আজকের দিনে তোমার মুখে বলবার কথা এ নয়, কিছুতেই নয়। কেন এটা তোমার মনে এল? তোমার এ কবিতা এখনই ফিরিয়ে নাও।"

"ভয় কিসের মিতা? এই আগুনে-পোড়া প্রেম, এ সুখের দাবি করে না, এ নিজে মুক্ত বলেই মুক্তি দেয়, এর পিছনে ক্লান্তি আসে না, ম্লানতা আসে না—এর চেয়ে আর কিছু কি দেবার আছে?"

"কিন্তু আমি জানতে চাই এ কবিতা তুমি পেলে কোথায় ?"

"রবি ঠাকুরের।"

"তার তো কোনো বইয়ে এটা দেখি নি।"

"বইয়ে বেরোয় নি।"

"তবে পেলে কী করে ?"

"একটি ছেলে ছিল, সে আমার বাবাকে গুরু বলে ভক্তি করত, বাবা দিয়েছিলেন তাকে তার জ্ঞানের খাদ্য, এদিকে তার হৃদয়টিও ছিল তাপস ! সময় পেলেই সে যেত রবি ঠাকুরের কাছে, তাঁর খাতা থেকে মুষ্টিভিক্ষা করে আনত।"

"আর নিয়ে এসে তোমার পায়ে দিত।"

"সে-সাহস তার ছিল না। কোথাও রেখে দিত, যদি আমার দৃষ্টিতে পড়ে, যদি আমি তুলে নিই।"

"তাকে দয়া করেছ ?"

"করবার অবকাশ হল না, মনে-মনে প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন তাকে দয়া করেন।"

"যে-কবিতাটি আজ তুমি পড়লে, বেশ বুঝতে পারছি এটা সেই হতভাগারই মনের কথা।"

"হাঁ, তারই কথা বই কি।"

"তবে তোমার কেন আজ ওটা মনে পড়ল ?"

"কেমন করে বলব ? ওই কবিতাটির সঙ্গে আর-এক টুকরো কবিতা ছিল সেটাও আজ আমার কেন মনে পড়ছে ঠিক বলতে পারি নে—

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রু-জল।
এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল।
দুঃখ যে তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠে,
মুগ্ধ প্রাণের আবেশ বন্ধ টুটে,
এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া
বিচ্ছেদ-শতদল।"

অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধরে বললে, "বন্যা, সে-ছেলেটা আজ আমাদের মাঝখানে কেন এসে পড়ল ? ঈর্ষা করতে আমি ঘৃণা করি, এ আমার ঈর্ষা নয়—কিন্তু কেমন

একটা ভয় আসছে মনে। বলো, তার দেওয়া ওই কবিতাগুলো আজই কেন তোমার এমন করে মনে পড়ে গেল।"

"একদিন সে যখন আমাদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল তার পরে যেখানে বসে সে লিখত সেই ডেস্কে এই কবিতা দুটি পেয়েছি। এর সঙ্গে রবি ঠাকুরের আরও অনেক অপ্রকাশিত কবিতা, প্রায় এক খাতা ভরা। আজ তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, হয়তো সেইজন্যেই বিদায়ের কবিতা মনে এল।"

"সে-বিদায় আর এ-বিদায় কি একই ?"

"কেমন করে বলব ? কিন্তু এ-তর্কের তো কোনো দরকার নেই। যে-কবিতা আমার ভালো লেগেছে তাই তোমাকে শুনিয়েছি, হয়তো এ ছাড়া আর কোনো কারণ এর মধ্যে নেই।"

"বন্যা, রবি ঠাকুরের লেখা যতক্ষণ না লোকে একেবারে ভুলে যাবে ততক্ষণ ওর ভালো লেখা সত্য করে ফুটে উঠবে না। সেইজন্যে ওর কবিতা আমি ব্যবহারই করি নে। দলের লোকের ভালো লাগাটা কুয়াশার মতো, যা আকাশের উপর ভিজে হাত লাগিয়ে তার আলোটাকে ময়লা করে ফেলে।"

"দেখো মিতা, মেয়েদের ভালো-লাগা তার আদরের জিনিসকে আপন অন্দরমহলে একলা নিজেরই করে রাখে, ভিড়ের লোকের কোনো খবরই রাখে না। সে যত দাম দিতে পারে সব দিয়ে ফেলে, অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়ে বাজার যাচাই করতে তার মন নেই।"

"তাহলে আমারও আশা আছে, বন্যা। আমার বাজারদরের ছোট্টো একটা ছাপ লুকিয়ে ফেলে তোমার আপন দরের মস্ত একটা মার্কা নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াব।"

"আমাদের বাড়ি কাছে এসে পড়ল, মিতা। এবার তোমার মুখে তোমার পথ-শেষের কবিতাটা শুনে নিই।"

"রাগ ক'রো না, বন্যা, আমি কিন্তু রবি ঠাকুরের কবিতা আওড়াতে পারব না।"

"রাগ করব কেন ?"

"আমি একটি লেখককে আবিষ্কার করেছি, তার স্টাইল—"

"তার কথা তোমার কাছে বরাবরই শুনতে পাই। কলকাতায় লিখে দিয়েছি তার বই পাঠিয়ে দেবার জন্যে।"

"সর্বনাশ ! তার বই ! সে-লোকটার অন্য অনেক দোষ আছে, কিন্তু কখনো বই ছাপতে দেয় না। তার পরিচয় আমার কাছ থেকেই তোমাকে ক্রমে ক্রমে পেতে হবে। নইলে হয়তো—"

"ভয় ক'রো না, মিতা, তুমি তাকে যে-ভাবে বোঝ আমিও তাকে সেই ভাবেই বুঝে নেব এমন ভরসা আমার আছে। আমারই জিত থাকবে।"

"কেন ?"

"আমার ভালো লাগায় যা পাই সেও আমার, আর তোমার ভালো লাগায় যা পাব সেও আমার হবে। আমার নেবার অঞ্জলি হবে দুজনের মনকে মিলিয়ে। কলকাতায় তোমার ছোটো ঘরের বইয়ের আলমারিতে এক শেলফেই দুই কবির কবিতা ধরাতে পারব। এখন তোমার কবিতাটি বলো।"

"আর বলতে ইচ্ছে করছে না। মাঝখানে বড্ডো কতকগুলো তর্কবিতর্ক হয়ে হাওয়াটা খারাপ হয়ে গেল।"

"কিচ্ছু খারাপ হয় নি। হাওয়া ঠিক আছে।"

অমিত তার কপালের চুলগুলো কপালের থেকে উপরের দিকে তুলে দিয়ে খুব দরদের সুর লাগিয়ে পড়ে গেল—

"সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শর্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ো দিক্‌ভ্রান্তে।

বুঝেছ বন্যা, চাঁদ ডাক দিয়েছে শুকতারাকে, সে আপনার রাত পোহাবার সঙ্গিনীকে চায়। নিজের রাতটার 'পরে ওর বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে।

ধরা যেথা অম্বরে মেশে
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র,
আঁধারের বক্ষের 'পরে
আধেক আলোক-রেখা রন্ধ্র।

ওর এই আধখানা জাগা, ওই অল্প একটুখানি আলো, আঁধারটাকে সামান্য খানিকটা আঁচড়ে দিয়েছে। এই হল ওর খেদ। এই স্বল্পতার জালে ওকে জড়িয়ে ফেলেছে, সেইটে ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে ও যেন সমস্ত রাত্রি ঘুমোতে ঘুমোতে গুমরে উঠছে। কী আইডিয়া। গ্র্যাণ্ড।

আমার আসন রাখে পেতে
নিদ্রাগহন মহাশূন্য।
তন্ত্রী বাজাই স্বপনেতে,
তন্দ্রা ঈষৎ করি ক্ষুণ্ণ।

কিন্তু এমন হালকা করে বাঁচার বোঝাটা যে বড্ডো বেশি ; যে-নদীর জল মরেছে তার মন্থর স্রোতের ক্লান্তিতে জঞ্জাল জমে, যে স্বল্প সে নিজেকে বইতে গিয়ে ক্লিষ্ট হয়। তাই ও বলছে—

মন্দচরণে চলি পারে,
যাত্রা হয়েছে মোর সাঙ্গ।
সুর থেমে আসে বারে বারে
ক্লান্তিতে আমি অবশাঙ্গ।

কিন্তু এই ক্লান্তিতেই কি ওর শেষ ? ওর ঢিলে তারের বীণাকে নতুন করে বাঁধবার আশা ও পেয়েছে, দিগন্তের ওপারে কার পায়ের শব্দ ও যেন শুনল—

সুন্দরী ওগো শুকতারা,
রাত্রি না যেতে এস তূর্ণ।
স্বপ্নে যে-বাণী হল হারা
জাগরণে করো তারে পূর্ণ।

উদ্ধারের আশা আছে, কানে আসছে জাগ্রত বিশ্বের বিপুল কলরব, সেই মহাপথের দূতী তার প্রদীপ হাতে করে এল বলে—

নিশীথের তল হতে তুলি
লহ তারে প্রভাতের জন্য।
আঁধারে নিজেরে ছিল ভুলি,
আলোকে তাহারে করো ধন্য।
যেখানে সুপ্তি হল লীনা,
যেথা বিশ্বের মহামন্ত্র,
অর্পিনু সেথা মোর বীণা
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র।

এই হতভাগা চাঁদটা তো আমি। কাল সকালবেলা চলে যাব। কিন্তু চলে যাওয়াকে তো শূন্য রাখতে চাই নে। তার উপরে আবির্ভাব হবে সুন্দরী শুকতারার, জাগরণের গান নিয়ে। অন্ধকার জীবনের স্বপ্নে এতদিন যা অস্পষ্ট ছিল, সুন্দরী শুকতারা তাকে প্রভাতের মধ্যে সম্পূর্ণ করে দেবে। এর মধ্যে একটা আশার জোর আছে, ভাবী প্রত্যুষের একটা উজ্জ্বল গৌরব আছে, তোমার ওই রবি ঠাকুরের কবিতার মতো মিইয়ে-পড়া হাল-ছাড়া বিলাপ নয়।"

"রাগ কর কেন, মিতা ? রবি ঠাকুর যা পারে তার বেশি সে পারে না এ-কথা বারবার বলে লাভ কী ?"

"তোমরা সবাই মিলে তাকে নিয়ে বড়ো বেশি—"

"ও-কথা ব'লো না, মিতা। আমার ভালো-লাগা আমারই, তাতে যদি আর-কারও সঙ্গে আমার মিল হয় বা তোমার সঙ্গে মিল না হয় সেটাতে কি আমার দোষ ? না-হয় কথা রইল; তোমার সেই পঁচাত্তর টাকার বাসায় একদিন আমার যদি জায়গা হয় তাহলে তোমার কবির লেখা আমাকে শুনিয়ো, আমার কবির লেখা তোমাকে শোনাব না।"

"কথাটা অন্যায় হল যে। পরস্পর পরস্পরের জুলুম ঘাড় পেতে বহন করবে এইজন্যেই তো বিবাহ।"

"রুচির জুলুম তোমার কিছুতেই সইবে না। রুচির ভোজে তোমরা নিমন্ত্রিত ছাড়া কাউকে ঘরে ঢুকতে দাও না, আমি অতিথিকেও আদর করে বসাই।"

"ভালো করলুম না তর্ক তুলে। আমাদের এখানকার এই শেষ সন্ধেবেলার সুর বিগড়ে গেল।"

"একটুও না। যা-কিছু বলবার আছে সব স্পষ্ট করে বলেও যে-সুরটা খাঁটি থাকে সেই আমাদের সুর। তার মধ্যে ক্ষমার অন্ত নেই।"

"আজ আমার মুখের বিস্বাদ ঘোচাতেই হবে। কিন্তু বাংলা কাব্যে হবে না। ইংরেজি কাব্যে আমার বিচারবুদ্ধি অনেকটা ঠাণ্ডা থাকে। প্রথম দেশে ফিরে এসে আমিও কিছুদিন প্রোফেসারি করেছিলুম।"

লাবণ্য হেসে বললে, "আমাদের বিচারবুদ্ধি ইংরেজ বাড়ির বুলডগের মতো—ধুতির কোঁচাটা দুলছে দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। ধুতির মহলে কোন্‌টা ভদ্র ও তার হিসেব পায় না। বরঞ্চ খানসামার তকমা দেখলে লেজ নাড়ে।"

"তা মানতেই হবে। পক্ষপাত-জিনিসটা স্বাভাবিক জিনিস নয়। অধিকাংশ স্থলেই ওটা ফরমাশে তৈরি। ইংরেজি সাহিত্যে পক্ষপাত কানমলা খেয়ে খেয়ে ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে। সেই অভ্যেসের জোরেই এক পক্ষকে মন্দ বলতে যেমন সাহস হয় না অন্য পক্ষকে ভালো বলতেও তেমনি সাহসের অভাব ঘটে। থাক গে, আজ নিবারণ চক্রবর্তীও না, আজ একেবারে নিছক ইংরেজি কবিতা—বিনা তর্জমায়।"

"না না মিতা, তোমার ইংরেজি থাক, সেটা বাড়ি গিয়ে টেবিলে বসে হবে। আজ আমাদের এই সন্ধেবেলাকার শেষ কবিতাটি নিবারণ চক্রবর্তীর হওয়াই চাই। আর-কারও নয়।"

অমিত উৎফুল্ল হয়ে বললে, "জয় নিবারণ চক্রবর্তীর। এতদিনে সে হল অমর। বন্যা, তাকে আমি তোমার সভাকবি করে দেব। তুমি ছাড়া আর-কারও দ্বারে সে প্রসাদ নেবে না।"

"তাতে কি সে বরাবর সন্তুষ্ট থাকবে?"

"না থাকে তো তাকে কান মলে বিদায় করে দেব।"

"আচ্ছা কানমলার কথা পরে স্থির করব, এখন শুনিয়ে দাও।"

অমিত আবৃত্তি করতে লাগল—

কত ধৈর্য ধরি
ছিলে কাছে দিবসশর্বরী।
তব পদ-অঙ্কনগুলিরে
কতবার দিয়ে গেছ মোর ভাগ্য-পথের ধূলিরে।
আজ যবে
দূরে যেতে হবে—
তোমারে করিয়া যাব দান
তব জয়গান।

কতবার ব্যর্থ আয়োজনে
এ জীবনে
হোমাগ্নি উঠে নি জ্বলি,
শূন্যে গেছে চলি
হতাশ্বাস ধূমের কুণ্ডলী।
কতবার ক্ষণিকের শিখা
আঁকিয়াছে ক্ষীণ টিকা
নিশ্চেতন নিশীথের ভালে।
লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে।

এবার তোমার আগমন
হোম-হুতাশন
জ্বেলেছে গৌরবে।
যজ্ঞ মোর ধন্য হবে।

আমার আহুতি দিনশেষে
করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে।
লহ এ প্রণাম
জীবনের পূর্ণ পরিণাম।
এ প্রণতি'পরে
স্পর্শ রাখো স্নেহ-ভরে,
তোমার ঐশ্বর্যমাঝে
সিংহাসন যেথায় বিরাজে,
করিয়ো আহ্বান,
সেথা এ প্রণতি মোর পায় যেন স্থান।

১৩

আশঙ্কা

সকালবেলায় কাজে মন দেওয়া আজ লাবণ্যর পক্ষে কঠিন। সে বেড়াতেও যায় নি। অমিত বলেছিল শিলঙ থেকে যাবার আগে আজ সকালবেলায় সে ওদের সঙ্গে দেখা করতে চায় না। সেই পণটাকে রক্ষা করবার ভার দুজনেরই উপর। কেননা, যে-রাস্তায় ও বেড়াতে যায় সেই রাস্তা দিয়েই অমিতকে যেতে হবে। মনে তাই লোভ ছিল যথেষ্ট। সেটাকে কষে দমন করতে হল। যোগমায়া খুব সকালেই স্নান সেরে তাঁর আহ্নিকের জন্যে কিছু ফুল তোলেন। তিনি বেরোবার আগেই লাবণ্য সে-জায়গাটা থেকে চলে এল য়ুক্যালিপটাস-তলায়। হাতে দুই-একটা বই ছিল, বোধ হয় নিজেকে এবং অন্যদেরকে ভোলাবার জন্যে। তার পাতা খোলা, কিন্তু বেলা যায়, পাতা ওলটানো হয় না। মনের মধ্যে কেবলই বলছে, জীবনের মহোৎসবের দিন কাল শেষ হয়ে গেল। আজ সকালে এক-একবার মেঘরৌদ্রের মধ্যে দিয়ে ভাঙনের দূত আকাশ ঝেঁটিয়ে বেড়াচ্ছে। মনে দৃঢ়বিশ্বাস যে, অমিত চিরপলাতক, একবার সে সরে গেলে আর তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। রাস্তায় চলতে চলতে কখন সে গল্প শুরু করে, তার পর রাত্রি আসে, পরদিন সকালে দেখা যায় গল্পের গাঁথন ছিন্ন, পথিক গেছে চলে। লাবণ্য তাই ভাবছিল ওর গল্পটা এখন থেকে চিরদিনের মতো রইল বাকি। আজ সেই অসমাপ্তির ম্লানতা সকালের আলোয়, অকাল-অবসানের অবসাদ আর্দ্র হাওয়ার মধ্যে।

এমন সময়, বেলা তখন নটা, অমিত দুমদাম শব্দে ঘরে ঢুকেই মাসিমা মাসিমা করে ডাক দিলে। যোগমায়া প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে ভাঁড়ারের কাজে প্রবৃত্ত। আজ তাঁরও মনটা পীড়িত। অমিত তার কথায় হাসিতে চাঞ্চল্যে এতদিন তাঁর স্নেহাসক্ত মনকে তাঁর ঘরকে ভরে রেখেছিল। সে চলে গেছে এই ব্যথার বোঝা নিয়ে তাঁর সকাল-বেলাটা যেন বৃষ্টিবিন্দুর ভারে সদ্যঃপাতী ফুলের মতো নুয়ে পড়ছে। তাঁর বিচ্ছেদকাতর ঘরকন্নার কাজে আজ তিনি লাবণ্যকে ডাকেন নি, বুঝেছিলেন আজ তার দরকার ছিল একলা থাকার, লোকের চোখের আড়ালে।

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, কোলের থেকে বই গেল পড়ে, জানতেও পারলে না। এদিকে যোগমায়া ভাঁড়ারঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে এসে বললেন, "কী বাবা অমিত, ভূমিকম্প নাকি ?"

"ভূমিকম্পই তো। জিনিসপত্র রওনা করে দিয়েছি ; গাড়ি ঠিক ; ডাকঘরে গেলুম দেখতে চিঠিপত্র কিছু আছে কিনা। সেখানে এক টেলিগ্রাম।"

অমিতর মুখের ভাব দেখে যোগমায়া উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "খবর সব ভালো তো ?"

লাবণ্যও ঘরে এসে জুটল। অমিত ব্যাকুল মুখে বললে, "আজই সন্ধ্যেবেলায় আসছে সিসি, আমার বোন, তার বন্ধু কেটি মিত্তির, আর তার দাদা নরেন।"

"তা ভাবনা কিসের, বাছা ? শুনেছি ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছে একটা বাড়ি খালি আছে। যদি নিতান্ত না পাওয়া যায় আমার এখানে কি একরকম করে জায়গা হবে না ?"

"সেজন্যে ভাবনা নেই, মাসি। তারা নিজেরাই টেলিগ্রাফ করে হোটেলে জায়গা ঠিক করেছে।"

"আর যাই হ'ক বাবা, তোমার বোনেরা এসে যে দেখবে তুমি ওই লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটাতে আছ সে কিছুতেই হবে না। তারা আপন লোকের খ্যাপামির জন্যে দায়িক করবে আমাদেরই।"

"না মাসি, আমার প্যারাডাইস লস্ট। ওই নগ্ন আসবাবের স্বর্গ থেকে আমার বিদায়। সেই দড়ির খাটিয়ার নীড় থেকে আমার সুখস্বপ্নগুলো উড়ে পালাবে। আমাকেও জায়গা নিতে হবে সেই অতিপরিচ্ছন্ন হোটেলের এক অতিসভ্য কামরায়।"

কথাটা বিশেষ কিছু নয়, তবু লাবণ্যর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এতদিন একটা কথা ওর মনেও আসে নি যে, অমিতর যে-সমাজ সে ওদের সমাজ থেকে সহস্র যোজন দূরে। এক মুহূর্তেই সেটা বুঝতে পারলে। অমিত যে আজ কলকাতায় চলে যাচ্ছিল তার

মধ্যে বিচ্ছেদের কঠোর মূর্তি ছিল না। কিন্তু এই যে আজ ও হোটেলে যেতে বাধ্য হল এইটেতেই লাবণ্য বুঝলে যে-বাসা এতদিন ওরা দুজনে নানা অদৃশ্য উপকরণে গড়ে তুলছিল সেটা কোনোদিন বুঝি আর দৃশ্য হবে না।

লাবণ্যর দিকে একটু চেয়ে অমিত যোগমায়াকে বললে, "আমি হোটেলেই যাই, আর জাহান্নমেই যাই কিন্তু এইখানেই রইল আমার আসল বাসা।"

অমিত বুঝেছে শহর থেকে আসছে একটা অশুভ দৃষ্টি। মনে-মনে নানা প্ল্যান করছে যাতে সিসির দল এখানে না আসতে পারে। কিন্তু ইদানীং ওর চিঠিপত্র আসছিল যোগমায়ার বাড়ির ঠিকানায়, তখন ভাবে নি কোনো সময়ে তাতে বিপদ ঘটতে পারে। অমিতর মনের ভাবগুলো চাপা থাকতে চায় না, এমন কি, প্রকাশ পায় কিছু আতিশয্যের সঙ্গে। ওর বোনের আসা-সম্বন্ধে অমিতর এত বেশি উদ্বেগ যোগমায়ার কাছে অসংগত ঠেকেছিল; লাবণ্যও ভাবলে অমিত ওকে নিয়ে বোনেদের কাছে লজ্জিত। ব্যাপারটা লাবণ্যর কাছে বিস্বাদ ও অসম্মানজনক হয়ে দাঁড়াল।

অমিত লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার কি সময় আছে? বেড়াতে যাবে?"

লাবণ্য একটু যেন কঠিন করে বললে, "না, সময় নেই।"

যোগমায়া ব্যস্ত হয়ে বললেন, "যাও না মা, বেড়িয়ে এস গে।"

লাবণ্য বললে, "কর্তামা, কিছুকাল থেকে সুরমাকে পড়ানোয় বড়ো অবহেলা হয়েছে। খুবই অন্যায় করেছি। কাল রাত্রেই ঠিক করেছিলুম আজ থেকে কিছুতেই আর ঢিলেমি করা হবে না।" বলে লাবণ্য ঠোঁট চেপে মুখ শক্ত করে রইল।

লাবণ্যর এই জেদের মেজাজটা যোগমায়ার পরিচিত। পীড়াপীড়ি করতে সাহস করলেন না।

অমিতও নীরস কণ্ঠে বললে, "আমিও চললুম কর্তব্য করতে, ওদের জন্যে সব ঠিক করে রাখা চাই।"

এই বলে চলে যাবার আগে বারান্দায় একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। বললে, "বন্যা, ওই চেয়ে দেখো। গাছের আড়াল থেকে আমার বাড়ির চালটা অল্প একটু দেখা যাচ্ছে। একটা কথা তোমাদের বলা হয় নি, ওই বাড়িটা কিনে নিয়েছি। বাড়ির মালেক অবাক, নিশ্চয় ভেবেছে ওখানে সোনার গোপন খনি আবিষ্কার করে থাকব। দাম বেশ একটু চড়িয়ে নিয়েছে। ওখানে সোনার খনির সন্ধান তো পেয়েইছিলুম, সে সন্ধান একমাত্র আমিই জানি। আমার জীর্ণ কুটিরের ঐশ্বর্য সবার চোখ থেকে লুকোনো থাকবে।"

লাবণ্যর মুখে গভীর একটা বিষাদের ছায়া পড়ল। বললে, "আর-কারও কথা অত

করে তুমি ভাব কেন? না হয় আর সবাই জানতে পারলে। ঠিকমতো জানতে পারাই তো চাই, তা হলে কেউ অমর্যাদা করতে সাহস করে না।"

এ-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে অমিত বললে, "বন্যা, ঠিক করে রেখেছি, বিয়ের পরে ওই বাড়িতেই আমরা কিছুদিন এসে থাকব। আমার সেই গঙ্গার ধারের বাগান, সেই ঘাট, সেই বটগাছ সব মিলিয়ে গেছে ওই বাড়িটার মধ্যে। তোমার দেওয়া মিতালি নাম ওকেই সাজে।"

"ও-বাড়ি থেকে আজ তুমি বেরিয়ে এসেছ, মিতা। আবার একদিন যদি ঢুকতে চাও দেখবে ওখানে তোমাকে কুলোবে না। পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না। সেদিন তুমি বলেছিলে, জীবনে মানুষের প্রথম সাধনা দারিদ্র্যের, দ্বিতীয় সাধনা ঐশ্বর্যের। তার পরে শেষ সাধনার কথা বল নি, সেটা হচ্ছে ত্যাগের।"

"বন্যা, ওটা তোমাদের রবি ঠাকুরের কথা। সে লিখেছে, শাজাহান আজ তার তাজমহলকেও ছাড়িয়ে গেল। একটা কথা তোমার কবির মাথায় আসে নি যে, আমরা তৈরি করি, তৈরি জিনিসকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যেই। বিশ্বসৃষ্টিতে ওইটেকেই বলে এভোল্যুশন। একটা অনাসৃষ্টি ভূত ঘাড়ে চেপে থাকে, বলে, সৃষ্টি করো, সৃষ্টি করলেই ভূত নামে, তখন সৃষ্টিটাকেও আর দরকার থাকে না। কিন্তু তাই বলে ওই ছেড়ে-যাওয়াটাই চরম কথা নয়। জগতে শাজাহান-মমতাজের অক্ষয় ধারা বয়ে চলেছেই, ওরা কি একজন মাত্র? সেইজন্যেই তো তাজমহল কোনোদিন শূন্য হতেই পারল না। নিবারণ চক্রবর্তী বাসরঘরের উপর একটা কবিতা লিখেছে,—সেটা তোমাদের কবিবরের তাজমহলের সংক্ষিপ্ত উত্তর, পোস্টকার্ডে লেখা—

তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে
রাত্রি যবে
উঠিবে উন্মনা হয়ে প্রভাতের রথচক্ররবে।
হায় রে বাসরঘর,
বিরাট বাহির সে যে বিচ্ছেদের দস্যু ভয়ংকর।
তবু সে যতই ভাঙে-চোরে,
মালাবদলের হার যত দেয় ছিন্ন ছিন্ন করে,
তুমি আছ ক্ষয়হীন
অনুদিন;
তোমার উৎসব
বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীরব।

কে বলে তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল
শূন্য করি তব শয্যাতল ?
যায় নাই, যায় নাই,
নব নব যাত্রী মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
তোমার আহ্বানে
উদার তোমার দ্বার পানে।
হে বাসরঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।

রবি ঠাকুর কেবল চলে যাবার কথাই বলে, রয়ে যাবার গান গাইতে জানে না। বন্ধু, কবি কি বলে যে, আমরাও দুজন যেদিন ওই দরজায় ঘা দেব, দরজা খুলবে না ?"

"মিনতি রাখো, মিতা, আজ সকালে কবির লড়াই তুলো না। তুমি কি ভাবছ প্রথম দিন থেকেই আমি জানতে পারি নি যে, তুমিই নিবারণ চক্রবর্তী ? কিন্তু তোমার ওই কবিতার মধ্যে এখনই আমাদের ভালোবাসার সমাধি তৈরি করতে শুরু ক'রো না, অন্তত তার মরার জন্যে অপেক্ষা ক'রো।"

অমিত আজ নানা বাজে কথা বলে ভিতরের কোন্ একটা উদ্বেগকে চাপা দিতে চায়, লাবণ্য তা বুঝেছিল।

অমিতও বুঝতে পেরেছে কাব্যের দ্বন্দ্ব কাল সন্ধ্যেবেলায় বেখাপ হয় নি, আজ সকালবেলায় তার সুর কেটে যাচ্ছে। কিন্তু সেইটে যে লাবণ্যর কাছে সুস্পষ্ট সেও ওর ভালো লাগল না। একটু নীরসভাবে বললে, "তা হলে যাই, বিশ্বজগতে আমারও কাজ আছে, আপাতত সে হচ্ছে হোটেল পরিদর্শন। ওদিকে লক্ষ্মীছাড়া নিবারণ চক্রবর্তীর ছুটির মেয়াদ এবার ফুরোল বুঝি।"

তখন লাবণ্য অমিতর হাত ধরে বললে, "দেখো, মিতা, আমাকে চিরদিন যেন ক্ষমা করতে পার। যদি একদিন চলে যাবার সময় আসে, তবে, তোমার পায়ে পড়ি, যেন রাগ করে চলে যেয়ো না।" এই বলে চোখের জল ঢাকবার জন্যে দ্রুত অন্য ঘরে গেল।

অমিত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরে আস্তে আস্তে যেন অন্যমনে গেল য়ুক্যালিপটাস-তলায়। দেখলে সেখানে আখরোটের গোটাকতক ভাঙা খোলা ছড়ানো। দেখেই ওর মনটার ভিতর কেমন একটা ব্যথা চেপে ধরলে। জীবনের ধারা চলতে চলতে তার যে-সব চিহ্ন বিছিয়ে যায় সেগুলোর তুচ্ছতাই সব-চেয়ে সকরুণ। তার পরে দেখলে ঘাসের উপর একটা বই, সেটা রবি ঠাকুরের 'বলাকা'। তার

নিচের পাতাটা ভিজে গেছে। একবার ভাবলে ফিরিয়ে দিয়ে আসি গে, কিন্তু ফিরিয়ে দিলে না, সেটা নিল পকেটে। হোটেলে যাব-যাব করলে, তাও গেল না; বসে পড়ল গাছতলাটাতে। রাত্রের ভিজে মেঘে আকাশটাকে খুব করে মেজে দিয়েছে। ধুলো-ধোওয়া বাতাসে অত্যন্ত স্পষ্ট করে প্রকাশ পাচ্ছে চারদিকের ছবিটা; পাহাড়ের আর গাছপালার সীমান্তগুলি যেন ঘন নীল আকাশে খুদে-দেওয়া, জগৎটা যেন কাছে এগিয়ে একেবারে মনের উপরে এসে ঠেকল। আস্তে আস্তে বেলা চলে যাচ্ছে, তার ভিতরটাতে ভৈরবীর সুর।

এখনই খুব কষে কাজে লাগবে বলে লাবণ্যর পণ ছিল, তবু যখন দূর থেকে দেখলে অমিত গাছতলায় বসে, আর থাকতে পারলে না, বুকের ভিতরটা হাঁপিয়ে উঠল, চোখ এল জলে ছলছলিয়ে। কাছে এসে বললে, "মিতা, তুমি কী ভাবছ?"

"এতদিন যা ভাবছিলুম একেবারে তার উলটো।"

"মাঝে মাঝে মনটাকে উলটিয়ে না দেখলে তুমি ভালো থাক না। তা তোমার উলটো ভাবনাটা কী রকম শুনি।"

"তোমাকে মনের মধ্যে নিয়ে এতদিন কেবল ঘর বানাচ্ছিলুম,—কখনো গঙ্গার ধারে, কখনো পাহাড়ের উপরে। আজ মনের মধ্যে জাগছে সকালবেলাকার আলোয় উদাস-করা একটা পথের ছবি,—অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় ওই পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে। হাতে আছে লোহার ফলাওআলা লম্বা লাঠি, পিঠে আছে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা চৌকো থলি। তুমি চলবে সঙ্গে। তোমার নাম সার্থক হ'ক, বন্যা, তুমি আমাকে বদ্ধঘর থেকে বের করে পথে ভাসিয়ে নিয়ে চললে বুঝি। ঘরের মধ্যে নানান লোক, পথ কেবল দুজনের।"

"ডায়মণ্ড হারবারের বাগানটা তো গেছেই, তার পরে সেই পচাত্তর টাকার ঘর-বেচারাও গেল। তা যাক গে। কিন্তু চলবার পথে বিচ্ছেদের ব্যবস্থাটা কী রকম করবে? দিনান্তে তুমি এক পান্থশালায় ঢুকবে, আর আমি আর-একটাতে?"

"তার দরকার হয় না, বন্যা। চলাতেই নতুন রাখে, পায়ে পায়ে নতুন, পুরোনো হবার সময় পাওয়া যায় না। বসে-থাকাটাই বুড়োমি।"

"হঠাৎ এ খেয়ালটা তোমার কেন মনে হল, মিতা?"

"তবে বলি। হঠাৎ শোভনলালের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তার নাম শুনেছ বোধ হয়, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদওআলা। ভারত-ইতিহাসের সাবেক পথগুলো সন্ধান করবে বলে কিছুকাল থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে। সে অতীতের লুপ্ত পথ উদ্ধার করতে চায়, আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতের পথ সৃষ্টি করা।"

লাবণ্যার বুকের ভিতরে হঠাৎ খুব একটা ধাক্কা দিলে। কথাটাকে বাধা দিয়ে অমিতকে বললে, "শোভনলালের সঙ্গে একই বৎসর আমি এম. এ. দিয়েছি। তার সব খবরটা শুনতে ইচ্ছে করে।"

"এক সময়ে সে খেপেছিল আফগানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস্তা চলেছিল, সেইটেকে আয়ত্ত করবে। ওই রাস্তা দিয়েই ভারতবর্ষে হিউয়েন সাঙের তীর্থযাত্রা, ওই রাস্তা দিয়েই তারও পূর্বে আলেকজাণ্ডারের রণযাত্রা। খুব কষে পুশতু পড়লে, পাঠানি কায়দাকানুন অভ্যেস করলে। সুন্দর চেহারা, ঢিলে কাপড়ে ঠিক পাঠানের মতো দেখতে হয় না, দেখায় যেন পারসিকের মতো। আমাকে এসে ধরলে সেখানে ফরাসি পণ্ডিতরা এই কাজে লেগেছেন তাঁদের কাছে পরিচয়-পত্র দিতে, ফ্রান্সে থাকতে তাঁদের কারও কারও কাছে আমি পড়েছি। দিলেম পত্র, কিন্তু ভারত-সরকারের ছাড়চিঠি জুটল না। তার পর থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবলই পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কখনো কাশ্মীরে কখনো কুমায়ুনে। এবার ইচ্ছে হয়েছে হিমালয়ের পূর্ব-প্রান্তটাতেও সন্ধান করবে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের রাস্তা এদিক দিয়ে কোথায় কোথায় গেছে সেইটে দেখতে চায়। ওই পথ-খ্যাপাটার কথা মনে করে আমারও মন উদাস হয়ে যায়। পুঁথির মধ্যে আমরা কেবল কথার রাস্তা খুঁজে খুঁজে চোখ খোওয়াই, ওই পাগল বেরিয়েছে পথের পুঁথি পড়তে, মানব-বিধাতার নিজের হাতে লেখা। আমার কী মনে হয় জান ?"

"কী, বলো।"

"প্রথম যৌবনে একদিন শোভনলাল কোন্ কাঁকনপরা হাতের ধাক্কা খেয়েছিল, তাই ঘরের থেকে পথের মধ্যে ছিটকিয়ে পড়েছে। ওর সমস্ত কাহিনীটা স্পষ্ট জানি নে, কিন্তু একদিন ওতে-আমাতে একলা ছিলুম, নানা কথায় হল প্রায় রাত দুপুর, জানলার বাইরে হঠাৎ চাঁদ দেখা দিল, একটা ফুলন্ত জারুলগাছের আড়ালে, ঠিক সেই সময়টাতে কোনো-একজনের কথা বলতে গেল, নাম করলে না, বিবরণ কিছুই বললে না, অল্প একটু আভাস দিতেই গলা ভার হয়ে এল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল। বুঝতে পারলুম ওর জীবনের মধ্যে কোন্‌খানে অত্যন্ত একটা নিষ্ঠুর কথা বিঁধে আছে। সেই কথাটাকেই বুঝি পথ চলতে চলতে ও পায়ে-পায়ে খইয়ে দিতে চায়।"

লাবণ্যর হঠাৎ উদ্ভিদতত্ত্বের ঝোঁক এল, ঝুয়ে পড়ে দেখতে লাগল, ঘাসের মধ্যে সাদায়-হলদেয় মেলানো একটা বুনো ফুল। একান্ত মনোযোগে তার পাপড়িগুলো গুনে দেখার জরুরি দরকার পড়ল।

অমিত বললে, "জান বন্যা, আমাকে তুমি আজ পথের দিকে ঠেলে দিয়েছ।"

"কেমন করে ?"

"আমি ঘর বানিয়েছিলুম। আজ সকালে তোমার কথায় মনে হল তুমি তার মধ্যে পা দিতে কুণ্ঠিত। আজ দু-মাস ধরে মনে-মনে ঘর সাজালুম। তোমাকে ডেকে বললুম, এস বধূ, ঘরে এস। তুমি আজ বধূসজ্জা খসিয়ে ফেললে, বললে, এখানে জায়গা হবে না, বন্ধু, চিরদিন ধরে আমাদের সপ্তপদীগমন হবে।"

বনফুলের বটানি আর চলল না। লাবণ্য হঠাৎ উঠে পড়ে ক্লিষ্টস্বরে বললে, "মিতা, আর নয়, সময় নেই।"

১৪

ধূমকেতু

এতদিন পরে অমিত একটা কথা আবিষ্কার করেছে যে, লাবণ্যর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা শিলঙসুদ্ধ বাঙালি জানে। গভর্মেন্ট আপিসের কেরানিদের প্রধান আলোচ্য বিষয় তাদের জীবিকাভাগ্যগগনে কোন্ গ্রহ রাজা হৈল কে বা মন্ত্রিবর। এমন সময় তাদের চোখে পড়ল মানবজীবনের জ্যোতির্মণ্ডলে এক যুগ্মতারার আবর্তন, একেবারে ফার্স্ট ম্যাগ্নিচ্যুডের আলো। পর্যবেক্ষকদের প্রকৃতি অনুসারে এই দুটি নবদীপ্যমান জ্যোতিষ্কের আগ্নেয়নাট্যের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা চলছে।

পাহাড়ে হাওয়া খেতে এসে এই ব্যাখ্যার মধ্যে পড়েছিল কুমার মুখুজ্যে—অ্যাটর্নি। সংক্ষেপে কেউ তাকে বলে কুমার মুখো, কেউ বলে মার মুখো। সিসিদের মিত্রগোষ্ঠীর অন্তশ্চর নয় সে, কিন্তু জ্ঞাতি, অর্থাৎ জানাশোনার দলে। অমিত তাকে ধূমকেতু মুখো নাম দিয়েছিল। তার একটা কারণ, সে এদের দলের বাইরে, তবু সে মাঝে মাঝে এদের কক্ষপথে পুচ্ছ বুলিয়ে যায়। সকলেই আন্দাজ করে, যে-গ্রহটি তাকে বিশেষ করে টান মারছে তার নাম লিসি। এই নিয়ে সকলেই কৌতুক অনুভব করে, কিন্তু লিসি স্বয়ং এতে ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত। তাই লিসি প্রায়ই প্রবল বেগে এর পুচ্ছমর্দন করে চলে যায়, কিন্তু দেখতে পাই তাতে ধূমকেতুর ল্যাজার বা মুড়োর কোনোই লোকসান হয় না।

অমিত শিলঙের রাস্তায় ঘাটে মাঝে মাঝে কুমার মুখোকে দূর থেকে দেখেছে। তাকে না দেখতে পাওয়া শক্ত। বিলেতে আজও যায় নি বলে তার বিলিতি কায়দা বধূ উৎকটভাবে প্রকাশমান। তার মুখে নিরবচ্ছিন্ন একটা দীর্ঘ মোটা চুরুট থাকে

এইটেই তার ধূমকেতু মুখো নামের প্রধান কারণ। অমিত তাকে দূর থেকেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে এবং নিজেকে ভুলিয়েছে যে, ধূমকেতু বুঝি সেটা বুঝতে পারে নি। কিন্তু দেখেও দেখতে না পাওয়াটা একটা বড়ো বিদ্যের অন্তর্গত। চুরিবিদ্যের মতোই, তার সার্থকতার প্রমাণ হয় যদি না পড়ে ধরা। তাতে প্রত্যক্ষ দৃশ্যটাকে সম্পূর্ণ পার করে দেখবার পারদর্শিতা চাই।

কুমার মুখো শিলঙের বাঙালিসমাজ থেকে এমন অনেক কথা সংগ্রহ করেছে যাকে মোটা অক্ষরে শিরোনামা দেওয়া যেতে পারে "অমিত রায়ের অমিতাচার।" মুখে সব-চেয়ে নিন্দে করেছে যারা, মনে সব-চেয়ে রসভোগ করেছে তারাই। যকৃতের বিকৃতি-শোধনের জন্যে কুমার কিছুদিন এখানে থাকবে বলেই স্থির ছিল, কিন্তু জনশ্রুতি বিস্তারের উগ্র উৎসাহে তাকে পাঁচদিনের মধ্যে কলকাতায় ফেরালে। সেখানে গিয়ে অমিত সম্বন্ধে তার চুরুটধূমাকৃত অত্যুক্তি উদ্‌গারে সিসি-লিসিমহলে কৌতুকে কৌতূহলে জড়িত বিভীষিকা উৎপাদন করলে।

অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রই এতক্ষণে অনুমান করে থাকবেন যে, সিসি-দেবতার বাহন হচ্ছে কেটি মিত্তিরের দাদা নরেন। তার অনেক দিনের একনিষ্ঠ বাহন-দশা এবার বৈবাহনের দশম দশায় উত্তীর্ণ হবে এমন কথা উঠেছে। সিসি মনে-মনে রাজি। কিন্তু যেন রাজি নয় ভাব দেখিয়ে একটা প্রদোষান্ধকার ঘনিয়ে রেখেছে। অমিতর সম্মতি-সহায়ে নরেন এই সংশয়টুকু পার হতে পারবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু অমিত হাম্বাগটা না ফেরে কলকাতায়, না দেয় চিঠির জবাব। ইংরেজি যতগুলো গর্হিত শব্দভেদী বাক্য তার জানা ছিল সবগুলিই প্রকাশ্যে ও স্বগত উক্তিতে নিরুদ্দেশ অমিতর প্রতি নিক্ষেপ করেছে। এমন কি, তারযোগে অত্যন্ত বেতার বাক্য শিলঙে পাঠাতে ছাড়ে নি,—কিন্তু উদাসীন নক্ষত্রকে লক্ষ্য করে উদ্ধত হাউয়ের মতো কোথাও তার দাহরেখা রইল না। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল অবস্থাটার সরেজমিন তদন্ত হওয়া দরকার। সর্বনাশের স্রোতে অমিতর ঝুঁটির ডগাটাও যদি কোথাও একটু দেখা যায় টেনে ডাঙায় তোলা আশু দরকার। এ-সম্বন্ধে তার আপন বোন সিসির চেয়ে পরের বোন কেটির উৎসাহ অনেক বেশি। ভারতের ধন বিদেশে লুপ্ত হচ্ছে বলে আমাদের পলিটিক্সের যে আক্ষেপ কেটি মিটারের ভাবখানা সেই জাতের।

নরেন মিটার দীর্ঘকাল য়ুরোপে ছিল। জমিদারের ছেলে, আয়ের জন্য ভাবনা নেই, ব্যয়ের জন্যেও; বিদ্যার্জনের ভাবনাও সেই পরিমাণে লঘু। বিদেশে ব্যয়ের প্রতিই অধিক মনোযোগ করেছিল, অর্থ এবং সময় দুই দিক থেকেই। নিজেকে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দিতে পারলে একই কালে দায়মুক্ত স্বাধীনতা ও অহৈতুক আত্মসম্মান লাভ করা

যায়। এই জন্যে আর্ট-সরস্বতীর অনুসরণে য়ুরোপের অনেক বড়ো বড়ো শহরের বোহিমীয় পাড়ায় সে বাস করেছে। কিছুদিন চেষ্টার পর স্পষ্টবক্তা হিতৈষীদের কঠোর অনুরোধে ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে হল, এখন সে ছবির সমজদারিতে পরিপক্ব বলেই নিজের প্রমাণনিরপেক্ষ পরিচয় দেয়। চিত্রকলা সে ফলাতে পারে না কিন্তু দুই হাতে সেটাকে চটকাতে পারে। ফরাসি ছাঁচে সে তার গোঁফের দুই প্রত্যন্তদেশকে সযত্নে কণ্টকিত করেছে, এদিকে মাথায় ঝাঁকড়া চুলের প্রতি তার সযত্ন অবহেলা। চেহারাখানা তার ভালোই, কিন্তু আরও ভালো করবার মহার্ঘ্য সাধনায় তার আয়নার টেবিল প্যারিসীয় বিলাসবৈচিত্র্যে ভারাক্রান্ত। তার মুখ-ধোবার টেবিলের উপকরণ দশাননের পক্ষেও বাহুল্য হত। দামি হাভানা দু-চার টান টেনেই অনায়াসেই সেটাকে অবজ্ঞা করা, এবং মাসে মাসে গাত্রবস্ত্র পার্সেল পোস্টে ফরাসি ধোবার বাড়িতে ধুইয়ে আনানো— এ-সব দেখে ওর আভিজাত্য সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করতে সাহস হয় না। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ দরজিশালার রেজেস্ট্রি বহিতে ওর গায়ের মাপ ও নম্বর লেখা, এমন সব কোঠায়, যেখানে খুঁজলে পাতিয়ালা-কর্পূরতলার নাম পাওয়া যেতে পারে। ওর স্ল্যাঙ-বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত বিলম্বিত, আমীলিত চক্ষুর অলস কটাক্ষ সহযোগে অনতিব্যক্ত; যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে শোনা যায় ইংলণ্ডের অনেক নীলরক্তবান্ আমীরদের কণ্ঠস্বরে এই রকম গদ্‌গদ জড়িমা। এর উপরে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্যসম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।

কেটি মিটারের আসল নাম কেতকী। চালচলন ওর দাদারই কায়দাকারখানার বকযন্ত্রপরম্পরায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই-করা,—বিলিতি কৌলীন্যের ঝাঁঝালো এসেন্স। সাধারণ বাঙালি মেয়ের দীর্ঘকেশগৌরবের গর্বের প্রতি গর্বসহকারেই কেটি দিয়েছে কাঁচি চালিয়ে, খোঁপাটা ব্যাঙাচির লেজের মতো বিলুপ্ত হয়ে অনুকরণের উল্লম্ফশীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন করছে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল-করা। জীবনের আদ্যলীলায় কেটির কালো চোখের ভাবটি ছিল স্নিগ্ধ, এখন মনে হয় সে যেন যাকে-তাকে দেখতেই পায় না। যদি বা দেখে তো লক্ষ্যই করে না, যদি বা লক্ষ্য করে তাতে যেন আধখোলা একটা ছুরির ঝলক থাকে। প্রথম-বয়সে ঠোঁটদুটিতে সরল মাধুর্য ছিল, এখন বার-বার বেঁকে বেঁকে তার মধ্যে বাঁকা অঙ্কুশের মতো ভাব স্থায়ী হয়ে গেছে। মেয়েদের বেশের বর্ণনায় আমি আনাড়ি। তার পরিভাষা জানি নে। মোটের উপর চোখে পড়ে, উপরে একটা পাতলা সাপের খোলসের মতো ফুরফুরে আবরণ, অন্দরের কাপড় থেকে অন্য একটা রঙের আভাস আসছে। বুকের অনেকখানিই অনাবৃত; আর অনাবৃত বাহুদুটিকে কখনো কখনো টেবিলে, কখনো

চৌকির হাতায়, কখনো পরস্পরকে জড়িত করে খন্দের ভঙ্গিতে আলগোছে রাখবার সাধনা সুসম্পূর্ণ। আর যখন সুমার্জিতনখররমণীয় দুই আঙুলে চেপে সিগারেট খায় সেটা যতটা অলংকরণের অঙ্গরূপে ততটা ধূমপানের উদ্দেশ্যে নয়। সব-চেয়ে যেটা মনে দুশ্চিন্তা উদ্রেক করে সেটা ওর সমুচ্চ খুরওআলা জুতোজোড়ার কুটিল ভঙ্গিমায়; যেন ছাগলজাতীয় জীবের আদর্শ বিস্মৃত হয়ে মানুষের পায়ের গড়ন দেবার বেলায় সৃষ্টিকর্তা ভুল করেছিলেন, যেন মুচির দত্ত পদোন্নতির কিম্ভূত বক্রতায় ধরণীকে পীড়ন করে চলার দ্বারা এভোল্যুশনের ত্রুটি সংশোধন করা হয়।

সিসি এখনও আছে মাঝামাঝি জায়গায়। শেষের ডিগ্রি এখনও পায় নি, কিন্তু ডবল প্রোমোশন পেয়ে চলেছে। উচ্চ হাসিতে, অজস্র খুশিতে, অনর্গল আলাপে ওর মধ্যে সর্বদা একটা চলনবলন টগবগ করছে, উপাসকমণ্ডলীর কাছে সেটার খুব আদর। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায় কোথাও তার ভাবখানা পাকা, কোথাও কাঁচা, এরও তাই। খুরওআলা জুতোয় যুগান্তরের জয়তোরণ, কিন্তু অনবচ্ছিন্ন খোপাটাতে রয়ে গেছে অতীত যুগ; পায়ের দিকে শাড়ির বহর ইঞ্চি দুই-তিন খাটো, কিন্তু উত্তরচ্ছদে অসংবৃতির সীমানা এখনও আলজ্জতার অভিমুখে; অকারণ দস্তানা পরা অভ্যস্ত, অথচ এখনও এক হাতের পরিবর্তে দুই হাতেই বালা; সিগারেট টানতে আর মাথা ঘোরে না, কিন্তু পান খাবার আসক্তি এখনও প্রবল; বিস্কুটের টিনে ঢেকে আচার-আমসত্ত্ব পাঠিয়ে দিলে সে আপত্তি করে না, ক্রিস্টমাসের প্লাম্ পুডিং এবং পৌষপার্বণের পিঠে এই দুইয়ের মধ্যে শেষটার প্রতিই তার লোলুপতা কিছু বেশি। ফিরিঙ্গি নাচওআলীর কাছে সে নাচ শিখেছে, কিন্তু নাচের সভায় জুড়ি মিলিয়ে ঘূর্ণিনাচ নাচতে সামান্য একটু সংকোচ বোধ করে।

অমিত সম্বন্ধে জনরব শুনে এরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে চলে এসেছে। বিশেষত এদের পরিভাষাগত শ্রেণীবিভাগে লাবণ্য গবর্নেস। ওদের শ্রেণীর পুরুষের জাত মারবার জন্যেই তার "স্পেশাল ক্রিয়েশন"। মনে সন্দেহ নেই, টাকার লোভে মানের লোভেই সে অমিতকে কষে আঁকড়ে ধরেছে, ছাড়াতে গেলে সেই কাজটাতে মেয়েদেরই সম্মার্জনপটু হস্তক্ষেপ করতে হবে। চতুর্মুখ তাঁর চারজোড়া চক্ষে মেয়েদের দিকে কটাক্ষপাত ও পক্ষপাত একসঙ্গেই করে থাকবেন, সেইজন্যে মেয়েদের সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধিতে পুরুষদের গড়েছেন নিরেট নির্বোধ করে। তাই, স্বজাতিমোহমুক্ত আত্মীয়-মেয়েদের সাহায্য না পেলে অনাত্মীয়-মেয়েদের মোহজাল থেকে পুরুষদের উদ্ধার পাওয়া এত দুঃসাধ্য।

আপাতত এই উদ্ধারের প্রণালীটা কী রকম হওয়া চাই তাই নিয়ে দুই নারী নিজেদের মধ্যে একটা পরামর্শ ঠিক করেছে। এটা নিশ্চিত, গোড়ায় অমিতকে কিছুই

জানতে দেওয়া হবে না। তার আগেই শত্রুপক্ষকে আর রণক্ষেত্রটাকে দেখে আসা চাই। তার পর দেখা যাবে মায়াবিনীর কত শক্তি।

প্রথমে এসেই চোখে পড়ল অমিতর উপর ঘন এক পোঁচ গ্রাম্য রং। এর আগেও ওর দলের সঙ্গে অমিতর ভাবের মিল ছিল না। তবু সে তখন ছিল প্রখর নাগরিক, চাঁচা মাজা ঝকঝকে। এখন কেবল যে খোলা হাওয়ায় রংটা কিছু ময়লা হয়েছে তা নয়, সবসুদ্ধ ওর উপর যেন গাছপালার আমেজ দিয়েছে। ও যেন কাঁচা হয়ে গেছে এবং ওদের মতে কিছু যেন বোকা। ব্যবহারটা প্রায় যেন সাধারণ মানুষের মতো। আগে জীবনের সমস্ত বিষয়কে হাসির অস্ত্র নিয়ে তাড়া করে বেড়াত, এখন ওর সে শখ নেই বললেই হয়; এইটেকেই ওরা মনে করেছে নিদেন কালের লক্ষণ।

সিসি একদিন ওকে স্পষ্টই বললে, "দূর থেকে আমরা মনে করছিলুম তুমি বুঝি খাসিয়া হবার দিকে নামছ। এখন দেখছি তুমি হয়ে উঠেছ, যাকে বলে গ্রীন, এখানকার পাইনগাছের মতো, হয়তো আগেকার চেয়ে স্বাস্থ্যকর, কিন্তু আগেকার মতো ইণ্টারেস্টিং নয়।"

অমিত ওঅর্ডসওঅর্থের কবিতা থেকে নজির পেড়ে বললে, প্রকৃতির সংসর্গে থাকতে থাকতে নির্বাক নিশ্চেতন পদার্থের ছাপ লেগে যায় দেহে মনে প্রাণে, যাকে কবি বলেছেন "**mute insensate things.**"

শুনে সিসি ভাবলে, নির্বাক নিশ্চেতন পদার্থকে নিয়ে আমাদের কোনো নালিশ নেই, যারা অত্যন্ত বেশি সচেতন আর যারা কথা কইবার মধুর প্রগল্‌ভতায় সুপটু, তাদের নিয়েই আমাদের ভাবনা।

ওরা আশা করেছিল লাবণ্য সম্বন্ধে অমিত নিজেই কথা তুলবে। একদিন দুদিন তিনদিন যায় সে একেবারে চুপ। কেবল একটা কথা আন্দাজে বোঝা গেল, অমিতর সাধের তরণী সম্প্রতি কিছু বেশিরকম ঢেউ খাচ্ছে। ওরা বিছানা থেকে উঠে তৈরি হবার আগেই অমিত কোথা থেকে ঘুরে আসে, তার পরে মুখ দেখে মনে হয় ঝড়ো হাওয়ায় যে-কলাগাছের পাতাগুলো ফালি ফালি হয়ে ঝুলছে তারই মতো শতদীর্ণ ভাবখানা। আরও ভাবনার কথাটা এই যে, রবি ঠাকুরের বই কেউ কেউ ওর বিছানায় দেখেছে। ভিতরের পাতায় লাবণ্যর নাম থেকে গোড়ার অক্ষরটা লাল কালি দিয়ে কাটা। বোধ হয় নামের পরশপাথরেই জিনিসটার দাম বাড়িয়েছে।

অমিত ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে যায়। বলে, খিদে সংগ্রহ করতে চলেছি। খিদের জোগানটা কোথায়, আর খিদেটা খুবই যে প্রবল তা অন্যদের অগোচর ছিল না। কিন্তু তারা এমনি অবুঝের মতো ভাব করত যেন হাওয়ায় ক্ষুধাকরতা ছাড়া শিলঙে আর

কিছু আছে এ-কথা কেউ ভাবতে পারে না। সিসি মনে-মনে হাসে, কেটি মনে-মনে জ্বলে। নিজের সমস্যাটাই অমিতর কাছে এত একান্ত যে, বাইরের কোনো চাঞ্চল্য লক্ষ্য করার শক্তিই তার নেই। তাই সে নিঃসংকোচে সখীযুগলের কাছে বলে, "চলেছি এক জলপ্রপাতের সন্ধানে।" কিন্তু প্রপাতটা কোন্ শ্রেণীর, আর তার গতিটা কোন্ অভিমুখী, তা নিয়ে অন্যদের মনে যে কিছু ধোঁকা আছে তা সে বুঝতেই পারে না। আজ বলে গেল, এক জায়গায় কমলালেবুর মধুর সওদা করতে চলেছে। মেয়ে দুটি নিতান্ত নিরীহভাবে সরল ভাষায় বললে, এই অপূর্ব মধু সম্বন্ধে তাদের দুর্দমনীয় কৌতূহল, তারাও সঙ্গে যেতে চায়। অমিত বললে, পথ দুর্গম, যানবাহনের আয়ত্তাতীত। বলেই আলোচনাটাকে প্রথম অংশে ছেদন করেই দৌড় দিলে। এই মধুকরের ডানার চাঞ্চল্য দেখে দুই বন্ধু স্থির করলে আর দেরি নয়, আজই কমলালেবুর বাগানে অভিযান করা চাই। এদিকে নরেন গেছে ঘোড়দৌড়ের মাঠে, সিসিকে নিয়ে যাবার জন্যে খুব আগ্রহ ছিল। সিসি গেল না। এই নিবৃত্তিতে তার কতখানি শমদমের দরকার হয়েছিল তা দরদি ছাড়া অন্যে কে বুঝবে।

১৫

ব্যাঘাত

দুই সখী যোগমায়ার বাগানে বাইরের দরজা পার হয়ে চাকরদের কাউকে দেখতে পেলে না। গাড়িবারাণ্ডায় এসে চোখে পড়ল বাড়ির রোয়াকে একটি ছোটো টেবিল পেতে একজন শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীতে মিলে পড়া চলছে। বুঝতে বাকি রইল না; এরই মধ্যে বড়োটি লাবণ্য।

কেটি টকটক করে উপরে উঠে ইংরেজিতে বললে, "দুঃখিত।"

লাবণ্য চৌকি ছেড়ে উঠে বললে, "কাকে চান আপনারা?"

কেটি এক মুহূর্তে লাবণ্যর আপাদমস্তকে দৃষ্টিটাকে প্রখর ঝাঁটার মতো দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে বললে, "মিস্টার অমিট্রায়ে এখানে এসেছেন কি না খবর নিতে এলুম।"

লাবণ্য হঠাৎ বুঝতেই পারলে না, অমিট্রায়ে কোন্ জাতের জীব। বললে, "তাঁকে তো আমরা চিনি নে।"

অমনি দুই সখীতে একটা বিদ্যুচ্চকিত চোখ-ঠারাঠারি হয়ে গেল, মুখে পড়ল

একটা আড়হাসির রেখা। কেটি দাঁড়িয়ে উঠে মাথা নাড়া দিয়ে বললে, "আমরা তো জানি, এ বাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা আছে **oftener than is good for him**।"

ভাব দেখে লাবণ্য চমকে উঠল, বুঝলে এরা কে আর ও কী ভুলটাই করেছে। অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "কর্তামাকে ডেকে দিই, তাঁর কাছে খবর পাবেন।"

লাবণ্য চলে গেলেই সুরমাকে কেটি সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার টীচার?"

"হাঁ।"

"নাম বুঝি লাবণ্য?"

"হাঁ।"

"গট ম্যাচেস?"

হঠাৎ দেশালাইয়ের প্রয়োজন আন্দাজ করতে না পেরে সুরমা কথাটার মানেই বুঝল না। মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কেটি বললে, "দেশালাই।"

সুরমা দেশালাইয়ের বাক্স নিয়ে এল। কেটি সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে সুরমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "ইংরেজি পড়?"

সুরমা স্বীকৃতিসূচক মাথা নেড়েই ঘরের দিকে দ্রুত চলে গেল। কেটি বললে, "গবর্নেসের কাছে মেয়েটা আর যাই শিখুক ম্যানার্স শেখে নি।"

তার পরে দুই সখীতে টিপ্পনী চলল। "ফেমাস লাবণ্য! ডিল্লীশস! শিলঙ পাহাড়টাকে ভলক্যানো বানিয়ে তুলেছে, ভূমিকম্পে অমিটের হৃদয়-ডাঙায় ফাটল ধরিয়ে দিলে, এধার থেকে ওধার। সিলি! মেন আর ফানি।"

সিসি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। এই হাসিতে ঔদার্য ছিল। কেননা, পুরুষমানুষ নির্বোধ বলে সিসির পক্ষে আক্ষেপের কারণ ঘটে নি। সে তো পাথুরে জমিতেও ভূমিকম্প ঘটিয়েছে, দিয়েছে একেবারে চৌচির করে। কিন্তু এ কী সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। একদিকে কেটির মতো মেয়ে, আর অন্যদিকে ওই অদ্ভুত ধরনে কাপড়-পরা গবর্নেস। মুখে মাখন দিলে গলে না, যেন একতাল ভিজে ন্যাকড়া, কাছে বসলে মনটাতে বাদলার বিস্কুটের মতো ছাতা পড়ে যায়। কী করে অমিট ওকে এক মোমেন্টও সহ্য করে?

"সিসি, তোমার দাদার মনটা চিরদিন উপরে পা করে হাঁটে। কোন্ এক সৃষ্টিছাড়া উলটো বুদ্ধিতে এই মেয়েটাকে হঠাৎ মনে হয়েছে এঞ্জেল।"

এই বলে টেবিলে অ্যালজেব্রার বইয়ের গায়ে সিগারেটটা ঠেকিয়ে রেখে কেটি ওর রুপোর শিকলওআলা প্রসাধনের থলি বের করে মুখে একটুখানি পাউডার লাগালে, অঞ্জনের পেনসিল দিয়ে ভুরুর রেখাটা একটু ফুটিয়ে তুললে। দাদার কাণ্ডজ্ঞানহীনতায়

সিসির যথেষ্ট রাগ হয় না, এমন কি, ভিতরে ভিতরে একটু যেন স্নেহই হয়। সমস্ত রাগটা পড়ে পুরুষদের মুগ্ধনয়নবিহারিণী মেকি এক্সেলদের 'পরে। দাদার সম্বন্ধে সিসির এই সকৌতুক ঔদাসীন্যে কেটির ধৈর্যভঙ্গ হয়। খুব করে ঝাঁকানি দিয়ে নিতে ইচ্ছে করে।

এমন সময়ে সাদা গরদের শাড়ি পরে যোগমায়া বেরিয়ে এলেন। লাবণ্য এল না। কেটির সঙ্গে এসেছিল ঝাঁকড়া চুলে দুই চোখ আচ্ছন্নপ্রায় ক্ষুদ্রকায়া ট্যাবি নামধারী কুকুর। সে একবার ঘ্রাণের দ্বারা লাবণ্য ও সুরমার পরিচয় গ্রহণ করেছে। যোগমায়াকে দেখে হঠাৎ কুকুরটার মনে কিছু উৎসাহ জন্মাল। তাড়াতাড়ি গিয়ে সামনের দুটো পা দিয়ে যোগমায়ার নির্মল শাড়ির উপর পঙ্কিল স্বাক্ষর অঙ্কিত করে দিয়ে কৃত্রিম প্রীতি জ্ঞাপন করলে। সিসি ঘাড় ধরে টেনে আনলে কেটির কাছে, কেটি তার নাকের উপর তর্জনী তাড়ন করে বললে, "নটি ডগ।"

কেটি চৌকি থেকে উঠলই না। সিগারেট টানতে টানতে অত্যন্ত নির্লিপ্ত আড়ভাবে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে যোগমায়াকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। যোগমায়ার 'পরে তার আক্রোশ বোধ করি লাবণ্যর চেয়েও বেশি। ওর ধারণা, লাবণ্যর ইতিহাসে একটা খুঁত আছে। যোগমায়াই মাসি সেজে অমিতর হাতে তাকে গতিয়ে দেবার কৌশল করছে। পুরুষমানুষকে ঠকাতে অধিক বুদ্ধির দরকার করে না, বিধাতার স্বহস্তে তৈরি ঠুলি তাদের দুই চোখে পরানো।

সিসি সামনে এসে যোগমায়াকে নমস্কারের একটু আভাস দিয়ে বললে, "আমি সিসি, অমির বোন।"

যোগমায়া একটু হেসে বললেন, "অমি আমাকে মাসি বলে, সেই সম্পর্কে আমি তোমারও মাসি হই, মা।"

কেটির রকম দেখে যোগমায়া তাকে লক্ষ্যই করলেন না। সিসিকে বললেন, "এস, মা, ঘরে বসবে এস।"

সিসি বললে, "সময় নেই, কেবল খবর নিতে এসেছি, অমি এসেছে কি না।"

যোগমায়া বললেন, "এখনও আসে নি।"

"কখন আসবেন জানেন?"

"ঠিক বলতে পারি নে, আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করে আসি গে।

কেটি তার স্বস্থানে বসেই তীব্রস্বরে বলে উঠল, "যে-মাস্টারনী এখানে বসে পড়াচ্ছিল সে তো ভান করলে অমিটকে সে কোনোকালেই জানেই না।"

যোগমায়ার ধাঁধা লেগে গেল। বুঝলেন কোথাও একটা গোল আছে। এ-ও

বুঝলেন এদের কাছে মান রাখা শক্ত হবে। এক মুহূর্তে মাসিত্ব পরিহার করে বললেন, "শুনেছি অমিতবাবু আপনাদের হোটেলেই থাকেন, তাঁর খবর আপনাদেরই জানা আছে।"

কেটি বেশ একটু স্পষ্ট করেই হাসলে। তাকে ভাষায় বললে বোঝায়, "লুকোতে পার, ফাঁকি দিতে পারবে না।"

আসল কথা, গোড়াতেই লাবণ্যকে দেখে এবং অমিকে সে চেনে না শুনে কেটি মনে-মনে আগুন হয়ে আছে। কিন্তু সিসির মনে আশঙ্কা আছে মাত্র, জালা নেই; যোগমায়ার সুন্দর মুখের গাম্ভীর্য তার মনকে টেনেছিল। তাই, যখন দেখলে কেটি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা দেখিয়ে চৌকি ছাড়লে না, তার মনে কেমন সংকোচ লাগল। অথচ কোনো বিষয়ে কেটির বিরুদ্ধে যেতে সাহস হয় না, কেননা, কেটি সিডিশন দমন করতে ক্ষিপ্রহস্ত,—একটু সে বিরোধ সয় না। কর্কশ ব্যবহারে তার কোনো সংকোচ নেই। অধিকাংশ মানুষই ভীরু, অকুণ্ঠিত দুর্ব্যবহারের কাছে তারা হার মানে। নিজের অজস্র কঠোরতায় কেটির একটা গর্ব আছে; যাকে সে মিষ্টিমুখো ভালোমানুষি বলে, বন্ধুদের মধ্যে তার কোনো লক্ষণ দেখলে তাকে সে অস্থির করে তোলে। রূঢ়তাকে সে অকপটতা বলে বড়াই করে, এই রূঢ়তার আঘাতে যারা সংকুচিত তারা কোনোমতে কেটিকে প্রসন্ন রাখতে পারলে আরাম পায়। সিসি সেই দলের,—সে কেটিকে মনে-মনে যতই ভয় করে ততই তার নকল করে, দেখাতে যায় সে দুর্বল নয়। সব সময়ে পেরে ওঠে না। কেটি আজ বুঝেছিল যে, তার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সিসির মনের কোণে একটা মুখচোরা আপত্তি লুকিয়ে ছিল। তাই সে ঠিক করেছিল, যোগমায়ার সামনে সিসির এই সংকোচ কড়া ক'রে ভাঙতে হবে। চৌকি থেকে উঠল, একটা সিগারেট নিয়ে সিসির মুখে বসিয়ে দিলে, নিজের ধরানো সিগারেট মুখে করেই সিসির সিগারেট ধরাবার জন্যে মুখ এগিয়ে নিয়ে এল। প্রত্যাখ্যান করতে সিসি সাহস করলে না। কানের ডগাটা একটুখানি লাল হয়ে উঠল। তবু জোর করে এমনি একটা ভাব দেখালে, যেন তাদের হাল পাশ্চাত্যিকতায় যাদের ভ্রূ এতটুকু কুঞ্চিত হবে তাদের মুখের উপর ও তুড়ি মারতে প্রস্তুত—**that much for it!**

ঠিক সেই সময়টাতে অমিত এসে উপস্থিত। মেয়েরা তো অবাক। হোটেল থেকে যখন সে বেরিয়ে এল মাথায় ছিল ফেল্ট হ্যাট, গায়ে ছিল বিলিতি কোর্তা। এখানে দেখা যাচ্ছে পরনে তার ধুতি আর শাল। এই বেশান্তরের আড্ডা ছিল তার সেই কুটিরে। সেইখানে আছে একটি বইয়ের শেল্ফ, একটি কাপড়ের তোরঙ্গ, আর যোগমায়ার দেওয়া একটি আরামকেদারা। হোটেল থেকে মধ্যাহ্নভোজন সেরে

এইখানে সে আশ্রয় নেয়। আজকাল লাবণ্যর শাসন কড়া, সুরমাকে পড়ানোর সময়ের মাঝখানটাতে জলপ্রপাত বা কমলালেবুর সন্ধানে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। সেইজন্তে, বিকেলে সাড়ে চারটে বেলায় চা-পানসভার পূর্বে এ-বাড়িতে দৈহিক মানসিক কোনোপ্রকার তৃষ্ণানিবারণের সৌজন্তসম্মত সুযোগ অমিতর ছিল না। এই সময়টা কোনোমতে কাটিয়ে কাপড় ছেড়ে যথানির্দিষ্ট সময়ে এখানে সে আসত।

আজ হোটেল থেকে বেরোবার আগেই কলকাতা থেকে এসেছে তার আংটি। কেমন করে সে সেই আংটি লাবণ্যকে পরাবে তার সমস্ত অনুষ্ঠানটা সে বসে বসে কল্পনা করেছে। আজ হল ওর একটা বিশেষ দিন। এ-দিনকে দেউড়িতে বসিয়ে রাখা চলবে না। আজ সব কাজ বন্ধ করা চাই। মনে-মনে ঠিক করে রেখেছে লাবণ্য যেখানে পড়াচ্ছে সেইখানে গিয়ে বলবে—একদিন হাতিতে চড়ে বাদশা এসেছিল, কিন্তু তোরণ ছোটো, পাছে মাথা হেঁট করতে হয় তাই সে ফিরে গেছে, নতুন-তৈরি প্রাসাদে প্রবেশ করে নি। আজ এসেছে আমাদের একটি মহাদিন, কিন্তু তোমার অবকাশের তোরণটা তুমি খাটো করে রেখেছ,—সেটাকে ভাঙো, রাজা মাথা তুলেই তোমার ঘরে প্রবেশ করুন।

অমিত এ-কথাও মনে করে এসেছিল যে, ওকে বলবে, ঠিক সময়টাতে আসাকেই বলে পাঙ্কচুয়ালিটি;—কিন্তু ঘড়ির সময় ঠিক সময় নয়, ঘড়ি সময়ের নম্বর জানে, তার মূল্য জানবে কী করে?

অমিত বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, মেঘে আকাশটা ম্লান, আলোর চেহারাটা বেলা পাঁচটা-ছটার মতো। অমিত ঘড়ি দেখলে না, পাছে ঘড়িটা তার অভদ্র ইশারায় আকাশের প্রতিবাদ করে। যেমন বহুদিনের জ্বরো রোগীর মা ছেলের গা একটু ঠাণ্ডা দেখে আর থার্মমিটর মিলিয়ে দেখতে সাহস করে না। আজ অমিত এসেছিল নির্দিষ্ট সময়ের যথেষ্ট আগে। কারণ, দুরাশা নির্লজ্জ।

বারান্দার যে-কোণটায় বসে লাবণ্য তার ছাত্রীকে পড়ায়, রাস্তা দিয়ে আসতে সেটা চোখে পড়ে। আজ দেখলে সে-জায়গাটা খালি। মন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। এতক্ষণ পরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে। এখনও তিনটে বেজে বিশ মিনিট। সেদিন ও লাবণ্যকে বলেছিল নিয়মপালনটা মানুষের, অনিয়মটা দেবতার; মর্ত্যে আমরা নিয়মের সাধনা করি স্বর্গে অনিয়ম-অমৃতে অধিকার পাব বলেই। সেই স্বর্গ মাঝে মাঝে মর্ত্যেই দেখা দেয় তখন নিয়ম ভেঙে তাকে সেলাম করে নিতে হয়। আশা হল, লাবণ্য নিয়ম-ভাঙার গৌরব বুঝেছে বা; লাবণ্যর মনের

মধ্যে হঠাৎ আজ বুঝি কেমন করে বিশেষ দিনের স্পর্শ লেগেছে, সাধারণ দিনের বেড়া গেছে ভেঙে।

নিকটে এসে দেখে যোগমায়া তাঁর ঘরের বাইরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে, আর সিসি তার মুখের সিগারেট কেটির মুখের সিগারেট থেকে জ্বালিয়ে নিচ্ছে। অসম্মান যে ইচ্ছাকৃত তা বুঝতে বাকি রইল না। ট্যাবি কুকুরটা তার প্রথম-মৈত্রীর উচ্ছ্বাসে বাধা পেয়ে কেটির পায়ের কাছে শুয়ে একটু নিদ্রার চেষ্টা করছিল। অমিতর আগমনে তাকে সংবর্ধনা করবার জন্যে আবার অসংযত হয়ে উঠল। সিসি আবার তাকে শাসনের দ্বারা বুঝিয়ে দিলে যে, এই সদ্‌ভাবপ্রকাশের প্রণালীটা এখানে সমাদৃত হবে না।

দুই সখীর প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করে "মাসি" বলে দূর থেকে ডেকেই অমিত যোগমায়ার পায়ের কাছে পড়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে। এ-সময়ে এমন করে প্রণাম করা তার প্রথার মধ্যে ছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, "মাসিমা, লাবণ্য কোথায় ?"

"কী জানি, বাছা, ঘরের মধ্যে কোথায় আছে।"

"এখনও তো তার পড়াবার সময় শেষ হয় নি।"

"বোধ হয় এঁরা আসাতে ছুটি নিয়ে ঘরে গেছে।"

"চলো, একবার দেখে আসি সে কী করছে।" যোগমায়াকে নিয়ে অমিত ঘরে গেল। সম্মুখে যে আর-কোনো সজীব পদার্থ আছে সেটা সে সম্পূর্ণই অস্বীকার করলে।

সিসি একটু চেঁচিয়ে বলে উঠল, "অপমান। চলো, কেটি, ঘরে যাই।"

কেটিও কম জ্বলে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে সে যেতে চায় না।

সিসি বললে, "কোনো ফল হবে না।"

কেটির বড়ো বড়ো চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, বললে, "হতেই হবে ফল।"

আরও খানিকটা সময় গেল। সিসি আবার বললে, "চলো ভাই, আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না।"

কেটি বারাণ্ডায় ধন্না দিয়ে বসে রইল। বললে, "এইখান দিয়ে তাকে বেরোতেই তো হবে।"

অবশেষে বেরিয়ে এল অমিত, সঙ্গে নিয়ে এল লাবণ্যকে। লাবণ্যর মুখে একটি নির্লিপ্ত শান্তি। তাতে একটুও রাগ নেই, স্পর্ধা নেই, অভিমান নেই। যোগমায়া পিছনের ঘরেই ছিলেন, তাঁর বেরোবার ইচ্ছা ছিল না। অমিত তাঁকে ধরে নিয়ে এল।

একমুহূর্তের মধ্যেই কেটির চোখে পড়ল লাবণ্যর হাতে আংটি। মাথায় রক্ত চন করে উঠল, লাল হয়ে উঠল দুই চোখ, পৃথিবীটাকে লাথি মারতে ইচ্ছে করল।

অমিত বললে, "মাসি, এই আমার বোন শমিতা, বাবা বোধ হয় আমার নামের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন, কিন্তু রয়ে গেল অমিত্রাক্ষর। ইনি কেতকী, আমার বোনের বন্ধু।"

ইতিমধ্যে আর-এক উপদ্রব। সুরমার এক পোষা বিড়াল ঘর থেকে বেরিয়ে আসাতেই ট্যাবির কুকুরীয় নীতিতে সে এই স্পর্ধাটাকে যুদ্ধঘোষণার বৈধ কারণ বলেই গণ্য করলে। একবার অগ্রসর হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করে, আবার বিড়ালের উদ্যত নখর ও ফোঁসফোঁসানিতে যুদ্ধের আশুফল সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হয়ে ফিরে আসে। এমন অবস্থায় কিঞ্চিৎ দূর হতেই অহিংস্র গর্জননীতিই নিরাপদ বীরত্ব প্রকাশের উপায় মনে করে অপরিমিত চীৎকার শুরু করে দিলে। বিড়ালটা তার কোনো প্রতিবাদ না করে পিঠ ফুলিয়ে চলে গেল। এইবার কেটি সহ্য করতে পারলে না। প্রবল আক্রোশে কুকুরটাকে কান-মলা দিতে লাগল। এই কান-মলার অনেকটা অংশই নিজের ভাগ্যের উদ্দেশে। কুকুরটা কেঁই কেঁই স্বরে অসদ্‌ব্যবহার সম্বন্ধে তীব্র অভিমত জানালে। ভাগ্য নিঃশব্দে হাসল।

এই গোলমালটা একটু থামলে পর অমিত সিসিকে লক্ষ্য করে বললে, "সিসি, এঁরই নাম লাবণ্য। আমার কাছ থেকে এঁর নাম কখনো শোন নি, কিন্তু বোধ হচ্ছে, আর-দশজনের কাছ থেকে শুনেছ। এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে, কলকাতায় অঘ্রান মাসে।"

কেটি মুখে হাসি টেনে আনতে দেরি করলে না। বললে, "আই কনগ্র্যাচুলেট। কমলালেবুর মধু পেতে বিশেষ বাধা হয় নি বলেই ঠেকছে, রাস্তা কঠিন নয়, মধু লাফ দিয়ে আপনিই এগিয়ে এসেছে মুখের কাছে।"

সিসি তার স্বাভাবিক অভ্যাসমতো হী হী করে হেসে উঠল।

লাবণ্য বুঝলে কথাটায় খোঁচা আছে, কিন্তু মানেটা সম্পূর্ণ বুঝলে না।

অমিত তাকে বললে, "আজ বেরোবার সময় এরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় যাচ্ছ? আমি বলেছিলুম বন্য মধুর সন্ধানে। তাই এরা হাসছে। ওটা আমারই দোষ;—আমার কোন্‌ কথাটা যে হাসির নয় লোকে সেটা ঠাওরাতে পারে না।"

কেটি শান্তস্বরেই বললে, "কমলালেবুর মধু নিয়ে তোমার তো জিত হল, এবার আমারও যাতে হার না হয়, সেটা করো।"

"কী করতে হবে, বলো।"

"নরেনের সঙ্গে আমার একটা বাজি আছে। সে বলেছিল, জেন্টেলম্যানরা যেখানে যায় কেউ সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে না, কিছুতেই তুমি রেস দেখতে যাবে না। আমি আমার এই হীরের আংটি বাজি রেখে বলেছিলুম, তোমাকে রেসে নিয়ে যাবই। এ-দেশে যত ঝরনা, যত মধুর দোকান আছে সব সন্ধান করে শেষকালে এখানে এসে তোমার দেখা পেলুম। বলো না, ভাই সিসি, কত ফিরতে হয়েছে বুনো হাঁস শিকারের চেষ্টায়, ইংরেজিতে যাকে বলে wild goose।"

সিসি কোনো কথা না বলে হাসতে লাগল। কেটি বললে, "মনে পড়ছে সেই গল্পটা—একদিন তোমার কাছেই শুনেছি অমিট। কোন পার্শিয়ান ফিলজফার তার পাগড়ি-চোরের সন্ধান না পেয়ে শেষে গোরস্থানে এসে বসেছিল। বলেছিল, পালাবে কোথায়? মিস লাবণ্য যখন বলেছিলেন ওকে চেনেন না আমাকে ধোঁকা লাগিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমার মন বললে, ঘুরে ফিরে ওকে ওর এই গোরস্থানে আসতেই হবে।"

সিসি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

কেটি লাবণ্যকে বললে, "অমিট আপনার নাম মুখে আনলে না, মধুর ভাষাতে ঘুরিয়ে বললে, কমলালেবুর মধু; আপনার বুদ্ধি খুবই বেশি সরল, ঘুরিয়ে বলবার কৌশল মুখে জোগায় না, ফস করে বলে ফেললেন, অমিটকে জানেনই না। তবু সান ডে স্কুলের বিধানমতো ফল ফলল না, দণ্ডদাতা আপনাদের কোনো দণ্ডই দিলেন না, শক্ত পথের মধুও একজন এক চুমুকেই খেয়ে নিলেন, আর অজানাকেও একজন এক দৃষ্টিতেই জানলেন, এখন কেবল আমার ভাগ্যেই হার হবে? দেখো তো, সিসি, কী অন্যায়।"

সিসির আবার সেই উচ্চ হাসি। ট্যাবি কুকুরটাও এই উচ্ছ্বাসে যোগ দেওয়া তার সামাজিক কর্তব্য মনে করে বিচলিত হবার লক্ষণ দেখালে। তৃতীয়বার তাকে দমন করা হল।

কেটি বললে, "অমিট তুমি জান, এই হীরের আংটি যদি হারি, জগতে আমার সান্ত্বনা থাকবে না। এ আংটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। একমুহূর্ত হাত থেকে খুলি নি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। শেষকালে আজ এই শিলঙ পাহাড়ে কি একে বাজিতে খোয়াতে হবে?"

সিসি বললে, "বাজি রাখতে গেলে কেন, ভাই?"

"মনে-মনে নিজের উপর অহংকার ছিল, আর মানুষের উপর ছিল বিশ্বাস।

অহংকার ভাঙল,—এবারকার মতো আমার রেস ফুরোল, আমারই হার। মনে হচ্ছে অমিটকে আর রাজি করতে পারব না। তা এমন অদ্ভুত করেই যদি হারাবে সেদিন এত আদরে আংটি দিয়েছিলে কেন? সে-দেওয়ার মধ্যে কি কোনো বাঁধন ছিল না? এই দেওয়ার মধ্যে কি কথা ছিল না যে, আমার অপমান কোনোদিন তুমি ঘটতে দেবে না?"

বলতে বলতে কেটির গলা ভার হয়ে এল, অনেক কষ্টে চোখের জল সামলে নিলে।

আজ সাত বৎসর হয়ে গেল, কেটির বয়স তখন আঠারো। সেদিন এই আংটি অমিত নিজের আঙুল থেকে খুলে ওকে পরিয়ে দিয়েছিল। তখন ওরা দুজনেই ছিল ইংলণ্ডে। অক্সফোর্ডে একজন পাঞ্জাবি যুবক ছিল কেটির প্রণয়মুগ্ধ। সেদিন আপসে অমিত সেই পাঞ্জাবির সঙ্গে নদীতে বাচ খেলেছিল। অমিতরই হল জিত। জুন মাসের জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ যেন কথা বলে উঠেছিল, মাঠে মাঠে ফুলের প্রচুর বৈচিত্র্যে ধরণী তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। সেইক্ষণে অমিত কেটির হাতে আংটি পরিয়ে দিলে, তার মধ্যে অনেক কথাই উহ্য ছিল কিন্তু কোনো কথাই গোপন ছিল না। সেদিন কেটির মুখে প্রসাধনের প্রলেপ লাগে নি, তার হাসিটি সহজ ছিল, ভাবের আবেগে তার মুখ রক্তিম হতে বাধা পেত না। আংটি হাতে পরা হলে অমিত তার কানে কানে বলেছিল—

Tender is the night

And haply the queen moon is on her throne.

কেটি তখন বেশি কথা বলতে শেখে নি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কেবল যেন মনে-মনে বলেছিল, "মন আমী," ফরাসি ভাষায় যার মানে হচ্ছে, বঁধু।

আজ অমিতর মুখেও জবাব বেধে গেল। ভেবে পেলে না, কী বলবে।

কেটি বললে, "বাজিতে যদিই হারলুম তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক, অমিট। আমার হাতে রেখে একে আমি মিথ্যে কথা বলতে দেব না।"

বলে আংটি খুলে টেবিলটার উপর রেখেই দ্রুতবেগে চলে গেল। এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দরদর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

১৬

মুক্তি

একটি ছোটো চিঠি এল লাবণ্যর হাতে, শোভনলালের লেখা :

> শিলঙে কাল রাত্রে এসেছি। যদি দেখা করতে অনুমতি দাও তবে দেখতে যাব। না যদি দাও কালই ফিরব। তোমার কাছে শাস্তি পেয়েছি, কিন্তু কবে কী অপরাধ করেছি আজ পর্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝতে পারি নি। আজ এসেছি তোমার কাছে সেই কথাটি শোনবার জন্যে, নইলে মনে শান্তি পাই নে। ভয় ক'রো না। আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই।

লাবণ্যর চোখ জলে ভরে এল। মুছে ফেললে। চুপ করে বসে ফিরে তাকিয়ে রইল নিজের অতীতের দিকে। যে-অঙ্কুরটা বড়ো হয়ে উঠতে পারত অথচ যেটাকে চেপে দিয়েছে, বাড়তে দেয় নি, তার সেই কচিবেলাকার করুণ ভীরুতা ওর মনে এল। এতদিনে সে ওর সমস্ত জীবনকে অধিকার করে তাকে সফল করতে পারত। কিন্তু সেদিন ওর ছিল জ্ঞানের গর্ব, বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। সেদিন আপন বাপের মুগ্ধতা দেখে ভালোবাসাকে দুর্বলতা বলে মনে-মনে ধিক্কার দিয়েছে। ভালোবাসা আজ তার শোধ নিলে, অভিমান হল ধূলিসাৎ। সেদিন যা সহজে হতে পারত নিঃশ্বাসের মতো, সরল হাসির মতো, আজ তা কঠিন হয়ে উঠল ;—সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে দু-হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে আজ বাধা পড়ে, তাকে ত্যাগ করতেও বুক ফেটে যায়। মনে পড়ল অপমানিত শোভনলালের সেই কুণ্ঠিত ব্যথিত মূর্তি। তার পরে কতদিন গেছে, যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত ভালোবাসা এতদিন কোন্ অমৃতে বেঁচে রইল ? আপনারই আন্তরিক মাহাত্ম্যে।

লাবণ্য চিঠিতে লিখলে,

> তুমি আমার সকলের বড়ো বন্ধু। এ বন্ধুত্বের পুরো দাম দিতে পারি এমন ধন আজ আমার হাতে নেই। তুমি কোনোদিন দাম চাও নি ; আজও তোমার যা দেবার জিনিস তাই দিতে এসেছ কিছুই দাবি না করে। চাই নে বলে ফিরিয়ে দিতে পারি এমন শক্তি নেই আমার, এমন অহংকারও নেই।

চিঠিটা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে এমন সময় অমিত এসে বললে, "বন্যা, চলো আজ দুজনে একবার বেড়িয়ে আসি গে।"

অমিত ভয়ে-ভয়েই বলেছিল, ভেবেছিল লাবণ্য আজ হয়তো যেতে রাজি হবে না।

লাবণ্য সহজেই বললে, "চলো।"

দুজনে বেরোল। অমিত কিছু দ্বিধার সঙ্গেই লাবণ্যর হাতটিকে হাতের মধ্যে নেবার চেষ্টা করলে। লাবণ্য একটুও বাধা না দিয়ে হাত ধরতে দিলে। অমিত হাতটি একটু জোরে চেপে ধরলে তাতেই মনের কথা যেটুকু ব্যক্ত হয় তার বেশি কিছু মুখে এল না। চলতে চলতে সেদিনকার সেই জায়গাতে এল যেখানে বনের মধ্যে হঠাৎ একটুখানি ফাঁক। একটি তরুশূন্য পাহাড়ের শিখরের উপর সূর্য আপনার শেষ স্পর্শ ঠেকিয়ে নেমে গেল। অতিসুকুমার সবুজের আভা আস্তে আস্তে সুকোমল নীলে গেল মিলিয়ে। দুজনে থেমে সেইদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

লাবণ্য আস্তে আস্তে বললে, "একদিন একজনকে যে-আংটি পরিয়েছিলে আমাকে দিয়ে আজ সে-আংটি খোলালে কেন?"

অমিত ব্যথিত হয়ে বললে, "তোমাকে সব কথা বোঝাব কেমন করে, বন্যা। সেদিন যাকে আংটি পরিয়েছিলুম, আর যে আজ সেটা খুলে দিলে তারা দুজনে কি একই মানুষ?"

লাবণ্য বললে, "তাদের মধ্যে একজন সৃষ্টিকর্তার আদরে তৈরি, আর একজন তোমার অনাদরে গড়া।"

অমিত বললে, "কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। যে-আঘাতে আজকের কেটি তৈরি তার দায়িত্ব কেবল আমার একলার নয়।"

"কিন্তু, মিতা, নিজেকে যে একদিন সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ করেছিল, তাকে তুমি আপনার করে রাখলে না কেন? যে-কারণেই হ'ক আগে তোমার মুঠো আলগা হয়েছে তার পরে দশের মুঠোর চাপ পড়েছে ওর উপরে, ওর মূর্তি গেছে বদলে। তোমার মন একদিন হারিয়েছে বলেই দশের মনের মতো করে নিজেকে সাজাতে বসল। আজ তো দেখি ও বিলিতি দোকানের পুতুলের মতো; সেটা সম্ভব হত না, যদি ওর হৃদয় বেঁচে থাকত। থাক গে ও-সব কথা। তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। রাখতে হবে।"

"বলো, নিশ্চয় রাখব।"

"অন্তত হপ্তাখানেকের জন্যে তোমার দলকে নিয়ে তুমি চেরাপুঞ্জিতে বেড়িয়ে এস। ওকে আনন্দ দিতে নাও যদি পার ওকে আমোদ দিতে পারবে।"

অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, "আচ্ছা।"

তার পরে লাবণ্য অমিতর বুকে মাথা রেখে বললে, "একটা কথা তোমাকে বলি, মিতা, আর কোনোদিন বলব না। তোমার সঙ্গে আমার যে-অন্তরের সম্বন্ধ তা নিয়ে

তোমার লেশমাত্র দায় নেই। আমি রাগ করে বলছি নে, আমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়েই বলছি, আমাকে তুমি আংটি দিয়ো না, কোনো চিহ্ন রাখবার কিছু দরকার নেই। আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন, বাইরের রেখা বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।"

এই বলে নিজের আঙুলের থেকে আংটি খুলে অমিতর আঙুলে আস্তে আস্তে পরিয়ে দিলে। অমিত তাতে কোনো বাধা দিলে না।

সায়াহ্নের এই পৃথিবী যেমন অস্তরশ্মি-উদ্‌ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপন মুখ তুলে ধরেছে, তেমনি নীরবে, তেমনি শান্ত দীপ্তিতে লাবণ্য আপন মুখ তুলে ধরলে অমিতর নত মুখের দিকে।

সাত দিন যেতেই অমিত ফিরে যোগমায়ার সেই বাসায় গেল। ঘর বন্ধ, সবাই চলে গেছে। কোথায় গেছে তার কোনো ঠিকানা রেখে যায় নি।

সেই য়ুক্যালিপটাস গাছের তলায় অমিত এসে দাঁড়াল, খানিকক্ষণ ধরে শূন্যমনে সেইখানে ঘুরে বেড়ালে। পরিচিত মালী এসে সেলাম করে জিজ্ঞাসা করলে, "ঘর খুলে দেব কি ? ভিতরে বসবেন ?" অমিত একটু দ্বিধা করে বললে, "হাঁ।"

ভিতরে গিয়ে লাবণ্যর বসবার ঘরে গেল। চৌকি টেবিল শেল্‌ফ আছে, সেই বইগুলি নেই। মেজের উপর দুই-একটা ছেঁড়া শূন্য লেফাফা, তার উপরে অজানা হাতের অক্ষরে লাবণ্যর নাম ও ঠিকানা লেখা ; দু-চারটে ব্যবহার-করা পরিত্যক্ত নিব, এবং ক্ষয়প্রাপ্ত একটি অতি ছোটো পেনসিল টেবিলের উপরে। পেনসিলটি পকেটে নিলে। এর পাশেই শোবার ঘর। লোহার খাটে কেবল একটা গদি, আর আয়নার টেবিলে একটা শূন্য তেলের শিশি। দুই হাতে মাথা রেখে অমিত সেই গদির উপর শুয়ে পড়ল, লোহার খাটটা শব্দ করে উঠল। সেই ঘরটার মধ্যে বোবা একটা শূন্যতা। তাকে প্রশ্ন করলে কোনো কথাই বলতে পারে না। সে একটা মূর্ছা, যে-মূর্ছা কোনোদিনই আর ভাঙবে না।

তার পরে শরীরমনের উপর একটা নিরুদ্যমের বোঝা বহন করে অমিত গেল নিজের কুটিরে। যা যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনিই সব আছে। এমন কি, যোগমায়া তাঁর কেদারাটিও ফিরিয়ে নিয়ে যান নি। বুঝলে, তিনি স্নেহ করেই এই চৌকিটি তাকে দিয়ে গেছেন, মনে হল যেন শুনতে পেলে, শান্ত মধুর স্বরে তাঁর সেই আহ্বান, বাছা। সেই চৌকির সামনে মাথা লুটিয়ে অমিত প্রণাম করলে।

সমস্ত শিলঙ পাহাড়ের শ্রী আজ চলে গেছে। অমিত কোথাও আর সান্ত্বনা পেল না।

১৭

শেষের কবিতা

কলকাতায় কলেজে পড়ে যতিশংকর। থাকে কলুটোলা প্রেসিডেন্সি কলেজের মেসে। অমিত তাকে প্রায় বাড়িতে নিয়ে আসে, খাওয়ায়, তার সঙ্গে নানা বই পড়ে, নানা অদ্ভুত কথায় তার মনটাকে চমকিয়ে দেয়, মোটরে করে তাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসে।

তার পর কিছুকাল যতিশংকর অমিতর কোনো নিশ্চিত খবর পায় না। কখনো শোনে সে নৈনিতালে, কখনো উটকামণ্ডে। একদিন শুনলে অমিতর এক বন্ধু ঠাট্টা করে বলছে, সে আজকাল কেটি মিত্তিরের বাইরেকার রংটা ঘোচাতে উঠে পড়ে লেগেছে। কাজ পেয়েছে মনের মতো, বর্ণান্তর করা। এতদিন অমিত মূর্তি গড়বার শখ মেটাত কথা দিয়ে, আজ পেয়েছে সজীব মানুষ। সে-মানুষটিও একে একে আপন উপরকার রঙিন পাপড়িগুলো খসাতে রাজি, চরমে ফল ধরবে আশা ক'রে। অমিতর বোন লিসি নাকি বলছে যে, কেটিকে একেবারে চেনাই যায় না, অর্থাৎ তাকে নাকি বড্ডো বেশি স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। বন্ধুদের সে বলে দিয়েছে তাকে কেতকী বলে ডাকতে; এটা তার পক্ষে নির্লজ্জতা, যে-মেয়ে একদা ফিনফিনে শান্তিপুরে শাড়ি পরত সেই লজ্জাবতীর পক্ষে জামাশেমিজ পরারই মতো। অমিত তাকে নাকি নিভৃতে ডাকে "কেয়া" বলে। এ-কথাও লোকে কানাকানি করছে যে, নৈনিতালের সরোবরে নৌকো ভাসিয়ে কেটি তার হাল ধরেছে আর অমিত তাকে পড়ে শোনাচ্ছে রবি ঠাকুরের "নিরুদ্দেশ যাত্রা।" কিন্তু লোকে কী না বলে। যতিশংকর বুঝে নিলে অমিতর মনটা পাল তুলে চলে গেছে ছুটিতত্ত্বের মাঝদরিয়ায়।

অবশেষে অমিত ফিরে এল। শহরে রাষ্ট্র কেতকীর সঙ্গে তার বিয়ে। অথচ অমিতর নিজ মুখে একদিনও যতী এ প্রসঙ্গ শোনে নি। অমিতর ব্যবহারেরও অনেকখানি বদল ঘটেছে। পূর্বের মতোই যতীকে অমিত ইংরেজি বই কিনে উপহার দেয়, কিন্তু তাকে নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় সে-সব বইয়ের আলোচনা করে না, যতী বুঝতে পারে আলোচনার ধারাটা এখন বইছে এক নতুন খাদে। আজকাল মোটরে বেড়াতে সে যতীকে ডাক পাড়ে না। যতীর বয়সে এ-কথা বোঝা কঠিন নয় যে, অমিতর "নিরুদ্দেশ যাত্রা"র পার্টিতে তৃতীয় ব্যক্তির জায়গা হওয়া অসম্ভব।

যতী আর থাকতে পারলে না। অমিতকে নিজেই গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, "অমিতদা, শুনলুম, মিস কেতকী মিত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে?"

অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, "লাবণ্য কি এ খবর জেনেছে ?"

"না, আমি তাকে লিখি নি। তোমার মুখে পাকা খবর পাই নি বলে চুপ করে আছি।"

"খবরটা সত্যি, কিন্তু লাবণ্য হয়তো বা ভুল বুঝবে।"

যতী হেসে বললে, "এর মধ্যে ভুল বোঝবার জায়গা কোথায় ? বিয়ে কর যদি তো বিয়েই করবে, সোজা কথা।"

"দেখো, যতী, মানুষের কোনো কথাটাই সোজা নয়। আমরা ডিকশনারিতে যে-কথার এক মানে বেঁধে দিই মানবজীবনের মধ্যে মানেটা সাতখানা হয়ে যায় সমুদ্রের কাছে এসে গঙ্গার মতো।"

যতী বললে, "অর্থাৎ তুমি বলছ বিবাহ মানে বিবাহ নয়।"

"আমি বলছি, বিবাহের হাজারখানা মানে—মানুষের সঙ্গে মিশে তার মানে হয়, মানুষকে বাদ দিয়ে তার মানে বের করতে গেলেই ধাঁধা লাগে।"

"তোমার বিশেষ মানেটাই বলো না।"

"সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায় না, জীবন দিয়ে বলতে হয়। যদি বলি ওর মূল মানেটা ভালোবাসা, তাহলেও আর-একটা কথায় গিয়ে পড়ব, ভালোবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে আরও বেশি জ্যান্ত।"

"তাহলে অমিতদা, কথা বন্ধ করতে হয় যে। কথা কাঁধে নিয়ে মানের পিছন পিছন ছুটব আর মানেটা বাঁয়ে তাড়া করলে ডাইনে, আর ডাইনে তাড়া করলে বাঁয়ে মারবে দৌড় এমন হলে তো কাজ চলে না।"

"ভায়া, মন্দ বল নি। আমার সঙ্গে থেকে তোমার মুখ ফুটেছে। সংসারে কোনো-মতে কাজ চালাতেই হবে, তাই কথার নেহাত দরকার যে-সব সত্যকে কথার মধ্যে কুলোয় না ব্যবহারের হাটে তাদেরই ছাঁটি, কথাটাকেই জাহির করি ; উপায় কী ? তাতে বোঝাপড়াটা ঠিক না হ'ক চোখ বুজে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।"

"তবে কি আজকের কথাটাকে একেবারেই খতম করতে হবে ?"

"এই আলোচনাটা যদি নিতান্তই জ্ঞানের গরজে হয়, প্রাণের গরজে না হয় তাহলে খতম করতে দোষ নেই।"

"ধরে নাও না প্রাণের গরজেই।"

"শাবাশ, তবে শোনো।"

এইখানে একটু পাদটীকা লাগালে দোষ নেই। অমিতর ছোটো বোন লিসির স্বহস্তে ঢালা চা যতী আজকাল মাঝে মাঝে প্রায়ই পান করে আসছে। অনুমান করা যেতে

পারে যে, সেই কারণেই ওর মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই যে, অমিত ওর সঙ্গে অপরাহ্ণে সাহিত্যালোচনা এবং সায়াহ্নে মোটরে করে বেড়ানো বন্ধ করেছে। অমিতকে ও সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছে।

অমিত বললে, "অক্সিজেন একভাবে বয় হাওয়ায় অদৃশ্য থেকে, সে না হলে প্রাণ বাঁচে না। আবার অক্সিজেন আর-একভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জ্বলতে থাকে, সেই আগুন জীবনের নানা কাজে দরকার,—দুটোর কোনোটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। এখন বুঝতে পেরেছ?"

"সম্পূর্ণ না, তবে কিনা বোঝবার ইচ্ছে আছে।"

"যে-ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে-ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।"

"তোমার কথা ঠিক বুঝছি, কি না, সেইটেই বুঝতে পারি নে। আর একটু স্পষ্ট করে বলো, অমিতদা।"

অমিত বললে, "একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ,—আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্টো বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল।"

"কিন্তু বিবাহে তোমার ওই সঙ্গ-আসঙ্গ কি একত্রেই মিলতে পারে না?"

"জীবনে অনেক সুযোগ ঘটতে পারে কিন্তু ঘটে না। যে-মানুষ অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গেই মিলিয়ে পায় তার ভাগ্য ভালো,—যে তা না পায় দৈবক্রমে তার যদি ডান দিক থেকে মেলে রাজত্ব আর বাঁ দিক থেকে মেলে রাজকন্যা, সে-ও বড়ো কম সৌভাগ্য নয়।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু তুমি যাকে মনে কর রোম্যান্স সেইটেতে কমতি পড়ে! একটুও না। গল্পের বই থেকেই রোম্যান্সের বাঁধা বরাদ্দ ছাঁচে ঢালাই করে জোগাতে হবে না কি? কিছুতেই না। আমার রোম্যান্স আমিই সৃষ্টি করব। আমার স্বর্গেও রয়ে গেল রোম্যান্স, আমার মর্তোও ঘটাব রোম্যান্স। যারা ওর একটাকে বাঁচাতে গিয়ে আর-একটাকে দেউলে করে দেয় তাদেরই তুমি বল রোমান্টিক! তারা হয় মাছের মতো জলে সাঁতার দেয়, নয় বেড়ালের মতো ডাঙায় বেড়ায়, নয় বাদুড়ের মতো আকাশে ফেরে। আমি রোম্যান্সের পরমহংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলে স্থলে উপলব্ধি করব, আবার আকাশেও। নদীর চরে রইল আমার পাকা দখল, আবার

মানসের দিকে যখন যাত্রা করব সেটা হবে আকাশের ফাঁকা রাস্তায়। জয় হ'ক আমার লাবণ্যর, জয় হ'ক আমার কেতকীর, আর সব দিক থেকেই ধন্য হ'ক অমিত রায়।"

যতী স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, বোধ করি কথাটা তার ঠিক লাগল না। অমিত তার মুখ দেখে ঈষৎ হেসে বললে, "দেখো ভাই, সব কথা সকলের নয়। আমি যা বলছি, হয়তো সেটা আমারই কথা। সেটাকে তোমার কথা বলে বুঝতে গেলেই ভুল বুঝবে। আমাকে গাল দিয়ে বসবে। একের কথার উপর আরের মানে চাপিয়েই পৃথিবীতে মারামারি খুনোখুনি হয়। এবার আমার নিজের কথাটা স্পষ্ট করেই না হয় তোমাকে বলি। রূপক দিয়েই বলতে হবে নইলে এ-সব কথার রূপ চলে যায়— কথাগুলো লজ্জিত হয়ে ওঠে। কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলবে, প্রতিদিন ব্যবহার করবে। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে-ভালোবাসা, সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।"

যতী একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললে, "কিন্তু অমিতদা, দুটোর মধ্যে একটাকেই কি বেছে নিতে হয় না?"

"যার হয় তারই হয়, আমার হয় না।"

"কিন্তু শ্রীমতী কেতকী যদি—"

"তিনি সব জানেন। সম্পূর্ণ বোঝেন কি না বলতে পারি নে। কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটেই তাঁকে বোঝাব যে, তাঁকে কোথাও ফাঁকি দিচ্ছি নে। এও তাঁকে বুঝতে হবে যে, লাবণ্যর কাছে তিনি ঋণী।"

"তা হ'ক, শ্রীমতী লাবণ্যকে তো তোমার বিয়ের খবর জানাতে হবে।"

"নিশ্চয় জানাব। কিন্তু তার আগে একটি চিঠি দিতে চাই, সেটি তুমি পৌঁছিয়ে দেবে?"

"দেব।"

অমিতর এই চিঠি :

> সেদিন সন্ধ্যেবেলায় রাস্তার শেষে এসে যখন দাঁড়ালুম, কবিতা দিয়ে যাত্রা শেষ করেছি। আজও এসে থামলুম একটা রাস্তার শেষে। এই শেষমুহূর্তটির উপর একটি কবিতা রেখে যেতে চাই। আর কোনো কথার ভার সইবে না। হতভাগা নিবারণ চক্রবর্তীটা যেদিন ধরা পড়েছে সেইদিন মরেছে—অতি শৌখিন জলচর মাছের মতো। তাই উপায় না দেখে তোমারই কবির উপর ভার দিলুম আমার শেষ-কথাটা তোমাকে জানাবার জন্যে :

তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন,
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার অন্তিম আগমন।
লভিয়াছি চিরস্পর্শমণি ;
আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি গিয়েছ আপনি।

জীবন আঁধার হল, সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউল দীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান।
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।

মিতা

তার পরেও আরও কিছুকাল গেল। সেদিন কেতকী গেছে তার বোনের মেয়ের অন্নপ্রাশনে। অমিত গেল না। আরামকেদারায় বসে সামনের চৌকিতে পা-দুটো তুলে দিয়ে বিলিয়ম জেমসের পত্রাবলী পড়ছে। এমন সময় যতিশংকর লাবণ্যর লেখা এক চিঠি তার হাতে দিলে। চিঠির এক পাতে শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যর বিবাহের খবর। বিবাহ হবে ছ-মাস পরে, জ্যৈষ্ঠমাসে, রামগড় পর্বতের শিখরে। অপর পাতে :

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়-স্পন্দন,
চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন।
ওগো বন্ধু,
সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি' তার জাল,—
তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হতে বহু দূরে।
মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়,
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।

ফিরিবার পথ নাহি ;
দূর হতে যদি দেখ চাহি
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে,
বসন্ত-বাতাসে
অতীতের তীর হতে যে-রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে ; বিস্মৃতপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব-চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

তোমার হয় নি কোনো ক্ষতি।
মর্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত-মুরতি
যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
হ'ক তব সন্ধ্যাবেলা,
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে ;
তৃষার্ত আবেগ-বেগে
ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে।

তোমার মানস-ভোজে সযত্নে সাজালে
যে ভাব-রসের পাত্র বাণীর তৃষায়,
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে।
আজো তুমি নিজে
হয়তো বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন।
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সে-ই ধন্য করিবে আমাকে।
শুক্লপক্ষ হতে আনি'
রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।
তোমারে যা দিয়েছিনু, তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।

ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান ;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়
হে বন্ধু, বিদায়।

বন্যা

---

২৫ জুন, ১৯২৮
ব্যাঙ্গালোর, বাঙ্গালোর

প্রবন্ধ

রাজা প্রজা

১০—৪৮

রাজা প্রজা

ইংরেজ ও ভারতবাসী

There is nothing like love and admiration for bringing people to a likeness with what they love and admire; but the Englishman seems never to dream of employing these influences upon a race he wants to fuse with himself. He employs simply material interests for his work of fusion; and, beyond these nothing except scorn and rebuke. Accordingly there is no vital union between him and the races he has annexed; and while France can freely boast of her magnificent unity, a unity of spirit no less than of name between all the people who compose her, in our country the Englishman proper is in union of spirit with no one except other Englishmen proper like himself:

Matthew Arnold

আমাদের প্রাচীন পুরাণে ইতিহাসে পাঠ করা যায় যে, চরিত্রে বা আচরণে একটা ছিদ্র না পাইলে অলক্ষ্মী প্রবেশ করিতে পথ পায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রত্যেক জাতিরই প্রায় একটা কোনো ছিদ্র থাকে। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যেখানে মানুষের দুর্বলতা সেইখানে তাহার স্নেহও বেশি। ইংরেজও আপনার চরিত্রের মধ্যে ঔদ্ধত্যকে যেন কিছু বিশেষ গৌরবের সহিত পালন করে। তাহার দ্বৈপায়ন সংকীর্ণতার মধ্যে সে যে অটল এবং ভ্রমণ অথবা রাজত্ব উপলক্ষে সে যাহাদের সংস্রবে আসে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিবার যে কিছুমাত্র প্রয়াস পায় না, সাধারণ "জন"-পুংগব এই গুণটিকে মনে মনে কিছু যেন শ্লাঘার বিষয় বলিয়া জ্ঞান করে। তাহার ভাবখানা এই যে, ঢেঁকি যেমন স্বর্গেও ঢেঁকি, তেমনি ইংরেজ সর্বত্রই খাড়া ইংরেজ, কিছুতেই তাহার আর অন্যথা হইবার জো নাই।

এই যে মনোহারিত্বের অভাব, এই যে অনুচর-আশ্রিতবর্গের অন্তরঙ্গ হইয়া তাহাদের মন বুঝিবার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা, এই যে সমস্ত পৃথিবীকে নিজের সংস্কার অনুসারেই বিচার করা, ইংরেজের চরিত্রের এই ছিদ্রটি অলক্ষ্মীর একটা প্রবেশপথ।

কোথায় কোন্ শত্রু আসিবার সম্ভাবনা আছে ইংরেজ সে ছিদ্র যত্নপূর্বক রোধ করে, যেখানে যত পথঘাট আছে সর্বত্রই পাহারা বসাইয়া রাখে এবং আশঙ্কার অঙ্কুরটি পর্যন্ত পদতলে দলন করিয়া ফেলে, কেবল নিজের স্বভাবের মধ্যে যে একটি নৈতিক বিঘ্ন আছে সেইটাকে প্রতিদিন প্রশ্রয় দিয়া দুর্দম করিয়া তুলিতেছে—কখনো কখনো অল্পস্বল্প আক্ষেপ করিয়াও থাকে—কিন্তু মমতাবশত কিছুতেই তাহার গায়ে হাত তুলিতে পারে না।

ঠিক যেন এক জন লোক বুট পায়ে দিয়া আপনার শস্যক্ষেত্রময় হুই হুই করিয়া বেড়াইতেছে পাছে পাখিতে শস্যের একটি কণামাত্র খাইয়া যায়। পাখি পলাইতেছে বটে কিন্তু কঠিন বুটের তলায় অনেকটা ছারখার হইয়া যাইতেছে তাহার কোনো খেয়াল নাই।

আমাদের কোনো শত্রুর উপদ্রব নাই, বিপদের আশঙ্কা নাই, কেবল বুকের উপরে অকস্মাৎ সেই বুটটা আসিয়া পড়ে। তাহাতে আমরা বেদনা পাই এবং সেই বুটওআলার যে কোনো লোকসান হয় না তাহা নহে। কিন্তু ইংরেজ সর্বত্রই ইংরেজ, কোথাও সে আপনার বুটজোড়াটা খুলিয়া আসিতে রাজি নহে।

আয়র্লণ্ডের সহিত ইংরেজের যে-সমস্ত খিটিমিটি বাধিয়াছে সে-সকল কথা আমাদের পাড়িবার আবশ্যক নাই; অধীন ভারতবর্ষেও দেখা যাইতেছে ইংরেজের সহিত ইংরেজিশিক্ষিতদের ক্রমশই একটি অ-বনিবনাও হইয়া আসিতেছে। তিলমাত্র অবসর পাইলে কেহ কাহাকেও ছাড়িতে চায় না। ইঁটটির পরিবর্তে পাটকেলটি চলিতেছেই।

আমরা যে, সকল জায়গায় সুবিচারপূর্বক পাটকেল নিক্ষেপ করি তাহা নহে, অধিকাংশ স্থলে অন্ধকারেই ঢেলা মারি। আমাদের কাগজে পত্রে অনেক সময় আমরা অন্যায় খিটিমিটি করিয়া থাকি এবং অমূলক কোন্দল উত্থাপন করি, সে-কথা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু সেগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিবার আবশ্যক নাই। তাহার কোনোটা সত্য কোনোটা মিথ্যা, কোনোটা ন্যায় কোনোটা অন্যায় হইতে পারে; আসল বিচার্য বিষয় এই যে, আজকাল এইরূপ পাটকেল ছুঁড়িবার প্রবৃত্তিটা এত প্রবল হইয়া উঠিতেছে কেন? শাসনকর্তা খবরের কাগজের কোনো একটা প্রবন্ধবিশেষকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া সম্পাদককে এবং হতভাগ্য মুদ্রাকরকে পর্যন্ত জেলে দিতে পারে কিন্তু প্রতিদিনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পথে এই যে-সমস্ত ছোটো ছোটো কাঁটাগাছগুলি গজাইয়া উঠিতেছে তাহার বিশেষ কী প্রতিকার করা হইল?

এই কাঁটাগাছগুলির মূল যখন মনের মধ্যে তখন ইহাকে উৎপাটন করিতে হইলে সেই মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু পাকা রাস্তা ও কাঁচা রাস্তা যোগে ইংরেজরাজের আর সর্বত্রই গতিবিধি আছে কেবল দুর্ভাগ্যক্রমে সেই মনের মধ্যেই নাই। হয়তো সে-জায়গাটাতে প্রবেশ করিতে হইলে ঈষৎ একটুখানি মাথা হেলাইয়া ঢুকিতে হয়, কিন্তু ইংরেজের মেরুদণ্ড কোনোখানেই বাঁকিতে চায় না।

অগত্যা ইংরেজ আপনাকে এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, এই যে খবরের কাগজে কটুকথা বলিতেছে, সভা হইতেছে, রাজ্যতন্ত্রের অপ্রিয় সমালোচনা চলিতেছে ইহার সহিত "পীপলের" কোনো যোগ নাই;—এ কেবল কতকগুলি শিক্ষিত পুতুলনাচওআলার বুজরুগিমাত্র। বলে যে, ভিতরে সমস্তই আছে ভালো; বাহিরে যে একটু-আধটু বিকৃতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে সে চতুর লোকে রং করিয়া দিয়াছে। তবে তো আর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিবার আবশ্যক নাই; কেবল যে-চতুর লোকটাকে সন্দেহ করা যায় তাহাকে শাসন করিয়া দিলেই চুকিয়া যায়।

ওইটেই ইংরেজের দোষ। সে কিছুতেই ঘরে আসিতে চায় না। কিন্তু দূর হইতে, বাহির হইতে, কোনোক্রমে স্পর্শসংস্রব বাঁচাইয়া মানুষের সহিত কারবার করা যায় না;—যে-পরিমাণে দূরে থাকা যায় সেই পরিমাণেই নিষ্ফলতা প্রাপ্ত হইতে হয়। মানুষ তো জড়যন্ত্র নহে যে, তাহাকে বাহির হইতে চিনিয়া লওয়া যাইবে; এমন কি পতিত ভারতবর্ষেরও একটা হৃদয় আছে এবং সে-হৃদয়টা সে তাহার জামার আস্তিনে ঝুলাইয়া রাখে নাই।

জড়পদার্থকেও বিজ্ঞানের সাহায্যে নিগূঢ়রূপে চিনিয়া লইতে হয় তবেই জড়প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারা যায়। মনুষ্যলোকে যাহারা স্থায়ী প্রভাব রক্ষা করিতে চাহে তাহাদের অন্যান্য অনেক গুণের মধ্যে অন্তরঙ্গরূপে মানুষ চিনিবার বিশেষ গুণটি থাকা আবশ্যক। মানুষের অত্যন্ত কাছে যাইবার যে ক্ষমতা সে একটা দুর্লভ ক্ষমতা।

ইংরেজের বিস্তর ক্ষমতা আছে কিন্তু সেইটি নাই। সে বরঞ্চ উপকার করিতে অসম্মত নহে কিন্তু কিছুতেই কাছে আসিতে চাহে না। কোনোমতে উপকারটা সারিয়া ফেলিয়া অমনি তাড়াতাড়ি সরিতে পারিলে বাঁচে। তাহার পরে সে ক্লবে গিয়া পেগ খাইয়া বিলিয়ার্ড খেলিয়া অনুগৃহীতদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বিশেষণ প্রয়োগপূর্বক তাহাদের বিজাতীয় অস্তিত্ব শরীরমনের নিকট হইতে যথাসাধ্য দূরীকৃত করিয়া রাখে।

ইহারা দয়া করে না উপকার করে, স্নেহ করে না রক্ষা করে, শ্রদ্ধা করে না অথচ ন্যায়াচরণের চেষ্টা করে; ভূমিতে জল সেচন করে না, অথচ রাশি রাশি বীজ বপন করিতে কার্পণ্য নাই।

কিন্তু তাহার পর যখন যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার শস্য উৎপন্ন হয় না তখন কি কেবলই মাটির দোষ দিবে? এ নিয়ম কি বিশ্বব্যাপী নহে যে, হৃদয়ের সহিত কাজ না করিলে হৃদয়ে তাহার ফল ফলে না?

আমাদের দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অনেকেই ইংরেজকৃত উপকার যে উপকার নহে ইহাই প্রাণপণে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। হৃদয়শূন্য উপকার গ্রহণ করিয়া তাহারা মনের মধ্যে কিছুতেই আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারিতেছে না। কোনোক্রমে তাহারা কৃতজ্ঞতার দায় হইতে আপনাকে যেন মুক্ত করিতে চাহে। সেইজন্য আজকাল আমাদের কাগজে পত্রে কথায় বার্তায় ইংরেজ সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুতর্ক দেখা যায়।

এক কথায়, ইংরেজ নিজেকে আমাদের পক্ষে আবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু প্রিয় করিয়া তোলা আবশ্যক বোধ করে নাই; পথ্য দেয়, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বাদ সঞ্চার করিয়া দেয় না, অবশেষে যখন বমনোদ্রেক হয় তখন চোখ রাঙাইয়া হুহুংকার দিয়া উঠে।

আজকালকার অধিকাংশ আন্দোলন গূঢ় মনঃক্ষোভ হইতে উৎপন্ন। এখন প্রত্যেক কথাটাই দুই পক্ষের হারজিতের কথা হইয়া দাঁড়ায়। হয়তো যেখানে পাঁচটা নরম কথা বলিলে উপকার হয় সেখানে আমরা তীব্রভাষায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইতে থাকি, এবং যেখানে একটা অনুরোধ পালন করিলে বিশেষ ক্ষতি নাই সেখানেও অপর পক্ষ বিমুখ হইয়া থাকে।

কিন্তু বৃহৎ অনুষ্ঠানমাত্রেই আপস ব্যতীত কাজ চলে না। পঞ্চবিংশতি কোটি প্রজাকে সুশৃঙ্খলায় শাসন করা সহজ ব্যাপার নহে। এতবড়ো বৃহৎ রাজশক্তির সহিত যখন কারবার করিতে হয় তখন সংযম, অভিজ্ঞতা এবং বিবেচনার আবশ্যক। এইটে জানা চাই গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলেই একটা কিছু করিতে পারে না; সে আপনার বৃহত্বে অভিভূত, জটিলতায় আবদ্ধ। তাহাকে একটুখানি নড়িতে হইলেই অনেক দূর হইতে অনেকগুলা কল চালনা করিতে হয়।

আমাদের এখানে আবার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ভারতবর্ষীয় এই দুই অত্যন্ত বিসদৃশ সম্প্রদায় লইয়া কারবার। উভয়ের স্বার্থ অনেক স্থলেই বিরোধী। রাজ্যতন্ত্রের যে চালক সে এই দুই বিপরীত শক্তির কোনোটাকেই উপেক্ষা করিতে পারে না—যে করিতে চায় সে নিষ্ফল হয়। আমরা যখন আমাদের মনের মতো কোনো একটা প্রস্তাব করি তখন মনে করি, গবর্মেণ্টের পক্ষে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের বাধাটা যেন বাধাই নহে। অথচ প্রকৃতপক্ষে শক্তি তাহারই বেশি। প্রবল শক্তিকে অবহেলা করিলে কিরূপ সংকটে পড়িতে হয় ইলবার্ট বিলের বিপ্লবে তাহার পরিচয় পাওয়া গেছে। সৎপথে এবং ন্যায়পথেও রেলগাড়ি চালাইতে হইলে আগে যথোচিত উপায়ে মাটি সমতল

করিয়া লাইন পাতিতে হইবে। ধৈর্য ধরিয়া সেই সময়টুকু যদি অপেক্ষা করা যায় এবং সেই কাজটা যদি সম্পন্ন হইতে দেওয়া যায় তার পরে দ্রুতবেগে চলিবার খুব সুবিধা হয়।

ইংলণ্ডে রাজাপ্রজার মধ্যে বৈষম্য নাই; এবং সেখানে রাজ্যতন্ত্রের কল বহুকাল হইতে চলিয়া সহজ হইয়া আসিয়াছে। তবু সেখানে একটা হিতজনক পরিবর্তন সাধন করিতেও কত কৌশল কত অধ্যবসায় প্রয়োগ এবং কত সম্প্রদায়কে কত ভাবে চালনা করিতে হয়। অথচ সেখানে বিপরীত স্বার্থের এমন তুমুল সংঘর্ষ নাই; সেখানে একবার যুক্তি দ্বারা প্রস্তাববিশেষের উপকারিতা সকলের কাছে প্রমাণ করিবামাত্র সাধারণ অথবা অধিকাংশের স্বার্থ এক হইয়া তাহা গ্রহণ করে। আর আমাদের দেশে যখন দুই শক্তি লইয়া কথা এবং আমরাই যখন সর্বাংশে দুর্বল তখন কেবল ভাষার বেগে গবর্মেণ্টকে বিচলিত করিবার আশা করা যায় না। নানা দূরগামী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

রাজকীয় ব্যাপারে সর্বত্রই ডিপ্লম্যাসি আছে এবং ভারতবর্ষে আমাদের পক্ষে তাহার সর্বাপেক্ষা আবশ্যক। আমি ইচ্ছা করিতেছি এবং আমার ইচ্ছা অন্যায় নহে বলিয়াই পৃথিবীতে কাজ সহজ হয় না। যখন চুরি করিতে যাইতেছি না শ্বশুরবাড়ি যাইতেছি তখন পথের মধ্যে যদি একটা পুষ্করিণী পড়ে তবে তাহার উপর দিয়াই হাঁটিয়া চলিয়া যাইব এমন পণ করিয়া বসিলে, চাই কি, শ্বশুরবাড়ি না পৌঁছিতেও পারি। সেস্থলে পুকুরটা ঘুরিয়া যাওয়াই ভালো। আমাদের রাজনৈতিক শ্বশুরবাড়ি, যেখানে ক্ষীরটা সরটা মাছের মুড়াটা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে সেখানে যাইতে হইলেও নানা বাধা নানা উপায়ে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। যেখানে লঙ্ঘন করিলে চলে সেখানে লঙ্ঘন করিতে হইবে, যেখানে সে সুবিধা নাই সেখানে রাগারাগি করিতে না বসিয়া ঘুরিয়া যাওয়া ভালো।

ডিপ্লম্যাসি অর্থে যে কপটাচরণ বুঝিতে হইবে এমন কথা নাই। তাহার প্রকৃত মর্ম এই, নিজের ব্যক্তিগত হৃদয়বৃত্তি দ্বারা অকস্মাৎ বিচলিত না হইয়া কাজের নিয়ম ও সময়ের সুযোগ বুঝিয়া কাজ করা।

কিন্তু আমরা সেদিক দিয়া যাই না। আমরা কাজ পাই বা না পাই কথা একটাও বাদ দিতে পারি না। তাহাতে কেবল যে আমাদের অনভিজ্ঞতা ও অবিবেচনা প্রকাশ পায় তাহা নহে; তাহাতে প্রকাশ পায় যে, কাজ আদায়ের ইচ্ছার অপেক্ষা দুয়ো দিবার, বাহবা লইবার, এবং মনের ঝাল ঝাড়িবার ইচ্ছা আমাদের বেশি। তাহার একটা সুযোগ পাইলে আমরা এত খুশি হই যে, তাহাতে আসল কাজের কত ক্ষতি হইল

তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। এবং কটু ভর্ৎসনার পর সংগত প্রার্থনা পূরণ করিতেও গবর্মেণ্টের মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়, পাছে প্রজার স্পর্ধা বাড়িয়া উঠে।

ইহার প্রধান কারণ, মনের ভিতরে এমন একটা অসদ্‌ভাব জন্মিয়া গিয়াছে এবং প্রতিদিন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে যে, উভয় পক্ষেরই কর্তব্যপালন ক্রমশই কিছু কিছু করিয়া দুরূহ হইতেছে। রাজাপ্রজার এই অহরহ কলহ দেখিতেও কিছুমাত্র ভালো হইতেছে না। গবর্মেণ্টও বাহ্যত যেমনই হউক, মনে মনে যে এ-সম্বন্ধে উদাসীন তাহা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু উপায় কী? ব্রিটিশ চরিত্র, হাজার হউক, মনুষ্যচরিত্র তো বটে।

ভাবিয়া দেখিলে এ সমস্যার মীমাংসা সহজ নহে।

সব-প্রথম সংকট বর্ণ লইয়া। শরীরের বর্ণটা যেমন ধুইয়া-মুছিয়া কিছুতেই দূর করা যায় না তেমনি বর্ণসম্বন্ধীয় যে সংস্কার সেটা মন হইতে তাড়ানো বড়ো কঠিন। শ্বেতকায় আর্যগণ কালো রংটাকে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ঘৃণাচক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। এই অবসরে বেদের ইংরেজি তর্জমা এবং এনসাইক্লোপীডিয়া হইতে এ-সম্বন্ধে অধ্যায়, সূত্র এবং পৃষ্ঠাঙ্ক সমেত উৎকট প্রমাণ আহরণ করিয়া পাঠকদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে চাহি না—কথাটা সকলেই বুঝিবেন। শ্বেতকৃষ্ণে যেন দিনরাত্রির ভেদ। শ্বেতজাতি দিনের ন্যায় সদাজাগ্রত, কর্মশীল, অনুসন্ধানতৎপর, আর কৃষ্ণজাতি রাত্রির ন্যায় নিশ্চেষ্ট, কর্মহীন, স্বপ্নকুহকে আবিষ্ট। এই শ্যামা-প্রকৃতিতে হয়তো রাত্রির মতো একটা গভীরতা, মাধুর্য, স্নিগ্ধ করুণা এবং সুনিবিড় আত্মীয়তার ভাব আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যস্ত চঞ্চল শ্বেতাঙ্গের তাহা আবিষ্কার করিবার অবসর নাই এবং তাহার কাছে ইহার যথেষ্ট মূল্যও নাই। তাহাদিগকে এ-কথা বলিয়াও কোনো ফল নাই যে, কালো গরুতেও সাদা দুধ দিয়া থাকে এবং ভিন্ন বর্ণের মধ্যে হৃদয়ের একটা গভীর ঐক্য আছে। কিন্তু কাজ নাই এ-সকল ওরিয়েণ্টাল উপমা-তুলনায়—কথাটা এই যে, কালো রং দেখিবামাত্র শ্বেতজাতির মন কিছু বিমুখ না হইয়া থাকিতে পারে না।

তার পরে বসনভূষণ-অভ্যাস-আচারে প্রত্যেক বিষয়েই এমন সকল বৈসাদৃশ্য আছে যাহা হৃদয়কে কেবলই প্রতিহত করিতে থাকে।

শরীর অর্ধাবৃত রাখিয়াও যে মনের অনেক সদ্‌গুণ পোষণ করা যাইতে পারে, মনের গুণগুলা যে ছায়াপ্রিয় শৌখিনজাতীয় উদ্ভিজ্জের মতো নহে, তাহাকে যে জিন-বনাতের দ্বারা না মুড়িলেও অন্য উপায়ে রক্ষা করা যায় সে-সমস্ত তর্ক করা মিথ্যা। ইহা তর্কের কথা নহে সংস্কারের কথা।

এক, নিকট-সংস্রবে এই সংস্কারের বল কতকটা অভিভূত হইতে পারে। কিন্তু

ওই সংস্কারই আবার নিকটে আসিতে দেয় না। যখন স্টীমার ছিল না এবং আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া পালের জাহাজ সুদীর্ঘকালে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে গিয়া পৌঁছিত তখন ইংরেজ দেশী লোকের সঙ্গে কিছু যেন বেশি ঘনিষ্ঠতা করিত। কিন্তু আজকাল সাহেব তিনটি মাসের ছুটি পাইলেই তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডে পলাইয়া গিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত ধুলা ধৌত করিয়া আসেন এবং ভারতবর্ষেও তাঁহাদের আত্মীয়সমাজ ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে, এই জন্য যে-দেশ তাঁহারা জয় করিয়াছেন সে-দেশে থাকিয়াও যথাসম্ভব না থাকা এবং যে-জাতিকে শাসন করিতেছেন সে-জাতিকে ভালো না বাসিয়াও কাজ করা সুসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সহস্র ক্রোশ দূর হইতে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া একটি সম্পূর্ণ বিদেশী রাজ্য নিতান্ত আপিসের কাজের ন্যায় দিনের বেলায় শাসন করিয়া সন্ধ্যাবেলায় পুনশ্চ সমুদ্রে খেয়া দিয়া বাড়ি গিয়া তপ্ত ভাত খাওয়া, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর কোথায় আছে।

এক তো, আমরা সহজেই বিদেশী—এবং আমাদের রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ ইংরেজের স্বভাবতই অরুচিকর, তাহার উপরে আরও একটা উপসর্গ আছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানসমাজ এ-দেশে যতই প্রাচীন হইতেছে ততই তাহার কতকগুলি লোকব্যবহার ও জনশ্রুতি ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। যদিও বা কোনো ইংরেজ স্বাভাবিক উদারতা ও সহৃদয়তাগুণে বাহ্য বাধাসকল দূর করিয়া আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবার পথ পাইতেন এবং আমাদিগকে অন্তরে আহ্বান করিবার জন্য দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতেন, তিনি এখানে আসিবামাত্র ইংরেজসমাজের জালের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার নিজের স্বাভাবিক সংস্কার এবং স্বজাতিসমাজের পুঞ্জীভূত সংস্কার একত্র হইয়া একটা অলঙ্ঘ্য বাধার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। পুরাতন বিদেশী নূতন বিদেশীকে আমাদের কাছে আসিতে না দিয়া তাঁহাদের দুর্গম সমাজদুর্গের মধ্যে কঠিন পাষাণময় স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখেন।

স্ত্রীলোক সমাজের শক্তিস্বরূপ। রমণী চেষ্টা করিলে বিরোধী পক্ষের মিলন সাধন করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারাই সর্বাপেক্ষা অধিকমাত্রায় সংস্কারের বশ। আমরা সেই অ্যাংলো-ইণ্ডীয় রমণীগণের স্নায়ুবিকার ও শিরঃপীড়াজনক। সেজন্য তাঁহাদের কী দোষ দিব, সে আমাদের অদৃষ্টদোষ। বিধাতা আমাদিগকে সর্বাংশেই তাঁহাদের রুচিকর করিয়া গড়েন নাই।

তাহার পরে, আমাদের মধ্যে ইংরেজেরা যে-ভাবে আমাদের সম্বন্ধে বলাকহা করে, চিন্তামাত্র না করিয়া আমাদের প্রতি যে-সমস্ত বিশেষণ প্রয়োগ করে, এবং আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে না জানিয়াও আমাদের যে-সমস্ত কুৎসাবাদ করিয়া থাকে, প্রত্যেক সামান্য

কথাটিতে আমাদের প্রতি তাহাদের যে বদ্ধমূল অপ্রেম প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা নবাগত ইংরেজ অল্পে অল্পে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া শোষণ না করিয়া থাকিতে পারে না।

এ-কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিধিবিড়ম্বনায় আমরা ইংরেজের অপেক্ষা অনেক দুর্বল এবং ইংরেজকৃত অসম্মানের কোনো প্রতিকার করিতে পারি না। যে নিজের সম্মান উদ্ধার করিতে পারে না এ পৃথিবীতে সে সম্মান পায় না। যখন একজন তাজা বিলাতি ইংরেজ আসিয়া দেখে যে, আমরা অপমান নিশ্চেষ্টভাবে বহন করি তখন আমাদের 'পরে আর তাহার শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না।

তখন তাহাদিগকে কে বুঝাইবে যে, অপমান সম্বন্ধে আমরা উদাসীন নহি কিন্তু আমরা দরিদ্র এবং আমরা কেহই স্বপ্রধান নহি, প্রত্যেক ব্যক্তিই এক-একটি বৃহৎ পরিবারের প্রতিনিধি। তাহার উপরে কেবল তাহার একলার নহে, তাহার পিতামাতা-ভ্রাতা-স্ত্রীপুত্রপরিবারের জীবনধারণ নির্ভর করিতেছে। তাহাকে অনেক আত্মসংযম আত্মত্যাগ করিয়া চলিতে হয়। ইহা তাহার চিরদিনের শিক্ষা ও অভ্যাস। সে যে ক্ষুদ্র আত্মরক্ষণেচ্ছার নিকট আত্মসম্মান বলি দেয় তাহা নহে, বৃহৎ পরিবারের নিকট, কর্তব্যজ্ঞানের নিকট দিয়া থাকে। কে না জানে দরিদ্র বাঙালি কর্মচারিগণ কতদিন সুগভীর নির্বেদ এবং সুতীব্র ধিক্‌কারের সহিত আপিস হইতে চলিয়া আসে, তাহাদের অপমানিত জীবন কী অসহ্য দুর্ভর বলিয়া বোধ হয়—সে তীব্রতা এত আত্যন্তিক যে, সে-অবস্থায় অক্ষমতম ব্যক্তিও সাংঘাতিক হইয়া উঠে কিন্তু তথাপি তাহার পরদিন যথাসময়ে ধুতির উপর চাপকানটি পরিয়া সেই আপিসের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে এবং সেই মসীলিপ্ত ডেস্কে চামড়ায় বাঁধানো বৃহৎ খাতাটি খুলিয়া সেই পিঙ্গলবর্ণ বড়োসাহেবের রূঢ় লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতে থাকে। হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া সে কি একমুহূর্তে আপনার বৃহৎ সংসারটিকে ডুবাইতে পারে? আমরা কি ইংরেজের মতো স্বতন্ত্র, সংসার-ভারবিহীন? আমরা প্রাণ দিতে উদ্যত হইলে অনেকগুলি নিরুপায় নারী অনেকগুলি অসহায় শিশু ব্যাকুল বাহু উত্তোলন করিয়া আমাদের কল্পনাচক্ষে উদিত হয় ইহা আমাদের বহুযুগের অভ্যাস।

কিন্তু সে-কথা ইংরেজের বুঝিবার নহে। ভাষায় একটিমাত্র কথা আছে, ভীরুতা। নিজের জন্য ভীরুতা ও পরের জন্য ভীরুতার প্রভেদ নির্ণয় করিয়া কোনো কথার সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং ভীরু শব্দটা মনে উদয় হইবামাত্র তৎসংবলিত দৃঢ়বদ্ধমূল অবজ্ঞাও মনে উদয় হইবে। আমরা বৃহৎ পরিবার ও বৃহৎ অপমান একত্রে মাথায় বহন করিতেছি।

তাহার পরে ভারতবর্ষের অধিকাংশ ইংরেজি খবরের কাগজ আমাদের প্রতিকূলপক্ষ অবলম্বন করিয়া আছে। চা রুটি এবং আণ্ডার সহিত আমাদের নিন্দাবাদ ভারতবর্ষীয় ইংরেজের ছোটাহাজরি। অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজি সাহিত্যে ও গল্পে, ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, ইতিহাসে, ভূগোলে, রাজনৈতিক প্রবন্ধে এবং বিদ্রূপাত্মক কবিতায় ভারতবর্ষীয়ের বিশেষত শিক্ষিত "বাবু"দের প্রতি ইংরেজের অরুচি উত্তরোত্তর বর্ধিত করিয়া তুলিতেছে।

ভারতবর্ষীয়েরা আপন গরিবখানায় পড়িয়া পড়িয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা কী প্রতিশোধ লইতে পারি। আমরা ইংরেজের কতটুকু ক্ষতি করিতে সক্ষম? আমরা রাগিতে পারি, ঘরে বসিয়া গাল পাড়িতে পারি, কিন্তু ইংরেজ যদি কেবলমাত্র দুইটি অঙ্গুলি দ্বারা আমাদের কোমল কর্ণমূলে কিঞ্চিৎ কঠিন মর্দন প্রয়োগ করে তবে সেটা আমাদিগকে সহ্য করিতে হয়। এইরূপ মর্দন করিবার ছোটো বড়ো কতপ্রকার অবসর যে তাহাদের আছে তাহা সদর-মফস্বলের লোকের অবিদিত নাই। ইংরেজ আমাদের প্রতি মনে মনে যতই বিমুখ বীতশ্রদ্ধ হইতে থাকিবে ততই আমাদের প্রকৃত স্বভাব বোঝা, আমাদের সুবিচার করা, আমাদের উপকার করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। ভারতবর্ষীয়ের অবিশ্রাম নিন্দা ও তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ইংরেজি কাগজ ভারতশাসনকার্য দুরূহ করিয়া তুলিতেছে। আর আমরা ইংরেজের নিন্দা করিয়া কেবল আমাদের নিরুপায় অসন্তোষ লালন করিতেছি মাত্র।

এ-পর্যন্ত ভারত-অধিকারকার্যে যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে ইহা নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষীয়ের নিকট হইতে ইংরেজের আশঙ্কার কোনো কারণ নাই। দেড়শত বৎসর পূর্বেই যখন কারণ ছিল না বলিলেই হয় তখন এখনকার তো আর কথাই নাই। রাজ্যের মধ্যে যাহারা উপদ্রব করিতে পারিত তাহাদের নখদন্ত গিয়াছে এবং অনভ্যাসে তাহারা এতই নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে যে, ভারতরক্ষাকার্যের জন্যই সৈন্য পাওয়া ক্রমশ দুর্ঘট হইতেছে। তথাপি ইংরেজ "সিডিশন" দমনের জন্য সর্বদা উদ্যত। তাহার কারণ, প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞগণ কোনো অবস্থাতেই সতর্কতাকে শিথিল হইতে দেন না। সাবধানের বিনাশ নাই।

তত্রাচ উহা অতিসাবধানতামাত্র। কিন্তু অপর পক্ষে ইংরেজ যদি ক্রমশই ভারতদ্রোহী হইয়া উঠিতে থাকে তাহা হইলেই রাজকার্যের বাস্তবিক বিঘ্ন ঘটা সম্ভব। বরং উদাসীন-ভাবেও কর্তব্যপালন করা যায় কিন্তু আন্তরিক বিদ্বেষ লইয়া কর্তব্যপালন করা মনুষ্য-ক্ষমতার অতীত।

তথাপি, অমানুষিক ক্ষমতাবলে সমস্ত কর্তব্য যথাযথ পালন করিলেও সেই অন্তরস্থিত বিদ্বেষ প্রজাকে পীড়ন করিতে থাকে। কারণ, যেমন জলের ধর্ম আপনার সমতল সন্ধান করা তেমনি মানবহৃদয়ের ধর্ম আপনার সম-ঐক্য অন্বেষণ করা। এমন কি, প্রেমের সূত্রে ঈশ্বরের সহিত সে আপনার ঐক্য স্থাপন করে। যেখানে সে আপনার ঐক্যের পথ খুঁজিয়া না পায় সেখানে অন্য যতপ্রকার সুবিধা থাক সে অতিশয় ক্লিষ্ট হইতে থাকে। মুসলমান রাজা অত্যাচারী ছিল কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে সমকক্ষতার সাম্য ছিল। আমাদের দর্শন কাব্য আমাদের কলাবিদ্যা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে রাজায় প্রজায় আদানপ্রদান ছিল। সুতরাং মুসলমান আমাদিগকে পীড়ন করিতে পারিত কিন্তু অসম্মান করা তাহার সাধ্য ছিল না। মনে মনে আমাদের আত্মসম্মানের কোনো লাঘব ছিল না, কারণ বাহুবলের দ্বারা শ্রেষ্ঠতা কিছুতেই অভিভূত হইতে পারে না।

কিন্তু আমরা ইংরেজের রেলগাড়ি কলকারখানা রাজ্যশৃঙ্খলা দেখি আর হাঁ করিয়া ভাবি ইহারা ময়দানবের বংশ—ইহারা এক জাতই স্বতন্ত্র, ইহাদের অসাধ্য কিছুই নহে—এই বলিয়া নিশ্চিন্তমনে রেলগাড়িতে চড়ি, কলের মাল সস্তায় কিনি এবং মনে করি ইংরেজের মুল্লুকে আমাদের আর কিছু ভয় করিবার চিন্তা করিবার চেষ্টা করিবার নাই—কেবল, পূর্বে ডাকাতে যাহা লইত এখন তাহা পুলিস এবং উকিলে মিলিয়া অংশ করিয়া লয়।

এইরূপে মনের এক ভাগ যেরূপ নিশ্চিন্ত নিশ্চেষ্ট হয়, অপর ভাগে এমন কি, মনের গভীরতর মূলে ভার বোধ হইতে থাকে। খাদ্যরস এবং পাকরস মিশিয়া তবে আহার পরিপাক হয়, ইংরেজের সভ্যতা আমাদের পক্ষে খাদ্যমাত্র কিন্তু তাহাতে রসের একান্ত অভাব হওয়াতে আমাদের মন তদুপযুক্ত পাকরস নিজের মধ্য হইতে জোগাইতে পারিতেছে না। লইতেছি মাত্র কিন্তু পাইতেছি না। ইংরেজের সকল কার্যের ফল-ভোগ করিতেছি কিন্তু আমার করিতে পারিতেছি না, এবং করিবার আশাও নিরস্ত হইতেছে।

রাজ্য জয় করিয়া গৌরব এবং লাভ আছে, রাজ্য সুশাসন করিয়া ধর্ম এবং অর্থ আছে, আর রাজাপ্রজার হৃদয়ের মিলন স্থাপন করিয়া কি কোনো মাহাত্ম্য এবং কোনো সুবিধা নাই? বর্তমান কালের ভারত-রাজনীতির সেই কি সর্বাপেক্ষা চিন্তা এবং আলোচনার বিষয় নহে?

কেমন করিয়া হইবে তাহাই প্রশ্ন। একে একে তো দেখানো গিয়াছে যে, রাজাপ্রজার মধ্যে দুর্ভেদ্য দুরূহ স্বাভাবিক বাধাসকল বর্তমান। কোনো কোনো

সহৃদয় ইংরেজও সেজন্য অনেক সময় চিন্তা ও দুঃখ অনুভব করেন। তবু যাহা অসম্ভব যাহা অসাধ্য তাহা লইয়া বিলাপ করিয়া ফল কী?

কিন্তু বৃহৎ কার্য মহৎ অনুষ্ঠান কবে সহজ সুসাধ্য হইয়াছে? এই ভারতজয়-ভারতশাসনকার্যে ইংরেজের যে-সকল গুণের আবশ্যক হইয়াছে সেগুলি কি সুলভ গুণ? সে সাহস, সে অদম্য অধ্যবসায়, সে ত্যাগস্বীকার কি স্বল্প সাধনার ধন? আর পঞ্চবিংশতি কোটি বিদেশীয় প্রজার হৃদয় জয় করিবার জন্য যে দুর্লভ সহৃদয়তাগুণের আবশ্যক তাহা কি সাধনার যোগ্য নহে?

ইংরেজ কবিগণ গ্রীস ইটালি হাঙ্গেরি পোলাণ্ডের দুঃখে অশ্রুমোচন করিয়াছেন, আমরা ততটা অশ্রুপাতের অধিকারী নহি, কিন্তু এ-পর্যন্ত মহাত্মা এডবিন আর্নল্ড্ ব্যতীত আর কোনো ইংরেজ কবি কোনো প্রসঙ্গ উপলক্ষে ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি ব্যক্ত করেন নাই। বরঞ্চ শুনিয়াছি নিঃসম্পর্ক ফ্রান্সের কোনো কোনো বড়ো কবি ভারতবর্ষীয় প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ইংরেজের যতটা অনাত্মীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে এমন আর কিছুতেই নহে।

ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয়দের লইয়া আজকাল ইংরেজি নভেল অনেকগুলি বাহির হইতেছে। শুনিতে পাই আধুনিক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান লেখকসম্প্রদায়ের মধ্যে রাডইয়ার্ড কিপ্লিং প্রতিভায় অগ্রগণ্য। তাঁহার ভারতবর্ষীয় গল্প লইয়া ইংরেজ পাঠকেরা অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। উক্ত গল্পগুলি পড়িয়া তাঁহার একজন অনুরক্ত ভক্ত ইংরেজ কবির মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে তাহা পড়িয়াছি। সমালোচনা উপলক্ষে এডমণ্ড গস বলিতেছেন:

> "এই সকল গল্প পড়িতে পড়িতে ভারতবর্ষীয় সেনানিবাসগুলিকে জনহীন বালুকাসমুদ্রের মধ্যবর্তী এক-একটি দ্বীপের মতো বোধ হয়। চারিদিকেই ভারতবর্ষের অপরিসীম মরুময়তা,—অখ্যাত, একঘেয়ে, প্রকাণ্ড—সেখানে কেবল কালা আদমি, পারিয়া কুকুর, পাঠান এবং সবুজবর্ণ টিয়াপাখি, চিল এবং কুম্ভীর, এবং লম্বা ঘাসের নির্জন ক্ষেত্র। এই মরুসমুদ্রের মধ্যবর্তী দ্বীপে কতকগুলি যুবাপুরুষ বিধবা মহারানীর কার্য করিতে এবং তাঁহার অধীনস্থ পূর্বদেশীয় ধনসম্পদপূর্ণ বর্বর সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সুদূর ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইয়াছে।"

ইংরেজের তুলিতে ভারতবর্ষের এই শুষ্ক শোভাহীন চিত্র অঙ্কিত দেখিয়া মন নৈরাশ্যে বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। আমাদের ভারতবর্ষ তো এমন নয়। কিন্তু ইংরেজের ভারতবর্ষ কি এত তফাত।

পরন্তু ভারতবর্ষের সহিত স্বার্থসম্পর্কীয় সম্বন্ধ লইয়া প্রবন্ধ আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। ইংলণ্ডের জনসংখ্যা প্রতিবৎসর বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশ কী পরিমাণে খাদ্যাভাব হইতেছে এবং ভারতবর্ষ তাহা কী পরিমাণে পূরণ করিতেছে এবং বিলাতি মালের আমদানি করিয়া বিলাতের বহুসংখ্যক শ্রমজীবীর হাতে কাজ দিয়া তাহাদের কিরূপে জীবনোপায় করিয়া দিতেছে তাহার তালিকা বাহির হইতেছে।

ইংলণ্ড উত্তরোত্তর ভারতবর্ষকে তাঁহাদেরই রাজগোষ্ঠের চিরপালিত গোরুটির মতো দেখিতেছেন। গোয়াল পরিষ্কার রাখিতে এবং খোলবিচালি জোগাইতে কোনো আলস্য নাই, এই অস্থাবর সম্পত্তিটি যাহাতে রক্ষা হয় সে-পক্ষে তাঁহাদের যত্ন আছে, যদি কখনো দৌরাত্ম্য করে সেজন্য শিং দুটা ঘষিয়া দিতে ঔদাসীন্য নাই এবং দুই বেলা দুগ্ধ দোহন করিয়া লইবার সময় কৃশকায় বৎসগুলাকে একেবারে বঞ্চিত করে না। কিন্তু তবু স্বার্থের সম্পর্কটাকেই উত্তরোত্তর জাজ্বল্যমান করিয়া তোলা হইতেছে। এই সকল প্রবন্ধে প্রায় একই সময় ভারতবর্ষের সহিত ইংরেজি উপনিবেশগুলিরও প্রসঙ্গ অবতারণা করা থাকে। কিন্তু সুরের কত প্রভেদ। তাহাদের প্রতি কত প্রেম, কত সৌভ্রাত্র। কত বারংবার করিয়া বলা হয় যে, যদিও মাতৃভূমি হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে তথাপি এখনও মাতার প্রতি তাহাদের অচলা ভক্তি আছে, তাহারা নাড়ির টান ভুলিতে পারে নাই—অর্থাৎ সে-স্থলে স্বার্থের সঙ্গে প্রেমের কথারও উল্লেখ করা আবশ্যক হয়। আর হতভাগা ভারতবর্ষেরও কোথাও একটা হৃদয় আছে এবং সেই হৃদয়ের সঙ্গে কোথাও একটু যোগ থাকা আবশ্যক সে-কথার কোনো আভাসমাত্র থাকে না। ভারতবর্ষ কেবল হিসাবের খাতায় শ্রেণীবদ্ধ অঙ্কপাতের দ্বারায় নির্দিষ্ট। ইংলণ্ডের প্র্যাকটিক্যাল লোকের কাছে ভারতবর্ষের কেবল মন-দরে সের-দরে, টাকার দরে সিকার দরে গৌরব। সংবাদপত্র এবং মাসিক-পত্রের লেখকগণ ইংলণ্ডকে কি কেবল এই শুষ্ক পাঠই অভ্যাস করাইবেন? ভারতবর্ষের সহিত যদি কেবল তাহার স্বার্থের সম্পর্কই দৃঢ় হয় তবে যে শ্যামাঙ্গিনী গাভীটি আজ দুধ দিতেছে কালে গোপকুলের অযথা বংশবৃদ্ধি ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে তাহার লেজটুকু এবং ক্ষুরটুকু পর্যন্ত তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা। এই স্বার্থের চক্ষে দেখা হয় বলিয়াই তো ল্যাঙ্কাশিয়র নিরুপায় ভারতবর্ষের তাঁতের উপর মাস্থল বসাইয়াছে আর নিজের মাল বিনা মাস্থলে চালান করিতেছে।

আমাদের দেশটাও যে তেমনি। যেমন রৌদ্র তেমনি ধুলা। কেবলই পাখার বাতাস এবং বরফজল না খাইলে সাহেব বাঁচে না। আবার দুর্ভাগ্যক্রমে পাখার কুলিটিও রুগ্ন প্লীহা লইয়া ঘুমাইয়া পড়ে এবং বরফ সর্বত্র সুলভ নহে। ভারতবর্ষ

ইংরেজের পক্ষে রোগশোক স্বজনবিচ্ছেদ এবং নির্বাসনের দেশ, সুতরাং খুব মোটা মাহিনায় সেটা পোষাইয়া লইতে হয়। আবার পোড়া এক্সচেঞ্জ তাহাতেও বাদ সাধিতে চাহে। স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া ভারতবর্ষ ইংরেজকে কী দিতে পারে।

হায় হতভাগিনী ইণ্ডিয়া, তোমাকে তোমার স্বামীর পছন্দ হইল না ; তুমি তাহাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে না। এখন দেখো, যাহাতে তাহার সেবার ক্রটি না হয়। তাহাকে অশ্রান্ত যত্নে বাতাস করো ; খসখসের পর্দা টাঙাইয়া জল সেচন করো, যাহাতে দুই দণ্ড তোমার ঘরে সে সুস্থির হইয়া বসিতে পারে। খোলো, তোমার সিন্দুকটা খোলো, তোমার গহনাগুলো বিক্রয় করো, উদর পূর্ণ করিয়া আহার এবং পকেট পূর্ণ করিয়া দক্ষিণা দাও। তবু সে মিষ্ট কথা বলিবে না, তবু মুখ ভার করিয়া থাকিবে, তবু তোমার বাপের বাড়ির নিন্দা করিবে। আজকাল তুমি লজ্জার মাথা খাইয়া মান-অভিমান করিতে আরম্ভ করিয়াছ, ঝংকার সহকারে দু-কথা পাঁচ কথা শুনাইয়া দিতেছ ; কাজ নাই বকাবকি করিয়া ; যাহাতে তোমার বিদেশী স্বামী সন্তোষে থাকে আরামে থাকে একমনে তাহাই সাধন করো। তোমার হাতের লোহা অক্ষয় হউক।

ইংরেজ রাজকবি টেনিসন মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার সর্বশেষ গ্রন্থে সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষকে কিঞ্চিৎ স্মরণ করিয়াছেন।

কবিবর উক্ত গ্রন্থে আকবরের স্বপ্ন নামক একটি কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। আকবর তাঁহার প্রিয়সুহৃৎ আবুল ফজলের নিকট রাত্রের স্বপ্নবর্ণন উপলক্ষে তাঁহার ধর্মের আদর্শ ও জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি ভারতবর্ষের ভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে ঐক্য এবং ভিন্ন জাতির মধ্যে যে প্রেম ও শান্তি স্থাপনার চেষ্টা করিয়াছেন, স্বপ্নে দেখিয়াছেন তাঁহার পরবর্তিগণ সে চেষ্টা বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে এবং অবশেষে সূর্যাস্তের দিক হইতে একদল বিদেশী আসিয়া তাঁহার সেই ভূমিসাৎ মন্দিরকে, একটি একটি প্রস্তর গাঁথিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই মন্দিরে সত্য এবং শান্তি, প্রেম এবং ন্যায়পরতা পুনরায় আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছে।

কবির এই স্বপ্ন সফল হউক প্রার্থনা করি। আজ পর্যন্ত এই মন্দিরের প্রস্তরগুলি গ্রথিত হইয়াছে ; বল, পরিশ্রম ও নৈপুণ্যের দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহার কোনো ক্রটি হয় নাই কিন্তু এখনও এ মন্দিরে সকল দেবতার অধিদেবতা প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

প্রেম পদার্থটি ভাবাত্মক, অভাবাত্মক নহে। আকবর সকল ধর্মের বিরোধভঞ্জন করিয়া যে একটি প্রেমের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ভাবাত্মক। তিনি নিজের হৃদয়মধ্যে একটি ঐক্যের আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি উদার হৃদয় লইয়া

শ্রদ্ধার সহিত সকল ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি একাগ্রতার সহিত নিষ্ঠার সহিত হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান পারসি ধর্মজ্ঞদিগের ধর্মালোচনা শ্রবণ করিতেন ও তিনি হিন্দু রমণীকে অন্তঃপুরে, হিন্দু অমাত্যদিগকে মন্ত্রী-সভায়, হিন্দু বীরগণকে সেনানায়কতায় প্রধান আসন দিয়াছিলেন। তিনি কেবল রাজনীতির দ্বারায় নহে প্রেমের দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে, রাজা ও প্রজাকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন। সুর্যাস্তভূমি হইতে বিদেশী আসিয়া আমাদের ধর্মে কোনো হস্তক্ষেপ করে না,—কিন্তু সেই নির্লিপ্ততা প্রেম, না রাজনীতি? উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ।

কিন্তু এক জন মহদাশয় ক্ষণজন্মা পুরুষ যে অত্যুচ্চ আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন একটি সমগ্র জাতির নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। সেইজন্য কবির স্বপ্ন কবে সত্য হইবে বলা কঠিন। বলা আরও কঠিন এইজন্য, যে, দেখিতে পাইতেছি, রাজা-প্রজার মধ্যে যে চলাচলের পথ ছিল উভয় পক্ষে কাঁটাগাছের ঘের দিয়া প্রতিদিন সে-পথ মারিয়া লইতেছেন। নব নব বিদ্বেষ মিলনক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

রাজ্যের মধ্যে এই প্রেমের অভাব আমরা আজকাল এত অধিক করিয়া অনুভব করি যে, লোকের মনে ভিতরে ভিতরে একটা আশঙ্কা এবং অশান্তি আন্দোলিত হইতেছে। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, আজকাল হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ উত্তরোত্তর যে নিদারুণতর হইয়া উঠিতেছে আমরা আপনাদের মধ্যে তাহা লইয়া কিরূপ বলাকহা করি? আমরা কি গোপনে বলি না যে, এই উৎপাতের প্রধান কারণ, ইংরেজেরা এই বিরোধ নিবারণের জন্য যথার্থ চেষ্টা করে না। তাহাদের রাজনীতির মধ্যে প্রেমনীতির স্থান নাই। ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষা বেশি করিয়া বপন করিয়াছে। ইচ্ছাপূর্বক করিয়াছে এমন নাও হইতে পারে—কিন্তু আকবর যে একটি প্রেমের আদর্শে খণ্ড ভারতবর্ষকে এক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ইংরেজের পলিসির মধ্যে সেই আদর্শটি নাই বলিয়াই এই দুই জাতির স্বাভাবিক বিরোধ হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। কেবল আইনের দ্বারা শাসনের দ্বারা এক করা যায় না—অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়, বেদনা বুঝিতে হয়, যথার্থ ভালোবাসিতে হয়—আপনি কাছে আসিয়া হাতে হাতে ধরিয়া মিলন করাইয়া দিতে হয়। কেবল পুলিস মোতাইন করিয়া এবং হাতকড়ি দিয়া শান্তি স্থাপন করায় দুর্ধর্ষ বলের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু সেটা ঠিক আকবরের স্বপ্নের মধ্যে ছিল না এবং সূর্যাস্তভূমির কবিগণ অলীক অহংকার না করিয়া যদি বিনীত প্রেমের সহিত সুগভীর আক্ষেপের সহিত স্বজাতিকে লাঞ্ছনা করিয়া প্রেমের সেই উচ্চ আদর্শ শিক্ষা দেন তবে তাঁহাদের স্বজাতিরও উন্নতি হয় এবং এই আশ্রিত-

বর্গেরও উপকার হয়। ইংরেজের আত্মাভিমান সভ্যতাগর্ব জাত্যহংকার কি যথেষ্ট নাই, কবি কি কেবল সেই অগ্নিতেই আহুতি দিবেন? এখনও কি নম্রতাশিক্ষা ও প্রেমচর্চার সময় হয় নাই? সৌভাগ্যের উন্নততম শিখরে অধিরোহণ করিয়া এখনও কি ইংরেজ কবি কেবল আত্মঘোষণা করিবেন।

কিন্তু আমাদের মতো অবস্থাপন্ন লোকের মুখে এ-সকল কথা কেমন শোভন হয় না, সেইজন্য বলিতেও লজ্জা বোধ হয়। দায়ে পড়িয়া প্রেম ভিক্ষা করার মতো দীনতা আর কিছু নাই। এবং এ-সম্বন্ধে দুই-এক কথা আমাদিগকে মাঝে মাঝে শুনিতেও হয়।

মনে পড়িতেছে কিছুদিন হইল ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের এক পত্রের উত্তরে লণ্ডনের স্পেক্টেটর পত্র বলিয়াছিলেন, নব্য বাঙালিদের অনেকগুলা ভালো লক্ষণ আছে কিন্তু একটা দোষ দেখিতেছি সিমপ্যাথি-লালসাটা তাহাদের বড়ো বেশি হইয়াছে।

এ দোষ স্বীকার করিতে হয় এবং এতক্ষণ আমি যে-ভাবে কথাগুলা বলিয়া আসিতেছি তাহাতে এ দোষ হাতে হাতে প্রমাণ হয়। ইংরেজের কাছ হইতে আদর পাইবার ইচ্ছাটা আমাদের কিছু অস্বাভাবিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ, আমরা স্পেক্টেটরের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। আমরা যখন "তৃষার্ত হইয়া চাহি এক ঘটি জল" আমাদের রাজা তখন "তাড়াতাড়ি এনে দেয় আধখানা বেল।" আধখানা বেল সময়বিশেষে অত্যন্ত উপাদেয় হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধাতৃষ্ণা দুই একসঙ্গে দূর হয় না। ইংরেজের সুনিয়মিত সুবিচারিত গবর্মেণ্ট অত্যন্ত উত্তম এবং উপাদেয় কিন্তু তাহাতে প্রজার হৃদয়ের তৃষ্ণা মোচন না হইতেও পরে, এমন কি, গুরুপাক প্রচুর ভোজনের ন্যায় তদ্দ্বারা তৃষ্ণা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতেও আটক নাই। স্পেক্টেটর দেশদেশান্তরের সকলপ্রকার ভোজ্য এবং সকলপ্রকার পানীয় অপর্যাপ্ত পরিমাণে আহরণ করিয়া পরিপূর্ণ ডিনারের মাঝখানে বসিয়া কিছুতেই ভাবিয়া পান না তাঁহাদের বাতায়নের বহিঃস্থিত পথপ্রান্তবর্তী ওই বিদেশী বাঙালিটির এমন বুভুক্ষু কাঙালের মতো ভাবখানা কেন?

কিন্তু স্পেক্টেটর শুনিয়া হয়তো সুখী হইবেন, অতিদুষ্প্রাপ্য তাঁহাদের সেই সিমপ্যাথির আঙুর ক্রমে আমাদের নিকটও টক হইয়া আসিয়াছে। আমরা অনেকক্ষণ ঊর্ধ্বে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিবার উপক্রম করিতেছি। আমাদের এই চির-উপবাসী ক্ষুধিত স্বভাবের মধ্যেও যেটুকু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট ছিল তাহা ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে।

আমরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি—তোমরা এতই কি শ্রেষ্ঠ। তোমরা না হয় কল

চালাইতে এবং কামান পাতিতে শিখিয়াছ কিন্তু মানবের প্রকৃত সভ্যতা আধ্যাত্মিক সভ্যতা, সেই সভ্যতায় আমরা তোমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠতর। অধ্যাত্মবিদ্যার ক খ হইতে আমরা তোমাদিগকে শিখাইতে পারি। তোমরা যে আমাদিগকে অর্ধসভ্য বলিয়া অবজ্ঞা কর সে তোমাদের অন্ধ মূঢ়তাবশত, হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠতা ধারণা করিবার শক্তিও তোমাদের নাই। আমরা পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিব। আজ হইতে তোমাদের য়ুরোপের সুখাসক্ত চপল সভ্যতার বাল্যলীলা হইতে সমস্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া তাহাকে কেবলমাত্র নাসাগ্রভাগে নিবিষ্ট করিয়া রাখিলাম। তোমরা কাছারি করো, আপিস করো, দোকান করো, নাচো, খেলো, মারো, ধরো, হুটোপাটি করো এবং সিমলার শৈলশিখরে বিলাসের স্বর্গপুরী নির্মাণ করিয়া সভ্যতামদে প্রমত্ত হইয়া থাকো।

দরিদ্র বঞ্চিত মানব আপনাকে এইরূপে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। যে শ্রেষ্ঠতার সহিত প্রেম নাই সে শ্রেষ্ঠতা সে কিছুতেই বহন করিতে সম্মত হয় না। কারণ, তাহার অন্তরে একটি সহজ জ্ঞান আছে তদ্দ্বারা সে জানে যে, এইরূপ শুষ্ক শ্রেষ্ঠতা বাধ্য হইয়া বহন করিতে হইলে ক্রমশ ভারবাহী মূঢ় পশুর সমতুল্য হইয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু কে বলিতে পারে এই মানসিক বিদ্রোহই বিধাতার অভিপ্রেত নহে। তিনি ক্ষুদ্র পৃথিবীকে যেরূপ প্রচণ্ড সূর্যের প্রবল আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিতেছেন, তাহার অন্তরে একটি প্রতিকূল শক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সেই শক্তির বলে সে সূর্যের আলোক-উত্তাপ ভোগ করিয়াও আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে এবং সূর্যের ন্যায় প্রতাপশালী হইবার চেষ্টা না করিয়া আপনার অন্তর্নিহিত স্নেহশক্তি দ্বারা শ্যামলা শস্যশালিনী কোমলা মাতৃরূপিণী হইয়া উঠিয়াছে, বিধাতা বোধ করি সেইরূপ আমাদিগকেও ইংরেজের বৃহৎ আকর্ষণের কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্‌যোগ করিয়াছেন। বোধ করি তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, আমরা ইংরেজি সভ্যতার জ্ঞানালোকে নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিব।

তাহার লক্ষণও দেখা যায়। ইংরেজের সহিত সংঘর্ষ আমাদের অন্তরে যে একটি উত্তাপ সঞ্চার করিয়া দিয়াছে তদ্দ্বারা আমাদের মুমূর্ষু জীবনীশক্তি পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিতেছে। আমাদের অন্তরের মধ্যে আমাদের যে-সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা অন্ধ ও জড়বৎ হইয়া অবস্থান করিতেছিল তাহারা নূতন আলোকে পুনরায় আপনাকে চিনিতে পারিতেছে। স্বাধীন যুক্তিতর্কবিচারে আমাদের মানসভূমি আমাদের নিকট নবাবিষ্কৃত হইতেছে। দীর্ঘ প্রলয়রাত্রির অবসানে অরুণোদয়ে যেন আমরা আমাদেরই দেশ আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছি। স্মৃতিশ্রুতি-কাব্যপুরাণ-ইতিহাসদর্শনের প্রাচীন

গহন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি—পুরাতন গুপ্তধনকে নূতন করিয়া লাভ করিবার ইচ্ছা। আমাদের মনে যে একটা ধিক্কারের প্রতিঘাত উপস্থিত হইয়াছে তাহাতেই আমাদিগকে আমাদের নিজের দিকে পুনরায় সবলে নিক্ষেপ করিয়াছে। প্রথম আক্ষেপে আমরা কিছু অন্ধভাবে আমাদের মাটি ধরিয়া পড়িয়াছি—আশা করা যায়, একদিন স্থিরভাবে অক্ষুব্ধচিত্তে ভালোমন্দ বিচারের সময় আসিবে এবং এই প্রতিঘাত হইতে যথার্থ গভীর শিক্ষা এবং স্থায়ী উন্নতি লাভ করিতে পারিব।

একপ্রকারের কালি আছে যাহা কাগজের গায়ে কালক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায় অবশেষে অগ্নির কাছে কাগজ ধরিলে পুনর্বার রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠে। পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যতা সেই কালিতে লেখা; কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যায় আবার শুভ দৈবক্রমে নব-সভ্যতার সংস্রবে নবজীবনের উত্তাপে তাহা পুনরায় ফুটিয়া উঠা অসম্ভব বোধ হয় না। আমরা তো সেইরূপ আশা করিয়া আছি। এবং সেই বিপুল আশায় উৎসাহিত হইয়া আমাদের সমুদয় প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলি সেই উত্তাপের কাছে আনিয়া ধরিতেছি,—যদি পূর্ব অক্ষর ফুটিয়া উঠে তবেই পৃথিবীতে আমাদের গৌরব রক্ষিত হইতে পারে—নচেৎ বৃদ্ধ ভারতের জরাজীর্ণ দেহ সভ্যতার জলন্ত চিতায় সমর্পণ করিয়া লোকান্তর ও রূপান্তর প্রাপ্তি হওয়াই সদ্গতি।

আমাদের মধ্যে সাধারণের সম্মানভাজন এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন তাঁহারা বর্তমান সমস্যার সহজ একটা মীমাংসা করিতে চান। তাঁহাদের ভাবখানা এই :

ইংরেজের সহিত আমাদের অনেকগুলি বাহ্য অমিল আছে। সেই বাহ্য অমিলই সর্বপ্রথম চক্ষে আঘাত করে এবং তাহা হইতেই বিজাতীয় বিদ্বেষের সূত্রপাত হইয়া থাকে। অতএব বাহ্য অনৈক্যটা যথাসম্ভব দূর করা আবশ্যক। যে-সমস্ত আচার-ব্যবহার এবং দৃশ্য চিরাভ্যাসক্রমে ইংরেজের সহজে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে সেইগুলি দেশে প্রবর্তন করা দেশের পক্ষে হিতজনক। বসনভূষণ ভাবভঙ্গি, এমন কি, ভাষাটা পর্যন্ত ইংরেজি হইয়া গেলে দুই জাতির মধ্যে মিলনসাধনের একটি প্রধান অন্তরায় চলিয়া যায় এবং আমাদের আত্মসম্মান রক্ষার একটি সহজ উপায় অবলম্বন করা হয়।

আমার বিবেচনায় এ-কথা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধেয় নহে। বাহ্য অনৈক্য লোপ করিয়া দেওয়ার একটি মহৎ বিপদ এই যে, অনভিজ্ঞ দর্শকের মনে একটি মিথ্যা আশার সঞ্চার করিয়া দেওয়া হয় এবং সেই আশাটি রক্ষা করিবার জন্য অলক্ষিতভাবে মিথ্যার শরণাপন্ন হইতে হয়। ইংরেজদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয় আমরা তোমাদেরই মতো, এবং যেখানে অন্যতর কিছু বাহির হইয়া পড়ে সেখানে তাড়াতাড়ি যেন তেন প্রকারে চাপাচুপি দিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। আডাম এবং ঈভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্বে যে সহজ বেশে

ভ্রমণ করিতেন তাহা অতি শোভন ও পবিত্র কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পরে যে-পর্যন্ত না পৃথিবীতে দরজির দোকান বসিয়াছিল সে-পর্যন্ত তাঁহাদের বেশভূষা অশ্লীলতা-নিবারিণী সভায় নিন্দার্হ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। আমাদেরও নব-আবরণে লজ্জানিবারণ না করিয়া লজ্জাবৃদ্ধি করিবারই সম্ভব। কারণ, সমস্ত দেশটাকে ঢাকিবার মতো দরজির এস্টাব্লিশমেণ্ট এখনও খোলা হয় নাই। ঢাকিতে গিয়া ঢাকা পড়িবে না এবং তাহার মতো বিড়ম্বনা আর কিছুই নাই। যাঁহারা লোভে পড়িয়া সভ্যতাবৃক্ষের এই ফলটি খাইয়া বসিয়াছেন তাঁহাদিগকে বড়োই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়। পাছে ইংরেজ দেখিতে পায় আমরা হাতে করিয়া খাই, পাছে ইংরেজ জানিতে পায় আমরা আসনে চৌকা হইয়া বসি, এজন্য কেবলই তাঁহাদিগকে পর্দা টানিয়া বেড়াইতে হয়। এটিকেট-শাস্ত্রে একটু ত্রুটি হওয়া, ইংরেজি ভাষায় স্বল্প স্খলন হওয়া তাঁহারা পাতকরূপে গণ্য করেন এবং স্বসম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে সাহেবি আদর্শের ন্যূনতা দেখিলে লজ্জা ও অবজ্ঞা অনুভব করিয়া থাকেন। ভাবিয়া দেখিলে অনাবরণ অপেক্ষা এই অসম্পূর্ণ আবরণে, এই আবরণের নিষ্ফল চেষ্টাতেই প্রকৃত অশ্লীলতা—ইহাতেই যথার্থ আত্মাবমাননা।

কতকটা পরিমাণে ইংরেজি ছদ্মবেশ ধারণ করিলে বৈসাদৃশ্যটা আরও বেশি জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাহার ফলটা বেশ সুশোভন হয় না। সুতরাং রুচিতে দ্বিগুণ আঘাত দেয়। ইংরেজের মনটা অভ্যাসকুহকে নিকটে আকৃষ্ট হওয়াতেই আপনাকে অন্যায় প্রতারিত জ্ঞান করিয়া দ্বিগুণ বেগে প্রতিহত হয়।

নব্য জাপান য়ুরোপীয় সভ্যতায় রীতিমতো দীক্ষিত হইয়াছে। তাহার শিক্ষা কেবল বাহ্যশিক্ষা নহে। কলকারখানা শাসনপ্রণালী বিদ্যাবিস্তার সমস্ত সে নিজের হাতে চালাইতেছে। তাহার পটুতা দেখিয়া য়ুরোপ বিস্মিত হয় এবং কোথাও কোনো ত্রুটি খুঁজিয়া পায় না কিন্তু তথাপি য়ুরোপ আপনার বিদ্যালয়ের এই সর্দার প'ড়োটিকে বিলাতি বেশভূষা-আচারব্যবহারের অনুকরণ করিতে দেখিলেই বিমুখ না হইয়া থাকিতে পারে না। জাপান নিজের এই অদ্ভুত কুরুচি, এই হাস্যজনক অসংগতি সম্বন্ধে নিজে একেবারেই অন্ধ। কিন্তু য়ুরোপ এই ছদ্মবেশী এশিয়াবাসীকে দেখিয়া বিপুল শ্রদ্ধাসত্ত্বেও না হাসিয়া থাকিতে পারে না।

আর আমরা কি য়ুরোপের সহিত অন্য সমস্ত বিষয়েই এতটা দূর একাত্ম হইয়া গিয়াছি যে, বাহ্য অনৈক্য বিলোপ করিয়া দিলে অসংগতি নামক গুরুতর রুচিদোষ ঘটিবে না?

এই তো গেল একটা কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, এই উপায়ে লাভ চুলায় যাক,

মূলধনেরই ক্ষতি হয়। ইংরেজের সহিত অনৈক্য তো আছেই আবার স্বদেশীয়ের সহিত অনৈক্যের সূচনা হয়। আমি যদি আজ ইংরেজের মতো হইয়া ইংরেজের নিকট মান কাড়িতে যাই তবে আমার যে-ভ্রাতারা ইংরেজের মতো সাজে নাই তাহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিতে স্বভাবতই কিছু সংকোচ বোধ হয়ই। তাহাদের জন্য লজ্জা অনুভব না করিয়া থাকিবার জো নাই। আমি যে নিজগুণে ওই সকল মানুষের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রজাতিভুক্ত হইয়াছি এইরূপ পরিচয় দিতে প্রবৃত্তি হয়।

ইহার অর্থ ই এই—জাতীয় সম্মান বিক্রয় করিয়া আত্মসম্মান ক্রয় করা। ইংরেজের কাছে একরকম করিয়া বলা যে, সাহেব, ওই বর্বরদের প্রতি যেমন ব্যবহারই কর আমি যখন কতকটা তোমাদের মতো চেহারা করিয়া আসিয়াছি তখন মনে বড়ো আশা আছে যে, আমাকে তুমি দূর করিয়া দিবে না।

মনে করা যাক যে, এইরূপ কাঙালবৃত্তি করিয়া কিছু প্রসাদ পাওয়া যায় কিন্তু ইহাতেই কি আপনার কিংবা স্বজাতির সম্মান রক্ষা করা হয়?

কর্ণ যখন অশ্বত্থামাকে বলেন যে, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার সহিত কী যুদ্ধ করিব, তখন অশ্বত্থামা বলিয়াছিলেন, আমি ব্রাহ্মণ সেইজন্যই তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না? আচ্ছা, তবে আমার এই পইতা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

সাহেব যদি শেকহ্যাণ্ডপূর্বক বলে এবং এক্সোয়ার যোজনাপূর্বক লেখে যে, আচ্ছা তুমি যখন তোমার জাতীয়ত্ব যথাসম্ভব ঢাকিয়া আসিয়াছ তখন এবারকার মতো তোমাকে আমাদের ক্লাবের সভ্য করা গেল, আমাদের হোটেলে স্থান দেওয়া গেল, এমন কি, তুমি দেখা করিলে এক-আধবার তোমার "কল রিটার্ন" করা যাইতেও পারে—তবে কি তৎক্ষণাৎ আপনাকে পরমসম্মানিত জ্ঞান করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিব, না, বলিব—ইহারই জন্য আমার সম্মান! তবে এ ছদ্মবেশ আমি ছিঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। যতক্ষণে না আমার সমস্ত স্বজাতিকে আমি যথার্থ সম্মানযোগ্য করিতে পারিব ততক্ষণ আমি রং মাখিয়া এক্সেপশন সাজিয়া তোমাদের দ্বারে পদার্পণ করিব না।

আমি তো বলি সেই আমাদের একমাত্র ব্রত; সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব। নিজের মধ্যে সম্মান অনুভব করিব। সেদিন যখন আসিবে তখন পৃথিবীর যে-সভায় ইচ্ছা প্রবেশ করিব—ছদ্মবেশ, ছদ্মনাম, ছদ্মব্যবহার এবং যাচিয়া মান কাঁদিয়া সোহাগের কোনো প্রয়োজন থাকিবে না।

উপায়টা সহজ নহে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি সহজ উপায়ে কোন্ দুঃসাধ্য কাজ হইয়াছে। বড়ো কঠিন কাজ সেইজন্য অন্য সমস্ত ফেলিয়া তাহারই প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে।

কার্যে প্রবৃত্ত হইবার আরম্ভে এই পণ করিয়া বসিতে হইবে যে, যতদিন না সুযোগ্য হইব ততদিন অজ্ঞাতবাস অবলম্বন করিয়া থাকিব।

নির্মাণ হইবার অবস্থায় গোপনের আবশ্যক। বীজ মৃত্তিকার নিম্নে নিহিত থাকে, ভ্রূণ গর্ভের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত হয়। শিক্ষাবস্থায় বালককে সংসারে অধিক পরিমাণে মিশিতে দিলে সে প্রবীণ সমাজের মধ্যে গণ্য হইবার দুরাশায় প্রবীণদিগের অযথা অনুকরণ করিয়া অকালপক্ব হইয়া যায়। সে মনে করে সে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া গিয়াছে। তাহার আর রীতিমতো শিক্ষার প্রয়োজন নাই—বিনয় তাহার পক্ষে বাহুল্য।

পাণ্ডবেরা পূর্বগৌরব গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া বল সঞ্চয় করিয়াছেন। সংসারে উদ্‌যোগপর্বের পূর্বে অজ্ঞাতবাসের পর্ব।

আমাদেরও এখন আত্মনির্মাণ-জাতিনির্মাণের অবস্থা, এখন আমাদের অজ্ঞাতবাসের সময়।

কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা বড়োই বেশি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা নিতান্ত অপরিপক্ব অবস্থাতেই অধীরভাবে ডিম্ব ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি, এখন প্রতিকূল সংসারের মধ্যে এই দুর্বল অপরিণত শরীরের পুষ্টিসাধন বড়ো কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা আজ পৃথিবীর রণভূমিতে কী অস্ত্র লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম? কেবল বক্তৃতা এবং আবেদন? কী বর্ম পরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছি? কেবল ছদ্মবেশ? এমন করিয়া কতদিনই বা কাজ চলে এবং কতটুকুই বা ফল হয়?

একবার নিজেদের মধ্যে অকপটচিত্তে সরলভাবে স্বীকার করিতে দোষ কী যে, এখনও আমাদের চরিত্রবল জন্মে নাই? আমরা দলাদলি ঈর্ষা ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ। আমরা একত্র হইতে পারি না, পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, আপনাদের মধ্যে কাহারও নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলি বৃহৎ বুদ্‌বুদের মতো ফাটিয়া যায়; আরম্ভে ব্যাপারটা খুব তেজের সহিত উদ্‌ভিন্ন হইয়া উঠে দুইদিন পরেই সেটা প্রথমে বিচ্ছিন্ন, পরে বিকৃত, পরে নির্জীব হইয়া যায়। যতক্ষণ না যথার্থ ত্যাগস্বীকারের সময় আসে ততক্ষণ আমরা ক্রীড়াসক্ত বালকের মতো একটা উদ্‌যোগ লইয়া উন্মত্ত হইয়া থাকি, তার পরে কিঞ্চিৎ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইলেই আমরা নানান ছুতায় স্ব স্ব গৃহে সরিয়া পড়ি। আত্মাভিমান কোনো কারণে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলে উদ্দেশ্যের মহত্ত্বসম্বন্ধে আমাদের আর কোনো জ্ঞান থাকে না। যেমন করিয়া হউক কাজ আরম্ভ হইতে না হইতেই তপ্ত তপ্ত নামটা চাই। বিজ্ঞাপন, রিপোর্ট, ধুমধাম এবং খ্যাতিটা যথেষ্টপরিমাণে

হইলেই আমাদের এমনি পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধ হয় যে, তাহার পরেই প্রকৃতিটা নিরালস্য হইয়া আসে; ধৈর্যসাধ্য শ্রমসাধ্য নিষ্ঠাসাধ্য কাজে হাত দিতে আর তেমন গা লাগে না।

এই দুর্বল অপরিণত শতজীর্ণ চরিত্রটা লইয়া আমরা কী সাহসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহাই বিস্ময় এবং ভাবনার বিষয়।

এরূপ অবস্থায় অসম্পূর্ণতা সংশোধন না করিয়া অসম্পূর্ণতা গোপন করিতেই ইচ্ছা যায়। একটা কোনো আত্মদোষের সমালোচনা করিতে গেলেই সকলে মিলিয়া মুখ চাপিয়া ধরে, বলে, আরে চুপ চুপ, ইংরেজেরা শুনিতে পাইবে—তাহারা কী মনে করিবে?

আবার আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজও অনেকগুলি বিষয়ে কিছু স্থূলদৃষ্টি। ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে যে বিশেষ গুণগুলি আছে এবং যেগুলি বিশেষ সমাদরের যোগ্য তাহা তাহারা তলাইয়া গ্রহণ করিতে পারে না; অবজ্ঞাভরেই হউক বা যে-কারণেই হউক তাহারা বিদেশী আবরণ ভেদ করিতে পারে না বা চাহে না। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখো—বিদেশে থাকিয়া জর্মান যেমন একাগ্রতার সহিত আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছে স্বক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া ইংরেজ তেমন করে নাই। ইংরেজ ভারতবর্ষে জীবনযাপন করে এবং দেশটাকে সম্পূর্ণই দখল করিয়াছে কিন্তু দেশী ভাষাটা দখল করিতে পারে নাই।

অতএব ইংরেজ ভারতবর্ষীয়কে ঠিক ভারতবর্ষীয়ভাবে বুঝিতে এবং শ্রদ্ধা করিতে অক্ষম। এইজন্য আমরা অগত্যা ইংরেজকে ইংরেজি ভাবেই মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। মনে যাহা জানি মুখে তাহা বলি না, কাজে যাহা করি কাগজে তাহা বাড়াইয়া লিখি। জানি যে, ইংরেজ পীপল নামক একটা পদার্থকে জুজুর মতো দেখে, আমরাও সেইজন্য কোনোমতে পাঁচজনকে জড়ো করিয়া পীপল সাজিয়া গলা গম্ভীর করিয়া ইংরেজকে ভয় দেখাই। পরস্পরকে বলি, কী করিব ভাই, এমন না করিলে উঁহারা যদি কোনো কথায় কর্ণপাত না করে তবে কী করা যায়। উঁহারা কেবল নিজের দস্তুরটাই বোঝে।

এইরূপে ইংরেজের স্বভাবগুণেই আমাদিগকে ইংরেজের মতো ভান করিয়া আড়ম্বর করিয়া তাহাদের নিকট সম্মান এবং কাজ আদায় করিতে হয়। কিন্তু তবু আমি বলি, সর্বাপেক্ষা ভালো কথা এই যে, আমরা সাজিতে পারিব না। না সাজিলে কর্তারা যদি আমাদিগকে একটুখানি অধিকার বা আধটুকরা অনুগ্রহ না দেন তো নাই দিলেন।

কর্তৃপক্ষের প্রতি অভিমান করিয়া যে এ-কথা বলা হইতেছে তাহা নহে। মনে বড়ো ভয় আছে। আমরা মৃৎপাত্র, কাংস্যপাত্রের সহিত বিবাদ চুলায় যাউক আত্মীয়তাপূর্বক শেকহ্যাণ্ড করিতে গেলেও আশঙ্কার সম্ভাবনা জন্মে।

কারণ, এত অনৈক্যের সংঘাতে আত্মরক্ষা করা বড়ো কঠিন। আমরা দুর্বল বলিয়াই ভয় হয় যে, সাহেবের কাছে যদি একবার ঘেঁষি, সাহেব যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি কিছু সুপ্রসন্ন হাস্য বর্ষণ করে তাহার প্রলোভন আমার কাছে বড়ো বেশি—এত বেশি যে, সে-অনুগ্রহের তুলনায় আমাদের যথার্থ হিত আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি। সাহেব যদি হাসিয়া বলিয়া বসে, বাঃ বাবু, তুমি তো ইংরেজি মন্দ বল না; তাহার পর হইতে বাংলার চর্চা করা আমার পক্ষে বড়োই কঠিন হইয়া উঠে। যে বহিরংশে ইংরেজের অনুগ্রহদৃষ্টি পড়ে সেই অংশেরই চাকচিক্য সাধনে প্রবৃত্তি হয়; যেদিকটা য়ুরোপের চক্ষুগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই সেদিকটা অন্ধকারে অনাদরে আবর্জনায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সেদিকের কোনোরূপ সংশোধনে হাত দিতে আলস্য বোধ হয়।

মানুষকে দোষ দিতে পারি না; অকিঞ্চন অপমানিতের পক্ষে এ প্রলোভন বড়ো স্বাভাবিক। সৌভাগ্যবানের প্রসন্নতায় তাহাকে বিচলিত না করিয়া থাকিতে পারে না।

আজ আমি বলিতেছি, ভারতবর্ষের দীনতম মলিনতম কৃষককেও আমি ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব আর ওই যে রাঙা সাহেব টমটম হাঁকাইয়া আমার সর্বাঙ্গে কাদা ছিটাইয়া চলিয়া যাইতেছে উহার সহিত আমার কানাকড়ির সম্পর্ক নাই।

ঠিক এমন সময়টিতে যদি উক্ত রাঙা সাহেব হঠাৎ টমটম থামাইয়া আমারই দরিদ্র কুটিরে পদার্পণ করিয়া বলে, "বাবু তোমার কাছে দেশালাই আছে?" তখন ইচ্ছা করে দেশের পঞ্চবিংশতি কোটি লোক সারি সারি কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া যায় যে, সাহেব আজ আমারই বাড়িতে দেশালাই চাহিতে আসিয়াছে। এবং দৈবাৎ ঠিক সেই সময়টিতে যদি আমার দীনতম মলিনতম কৃষক ভাইটি মাঠাকরুনকে প্রণাম করিবার জন্য আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সেই কুৎসিত দৃশ্যটিকে ধরণীতলে বিলুপ্ত করিয়া দিতে ইচ্ছা করে; পাছে সেই বর্বরের সহিত আমার কোনো যোগ কোনো সংস্রব কোনো সুদূর ঐক্য বড়ো সাহেবের কল্পনাপথে উদিত হয়।

অতএব, যখন মনে মনে বলি সাহেবের কাছে আর ঘেঁষিব না তখন অহংকারের সহিত বলি না, বড়ো বিনয়ের সহিত বড়ো আশঙ্কার সহিত বলি। জানি যে, সেই সৌভাগ্যগর্বেই আমার সর্বাপেক্ষা সর্বনাশ হইবে—আমি আর নিভৃতে বসিয়া আপনার কর্তব্যপালন করিতে পারিব না, মনটা সর্বদাই উড়ু উড়ু করিতে থাকিবে এবং

আপনাদের দরিদ্র স্বজনের খ্যাতিহীন গৃহটাকে বড়োই বেশি শূন্য বলিয়া বোধ হইবে। যাহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করা আমার কর্তব্য তাহাদের সহিত নিকট-আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করিতে আমার লজ্জা বোধ হইবে।

ইংরেজ তাহাদের আমোদপ্রমোদ আহারবিহার আসঙ্গপ্রসঙ্গ বন্ধুত্বপ্রণয় হইতে আমাদিগকে সর্বতোভাবে বহিষ্কৃত করিয়া দ্বার রুদ্ধ রাখিতে চাহে তবু আমরা নত হইয়া প্রণত হইয়া ছল করিয়া কল করিয়া একটুখানি প্রবেশাধিকার পাইলে, রাজ-সমাজের একটু ঘ্রাণমাত্র পাইলে, এত কৃতার্থ হই যে, আপনার দেশের লোকের আত্মীয়তা সে-গৌরবের নিকট তুচ্ছ বোধ হয়, এমন স্থলে, এমন দুর্বল মানসিক অবস্থায় সেই সর্বনাশী অনুগ্রহমদ্যকে অপেয়মস্পর্শং বলিয়া সর্বথা পরিহার করাই কর্তব্য।

আরও একটা কারণ আছে। ইংরেজের অনুগ্রহকে কেবল গৌরব মনে করিয়া কেবল নিঃস্বার্থভাবে ভোগ করাও আমাদের পক্ষে কঠিন। কারণ আমরা দরিদ্র, এবং জঠরানল কেবল সম্মানবর্ষণে শান্ত হয় না। আমরা অনুগ্রহটিকে সুবিধায় ভাঙাইয়া লইতে চাহি। কেবল অনুগ্রহ নহে সেই সঙ্গে কিছু অন্নেরও প্রত্যাশা রাখি। কেবল শেকহ্যাণ্ড নহে চাকরিটা বেতনবৃদ্ধিটাও আবশ্যক। প্রথম দুই দিন যদি সাহেবের কাছে বন্ধুর মতো আনাগোনা করি তো তৃতীয় দিনে ভিক্ষুকের মতো হাত পাতিতে লজ্জা বোধ করি না। সুতরাং সম্বন্ধটা বড়োই হীন হইয়া পড়ে। এদিকে অভিমান করি যে, ইংরেজ আমাদিগকে সমকক্ষ ভাবের সম্মান দেয় না ওদিকে তাহাদের দ্বারস্থ হইয়া ভিক্ষা করিতেও ছাড়ি না।

ইংরেজ আমাদের দেশী সাক্ষাৎকারীকে উমেদার, অনুগ্রহপ্রার্থী অথবা টাইটেল-প্রত্যাশী না মনে করিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, ইংরেজের সঙ্গে তো আমাদের দেখাশুনার কোনো সম্বন্ধই নাই। তাহাদের ঘরের দ্বার রুদ্ধ, আমাদের কপাটে তালা। তবে আজ হঠাৎ ওই যে লোকটা পাগড়ি-চাপকান পরিয়া শঙ্কিতমনে আসিতেছে, অপ্রস্তুত অভদ্রের মতো অনভ্যস্ত অশোভন ভাবে সেলাম করিতেছে, কোথায় বসিবে ভাবিয়া পাইতেছে না এবং থতমত খাইয়া কথা কহিতেছে উহার সহসা এত বিরহবেদনা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল যে, দ্বারীকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়াও সাহেবের মুখচন্দ্রমা দেখিতে আসিয়াছে?

যাহার অবস্থা হীন সে যেন বিনা আমন্ত্রণে বিনা আদরে সৌভাগ্যশালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে না যায়—তাহাতে কোনো পক্ষেরই মঙ্গল হয় না। ইংরেজ এ-দেশে আসিয়া ক্রমশই নূতন মূর্তি ধারণ করিতে থাকে তাহার অনেকটা কি আমাদেরই

হীনতাবশত নহে? সেইজন্যও বলি, অবস্থা যখন এতই মন্দ তখন আমাদের সংস্রব সংঘর্ষ হইতে ইংরেজকে রক্ষা করিলে উহাদেরও চরিত্রের এমন দ্রুত বিকৃতি হইবে না। সে উভয় পক্ষেরই লাভ।

অতএব সকল দিক পর্যালোচনা করিয়া রাজাপ্রজার বিদ্বেষভাব শমিত রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে ইংরেজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকটকর্তব্যসকল পালনে একান্তমনে নিযুক্ত হওয়া। কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনোই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। আজ আমরা মনে করিতেছি ইংরেজের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। ভিক্ষাস্বরূপে সমস্ত অধিকারগুলি যখন পাইব তখনও দেখিব অন্তর হইতে লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইতেছে না—বরং যতদিন না পাইয়াছি ততদিন যে-সান্ত্বনাটুকু ছিল সে সান্ত্বনাও আর থাকিবে না। আমাদের অন্তরের শূন্যতা না পুরাইতে পারিলে কিছুতেই আমাদের শান্তি নাই। আমাদের স্বভাবকে সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিলে তবেই আমাদের যথার্থ দৈন্য দূর হইবে এবং তখন আমরা তেজের সহিত সম্মানের সহিত রাজসাক্ষাতে যাতায়াত করিতে পারিব।

আমি এমন বাতুল নহি যে, আশা করিব সমস্ত ভারতবর্ষ পদচিন্তা প্রভাবচিন্তা ইংরেজের প্রসাদচিন্তা ত্যাগ করিয়া, বাহ্য আস্ফালন বাহ্য যশ-খ্যাতি পরিহার করিয়া ইংরেজ-আকর্ষণের প্রবল মোহ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া, নির্বিষ্টমনে অবিচলিতচিত্তে চরিত্রবল সঞ্চয় করিবে, জ্ঞানবিজ্ঞান অর্জন করিবে, স্বাধীন বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবে, পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া লোকব্যবহার শিক্ষা করিবে, পরিবার ও সমাজের মধ্যে সত্যাচরণ সত্যানুষ্ঠান প্রচার করিবে, মানুষ যেমন আপন মস্তক সহজে বহন করে তেমনি অনায়াসে স্বভাবতই আপনার সম্মান ঊর্ধ্বে বহন করিয়া রাখিবে, লালায়িত লোলজিহ্বায় পরের কাছে মান যাচ্ঞা করিতে যাইবে না এবং ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ এই কথাটির সুগভীর তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করিবে। এ-কথা সুবিদিত যে, সুবিধার ঢাল যে-দিকে, মানুষ অলক্ষিতে ধীরে ধীরে সেই দিকে গড়াইয়া যায়; যদি হ্যাটকোট পরিয়া ইংরেজি ভাষা অবলম্বন করিয়া, ইংরেজের দ্বারস্থ হইয়া, ইংরেজিতে নিজেকে বড়ো বড়ো অক্ষরে তর্জমা করিয়া কোনো সুবিধা থাকে তবে অল্পে অল্পে লোকে হ্যাটকোট ধরিবে, সন্তান-দিগকে বহুচেষ্টায় বাংলা ভুলিতে দিবে এবং নিজের পিতা-ভ্রাতার অপেক্ষা সাহেবের দ্বারবানমহলে বেশি আত্মীয়তা স্থাপন করিবে। এ প্রবাহ রোধ করা দুঃসাধ্য।

দুঃসাধ্য, তবু মনের আক্ষেপ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া বলা আবশ্যক। যদি অরণ্যে রোদনও হয় তবু বলিতে হইবে যে, ইংরেজি ফলাইয়া কোনো ফল নাই, স্বভাষায় শিক্ষার

মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াই দেশের স্থায়ী উন্নতি; ইংরেজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোনো ফল নাই, আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব; অন্যের নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া আদায় করিয়া কিছু পাওয়া যায় না, প্রাণপণ নিষ্ঠার সহিত ত্যাগস্বীকারেই প্রকৃত কার্যসিদ্ধি।

শিখদিগের শেষগুরু গুরুগোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া নানা জাতির নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতিসাধনপূর্বক তাহার পর নির্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে, পরম ধৈর্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমস্ত দেশ অনিবার্যবেগে অন্ধভাবে যে-আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহুযত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিতজ্ঞানকে অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে—তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন আমাদের চিরপরিচিত ভাষায় আমাদিগকে আহ্বান করিবেন আদেশ করিবেন, তখন আর কিছু না হউক সহসা চৈতন্য হইবে এতদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্নের বশবর্তী হইয়া চোখ বুজিয়া সংকটের পথে চলিতেছিলাম, সেইটাই পতনের উপত্যকা।

আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদ্‌ভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই; তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরেজি কাগজের রিপোর্ট চাহিতেছেন না, তিনি সমস্ত মত্ততা হইতে মূঢ় জনস্রোতের আবর্ত হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন; কোনো একটি বিশেষ আইন সংশোধন করিয়া বা বিশেষ সভায় স্থান পাইয়া আমাদের কোনো যথার্থ দুর্গতি দূর হইবে আশা করিতেছেন না। তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন; আপনার জীবনকে মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া তুলিয়া চারিদিকের জনমণ্ডলীকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি চতুর্দিককে যেন উদার বিশ্বগ্রাহী হৃদয় দিয়া নীরবে শোষণ করিয়া লইতেছেন; এবং বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি স্নেহদৃষ্টিপাত করিয়া দেবতার নিকট একান্তমনে প্রার্থনা করিতেছেন যেন এখনকার দিনের মিথ্যা তর্ক ও বাঁধি কথায় তাঁহাকে কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে এবং দেশের লোকের বিশ্বাসহীন নিষ্ঠাহীনতায়, উদ্দেশ্যসাধন অসাধ্য বলিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া না দেয়। অসাধ্য বটে, কিন্তু এ-দেশের যিনি উন্নতি করিবেন অসাধ্যসাধনই তাঁহার ব্রত।

১৩০০

রাজনীতির দ্বিধা

সাধারণত ন্যায়পরতা দয়া প্রভৃতি অনেক বড়ো বড়ো গুণ আপন সমকক্ষ লোকদের মধ্যে যতটা স্ফূর্তি পায় অসমকক্ষ লোকদের মধ্যে ততটা স্ফূর্তি পায় না। এমন অনেক দেখা যায় যাঁহারা আপনার সমশ্রেণীর লোকের মধ্যে গৃহপালিত মৃগশিশুর মতো মৃদুস্বভাব তাঁহারাই নিম্নশ্রেণীয়দের নিকট ডাঙার বাঘ, জলের কুম্ভীর এবং আকাশের শ্যেনপক্ষিবিশেষ।

য়ুরোপীয় জাতি য়ুরোপে যত সভ্য, যত সদয়, যত ন্যায়পর, বাহিরে ততটা নহে এ-পর্যন্ত ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। যাহারা খ্রীস্টানদের নিকট খ্রীস্টান অর্থাৎ গালে চড় খাইলে সময়বিশেষে অন্য গালটিও ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয় তাহারাই স্থানান্তরে গায়ে পড়িয়া অখ্রীস্টানের এক গালে চড় মারিয়া তাহাকে অন্য গাল ফিরাইতে বলে এবং অখ্রীস্টান যদি দুর্বুদ্ধিবশত উক্ত অনুরোধ পালনে ইতস্তত করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কান ধরিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিয়া তাহার ঘরের মধ্যে নিজের চৌকি টেবিল ও ক্যাম্পখাট আনিয়া হাজির করে, তাহার শস্যক্ষেত্র হইতে শস্য কাটিয়া লয়, তাহার স্বর্ণখনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলন করে, তাহার গাভীগুলা হইতে দুগ্ধ দোহন করে এবং তাহার বাছুরগুলা কাটিয়া বাবুর্চিখানায় বোঝাই করিতে থাকে।

সভ্য খ্রীস্টান আমেরিকায় কিরূপ প্রলয়ব্যাপার এবং অস্ট্রেলিয়ায় কিরূপ নিদারুণ লোকসংহার উপস্থিত করিয়াছিল সেই অপেক্ষাকৃত পুরাতন কথা পাড়িবার আবশ্যক দেখি না। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ম্যাটাবিলি যুদ্ধের বৃত্তান্ত ভালো করিয়া পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেই, অখ্রীস্টানের গালে খ্রীস্টানি চড় কাহাকে বলে কতকটা বুঝিতে পারা যায়।

সমস্ত সংবাদ পুরাপুরি পাওয়া যায় না, এবং যাহা পাওয়া যায় তাহার যে সমস্তই সত্য তাহাতেও সন্দেহ আছে, কারণ, যুদ্ধসংবাদের টেলিগ্রাম রচনার ভার উক্ত খ্রীস্টানের হাতে। ট্রুথ নামক বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়েকটি পত্র ও প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা পাঠকদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পাঠ করিয়া যে কেহ বিশেষ আশ্বস্ত হইবেন বা আনন্দ লাভ করিবেন এরূপ আশা দিতে পারি না, তবে এইটুকু বুঝিতে পারিবেন সভ্য জাতি যাহাকে আপনার অপেক্ষা অল্প সভ্য জ্ঞান করে তাহার নিকট আপন সভ্যতাকে এবং সেই সঙ্গে সেই অসভ্যটাকে বলিদান দিতে কুণ্ঠিত বোধ করে না। উনিশ শত বৎসরের চিরসঞ্চিত সভ্যনীতি,

য়ুরোপীয় আলোকিত নাট্যমঞ্চের বাহিরে অন্ধকার নেপথ্যদেশে ক্ষণপরিহিত ছদ্মবেশের মতো খসিয়া পড়ে এবং সেখানে যে আদিম উলঙ্গ মানুষ বাহির হইয়া পড়ে উলঙ্গ ম্যাটাবিলি তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নহে।

কিছু সসংকোচে বলিলাম নিকৃষ্টতর নহে, নির্ভয়ে সত্য বলিতে গেলে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর। বর্বর লবেঙ্গুলা ইংরেজদের প্রতি ব্যবহারে যে উদারতা এবং উন্নত বীর-হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছে ইংরেজদের ক্রূর ব্যবহার তাহার নিকট লজ্জায় ম্লান হইয়া রহিয়াছে ইংরেজের পত্রেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

কোনো ইংরেজ যে সে-কথা স্বীকার করে ইহাই অনেকে ইংরেজের গৌরব বলিয়া মনে করিবেন এবং আমিও তাহা করি। কিন্তু আজকাল ইংরেজের মধ্যে অনেকে সেটাকে গৌরব বলিয়া জ্ঞান করে না।

তাহারা মনে করে ধর্মনীতি আজকাল বড়ো বেশি সূক্ষ্ম হইয়া আসিতেছে। পদে পদে এত খুঁতখুঁত করিলে কাজ চলে না। ইংরেজের যখন গৌরবের মধ্যাহ্নকাল ছিল তখন নীতির সূক্ষ্ম গণ্ডিগুলা এক লম্ফে সে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিত। যখন আবশ্যক তখন অন্যায় করিতে হইবে। নর্মান দস্যু যখন সমুদ্রে সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত তখন তাহারা সুস্থ সবল ছিল, এখন তাহার যে ইংরেজ বংশধর ভিন্নজাতির প্রতি জবরদস্তি করিতে কুণ্ঠিত হয় সে দুর্বল রুগ্নপ্রকৃতি। কিসের ম্যাটাবিলি, কেই বা লবেঙ্গুলা, আমি ইংরেজ, আমি তোমার সোনার খনি, তোমার গোরুর পাল লুঠিতে ইচ্ছা করি ইহার জন্য এত ছুতা এত ছল কেন, মিথ্যা সংবাদই বা কেন বানাই, আর দুটো-একটা দুরন্তপনা ধরা পড়িলেই বা এত উচ্চৈঃস্বরে কাগজে পরিতাপ করিতে বসি কেন।

কিন্তু বালককালে যাহা শোভা পায় বয়সকালে তাহা শোভা পায় না। একটা দুরন্ত লুব্ধ বালক নিজের অপেক্ষা ছোটো এবং দুর্বলতর বালকের হাতে মোওয়া দেখিলে কাড়িয়া ছিঁড়িয়া লুটপাট করিয়া লইয়া এক মুহূর্তে মুখের মধ্যে পুরিয়া বসে, হৃতমোদক অসহায় শিশুর ক্রন্দন দেখিয়াও কিছুমাত্র অনুতপ্ত হয় না। এমন কি, হয়তো ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া সবলে তাহার ক্রন্দন থামাইয়া দিতে চেষ্টা করে এবং অন্যান্য বালকেরাও মনে মনে তাহার বাহুবল ও দৃঢ় সংকল্পের প্রশংসা করিতে থাকে।

বয়সকালেও সেই বলবানের যদি অসংযত লোভ থাকে তবে সে আর চড় মারিয়া মোওয়া লয় না, ছল করিয়া লয় এবং যদি ধরা পড়ে তো কিছু অপ্রতিভ হয়। তখন সে আর পরিচিত প্রতিবেশীদের ঘরে হাত বাড়াইতে সাহস করে না; দূরে কোনো দরিদ্রপল্লীর অসভ্য মাতার উলঙ্গ শীর্ণ সন্তানের হস্তে যখন তাহার এক সন্ধ্যার

একমাত্র উপজীব্য খাদ্যখণ্ডটুকু দেখে চারিদিকে চাহিয়া গোপনে ছোঁ মারিয়া লয় এবং যখন তাহার ক্রন্দনে গগনতল বিদীর্ণ হইতে থাকে তখন সমাগত স্বজাতীয় পান্থদের প্রতি চোখ টিপিয়া বলে, এই অসভ্য কালো ছোকরাটাকে আচ্ছা শাসন করিয়া দিয়াছি। কিন্তু স্বীকার করে না যে, ক্ষুধা পাইয়াছিল তাই কাড়িয়া খাইয়াছি।

পুরাকালের দস্যুবৃত্তির সহিত এই অধুনাতন কালের চৌর্যবৃত্তির অনেক প্রভেদ আছে। এখনকার অপহরণব্যাপারের মধ্যে পূর্বকালের সেই নির্লজ্জ অসংকোচ বলদর্প থাকিতেই পারে না। এখন নিজের কাজের সম্বন্ধে নিজের চেতনা জন্মিয়াছে সুতরাং এখন প্রত্যেক কাজের জন্য বিচারের দায়িক হইতে হয়। তাহাতে কাজও পূর্বের মতো তেমন সহজে সম্পন্ন হয় না এবং গালিও খাইতে হয়। পুরাতন দস্যু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে তবে তাহার আবির্ভাব নিতান্ত অসাময়িক হইয়া পড়ে।

সমাজে এরূপ অসাময়িক আবির্ভাব সর্বদা ঘটিয়া থাকে। দস্যু বিস্তর জন্মে কিন্তু সহসা তাহাদিগকে চেনা যায় না—অকালে অস্থানে পড়িয়া তাহারা অনেক সময় আপনাদিগকেও চেনে না। এদিকে তাহারা গাড়ি চড়িয়া বেড়ায়, সংবাদপত্র পড়ে, হুইস্ট খেলে, স্ত্রীসমাজে মধুরালাপ করে, কেহ সন্দেহমাত্র করে না যে, এই সাদা কামিজ কালো কোর্তার মধ্যে রবিন হুডের নব অবতার ফিরিয়া বেড়াইতেছে।

য়ুরোপের বাহিরে গিয়া ইহারা সহসা পূর্ণশক্তিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ধর্মনীতির আবরণমুক্ত সেই উৎকট রুদ্রমূর্তির কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু য়ুরোপের সমাজমধ্যেই যে-সমস্ত ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গার আছে তাহাদেরও উত্তাপ বড়ো অল্প নহে।

ইহারাই আজকাল বলিতেছে, বলনীতির সহিত প্রেমনীতিকে যোগ করিলে নীতির নীতিত্ব বাড়িতে পারে কিন্তু বলের বলত্ব কমিয়া যায়। প্রেম দয়া এ-সব কথা শুনিতে বেশ—কিন্তু যেখানে আমরা রক্তপাত করিয়া আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি সেখানে যে নীতিদুর্বল নব শতাব্দীর সুকুমারহৃদয় শিশু সেন্টিমেন্টের অশ্রুপাত করিতে আসে তাহাকে আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। এখানে সংগীত সাহিত্য শিল্পকলা এবং শিষ্টাচার, সেখানে উলঙ্গ তরবারি এবং অসংকোচ একাধিপত্য।

এইজন্য আমাদের কর্তৃজাতীয়দের মধ্য হইতে আজকাল দুই সুরের গলা শুনা যায়। একদল প্রবলতার পক্ষপাতী, আর একদল প্রেম এবং শান্তি এবং সুবিচার জগতে বিস্তার করিতে চাহে।

জাতির হৃদয় এইরূপে বিভক্ত হইয়া গেলে বলের খর্বতা হয়—আপনি আপনাকে বাধা দিতে থাকে। আজকাল ভারতবর্ষীয় ইংরেজসম্প্রদায় ইহাই লইয়া সুতীব্র আক্ষেপ

করে। তাহারা বলে, আমরা কিছু জোরের সহিত যে-কাজটা করিতে চাই ইংলণ্ডীয় ভ্রাতারা তাহাতে বাধা দিয়া বসে। সকল কথাতেই নৈতিক কৈফিয়ত দিতে হয়। যখন দস্যু ড্রেক সমুদ্রদিগ্‌বিজয় করিয়া বেড়াইত, যখন ক্লাইব ভারতভূমিতে বৃটিশ ধ্বজা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল তখন নীতির কৈফিয়ত দিতে হইলে ঘরের বাহিরে ইংরেজের ছেলের এক ছটাক জমি মিলিত না।

কিন্তু এমন করিয়া যতই বিলাপ কর কিছুতেই আর সেই অখণ্ড দোর্দণ্ড বলের বয়সে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। এখন কোনো জুলুমের কাজ করিতে বসিলেই সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া একটা দ্বিধা উপস্থিত হইবে। এখন যদি কোনো নিপীড়িত ব্যক্তি ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে তবে স্বার্থহানির সম্ভাবনা থাকিলেও, নিদেন, গুটিকতক লোকও তাহার সদ্‌বিচার করিতে উদ্যত হইবে। এখন একজন ব্যক্তিও যদি ন্যায়ের দোহাই দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় তবে প্রবল স্বার্থপরতা হয় লজ্জায় কিঞ্চিৎ সংকুচিত হইয়া পড়ে, নয়, ন্যায়েরই ছদ্মবেশ ধারণ করিতে চেষ্টা করে। অন্যায় অনীতি যখন বলের সহিত আপনাকে অসংকোচে প্রকাশ করিত তখন বল ব্যতীত তাহার আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, কিন্তু যখনই সে আপনাকে আপনি গোপন করিতে চেষ্টা করে এবং বলের সহিত আপন কুটুম্বিতা অস্বীকার করিয়া ন্যায়কে আপন পক্ষে টানিয়া বলী হইতে চায় তখনই সে আপনি আপনার শত্রুতা সাধন করে। এইজন্য বিদেশে ইংরেজ আজকাল কিঞ্চিৎ দুর্বল এবং সেজন্য সে সর্বদা অধৈর্য প্রকাশ করে।

আমরাও সেইজন্য ইংরেজের দোষ পাইলে তাহাকে দোষী করিতে সাহসী হই। সেজন্য ইংরেজ প্রভুরা কিছু রাগ করে। তাহারা বলে, নবাব যখন যথেচ্ছাচারী ছিল, বর্গি যখন লুটপাট করিত, ঠগি যখন গলায় ফাঁসি লাগাইত তখন তোমাদের কনগ্রেসের সভাপতি এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিল কোথায়। কোথাও ছিল না এবং থাকিলেও কোনো ফল হইত না। তখন গোপন বিদ্রোহী ছিল, মারহাট্টা এবং রাজপুত ছিল, তখন বলের বিরুদ্ধে বল ছাড়া গতি ছিল না। তখন চোরার নিকট ধর্মের কাহিনী উত্থাপন করিবার কথা কাহারও মনেও উদয় হইত না।

আজ যে কনগ্রেস এবং সংবাদপত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহার কারণই এই যে, ইংরেজের মধ্যে অখণ্ড বলের প্রাদুর্ভাব নাই। এখন চোরকে ধর্মের কাহিনী বলিলে যদি বা সে না মানে তবু তার একটা ধর্মসংগত জবাব দিতে চেষ্টা করে এবং ভালো জবাবটি দিতে না পারিলে তেমন বলের সহিত কাজ করিতে পারে না। অতএব যে-সকল ইংরেজ ভারতবর্ষীয় সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের বাহুল্যবিস্তারে আক্ষেপ প্রকাশ করে, তাহারা যথার্থপক্ষে স্বদেশীয়দের জাতীয় প্রকৃতিতে ধর্মবুদ্ধির অস্তিত্ব লইয়া দুঃখ

করে। তাহারা যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা যে নিজের ত্রুটির জন্য নিজে লজ্জিত হইতে শিখিয়াছে ইহাই তাহাদের নিকট শোচনীয় বলিয়া বোধ হয়

এক হিসাবে ইহার মধ্যে কতকটা শোচনীয়তা আছে। এদিকে ক্ষুধার জ্বালাও নিবারণ হয় নাই ওদিকে পরের অন্নও কাড়িতে পারিব না এ এক বিষম সংকট। জাতির পক্ষে নিজের জীবনরক্ষা এবং ধর্মরক্ষা উভয়ই পরমাবশ্যক। পরের প্রতি অন্যায়াচরণ করিলে যে পরের ক্ষতি হয় তাহা নহে নিজেদের ধর্মের আদর্শ ক্রমশ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। দাসদের প্রতি যাহারা অত্যাচার করে তাহারা নিজের চরিত্র ধ্বংস করে। ধর্মকে সর্বপ্রযত্নে বলবান না রাখিলে আপনাদের মধ্যে জাতীয় বন্ধন ক্রমশ শিথিল হইয়া পড়িতে থাকে। অপর পক্ষে, পেট ভরিয়া খাইতেও হইবে। ক্রমে বংশবৃদ্ধি ও স্থানাভাব হইতেছে এবং সভ্যতার উন্নতিসহকারে জীবনের আবশ্যক উপকরণ অতিরিক্ত বাড়িয়া চলিয়াছে।

অতএব পঁচিশ কোটি ভারতবাসীর অদৃষ্টে যাহাই থাক মোটাবেতনের ইংরেজ কর্মচারীকে এক্সচেঞ্জের ক্ষতিপূরণস্বরূপ রাশি রাশি টাকা ধরিয়া দিতে হইবে। সেইজন্য রাজকোষে যদি টাকার অনটন পড়ে তবে পণ্যদ্রব্যে মাস্থল বসানো আবশ্যক হইবে। কিন্তু তাহাতে যদি ল্যাঙ্কাশিয়রের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয় তবে তুলার উপর মাশুল বসানো যাইতে পারে। তৎপরিবর্তে বরঞ্চ পবলিক ওআর্কস কিছু খাটো করিয়া এবং দুর্ভিক্ষ-ফণ্ড বাজেয়াপ্ত করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে হইবে।

একদিকে ইংরেজ কর্মচারীদিগেরও কষ্ট চক্ষে দেখা যায় না, অপরদিকে ল্যাঙ্কাশিয়রের ক্ষতিও প্রাণে সহ্য হয় না। এদিকে আবার পঞ্চবিংশতিকোটি হতভাগ্যের জন্য যে কিছুমাত্র দুঃখ হয় না তাহাও নহে। ধর্মনীতি এমন সংকটেও ফেলে!

অমনি খবরের কাগজে ঢাক বাজিয়া যায়, আহুতনীড় পক্ষিসমাজের ন্যায় সভাস্থলে কর্ণবধির কলকলধ্বনি উত্থিত হয়, ইংরেজ ভারি চটিয়া উঠে।

যখন কাজটা ন্যায়সংগত হইতেছে না বলিয়া মন বলিতেছে অথচ না করিয়াও এড়াইবার জো নাই সেই সময়ে ধর্মের দোহাই পাড়িতে থাকিলে বিষম রাগ হয়। তখন রিক্তহস্তে কোনো যুক্তি-অস্ত্র না থাকাতে একেবারে ঘুষি মারিতে ইচ্ছা করে। কেবল মানুষটা নহে ধর্মশাস্ত্রটার উপরেও দিক ধরিয়া যায়।

ভারত-মন্ত্রিসভার সভাপতি এবং অনেক মাতব্বর সভা ভাবগতিকে বলিয়াছেন যে, কেবল ভারতবর্ষের নহে সমস্ত ইংরেজ-রাজ্যের মুখ চাহিয়া যখন আইন করিতে হইবে তখন কেবল স্থানীয় ন্যায়-অন্যায় বিচার করিলে চলিবে না এবং করিলে তাহা টিঁকিবেও না। ল্যাঙ্কাশিয়র স্বপ্ন নহে। ভারতবর্ষের দুঃখ যেমন সত্য ল্যাঙ্কাশিয়রের লাভও তেমনি

সত্য, বরঞ্চ শেষোক্তটার বল কিছু বেশি। আমি যেন ভারত-মন্ত্রিসভায় ল্যান্সাশিয়রকে ছাড়িয়া দিয়াই একটা আইন পাস করিয়া দিলাম, কিন্তু ল্যান্সাশিয়র আমাকে ছাড়িবে কেন? কমলি নেহি ছোড়্‌তা—বিশেষত কমলির গায়ে খুব জোর আছে।

চতুর্দিকের অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া তাড়াতাড়ি একটা আইন পাস করিয়া শেষকালে আবার দায়ে পড়িয়া তাহা হইতে পশ্চাদ্‌বর্তী হইলেও মান থাকে না, এদিকে আবার কৈফিয়তও তেমন সুবিধামতো নাই। নবাবের মতো বলিতে পারি না যে, আমার যে-অভাব হইবে আমার যেমন ইচ্ছা তাহা পূরণ করিব, ওদিকে ন্যায়বুদ্ধিতে যাহা বলে তাহা সম্পন্ন করিবার অলঙ্ঘ্য বিঘ্ন—অথচ এই সংকটের অবস্থাটাও সাধারণের কাছে প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হয়, ইহা বাস্তবিকই শোচনীয় বটে।

এইরূপ সময়টায় আমরা দেশী সভা এবং দেশী কাগজপত্রে যখন গোলমাল করিতে আরম্ভ করিয়া দিই তখন সাহেবেরা মাঝে মাঝে আমাদিগকে শাসায় এবং গবর্মেণ্ট যদি বা আমাদের গায়ে হাত তুলিতে সংকোচ বোধ করে, ছোটো ছোটো কর্তারা কোনো সুযোগে একবার আমাদিগকে হাতে পাইলে ছাড়িতে চায় না এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজের বড়ো বড়ো খবরের কাগজগুলো শৃঙ্খলবদ্ধ কুক্কুরের মতো দাঁত বাহির করিয়া আমাদের প্রতি অবিশ্রাম তারস্বর প্রয়োগ করিতে থাকে। ভালো, যেন আমরাই চুপ করিলাম কিন্তু তোমাদের আপনাদিগকে থামাও দেখি। তোমাদের মধ্যে যাঁহারা স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া ধর্মের পতাকা ধরিয়া দণ্ডায়মান হন, তাঁহাদিগকে নির্বাসিত করো, তোমাদের জাতীয় প্রকৃতিতে যে ন্যায়পরতার আদর্শ আছে তাহাকে পরিহাস করিয়া ম্লান করিয়া দাও।

কিন্তু সে কিছুতেই হইবে না। তোমাদের রাজনীতির মধ্যে ধর্মবুদ্ধি একটা সত্য পদার্থ। কখনো বা তাহার জয় হয় কখনো বা তাহার পরাজয় হয় কিন্তু তাহাকে বাদ দিয়া চলিতে পারে না। আয়র্লণ্ড যখন ব্রিটেনিয়ার নিকট কোনো অধিকার প্রার্থনা করে তখন সে যেমন একদিকে খুনের ছুরিতে শান দিতে থাকে তেমনি অন্যদিকে ইংলণ্ডের ধর্মবুদ্ধিকে আপন দলে লইতে চেষ্টা করে। ভারতবর্ষ যখন বিদেশী স্বামীর দ্বারে আপন দুঃখ নিবেদন করিতে সাহসী হয় তখন সেও ইংরেজের ধর্মবুদ্ধিকে আপন সহায় করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। মাঝে হইতে ইংরেজের রাজকার্যে ল্যাঠা বিস্তর বাড়িয়া যায়।

কিন্তু যতদিন ইংরেজপ্রকৃতির কোথাও এই সচেতন ধর্মবুদ্ধির প্রভাব থাকিবে, যতদিন তাহার নিজের মধ্যেই তাহার নিজের সুকৃতি-দুষ্কৃতির একটি বিচারক বর্তমান থাকিবে ততদিন আমাদের সভাসমিতি বাড়িয়া চলিবে, আমাদের সংবাদপত্র ব্যাপ্ত

হইতে থাকিবে। ইহাতে আমাদের বলবান ইংরেজগণ বিফল গাত্রদাহে যতই অধীর হইয়া উঠিবে আমাদের উৎসাহ এবং উদ্যমের আবশ্যকতা ততই আরও বাড়াইয়া তুলিবে মাত্র।

১৩০০

অপমানের প্রতিকার

একদা কোনো উচ্চপদস্থ বাঙালি গবর্মেণ্ট-কর্মচারীর বাড়িতে কোনো কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তখন জুরি-দমন বিল লইয়া দেশে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

আহারান্তে নিমন্ত্রিত মহিলাগণ পার্শ্ববর্তী গৃহে উঠিয়া গেলে প্রসঙ্গক্রমে জুরিপ্রথার কথা উঠিল। ইংরেজ প্রোফেসর কহিলেন, যে-দেশের লোক অধসভ্য, অর্ধশিক্ষিত, যাহাদের ধর্মনীতির আদর্শ উন্নত নহে, জুরির অধিকার তাহাদের হস্তে কুফল প্রসব করে।

শুনিয়া এই কথা মনে করিলাম, ইংরেজ এত অধিক সভ্য হইয়াছে যে, আমাদের সহিত সভ্যতা রক্ষা সে বাহুল্য জ্ঞান করে। আমাদের নৈতিক আদর্শ কত মাত্রা উঠিয়াছে অথবা নামিয়াছে জানি না, কিন্তু ইহা জানি, যাহার আতিথ্য ভোগ করিতেছি তাঁহার স্বজাতিকে পরুষবাক্যে অবমাননা করা আমাদের শিষ্টনীতির আদর্শের অনেক বাহিরে।

অধ্যাপক মহাশয় আর-একটি কথা বলিয়াছিলেন, যে-কথা কেবলমাত্র অমিষ্ট ও অশিষ্ট নহে পরন্তু ইংরেজের মুখে অত্যন্ত অসংগত শুনিতে হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, জীবনের পবিত্রতা, অর্থাৎ জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করার পরমদূষণীয়তা সম্বন্ধে ভারতবাসীর ধারণা ইংরেজের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্পপরিমিত। সেইজন্য হত্যাকারীর প্রতি ভারতবর্ষীয় জুরির মনে যথোচিত বিদ্বেষের উদ্রেক হয় না।

যাহারা মাংসাশী জাতি এবং যাহারা বিরাট হত্যাকাণ্ডের দ্বারা পৃথিবীর দুই নবাবিষ্কৃত মহাদেশের মধ্যে আপনাদের বাসযোগ্য স্থান পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে, এবং সম্প্রতি তরবারির দ্বারা তৃতীয় মহাদেশের প্রচ্ছন্ন বক্ষোদেশ অল্পে অল্পে বিদীর্ণ করিয়া তাহার শস্য-অংশটুকু সুখে ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছে তাহারা যদি নিমন্ত্রণ-সভায় আরামে ও স্পর্ধাভরে নৈতিক আদর্শের উচ্চ দণ্ডে চড়িয়া বসিয়া জীবনের

পবিত্রতা ও প্রাণহিংসার অকর্তব্যতা সম্বন্ধে অহিংসক ভারতবর্ষকে উপদেশ দিতে থাকে তবে অহিংসা পরমোধর্মঃ এই শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়াই সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হয়।

এই ঘটনা আজ বছর দুয়েকের কথা হইবে। সকলেই জানেন তাহার পরে এই দুই বৎসরের মধ্যে ইংরেজ কর্তৃক অনেকগুলি ভারতবাসীর অপমৃত্যু ঘটিয়াছে এবং ইংরেজের আদালতে সেই সকল হত্যাকাণ্ডে এক জন ইংরেজেরও দোষ সপ্রমাণ হয় নাই। সংবাদপত্রে উপর্যুপরি এই সকল সংবাদ পাঠ করা যায় এবং ভারতবর্ষীয়ের প্রতি সেই মুণ্ডিতগুম্ফশ্মশ্রু খড়্গনাসা ইংরেজ অধ্যাপকের তীব্র ঘৃণাবাক্য এবং জীবন-হনন সম্বন্ধে তাঁহাদের নৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান মনে পড়ে। মনে পড়িয়া তিলমাত্র সান্ত্বনা লাভ হয় না।

ভারতবর্ষীয়ের প্রাণ এবং ইংরেজের প্রাণ ফাঁসিকাষ্ঠের অটল তুলাদণ্ডে এক ওজনে তুলিত হইয়া থাকে ইহা বোধ হয় ইংরেজ মনে মনে রাজনৈতিক কুদৃষ্টান্তস্বরূপে গণ্য করে।

ইংরেজ এমন কথা মনে করিতে পারে, আমরা গুটিকতক প্রবাসী পঁচিশ কোটি বিদেশীকে শাসন করিতেছি। কিসের জোরে? কেবলমাত্র অস্ত্রের জোরে নহে, নামের জোরেও বটে। সেইজন্য সর্বদাই বিদেশীর মনে ধারণা জন্মাইয়া রাখা আবশ্যক আমরা তোমাদের অপেক্ষা পঁচিশ কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা সমান ক্ষেত্রে আছি এরূপ ধারণার লেশমাত্র জন্মিতে দিলে আমাদের বলক্ষয় হয়। পরস্পরের মধ্যে একটা সুদূর ব্যবধান, অধীন জাতির মনে একটা অনির্দিষ্ট সম্ভ্রম এবং অকারণ ভয় শতসহস্র সৈন্যের কাজ করে। ভারতবর্ষীয় যে, কোনোদিন বিচারে নিজের প্রাণের পরিবর্তে ইংরেজকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখে নাই, ইহাতে তাহার মনে সেই সম্ভ্রম দৃঢ় হয়—মনে ধারণা হয় আমার প্রাণে ইংরেজের প্রাণে অনেক তফাত, অসহ্য অপমান অথবা নিতান্ত আত্মরক্ষার স্থলেও ইংরেজের গায়ে হাত তুলিতে তাহার দ্বিধা হয়।

এই পলিসির কথা স্পষ্টত অথবা অস্পষ্টত ইংরেজের মনে আছে কিনা জোর করিয়া বলা কঠিন—কিন্তু এ-কথা অনেকটা নিশ্চয় অনুমান করা যাইতে পারে যে, স্বজাতীয় প্রাণের পবিত্রতা তাঁহারা মনে মনে অত্যন্ত অধিক করিয়া উপলব্ধি করেন। একজন ইংরেজ ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিলে নিঃসন্দেহ তাঁহারা দুঃখিত হন—সেটাকে একটা "গ্রেট মিস্টেক", এমন কি, একটা "গ্রেট শেম" মনে করাও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব—কিন্তু তাই বলিয়া তাহার শাস্তিস্বরূপে য়ুরোপীয়ের প্রাণ হরণ করা তাঁহারা সমুচিত মনে করিতে পারেন না। তদপেক্ষা লঘু শাস্তি যদি আইনে নির্দিষ্ট থাকিত তবে ভারতবর্ষীয়

হত্যাপরাধে ইংরেজের শাস্তি পাইবার সম্ভাবনা অনেক অধিক হইত। যে-জাতিকে নিজেদের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচনা করা যায়, সে-জাতি সম্বন্ধে আইনের ধারায় অপক্ষপাতের বিধান থাকিলেও বিচারকের অন্তঃকরণে অপক্ষপাত রক্ষিত হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। সে-স্থলে প্রমাণের সামান্য ত্রুটি, সাক্ষ্যের সামান্য স্খলন এবং আইনের ভাষাগত তিলমাত্র ছিদ্রও স্বভাবতই এত বৃহৎ হইয়া উঠে যে, ইংরেজ অপরাধী অনায়াসে তাহার মধ্যে দিয়া গলিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশের লোকের পর্যবেক্ষণশক্তি এবং ঘটনাস্মৃতি তেমন পরিষ্কার এবং প্রবল নহে; আমাদের স্বভাবের মধ্যে মানসিক শৈথিল্য এবং কল্পনার উচ্ছৃঙ্খলতা আছে এ-দোষ স্বীকার করিতেই হয়। একটা ঘটনার মধ্যে উপস্থিত থাকিয়াও তাহার সমস্ত আনুপূর্বিক পরম্পরা আমাদের মনে মুদ্রিত হইয়া যায় না—এইজন্য আমাদের বর্ণনার মধ্যে অসংগতি ও দ্বিধা থাকে—এবং ভয় অথবা তর্কের মুখে পরিচিত সত্য ঘটনারও সূত্র হারাইয়া ফেলি। এইজন্য আমাদের দেশীয় সাক্ষ্যের সত্যমিথ্যা সূক্ষ্মরূপে নির্ধারণ করা বিদেশীয় বিচারকের পক্ষে সর্বদাই কঠিন। তাহার উপরে অভিযুক্ত যখন স্বদেশী তখন কঠিনতা শতসহস্রগুণে বাড়িয়া উঠে। আরও বিশেষত যখন স্বভাবতই ইংরেজের নিকটে স্বল্পাবৃত স্বল্পাহারী স্বল্পমান স্বল্পবল ভারতবাসীর "প্রাণের পবিত্রতা" স্বদেশীয়ের তুলনায় ক্ষুদ্রতমভগ্নাংশপরিমিত, তখন ভারতবর্ষের পক্ষে যথোপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব একে আমাদের সাক্ষ্য দুর্বল, তাহাতে প্লীহা প্রভৃতি আমাদের শারীরযন্ত্রগুলিরও বিস্তর ত্রুটি আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, সুতরাং আমরা সহজে মারাও পড়ি এবং তাহার বিচার পাওয়াও আমাদের দ্বারা দুঃসাধ্য হয়।

লজ্জা এবং দুঃখ সহকারে এ-সমস্ত দুর্বলতা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় কিন্তু সেই সঙ্গে এ সত্যটুকুও প্রকাশ করিয়া বলা উচিত যে, উপর্যুপরি এই সকল ঘটনায় দেশের লোকের চিত্ত নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ লোকে আইনের এবং প্রমাণের সূক্ষ্মবিচার করিতে পারে না। ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া কোনো ইংরেজেরই প্রাণদণ্ড হয় না এই তথ্যটি বারংবার এবং অল্পকালের মধ্যে ঘন ঘন লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মনে ইংরেজের অপক্ষপাত ন্যায়পরতা সম্বন্ধে সুতীব্র সন্দেহের উদয় হয়।

সাধারণ লোকের মূঢ়তার কেন দোষ দিই, গবর্মেণ্ট অনুরূপ স্থলে কী করেন? যদি তাঁহারা দেখেন কোনো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অধিকাংশসংখ্যক আসামিকে খালাস দিতেছেন, তখন তাঁহারা এমন বিবেচনা করেন না যে, সম্ভবত উক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট

অন্য ম্যাজিস্ট্রেট অপেক্ষা অধিকতর ন্যায়পর, এবং তিনি সাক্ষ্যের সত্যমিথ্যা সম্পূর্ণ নিঃসংশয় সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় না করিয়া আসামিকে দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত, অতএব এই সচেতন ধর্মবুদ্ধি এবং সতর্ক ন্যায়পরতার জন্য সত্বর তাঁহার পদবৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্তব্য ; অথবা যদি দেখিতে পান যে, কোনো পুলিস-কর্মচারীর এলাকায় অপরাধের সংখ্যার তুলনায় অল্পসংখ্যক অপরাধী ধরা পড়িতেছে অথবা চালান আসামি বহুলসংখ্যায় খালাস পাইতেছে তখন তাঁহারা এমন তর্ক করেন না যে, সম্ভবত এই পুলিস-কর্মচারী অন্য পুলিস-কর্মচারী অপেক্ষা সংপ্রকৃতির—ইনি সাধু লোককে চোর বলিয়া চালান দেন না এবং মিথ্যাসাক্ষ্য স্বহস্তে সৃজন করিয়া অভিযোগের ছিদ্রসকল সংশোধন করিয়া লন না, অতএব পুরস্কার স্বরূপে অচিরাৎ ইঁহার গ্রেড বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্তব্য। আমরা যে দুই আনুমানিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম উভয়তই সম্ভবপরতা ন্যায় ও ধর্মের দিকেই অধিক। কিন্তু কাহারও অবিদিত নাই গবর্মেন্টের হস্তে উক্তবিধ হতভাগ্য সাধুদিগের সম্মান এবং উন্নতি লাভ হয় না।

জনসাধারণও গবর্মেন্টের অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্মবুদ্ধি নহে, সেও খুব মোটামুটি রকমের বিচার করে। সে বলে আমি অত আইনকানুন সাক্ষীসাবুদ বুঝি না, কিন্তু ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া একটা ইংরেজও উপযুক্ত দণ্ডার্হ হয় না এ কেমন কথা।

বারংবার আঘাতে প্রজাসাধারণের হৃদয়ে যদি একটা সাংঘাতিক ক্ষত উৎপন্ন হইতে থাকে তবে তাহা গোপনে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা রাজভক্তি নহে। তাই 'ব্যাবু'-অভিহিত অস্মৎপক্ষীয়েরা এ-সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলাই কর্তব্য জ্ঞান করে। আমরা ভারতরাজ্য-পরিচালক বাষ্পযন্ত্রের "বয়লার"স্থিত তাপমান মাত্র, আমাদের নিজের কোনো শক্তি নাই, ছোটো বড়ো বিচিত্র লৌহচক্রচালনার কোনো ক্ষমতাই রাখি না, কেবল বৈজ্ঞানিক নিগূঢ় নিয়মানুসারে সময়ে সময়ে আমাদের চঞ্চল পারদবিন্দু হঠাৎ উপরের দিকে চড়িয়া যায়, কিন্তু এঞ্জিনিয়ার সাহেবের তাহাতে রাগ করা কর্তব্য নহে। তিনি একটি ঘুষি মারিলেই এই ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর পদার্থটি ভাঙিয়া তাহার সমস্ত পারদটুকু নাস্তিনভূত হইয়া যাইতে পারে—কিন্তু বয়লার-গত উত্তাপের পরিমাণ নির্ণয় করা যন্ত্র-চালনকার্যের একটা প্রধান অঙ্গ। ইংরেজ অনেক সময় বিপরীত উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়া বলে—প্রজাসাধারণের নাম করিয়া আত্মপরিচয় দিতেছ, তোমরা কে। তোমরা তো আমাদেরই স্কুলের গুটিকয়েক বাক্যবিশারদ ইংরেজিনবিশ।

প্রভু, আমরা কেহই নহি। কিন্তু তোমাদের বিদ্রূপ বিরক্তি এবং ক্রোধদহনের দ্বারা অনুমান করিতেছি তোমরা আমাদিগকে নিতান্তই সামান্য বলিয়া জ্ঞান কর না। এবং সামান্য জ্ঞান করা কর্তব্যও নহে। সংখ্যায় সামান্য হইলেও এই বিচ্ছিন্নসমাজ

ভারতবর্ষে কেবল শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যেই শিক্ষা এবং হৃদয়ের ঐক্য আছে—এবং এই শিক্ষিতসম্প্রদায়ই ভারতবর্ষীয় হৃদয়বেদনা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ এবং নানা উপায়ে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে। এই শিক্ষিতসাধারণের অন্তরে কখন কীরূপ আঘাত-অভিঘাত লাগিতেছে তাহা মনোযোগসহকারে আলোচনা করা গবর্মেণ্টের রাজনীতির একটা প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। লক্ষণে যতদূর প্রকাশ পায় গবর্মেণ্টেরও তাহাতে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য নাই।

আমরা আলোচিত ব্যাপারে দুই কারণে আঘাত পাই। প্রথমত, একটা অত্যাচারের কথা শুনিলেই তাহার উপযুক্ত দণ্ডবিধানের প্রত্যাশা করিয়া হৃদয় ব্যগ্র হইয়া থাকে। যেজন্যই হউক দোষী অব্যাহতি পাইলে অন্তর ক্ষুব্ধ হয়। দ্বিতীয়ত, এই সকল ঘটনায় আমরা আমাদের জাতীয় অসম্মান তীব্ররূপে অনুভব করিয়া একান্ত মর্মাহত হই।

দোষী অব্যাহতি পাওয়া দোষের বটে কিন্তু আদালতের বিচারের নিকট অদৃষ্টবাদী ভারতবর্ষ অসম্ভব কিছু প্রত্যাশা করে না। আইন এতই জটিল, সাক্ষ্য এতই পিচ্ছল, এবং দেশীয় চরিত্রজ্ঞান মমত্বহীন অবজ্ঞাকারী বিদেশীয়ের পক্ষে এতই দুর্লভ যে, অনিশ্চিতফল মকদ্দমা অনেকটা জুয়াখেলার মতো বোধ হয়। এইজন্যই জুয়াখেলার যেমন একটা মোহকারী উত্তেজনা আছে আমাদের দেশের অনেক লোকের কাছে মকদ্দমার সেইরূপ একটা মাদকতা দেখা যায়। অতএব মকদ্দমার ফলের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে যখন সাধারণের একটা ধারণা আছে এবং যখন সে অনিশ্চয়তা জন্য আমাদের স্বভাবদোষও অনেকটা দায়ী তখন মধ্যে মধ্যে নির্দোষীর পীড়ন ও দোষীর নিষ্কৃতি শোচনীয় অথচ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া দেখিতে হয়।

কিন্তু বারংবার য়ুরোপীয় অপরাধীর অব্যাহতি এবং তৎসম্বন্ধে কর্তৃপক্ষীয়ের ঔদাসীন্যে ভারতবর্ষীয়ের প্রতি ইংরেজের আন্তরিক অবজ্ঞার পরিচয় দেয়। সেই অপমানের ধিক্কার শেলের ন্যায় স্থায়ীভাবে হৃদয়ে বিঁধিয়া থাকে।

যদি ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটিত, যদি স্বল্পকালের মধ্যে অনেকগুলি য়ুরোপীয় দেশীয় কর্তৃক হত হইত এবং প্রত্যেক অভিযুক্তই বিচারে মুক্তি পাইত, তবে এরূপ দুর্ঘটনার সমস্ত সম্ভাবনা লোপ করিবার সহস্রবিধ উপায় উদ্‌ভাবিত হইত। কিন্তু প্রাচ্য ভারতবাসী যখন নিরর্থক গুলি খাইয়া লাথি খাইয়া মরে তখন পাশ্চাত্য কর্তৃপুরুষদের কোনোপ্রকার দুর্ভাবনার লক্ষণ দেখা যায় না। কী করিলে এ-সমস্ত উপদ্রব নিবারণ হইতে পারে সে-সম্বন্ধে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপন হইতেও শুনা যায় না।

কিন্তু আমাদিগের প্রতি কর্তৃজাতীয়ের এই যে অবজ্ঞা, সেজন্য প্রধানত আমরাই

ধিক্কারের যোগ্য। কারণ, এ-কথা কিছুতেই আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আইনের সাহায্যে সম্মান পাওয়া যায় না—সম্মান নিজের হস্তে। আমরা সানুনাসিক স্বরে যেভাবে ক্রমাগত নালিশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহাতে আমাদের আত্মমর্যাদার নিরতিশয় লাঘব হইতেছে।

উদাহরণস্থলে আমরা খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মুহুরি মারার ঘটনা উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বেল সাহেব অত্যন্ত দয়ালু উন্নতচেতা সহৃদয় ব্যক্তি এবং ভারতবর্ষীয়ের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য অথবা অবজ্ঞা নাই। আমাদের বিশ্বাস, তিনি যে মুহুরিকে মারিয়াছিলেন তাহাতে কেবল দুর্ধর্ষ ইংরেজপ্রকৃতির হঠকারিতা প্রকাশ পাইয়াছে, বাঙালিঘৃণা প্রকাশ পায় নাই। জঠরানল যখন প্রজ্বলিত তখন ক্রোধানল সামান্য কারণেই উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে, তা বাঙালিরও হয় ইংরেজেরও হয়; অতএব এ ঘটনার প্রসঙ্গে বিজাতিবিদ্বেষের কথা উত্থাপন করা উচিত হয় না।

কিন্তু ফরিয়াদির পক্ষের বাঙালি ব্যারিস্টার মহাশয় এই মকদ্দমার প্রসঙ্গে বারংবার বলিয়াছেন মুহুরি-মারা কাজটা ইংরেজের অযোগ্য হইয়াছে, কারণ, বেল সাহেবের জানা ছিল অথবা জানা উচিত ছিল যে, মুহুরি তাঁহাকে ফিরিয়া মারিতে পারে না।

এ-কথা যদি সত্য হয় তবে যথার্থ লজ্জার বিষয় মুহুরির এবং মুহুরির স্বজাতিবর্গের। কারণ, হঠাৎ রাগিয়া প্রহার করিয়া বসা পুরুষের দুর্বলতা, কিন্তু মার খাইয়া বিনা প্রতিকারে ক্রন্দন করা কাপুরুষের দুর্বলতা। এ-কথা বলিতে পারি মুহুরি যদি ফিরিয়া মারিত তবে বেল সাহেব যথার্থ ইংরেজের ন্যায় তাঁহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিতেন।

যথেষ্ট অপমানিত হইলেও একজন মুহুরি কোনো ইংরেজকে ফিরিয়া মারিতে পারে না এই কথাটি ধ্রুব সত্যরূপে অম্লানমুখে স্বীকার করা এবং ইহারই উপরে ইংরেজকে বেশি করিয়া দোষাই করা আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত অনাবশ্যক এবং লজ্জাজনক আচরণ।

মার খাওয়ার দরুন আইনমতে মুহুরির যে-কোনো প্রতিকার প্রাপ্য, তাহা হইতে সে তিলমাত্র বঞ্চিত না হয় তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত হইতে পারে কিন্তু তাহার আঘাত এবং অপমান-বেদনার উপর সমস্ত দেশের লোক মিলিয়া অজস্র-পরিমাণে আহা উহু করার, এবং কেবলমাত্র বিদেশীকে গালিমন্দ দিবার কোনো কারণ দেখি না। বেল সাহেবের ব্যবহার প্রশংসনীয় নহে, কিন্তু মুহুরি ও তাহার নিকটবর্তী সমস্ত লোকের আচরণ হেয়, এবং খুলনার বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের আচরণে হীনতা ও অন্যায় মিশ্রিত হইয়া সর্বাপেক্ষা বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।

অল্পকাল হইল ইহার অনুরূপ ঘটনা পাবনায় ঘটিয়াছিল। সেখানে মুনিসিপালিটির খেয়াঘাটের কোনো ব্রাহ্মণ কর্মচারী পুলিস সাহেবের পাখা-টানা বেহারার নিকট উচিত মাসুল আদায় করাতে পুলিস সাহেব তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া লাঞ্ছনার একশেষ করিয়াছিলেন; বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট সেই অপরাধী ইংরেজের কোনোরূপ দণ্ডবিধান না করিয়া কেবলমাত্র সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অথচ যখন পাখা-টানা বেহারা উক্ত ব্রাহ্মণের নামে উপদ্রবের নালিশ আনে তখন তিনি ব্রাহ্মণকে জরিমানা না করিয়া ছাড়েন নাই।

যে কারণবশত বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট প্রবল ইংরেজ অপরাধীকে সতর্ক এবং অক্ষম বাঙালি অভিযুক্তকে জরিমানা করিয়া থাকেন, সেই কারণটি আমাদের জাতির মর্মে মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। আমাদের স্বজাতিকে যে সম্মান আমরা নিজে দিতে জানি না, আমরা আশা করি এবং আবদার করি সেই সম্মান ইংরেজ আমাদিগকে যাচিয়া সাধিয়া দিবে।

এক বাঙালি যখন নীরবে মার খায় এবং অন্য বাঙালি যখন তাহা কৌতূহলভরে দেখে, এবং স্বহস্তে অপমানের প্রতিকার সাধন বাঙালির নিকট প্রত্যাশাই করা যায় না এ-কথা যখন বাঙালি বিনা লজ্জায় ইঙ্গিতেও স্বীকার করে তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, ইংরেজের দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল প্রধান কারণ আমাদের নিজের স্বভাবের মধ্যে—গবর্মেণ্ট কোনো আইনের দ্বারা বিচারের দ্বারা তাহা দূর করিতে পারিবেন না।

আমরা অনেক সময় ইংরেজ কর্তৃক অপমানবৃত্তান্ত শুনিলে আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকি, কোনো ইংরেজের প্রতি ইংরেজ এমন ব্যবহার করিত না। করিত না বটে, কিন্তু ইংরেজের উপর রাগ করিতে বসার অপেক্ষা নিজের প্রতি রাগ করিতে বসিলে অধিক ফল পাওয়া যায়। যে যে কারণবশত একজন ইংরেজ সহজে আর-একজন ইংরেজের গায়ে হাত তুলিতে সাহস করে না সেই কারণগুলি থাকিলে আমরাও অনুরূপ আচরণ প্রাপ্ত হইতে পারিতাম, সানুনাসিক স্বরে এত অধিক কান্নাকাটি করিতে হইত না।

বাঙালির প্রতি বাঙালি কিরূপ ব্যবহার করে সেইটে গোড়ায় দেখা উচিত। কারণ তাহারই উপর আমাদের সমস্ত শিক্ষা নির্ভর করে। আমরা কি আমাদের ভৃত্যদিগকে প্রহার করি না, আমাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রতি ঔদ্ধত্য এবং নিম্নশ্রেণীস্থদিগের প্রতি সর্বদা অসম্মান প্রকাশ করি না? আমাদের সমাজ স্তরে স্তরে উচ্চে নীচে বিভক্ত, যে-ব্যক্তি কিছুমাত্র উচ্চে আছে সে নিম্নতর ব্যক্তির নিকট হইতে অপরিমিত অধীনতা

প্রত্যাশা করে। নিম্নবর্তী কেহ তিলমাত্র স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিলে উপরের লোকের গায়ে তাহা অসহ্য বোধ হয়। ভদ্রলোকের নিকট "চাষা বেটা" প্রায় মনুষ্যের মধ্যেই নহে ;—ক্ষমতাপন্নের নিকট অক্ষম লোক যদি সম্পূর্ণ অবনত হইয়া না থাকে তবে তাহাকে ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। যেমন দেখা যায় চৌকিদারের উপর কনস্টেবল, কনস্টেবলের উপর দারোগা, কেবল যে গবর্মেণ্টের কাজ আদায় করে তাহা নহে, কেবল যে উচ্চতর পদের উচিত সম্মানটুকু গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হয় তাহা নহে, তদতিরিক্ত দাসত্ব দাবি করিয়া থাকে—চৌকিদারের নিকট কনস্টেবল যথেচ্ছাচারী রাজা, এবং কনস্টেবলের নিকট দারোগাও তদ্রূপ, তেমনি আমাদের সমাজে সর্বত্র অধস্তনের নিকট উচ্চতনের দাবির একেবারে সীমা নাই। স্তরে স্তরে প্রভুত্বের ভার পড়িয়া দাসত্ব এবং ভয় আমাদের মজ্জার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে। আমাদের আজন্ম-কালের প্রতিনিয়ত অভ্যাস ও দৃষ্টান্তে আমাদিগকে অন্ধ বাধ্যতার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখে, তাহাতে আমরা অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচারী, সমকক্ষ লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং উপরিস্থ লোকের নিকট ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা করি। সেই আমাদের প্রতিমুহূর্তের শিক্ষার মধ্যে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং জাতীয় অসম্মানের মূল নিহিত রহিয়াছে। গুরুকে ভক্তি করিয়া ও প্রভুকে সেবা করিয়া ও মান্য লোককে যথোচিত সম্মান দিয়াও মনুষ্যমাত্রের যে একটি মনুষ্যোচিত আত্মমর্যাদা থাকা আবশ্যক তাহা রক্ষা করা যায়। আমাদের গুরু, আমাদের প্রভু, আমাদের রাজা, আমাদের মান্য ব্যক্তিগণ যদি সেই আত্মমর্যাদাটুকুও অপহরণ করিয়া লন তবে একেবারে মনুষ্যত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হয়। সেই সকল কারণে আমরা যথার্থই মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছি এবং সেই কারণেই ইংরেজ ইংরেজের প্রতি যেমন ব্যবহার করে আমাদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করে না।

গৃহের এবং সমাজের শিক্ষায় যখন আমরা সেই মনুষ্যত্ব উপার্জন করিতে পারিব তখন ইংরেজ আমাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইবে এবং অপমান করিতে সাহস করিবে না। ইংরেজ গবর্মেণ্টের নিকট আমরা অনেক প্রত্যাশা করিতে পারি কিন্তু স্বাভাবিক নিয়ম বিপর্যস্ত করা তাঁহাদেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। হীনত্বের প্রতি আঘাত ও অবমাননা সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম।

১৩০১

সুবিচারের অধিকার

সংবাদপত্রপাঠকগণ অবগত আছেন অল্পকাল হইল সেতারা জিলায় বাই নামক নগরে তেরো জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু জেলে গিয়াছেন। তাঁহারা অপরাধ করিয়া থাকিবেন, এবং আইনমতেও হয়তো তাঁহারা দণ্ডনীয়—কিন্তু ঘটনাটি সমস্ত হিন্দুর হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে এবং আঘাতের ন্যায্য কারণও আছে।

উক্ত নগরে হিন্দুসংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা অনেক অধিক এবং পরস্পরের মধ্যে কোনো কালে কোনো বিরোধের লক্ষণ দেখা যায় নাই। একটি মুসলমান সাক্ষীও প্রকাশ করিয়াছে যে, সে-স্থানে হিন্দুর সহিত মুসলমানের কোনো বিবাদ নাই—বিবাদ হিন্দুর সহিত গবর্মেণ্টের।

অকস্মাৎ ম্যাজিস্ট্রেট অশান্তি আশঙ্কা করিয়া কোনো এক পূজা উপলক্ষ্যে হিন্দুদিগকে বাদ্য বন্ধ করিতে আদেশ করেন। হিন্দুগণ ফাঁপরে পড়িয়া রাজাজ্ঞা ও দেবসম্মান উভয়রক্ষা করিতে গিয়া কোনোটাই রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা চিরনিয়মানু-মোদিত বাদ্যাড়ম্বর বন্ধ করিয়া একটিমাত্র সামান্য বাদ্যযোগে কোনোমতে উৎসব পালন করিলেন। ইহাতে দেবতা সন্তুষ্ট হইলেন কিনা জানি না, মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট হইলেন না, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট রুদ্রমূর্তি ধারণ করিলেন। নগরের তেরো জন ভদ্র হিন্দুকে জেলে চালান করিয়া দিলেন।

হাকিম খুব জবরদস্ত, আইন খুব কঠিন, শাসন খুব কড়াক্কড়, কিন্তু এমন করিয়া স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয় কিনা সন্দেহ। এমন করিয়া যেখানে বিরোধ নাই সেখানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, যেখানে বিদ্বেষের বীজমাত্র আছে সেখানে তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিতে থাকে। প্রবল প্রতাপে শান্তি স্থাপন করিতে গিয়া মহাসমারোহে অশান্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা হয়।

সকলেই জানেন অনেক অসভ্যদের মধ্যে আর-কোনোপ্রকার চিকিৎসা নাই কেবল ভূতঝাড়ানো আছে। তাহারা গর্জন করিয়া নৃত্য করিয়া রোগীকে মারিয়া ধরিয়া প্রলয়-কাণ্ড বাধাইয়া দেয়। ইংরেজ হিন্দুমুসলমান-বিরোধব্যাধির যদি সেইরূপ আদিম প্রণালী-মতে চিকিৎসা শুরু করেন তাহাতে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে কিন্তু ব্যাধির উপশম না হইবার সম্ভাবনা। এবং ওঝা ভূত ঝাড়িতে গিয়া যে-ভূত নামাইয়া আনেন তাহাকে শান্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্মেণ্টের আন্তরিক অভিপ্রায়

নহে। পাছে কনগ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দুমুসলমানগণ ক্রমশ ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এইজন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান, এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্প চূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।

অথচ লর্ড ল্যান্সডাউন হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড হ্যারিস পর্যন্ত সকলেই বলিতেছেন এমন কথা যে মুখে আনে সে পাষণ্ড মিথ্যাবাদী। ইংরেজ-গবর্মেন্ট হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের প্রতি যে অধিক পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছেন এ অপবাদকেও তাঁহারা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন।

আমরাও তাঁহাদের কথা অবিশ্বাস করি না। কনগ্রেসের প্রতি গবর্মেন্টের সুগভীর প্রীতি না থাকিতে পারে এবং মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত যোগ দিয়া কনগ্রেসকে বলশালী না করুক এমন ইচ্ছাও তাঁহাদের থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব, তথাপি রাজ্যের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের অনৈক্যকে বিরোধে পরিণত করিয়া তোলা কোনো পরিণামদর্শী বিবেচক গবর্মেন্টের অভিপ্রেত হইতে পারে না। অনৈক্য থাকে সে ভালো, কিন্তু তাহা গবর্মেন্টের সুশাসনে শান্তমূর্তি ধারণ করিয়া থাকিবে। গবর্মেন্টের বারুদখানায় বারুদ যেমন শীতল হইয়া আছে অথচ তাহার দাহিকাশক্তি নিবিয়া যায় নাই— হিন্দুমুসলমানের আভ্যন্তরিক অসদ্‌ভাব গবর্মেন্টের রাজনৈতিক শস্ত্রশালায় সেইরূপ সুশীতলভাবে রক্ষিত হইবে এমন অভিপ্রায় গবর্মেন্টের মনে থাকা অসম্ভব নহে।

এই কারণে, গবর্মেন্ট হিন্দুমুসলমানের গলাগলি-দৃশ্য দেখিবার জন্যও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন না, অথচ লাঠালাঠি-দৃশ্যটাও তাঁহাদের সুশাসনের হানিজনক বলিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন।

সর্বদাই দেখিতে পাই দুই পক্ষে যখন বিরোধ ঘটে এবং শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা উপস্থিত হয় তখন ম্যাজিস্ট্রেট সূক্ষ্মবিচারের দিকে না গিয়া উভয় পক্ষকেই সমানভাবে দমন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। কারণ, সাধারণ নিয়ম এই যে, এক হাতে তালি বাজে না। কিন্তু হিন্দুমুসলমানবিরোধে সাধারণের বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়াছে যে, দমনটা অধিকাংশ হিন্দুর উপর দিয়াই চলিতেছে এবং প্রশ্রয়টা অধিকাংশ মুসলমানেরাই লাভ করিতেছেন। এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়া যাওয়াতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষানল আরও অধিক করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এবং যেখানে কোনোকালে বিরোধ ঘটে নাই সেখানেও কর্তৃপক্ষ আগেভাগে অমূলক আশঙ্কার অবতারণা করিয়া একপক্ষের চিরাগত অধিকার কাড়িয়া লওয়াতে অন্যপক্ষের সাহস ও স্পর্ধা বাড়িতেছে এবং চিরবিরোধের বীজ বপন করা হইতেছে।

হিন্দুদের প্রতি গবর্মেণ্টের বিশেষ একটা বিরাগ না থাকাই সম্ভব কিন্তু একমাত্র গবর্মেণ্টের পলিসির দ্বারাই গবর্মেণ্ট চলে না—প্রাকৃতিক নিয়ম একটা আছে। স্বর্গরাজ্যে পবনদেবের কোনোপ্রকার অসাধু অভিপ্রায় থাকিতে পারে না তথাচ উত্তাপের নিয়মের বশবর্তী হইয়া তাঁহার মর্ত্যরাজ্যের অনুচর উনপঞ্চাশ বায়ু অনেক সময় অকস্মাৎ ঝড় বাধাইয়া বসে। আমরা গবর্মেণ্টের স্বর্গলোকের খবর ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, সে-সকল খবর লর্ড ল্যান্সডাউন এবং লর্ড হ্যারিস জানেন কিন্তু আমরা আমাদের চতুর্দিকের হাওয়ার মধ্যে একটা গোলযোগ অনুভব করিতেছি। স্বর্গধাম হইতে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ আসিতেছে কিন্তু আমাদের নিকটবর্তী দেবচরগণের মধ্যে ভারি একটা উষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমানেরাও জানিতেছেন তাঁহাদের জন্য বিষ্ণুদূত অপেক্ষা করিয়া আছে, আমরাও হাড়ের মধ্যে কম্পসহকারে অনুভব করিতেছি আমাদের জন্য যমদূত দ্বারের নিকটে গদাহস্তে বসিয়া আছে এবং উপরন্তু সেই যমদূতগুলার খোরাকি আমাদের নিজের গাঁঠ হইতে দিতে হইবে।

হাওয়ার গতিক আমরা যেরূপ অনুভব করিতেছি তাহা যে নিতান্ত অমূলক এ-কথা বিশ্বাস হয় না। অল্পকাল হইল স্টেটসম্যান পত্রে গবর্মেণ্টের উচ্চ-উপাধিধারী কোনো শ্রদ্ধেয় ইংরেজ সিভিলিয়ান প্রকাশ করিয়াছেন যে, আজকাল সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরেজের মনে একটা হিন্দুবিদ্বেষের ভাব ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং মুসলমানজাতির প্রতিও একটি আকস্মিক বাৎসল্যরসের উদ্রেক দেখা যাইতেছে। মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি ইংরেজের স্তনে যদি ক্ষীরসঞ্চার হইয়া থাকে তবে তাহা আনন্দের বিষয় কিন্তু আমাদের প্রতি যদি কেবলই পিত্তসঞ্চার হইতে থাকে তবে সে আনন্দ অকপটভাবে রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে।

কেবল রাগদ্বেষের দ্বারা পক্ষপাত এবং অবিচার ঘটিতে পারে তাহা নহে, ভয়েতে করিয়াও ন্যায়পরতার নিক্তির কাঁটা অনেকটা পরিমাণে কম্পিত বিচলিত হইয়া উঠে। আমাদের এমন সন্দেহ হয় যে, ইংরেজ মুসলমানকে মনে মনে কিছু ভয় করিয়া থাকেন। এইজন্য রাজদণ্ডটা মুসলমানের গা ঘেঁষিয়া ঠিক হিন্দুর মাথার উপরে কিছু জোরের সহিত পড়িতেছে।

ইহাকে নাম দেওয়া যাইতে পারে "ঝিকে মারিয়া বউকে শেখানো" রাজনীতি। ঝিকে কিছু অন্যায় করিয়া মারিলেও সে সহ্য করে, কিন্তু বউ পরের ঘরের মেয়ে, উচিত শাসন উপলক্ষ্যে গায়ে হাত তুলিতে গেলেও বরদাস্ত না করিতেও পারে। অথচ বিচারকার্যটা একেবারে বন্ধ করাও যায় না। যেখানে বাধা স্বল্পতম সেখানে শক্তিপ্রয়োগ করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় এ-কথা বিজ্ঞানসম্মত। অতএব হিন্দু-

মুসলমানের স্কন্ধে শান্তপ্রকৃতি, ঐক্যবন্ধনহীন, আইন ও বেআইনসহিষ্ণু হিন্দুকে দমন করিয়া দিলে মীমাংসাটা সহজে হয়। আমরা বলি না যে, গবর্মেণ্টের এইরূপ পলিসি, কিন্তু কার্যবিধি স্বভাবত, এমন কি অজ্ঞানত, এই পথ অবলম্বন করিতে পারে। যেমন, নদীস্রোত কঠিন মৃত্তিকাকে পাশ কাটাইয়া স্বতই কোমল মৃত্তিকাকে খনন করিয়া চলিয়া যায়।

অতএব, হাজার গবর্মেণ্টের দোহাই পাড়িতে থাকিলেও গবর্মেণ্ট যে ইহার প্রতিকার করিতে পারেন এ-কথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা কনগ্রেসে যোগ দিয়াছি, বিলাতে আন্দোলন করিতেছি, অমৃতবাজারে প্রবন্ধ লিখিতেছি, ভারতবর্ষের উচ্চ হইতে নিম্নতন ইংরেজ কর্মচারীদের কার্য স্বাধীনভাবে সমালোচনা করিতেছি, অনেক সময় তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিতে কৃতকার্য হইতেছি এবং ইংলণ্ডবাসী অপক্ষপাতী ইংরেজের সহায়তা লইয়া ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনেক রাজবিধি সংশোধন করিতেও সক্ষম হইয়াছি—এই সকল ব্যবহারে ইংরেজ এতদূর পর্যন্ত জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে যে, ভারত-রাজতন্ত্রের বড়ো বড়ো ভূধর-শিখর হইতেও রাজনীতি সম্মত মৌন ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে আগ্নেয়স্রাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। অপর পক্ষে, মুসলমানগণ রাজভক্তিভরে অবনতপ্রায় হইয়া কনগ্রেসের উদ্দেশ্যপথে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই সকল কারণে ইংরেজের মনে একটা বিকার উপস্থিত হইয়াছে—গবর্মেণ্টের ইহাতে কোনো হাত নাই।

কেবল ইহাই নহে। কনগ্রেস অপেক্ষা গোরক্ষণী সভাটাতে ইংরেজের মনে অধিক আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। তাঁহারা জানেন ইতিহাসের প্রারম্ভকাল হইতে যে-হিন্দুজাতি আত্মরক্ষার জন্য কখনো একত্র হইতে পারে নাই, গাই কি গোরক্ষার জন্য সে-জাতি একত্র হইতেও পারে। অতএব, সেই সূত্রে যখন হিন্দুমুসলমানের বিরোধ আরম্ভ হইল তখন স্বভাবতই মুসলমানের প্রতিই ইংরেজের দরদ বাড়িয়া গিয়াছিল। তখন উপস্থিত ক্ষেত্রে কোন্ পক্ষ অধিক অপরাধী, অথবা উভয় পক্ষ ন্যূনাধিক অপরাধী কি না তাহা অবিচলিতচিত্তে অপক্ষপাতসহকারে বিচার করিবার ক্ষমতা অতি অল্প ইংরেজের ছিল। তখন তাঁহারা ভীতচিত্তে একটা রাজনৈতিক সংকট কিরূপে নিবারণ হইতে পারে সেইদিকেই অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন। তৃতীয় খণ্ড সাধনায় "ইংরেজের আতঙ্ক" নামক প্রবন্ধে আমরা সাঁওতাল-দমনের উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছি, ভয় পাইলে সুবিচার করিবার ধৈর্য থাকে না এবং যাহারা জ্ঞানত অথবা অজ্ঞানত ভীতির কারণ, তাহাদের প্রতি একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ভাবের উদয় হয়। এই কারণে, গবর্মেণ্ট নামক যন্ত্রটি যেমনই নিরপেক্ষ থাক গবর্মেণ্টের

ছোটোবড়ো মন্ত্রীগুলি যে আদ্যোপান্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা বারংবার অস্বীকার করিলেও লক্ষণে স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছিল এখনও প্রকাশ পাইতেছে। এবং সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরেজের মনে বিবিধ স্বাভাবিক কারণে একবার এইরূপ বিকার উপস্থিত হইলে তাহার যে ফল সে ফলিতে থাকিবেই;— ক্যান্যুট যেমন সমুদ্রতরঙ্গকে নিয়মিত করিতে পারেন নাই গবর্মেণ্টও সেইরূপ স্বাভাবিক নিয়মকে বাধা দিতে পারিবেন না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কেনই বা বৃথা আন্দোলন করা এবং আমারই বা এ প্রবন্ধ লিখিতে বসিবার প্রয়োজন কী ছিল?

গবর্মেণ্টের নিকট সকরুণ অথবা সাভিমান স্বরে আবেদন বা অভিযোগ করিবার জন্য প্রবন্ধ লিখার কোনো আবশ্যক নাই সে-কথা আমি সহস্রবার স্বীকার করি। আমাদের এই প্রবন্ধ কেবল আমাদের স্বজাতীয়ের জন্য। আমরা নিজেরা ব্যতীত আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

ক্যান্যুট সমুদ্রতরঙ্গকে যেখানে থামিতে বলিয়াছিলেন, সমুদ্রতরঙ্গ সেখানে থামে নাই—সে জড়শক্তির নিয়মানুবর্তী হইয়া যথোপযুক্ত স্থানে গিয়া আঘাত করিয়াছিল। ক্যান্যুট মুখের কথায় বা মন্ত্রোচ্চারণে তাহাকে ফিরাইতে পারিতেন না বটে কিন্তু বাঁধ বাঁধিয়া তাহাকে প্রতিহত করিতে পারিতেন।

স্বাভাবিক নিয়মানুগত আঘাতপরম্পরাকে যদি অর্ধপথে বাধা দিতে হয় তবে আমাদিগকেও বাঁধ বাঁধিতে হইবে। সকলকে এক হইতে হইবে। সকলকে সমহৃদয় হইয়া সমবেদনা অনুভব করিতে হইবে।

দল বাঁধিয়া যে বিপ্লব করিতে হইবে তাহা নহে—আমাদের সে শক্তিও নাই। কিন্তু দল বাঁধিলে যে একটা বৃহত্ত্ব এবং বল লাভ করা যায় তাহাকে লোকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে না পারিলে সুবিচার আকর্ষণ করা বড়ো কঠিন।

কিন্তু বালির বাঁধ বাঁধিবে কী করিয়া? যাহারা বারংবার নিহত পরাহত হইয়াছে অথচ কোনোকালে সংহত হইতে শিখে নাই, যাহাদের সমাজের মধ্যে অনৈক্যের সহস্র বিষবীজ নিহিত রহিয়াছে তাহাদিগকে কিসে বাঁধিতে পারিবে? ইংরেজ যে আমাদের মর্মবেদনা অনুভব করিতে পারে না এবং ইংরেজ ঔষধের দ্বারা চিকিৎসার চেষ্টা না করিয়া কঠিন আঘাতের দ্বারা আমাদের হৃদয়ব্যথা চতুর্গুণ বর্ধিত করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে এই বিশ্বাসে উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে সমস্ত হিন্দুজাতির হৃদয় অলক্ষিতভাবে প্রতিদিন পরস্পর নিকটে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। আমাদের স্বজাতি এখনও আমাদের স্বজাতীয়ের পক্ষে ধ্রুব আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিতে পারেন নাই। এই জন্য বাহিরের ঝটিকা অপেক্ষা আমাদের গৃহভিত্তির বালুকাময় প্রতিষ্ঠাস্থানকে অধিক আশঙ্কা করি। খরবেগ নদীর মধ্যস্রোত অপেক্ষা তাহার শিথিলবন্ধন ভঙ্গপ্রবণ তটভূমিকে পরিহার করিয়া চলিতে হয়।

আমরা জানি, বহুকাল পরাধীনতায় পিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় মনুষ্যত্ব ও সাহস চূর্ণ হইয়া গেছে, আমরা জানি যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হইতে হয় তবে সর্বাপেক্ষা ভয় আমাদের স্বজাতিকে—যাহার হিতের জন্য প্রাণপণ করা যাইবে সেই আমাদের প্রধান বিপদের কারণ, আমরা যাহার সহায়তা করিতে যাইব তাহার নিকট হইতে সহায়তা পাইব না, কাপুরুষগণ সত্য অস্বীকার করিবে, নিপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, আইন আপন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করিবে এবং জেলখানা আপন লৌহবদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিবে কিন্তু তথাপি অকৃত্রিম মহত্ত্ব এবং স্বাভাবিক ন্যায়প্রিয়তাবশত আমাদের মধ্যে দুই-চারিজন লোকও যখন শেষ পর্যন্ত অটল থাকিতে পারিবে তখন আমাদের জাতীয় বন্ধনের সূত্রপাত হইতে থাকিবে এবং তখন আমরা ন্যায়বিচার পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইব।

জানি না হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ অথবা ভারতবর্ষীয় ও ইংরেজের সংঘর্ষস্থলে আমরা যাহা অনুমান ও অনুভব করিয়া থাকি তাহা সত্য কি না, আমরা যে অবিচারের আশঙ্কা করিয়া থাকি, তাহা সমূলক কি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি যে, কেবলমাত্র বিচারকের অনুগ্রহ ও কর্তব্যবুদ্ধির উপর বিচারভার রাখিয়া দিলে সুবিচারের অধিকারী হওয়া যায় না। রাজতন্ত্র যতই উন্নত হউক প্রজার অবস্থা নিতান্ত অবনত হইলে সে কখনোই আপনাকে উচ্চে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না, কারণ মানুষের দ্বারাই রাজ্য চলিয়া থাকে, যন্ত্রের দ্বারাও নহে, দেবতার দ্বারাও নহে। তাহাদের নিকট যখন আমরা আপনাদিগকে মনুষ্য বলিয়া প্রমাণ দিব তখন তাহারা সকল সময়েই আমাদের সহিত মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে। যখন ভারতবর্ষে অন্তত কতকগুলি লোকও উঠিবেন যাঁহারা আমাদের মধ্যে অটল সত্যপ্রিয়তা ও নির্ভীক ন্যায়পরতার উন্নত আদর্শ স্থাপন করিবেন, যখন ইংরেজ অন্তরের সহিত অনুভব করিবে যে, ভারতবর্ষ ন্যায়বিচার নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ করে না, সচেষ্টভাবে প্রার্থনা করে, অন্যায় নিবারণের জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয় তখন তাহারা কখনো ভ্রমেও আমাদিগকে অবহেলা করিবে না এবং আমাদের প্রতি ন্যায়বিচারে শৈথিল্য করিতে তাহাদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইবে না।

১৩০১

কণ্ঠরোধ

সিডিশন বিল পাস হইবার পূর্ব দিনে টাউনহলে পঠিত

অদ্য আমি যে-ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা যদিও বাঙালির ভাষা, দুর্বলের ভাষা, বিজিত জাতির ভাষা তথাপি সে-ভাষাকে আমাদের কর্তৃপক্ষেরা ভয় করিয়া থাকেন। তাহার একটি কারণ, এ-ভাষা তাঁহারা জানেন না। এবং যেখানেই অজ্ঞানের অন্ধকার সেইখানেই অন্ধ আশঙ্কার প্রেতভূমি।

কারণ যাহাই হউক না কেন যে-ভাষা আমাদের শাসনকর্তারা জানেন না, এবং যে-ভাষাকে তাঁহারা মনে মনে ভয় করেন সে-ভাষায় তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিতে আমি ততোধিক ভয় করি। কেননা আমরা কোন্ ভাব হইতে কী কথা বলিতেছি, আমাদের কথাগুলি সুদুঃসহ বেদনা হইতে উচ্ছ্বসিত, না দুর্বিষহ স্পর্ধা হইতে উদ্‌গিরিত তাহার বিচারের ভার তাঁহাদেরই হস্তে, এবং তাহার বিচারের ফল নিতান্ত সামান্য নহে।

আমি বিদ্রোহী নহি, বীর নহি, বোধ করি নির্বোধও নহি। উদ্যত রাজদণ্ডপাতের দ্বারা দলিত হইয়া অকস্মাৎ অপঘাতমৃত্যুর ইচ্ছাও আমার নাই; কিন্তু আমাদের রাজকীয় দণ্ডধারী পুরুষটি ভাষার ঠিক কোন্ সীমানায় ঘাটি বাঁধিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন তাহা আমি স্পষ্টরূপে জানি না,—এবং আমি ঠিক কোন্‌খানে পদার্পণ করিলে শাসন-কর্তার লগুড় আসিয়া আমাকে ভূমিশায়ী করিবে তাহা কর্তার নিকটও অস্পষ্ট,—কারণ, কর্তার নিকট আমার ভাষা অস্পষ্ট, আমিও নিরতিশয় অস্পষ্ট, সুতরাং স্বভাবতই তাঁহার শাসনদণ্ড আনুমানিক আশঙ্কাবেগে অন্ধভাবে পরিচালিত হইয়া দণ্ডবিধির ন্যায়সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্বক আকস্মিক উল্কাপাতের ন্যায় অযথাস্থানে দুর্বলজীবের অন্তরিন্দ্রিয়কে অসময়ে সচকিত করিয়া তুলিতে পারে। এমনস্থলে সর্বতোভাবে মূক হইয়া থাকাই সুবুদ্ধির কাজ, এবং আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে অনেকেই কর্তব্যক্ষেত্র হইতে যথেষ্ট দূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেই নিরাপদ সদ্‌বুদ্ধি অবলম্বন করিবেন তাহারও দুই-একটা লক্ষণ এখন হইতে দেখা যাইতেছে,—আমাদের দেশের বিক্রমশালী বাগ্মী যাঁহারা বিলাতি সিংহনাদে শ্বেতদ্বৈপায়নগণের চিত্তেও সহসা বিভ্রম উৎপাদন করিতে পারেন তাঁহাদের অনেকে বিবর আশ্রয় করিয়া বাগ্‌রোধ অভ্যাস করিতে বসিবেন দেশের এমন একটা দুঃসময় আসন্ন;—সে-সময়ে দুর্ভাগ্য দেশের নির্বাক বেদনা নিবেদন করিতে রাজদ্বারে অগ্রসর হইবে এমন দুঃসাহসিক দেশবন্ধু দুর্লভ হইয়া পড়িবে। যদিচ শাস্ত্রে আছে

"রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ" তথাপি শ্মশান যখন রাজদ্বারের এত অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়াছে তখন ভীত বন্ধুদিগকে কথঞ্চিৎ মার্জনা করিতে হইবে।

অবশ্য, রাজা বিমুখ হইলে আমরা ভয় পাইব না আমাদের এমন স্বভাবই নহে কিন্তু রাজা যে কেন আমাদের প্রতি এতটা ভয় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন সেই প্রশ্নই আমাদিগকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে।

যদিচ ইংরেজ আমাদের একেশ্বর রাজা, এবং তাঁহাদের শক্তিও অপরিমেয়, তথাপি এ-দেশে তাঁহারা ভয়ে ভয়ে বাস করেন ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্ময় বোধ করি। অতিদূরে রুশিয়ার পদধ্বনি অনুমানমাত্র করিলে তাঁহারা যে কিরূপ চকিত হইয়া উঠেন তাহা আমরা বেদনার সহিত অনুভব করিয়াছি। কারণ প্রত্যেকবার তাঁহাদের সেই হৃৎকম্পের চমকে আমাদের ভারতলক্ষ্মীর শূন্যপ্রায় ভাণ্ডারে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, আমাদের দৈন্যপীড়িত কঙ্কালসার দেশের ক্ষুধার অন্নপিণ্ডগুলি মুহূর্তের মধ্যে কামানের কঠিন লৌহপিণ্ডে পরিণত হইয়া যায়;—সেটা আমাদের পক্ষে লঘুপাক খাদ্য নহে।

বাহিরে প্রবল শত্রুসম্বন্ধে এইরূপ সচকিত সতর্কতার সমূলক কারণ থাকিতেও পারে, তাহার নিগূঢ় সংবাদ এবং জটিল তত্ত্ব আমাদের জানা নাই।

কিন্তু আমরা আমাদিগকে জানি। আমরা যে কোনো অংশেই ভয়ংকর নহি সে-বিশ্বাস আমাদের বদ্ধমূল। এবং যতক্ষণ সে-বিশ্বাস আমাদের নিজের মনে নিঃসংশয়-ভাবে দৃঢ় থাকে ততক্ষণ আমাদের ভয়ংকারিতাও সর্বতোভাবে দূরীকৃত।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে উপর্যুপরি কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনায় আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছি যে, বিনা চেষ্টায় বিনা কারণে আমরা ভয় উৎপাদন করিতেছি। আমরা ভয়ংকর! আশ্চর্য! ইহা আমরা পূর্বে কেহ সন্দেহই করি নাই।

ইতিমধ্যে একদিন দেখিলাম গবর্মেণ্ট অত্যন্ত সচকিত ভাবে তাঁহার পুরাতন দণ্ডশালা হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল লৌহশৃঙ্খল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাফ করিতে বসিয়াছেন। প্রত্যহ প্রচলিত আইনের মোটা কাছিতেও আমাদিগকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না—আমরা অত্যন্ত ভয়ংকর!

একদিন শুনিলাম অপরাধিবিশেষকে সন্ধানপূর্বক গ্রেফতার করিতে অক্ষম হইয়া রোষরক্ত গবর্মেণ্ট সাক্ষীসাবুদ-বিচারবিবেচনার বিলম্বমাত্র না করিয়া একেবারে সমস্ত পুনা শহরের বক্ষের উপর রাজদণ্ডের জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলেন। আমরা ভাবিলাম, পুনা বড়ো ভয়ংকর শহর। ভিতরে ভিতরে না জানি কী ভয়ানক কাণ্ডই করিয়াছে!

আজ পর্যন্ত সে ভয়ানক কাণ্ডের কোনো অন্ধিসন্ধি পাওয়া গেল না।

কাণ্ডটা সত্য অথবা স্বপ্ন ইহাই ভাবিয়া অবাক হইয়া বসিয়া আছি এমন সময় তারের খবর আসিল, রাজপ্রাসাদের গুপ্তচূড়া হইতে কোন্ এক অজ্ঞাত অপরিচিত বীভৎস আইন বিদ্যুতের মতো পড়িয়া নাটুভ্রাতৃযুগলকে ছোঁ মারিয়া কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আকস্মিক গুরুবর্ষার মতো সমস্ত বম্বাই প্রদেশের মাথার উপরে কালো মেঘ নিবিড় হইয়া উঠিল এবং জবরদস্ত শাসনের ঘন ঘন বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির আয়োজন-আড়ম্বরে আমরা ভাবিলাম, ভিতরে কী ঘটিয়াছে জানি না, কিন্তু বেশ দেখিতেছি, ব্যাপারটি সহজ নহে। মাহারাষ্ট্রীরা বড়ো ভয়ংকর জাত!

একদিকে পুরাতন আইন-শৃঙ্খলের মরিচা সাফ হইল আবার অন্যদিকে রাজকারখানায় নূতন লৌহশৃঙ্খল নির্মাণের ভীষণ হাতুড়ি-ধ্বনিতে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। একটা ভয়ানক ধুম পড়িয়া গেছে। আমরা এতই ভয়ংকর!

আমরা এতকাল বিপুলা পৃথিবীকে অচলা বলিয়া বিশ্বাস করিতাম এবং এই প্রবলা বসুন্ধরার প্রতি আমরা যতই নির্ভর ও যতই উপদ্রব করিয়াছি তিনি তাহা অকুণ্ঠিত প্রকাণ্ড শক্তিতে অনায়াসে বহন করিয়াছেন। একদিন নববর্ষার দুর্যোগে মেঘাবৃত অপরাহ্ণে অকস্মাৎ আমাদের সেই চিরনির্ভরভূমি জানি না কোন্ নিগূঢ় আশঙ্কায় কম্পান্বিত হইতে লাগিলেন। আমরা দেখিলাম তাঁহার সেই মুহূর্তকালের চাঞ্চল্যে আমাদের বহুকালের প্রিয় পুরাতন বাসস্থানগুলি ধূলিসাৎ হইল।

গবর্মেণ্টের অচলা নীতিও যদি অকস্মাৎ সামান্য অথবা অনির্দেশ্য আতঙ্কে বিচলিত ও বিদীর্ণ হইয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয় তাহা হইলে তাহার শক্তি ও নীতির দৃঢ়তা সম্বন্ধে আমাদের চিরবিশ্বাস হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়। সেই আঘাতে প্রজার মনে ভয়সঞ্চার হওয়া সম্ভবপর কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের প্রতিও তাহার অকস্মাৎ অত্যধিক মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। হঠাৎ এ প্রশ্নটা আপনিই মনে উদয় হয় আমি না জানি কী!

সুতরাং ইহার মধ্যে আমাদের একটুখানি সান্ত্বনা আছে। কারণ, সম্পূর্ণ নিস্তেজ নিঃসত্ত্ব জাতির প্রতি বলপ্রয়োগ করা যেমন অনাবশ্যক, তেমনি তাহাকে শ্রদ্ধা করাও অসম্ভব। আমাদিগকে দমন করিবার জন্য অতিরিক্ত আয়োজন দেখিলে ন্যায়-অন্যায় বিচার-অবিচারের তর্ক দূরে রাখিয়া এ-কথা আমাদের স্বভাবতই মনে হয় যে, হয়তো আমাদের মধ্যে একটা শক্তির সম্ভাবনা আছে যাহা কেবল

মূঢ়তাবশত আমরা সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে পারি না। গবর্মেন্ট যখন চারি তরফ হইতেই কামান পাতিতেছেন তখন ইহা নিশ্চয় যে আমরা মশা নহি,—অন্তত মরা মশা নহি।

আমাদের স্বজাতির অন্তরে একটা প্রাণ একটা শক্তির সঞ্চার-সম্ভাবনা আমাদের পক্ষে পরমানন্দের বিষয় এ-কথা অস্বীকার করা এমন সুস্পষ্ট কপটতা যে, তাহা পলিসিস্বরূপে অনাবশ্যক এবং প্রবঞ্চনাস্বরূপে নিষ্ফল। অতএব গবর্মেন্টের তরফ হইতে আমাদের কোনোখানে সেই শক্তির স্বীকার দেখিতে পাইলে নিরাশচিত্তে কিঞ্চিৎ গর্বের সঞ্চার না হইয়া থাকিতে পারে না।

কিন্তু, হায়, এ গর্ব আমাদের পক্ষে সাংঘাতিক,—শুক্তির মুক্তার ন্যায় ইহা আমাদের পক্ষে ব্যাধি,—উপযুক্ত ধীবররাজ আমাদের জঠরের মধ্যে কঠোর ছুরিকা চালাইয়া এই গর্বটুকু নিঃশেষে বাহির করিয়া লইয়া নিজেদের রাজমুকুটের উপরে স্থাপন করিবেন। ইংরেজ নিজের আদর্শে পরিমাপ করিয়া আমাদিগকে যে অযথা সম্মান দিতেছেন সে-সম্মান হয়তো আমাদের পক্ষে একই কালে পরিহাস এবং মৃত্যু। আমাদের যে-বল সন্দেহ করিয়া গবর্মেণ্ট আমাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেছেন সে-বল যদি আমাদের না থাকে তবে গবর্মেন্টের গুরুদণ্ডে আমরা নষ্ট হইয়া যাইব,—সে-বল যদি যথার্থ থাকে তবে দণ্ডের তাড়নায় তাহা উত্তরোত্তর দৃঢ় এবং গোপনে প্রবল হইবে।

আমরা তো আমাদিগকে জানি, কিন্তু ইংরেজ আমাদিগকে জানেন না। না জানিবার ১০১ কারণ আছে—তাহা বিস্তারিত পর্যালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। মূল কথাটা এই, তাঁহারা আমাদিগকে জানেন না। আমরা পূর্বদেশী, তাঁহারা পশ্চিমদেশী। আমাদের মধ্যে যে কী হইতে কী হয়, কোথায় আঘাত লাগিলে কোন্‌খানে ধোঁয়াইয়া উঠে তাহা তাঁহারা ঠিক করিয়া বুঝিতে পারেন না। সেইজন্যই তাঁহাদের ভয়। আমাদের মধ্যে ভয়ংকরত্বের আর কোনো লক্ষণ নাই কেবল একটি আছে, আমরা অজ্ঞাত। আমরা শুন্যপায়ী উদ্ভিজ্জাশী জীব, আমরা শান্ত সহিষ্ণু উদাসীন কিন্তু তবু আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই, কারণ আমরা প্রাচ্য আমরা দুর্জ্ঞেয়।

সত্য যদি তাহাই হইবে, তবে হে রাজন্, আমাদিগকে আরও কেন অজ্ঞেয় করিয়া তুলিতেছ? যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটিয়া থাকে তবে তাড়াতাড়ি ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া ভয়কে আরও পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিতেছ কেন? যে একমাত্র উপায়ে আমরা আত্মপ্রকাশ করিতে পারি, তোমাদের নিকট আপনাকে পরিচিত করিতে পারি তাহা রোধ করিয়া ফল কী?

সিপাহিবিদ্রোহের পূর্বে হাতে হাতে যে-রুটি বিলি হইয়াছিল তাহাতে একটি অক্ষরও লেখা ছিল না—সেই নির্বাক নিরক্ষর সংবাদপত্রই কি যথার্থ ভয়ংকর নহে? সর্পের গতি গোপন এবং দংশন নিঃশব্দ, সেইজন্যই কি তাহা নিদারুণ নহে? সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না। যদি কখনো কোনো ঘনান্ধকার অমাবস্যারাত্রে আমাদের অবলা ভারতভূমি দুরাশার দুঃসাহসে উন্মাদিনী হইয়া বিপ্লবাভিসারে যাত্রা করে, তবে সিংহদ্বারের কুক্কুর না ডাকিতেও পারে, রাজার প্রহরী না জাগিতেও পারে, পুররক্ষক কোতোয়াল তাহাকে না চিনিতেও পারে, কিন্তু তাহার নিজেরই সর্বাঙ্গের কঙ্কণকিঙ্কিণীনূপুরকেয়ুর, তাহার বিচিত্র ভাষার বিচিত্র সংবাদপত্রগুলি কিছু-না-কিছু বাজিয়া উঠিবেই, নিষেধ মানিবে না। প্রহরী যদি নিজহস্তে সেই মুখর ভূষণগুলির ধ্বনি রোধ করিয়া দেন তবে তাঁহার নিদ্রার সুযোগ হইতে পারে কিন্তু পাহারার কী সুবিধা হইবে জানি না।

কিন্তু পাহারা দিবার ভার যে জাগ্রত লোকটির হাতে, পাহারা দিবার প্রণালীও তিনি স্থির করিবেন; সে-সম্বন্ধে বিজ্ঞভাবে পরামর্শ দেওয়া আমার পক্ষে নিরতিশয় ধৃষ্টতা এবং সম্ভবত তাহা নিরাপদও নহে। অতএব মাতৃভাষায় আমার এই দুর্বল উদ্যমের মধ্যে সে দুশ্চেষ্টা নাই। তবে আমার এই ক্ষীণ, ক্ষুদ্র, ব্যর্থ অথচ বিপৎসংকুল বাচালতা কেন? সে কেবল, প্রবলের ভয় দুর্বলের পক্ষে কী ভয়ংকর তাহাই স্মরণ করিয়া।

ইহার একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিছুদিন হইল একদল ইতরশ্রেণীর অবিবেচক মুসলমান কলিকাতার রাজপথে লোষ্ট্রখণ্ডহস্তে উপদ্রবের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, উপদ্রবের লক্ষ্যটা বিশেষরূপে ইংরেজেরই প্রতি। তাহাদের শাস্তিও যথেষ্ট হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, ইঁটটি মারিলেই পাটকেলটি খাইতে হয়, কিন্তু মূঢ়গণ ইঁটটি মারিয়া পাটকেলের অপেক্ষা অনেক শক্ত শক্ত জিনিস খাইয়াছিল। অপরাধ করিল দণ্ড পাইল কিন্তু ব্যাপারটা কী আজ পর্যন্ত স্পষ্ট বুঝা গেল না। এই নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণ সংবাদপত্র পড়েও না, সংবাদপত্রে লেখেও না;—একটা ছোটো বড়ো কাণ্ড হইয়া গেল অথচ এই মূক নির্বাক প্রজাসম্প্রদায়ের মনের কথা কিছুই বোঝা গেল না। ব্যাপারটি রহস্যাবৃত রহিল বলিয়াই সাধারণের নিকট তাহার একটা অযথা এবং কৃত্রিম গৌরব জন্মিল। কৌতূহলী কল্পনা হ্যারিসন রোডের প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তুরস্কের অর্ধচন্দ্রশিখরী রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সম্ভব ও অসম্ভব অনুমানকে শাখাপল্লবান্বিত করিয়া চলিল। ব্যাপারটি রহস্যাবৃত রহিল বলিয়াই আতঙ্কচকিত ইংরেজি কাগজ কেহ বলিল, ইহা কনগ্রেসের সহিত যোগবদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা, কেহ বলিল, মুসলমানদের বসতিগুলা একেবারে উড়াইয়া পুড়াইয়া

দেওয়া যাক, কেহ বলিল, এমন নিদারুণ বিপৎপাতের সময় তুহিনাবৃত শৈলশিখরের উপর বড়োলাটসাহেবের এতটা সুশীতল হইয়া বসিয়া থাকা উচিত হয় না।

রহস্যই অনিশ্চিত ভয়ের প্রধান আশ্রয়স্থান—এবং প্রবল ব্যক্তির অনিশ্চিত ভয় দুর্বল ব্যক্তির নিশ্চিত মৃত্যু। রুদ্ধবাক সংবাদপত্রের মাঝখানে রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে বড়োই ভয়ংকর অবস্থা। তাহাতে করিয়া আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ রাজপুরুষদের চক্ষে সংশয়ান্ধকারে অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ দেখাইবে। দুরপনেয় অবিশ্বাসে রাজদণ্ড উত্তরোত্তর খরধার হইয়া উঠিবে এবং প্রজার হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত ও নির্বাক নৈরাশ্যে বিষতিক্ত হইতে থাকিবে। আমরা ইংরেজের একান্ত অধীন প্রজা, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম তাঁহার দাসত্ব করে না। আঘাত করিলে আমরা বেদনা পাইব; ইংরেজ হাজার চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেও এ নিয়মটাকে দেশান্তরিত করিতে পারিবেন না। তাঁহারা রাগ করিয়া আঘাতের মাত্রা বাড়াইতে পারেন, কিন্তু বেদনার মাত্রাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিবে। কারণ, সে বিধির নিয়ম; পিনাল কোডে তাহার কোনো নিষেধ নাই। অন্তর্দাহ বাক্যে প্রকাশ না হইলে অন্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে। সেইরূপ অস্বাস্থ্যকর অস্বাভাবিক অবস্থায় রাজাপ্রজার সম্বন্ধ যে কিরূপ বিকৃত হইবে তাহা কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইতেছি।

কিন্তু এই অনির্দিষ্ট সংশয়ের অবস্থা সর্বাপেক্ষা প্রধান অমঙ্গল নহে। আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর অশুভ আছে।

মানবচরিত্রের উপরে পরাধীনতার অবনতিকর ফল আছেই তাহা আমরা ইংরেজের নিকট হইতেই শিখিয়াছি। অসত্যাচরণ কপটতা অধীন জাতির আত্মরক্ষার অস্ত্রস্বরূপ হইয়া তাহার আত্মসম্মানকে তাহার মনুষ্যত্বকে নিশ্চিতরূপে নষ্ট করিয়া ফেলে। স্বাধীনতাপূজক ইংরেজ আপন প্রজাদিগের অধীনদশা হইতে সেই হীনতার কলঙ্ক যথাসম্ভব অপনয়ন করিয়া আমাদিগকে মনুষ্যত্বের শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরা বিজিত তাঁহারা বিজেতা, আমরা দুর্বল তাঁহারা সবল ইহা তাঁহারা পদে পদে স্মরণ করাইয়া রাখেন নাই। এতদূর পর্যন্তও ভুলিতে দিয়াছিলেন যে, আমরা মনে করিয়াছিলাম ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা আমাদের মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক অধিকার।

আজ সহসা জাগ্রত হইয়া দেখিতেছি দুর্বলের কোনো অধিকারই নাই। আমরা যাহা মনুষ্যমাত্রেরই প্রাপ্য মনে করিয়াছিলাম তাহা দুর্বলের প্রতি প্রবলের স্বেচ্ছাধীন অনুগ্রহ মাত্র। আমি আজ যে এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া একটিমাত্র শব্দোচ্চারণ করিতেছি তাহাতে আমার মনুষ্যোচিত গর্বানুভব করিবার কোনো কারণ নাই,—দোষ

করিবার ও বিচার হইবার পূর্বেই যে আমি কারাগারের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি না তাহাতেও আমার কোনো গৌরব নাই।

ইহা এক হিসাবে সত্য। কিন্তু এই সত্য সর্বদা অনুভব করা রাজা প্রজা কাহারও পক্ষে হিতকর নহে। মনুষ্য, অবস্থার পার্থক্যের মাঝখানে হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অসমানতার মধ্যেও নিজের মনুষ্যত্ব রক্ষার চেষ্টা করে।

শাসিত ও শাসনকর্তার মধ্যবর্তী শাসনশৃঙ্খলটাকে সর্বদা ঝংকার না দিয়া সেটাকে আত্মীয়সম্বন্ধ-বন্ধনরূপে ঢাকিয়া রাখিলে অধীন জাতির ভার লাঘব হয়।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এই প্রকারের একটা আচ্ছাদনপট। ইহাতে আমাদের অবস্থার হীনতা গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা জেতৃজাতির সহস্র ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াও এই স্বাধীনতাসূত্রে অন্তরঙ্গভাবে তাঁহাদের নিকটবর্তী ছিলাম। আমরা দুর্বলজাতির হীন ভয় ও কপটতা ভুলিয়া মুক্তহৃদয়ে উন্নতমস্তকে সত্য কথা স্পষ্ট কথা বলিতে শিখিতেছিলাম।

যদিচ উচ্চতর রাজকার্যে আমাদের স্বাধীনতা ছিল না, তথাপি নির্ভীকভাবে পরামর্শ দিয়া স্পষ্টবাক্যে সমালোচনা করিয়া আপনাদিগকে এই বিপুল ভারতরাজ্যশাসন-কার্যের অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিতাম। তাহার অন্য ফলাফল বিবেচনা করিবার সময় নাই, কিন্তু তাহাতে আমাদের আত্মসম্মান বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা জানিতাম আমাদের স্বদেশ-শাসনের বিপুল ব্যাপারে আমরা অকর্মণ্য নিশ্চেষ্ট নহি—ইহার মধ্যে আমাদেরও কর্তব্য আমাদেরও দায়িত্ব আছে। এই শাসনকার্যের উপর যখন প্রধানত আমাদের সুখদুঃখ আমাদের শুভ-অশুভ নির্ভর করিতেছে, তখন তাহার সহিত আমাদের কোনো মন্তব্য কোনো বক্তব্য কোনো কর্তব্যবন্ধনের যোগ না থাকিলে আমাদের দীনতা আমাদের হীনতার আর অবধি থাকে না। বিশেষত আমরা ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছি, ইংরেজি সাহিত্য হইতে ইংরেজ কর্মবীরগণের দৃষ্টান্ত আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সর্বপ্রকার ব্যাপারেই নিজের শুভসাধনে আমাদের নিজের স্বাধীন অধিকার থাকার যে পরম গৌরব তাহা আমরা অনুভব করিয়াছি। আজ যদি অকস্মাৎ আমরা সেই ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হই,—রাজকার্যচালনার সহিত আমাদের সমালোচনার ক্ষুদ্র সম্বন্ধটুকুও এক আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং হয় আমরা নিশ্চেষ্ট উদাসীনতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকি, নয় কপটতা ও মিথ্যা বাক্যের দ্বারা প্রবলতার রাজপদতলে আপন মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ বলিদান করি, তবে পরাধীনতার সমস্ত হীনতার সঙ্গে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত আকাঙ্ক্ষার বাক্যহীন ব্যর্থবেদনা মিশ্রিত হইয়া আমাদের দুর্দশা পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইবে; যে-সম্বন্ধের

মধ্যে আদানপ্রদানের একটি সংকীর্ণ পথ খোলা ছিল ভয় আসিয়া সে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে ;—রাজার প্রতি প্রজার সে-ভয় গৌরবের নহে এবং প্রজার প্রতি রাজার সে-ভয় ততোধিক শোচনীয়।

এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাবরণ উত্তোলন করিয়া লইলে আমাদের পরাধীনতার সমস্ত কঠিন কঙ্কাল একমুহূর্তে বাহির হইয়া পড়িবে। আজকালকার কোনো কোনো জবরদস্ত ইংরেজ লেখক বলেন, যাহা সত্য তাহা অনাবৃত হইয়া থাকাই ভালো। কিন্তু, আমরা জিজ্ঞাসা করি ইংরেজশাসনে এই কঠিন শুষ্ক পরাধীনতার কঙ্কালই কি একমাত্র সত্য, ইহার উপরে জীবনের লাবণ্যের যে আবরণ, স্বাধীন গতিভঙ্গির যে বিচিত্র লীলা মনোহর শ্রী অর্পণ করিয়াছিল তাহাই কি মিথ্যা, তাহাই কি মায়া? দুইশত বৎসর পরিচয়ের পরে আমাদের মানবসম্বন্ধের এই কি অবশেষ?

১৩০৫

ইম্পীরিয়লিজ্‌ম

বিলাতে ইম্পীরিয়লিজ্‌মের একটা নেশা ধরিয়াছে। অধীন দেশ ও উপনিবেশ প্রভৃতি জড়াইয়া ইংরেজসাম্রাজ্যকে একটা বৃহৎ উপসর্গ করিয়া তুলিবার ধ্যানে সে-দেশে অনেকে নিযুক্ত আছেন। বিশ্বামিত্র একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবার উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন, বাইবেল-কথিত কোনো রাজা স্বর্গের প্রতি স্পর্ধা করিয়া এক স্তম্ভ তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্বয়ং দশাননের সম্বন্ধেও এরূপ একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

দেখা যাইতেছে এইরূপ বড়ো বড়ো মতলব পৃথিবীতে অনেক সময়ে অনেক লোকে মনে মনে আঁটিয়াছে। এ-সকল মতলব টেকে না—কিন্তু নষ্ট হইবার পূর্বে পৃথিবীতে কিছু অমঙ্গল না সাধিয়া যায় না।

তাঁহাদের দেশের এই খেয়ালের ঢেউ লর্ড কার্জনের মনের মধ্যেও যে তোলপাড় করিতেছে সেদিনকার এক অলক্ষণে বক্তৃতায় তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন। দেখিয়াছি আমাদের দেশের কোনো কোনো খবরের কাগজ কখনো কখনো এই বিষয়টাতে একটু উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, বেশ কথা, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ "এম্পায়ারে" একাত্মা হইবার অধিকার দাও না।

কথার ছল ধরিয়া তো কোনো অধিকার পাওয়া যায় না—এমন কি, লেখাপড়া পাকা কাগজে হইলেও দুর্বল লোকের পক্ষে নিজের স্বত্ব উদ্ধার করা শক্ত। এই কারণে যখন দেখিতে পাই যাঁহারা আমাদের উপরওআলা তাঁহারা ইম্পীরিয়লবায়ুগ্রস্ত, তখন মনের মধ্যে স্বস্তি বোধ করি না।

পাঠকেরা বলিতে পারেন, তোমার অত ভয় করিবার প্রয়োজন কী, যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে-ব্যক্তি ইম্পীরিয়লিজ্‌মের বুলি আওড়াক বা নাই আওড়াক তোমার মন্দ করিতে ইচ্ছা করিলে সে তো অনায়াসে করিতে পারে।

অনায়াসে করিতে পারে না। কেননা হাজার হইলেও দয়াধর্ম একেবারে ছাড়া কঠিন। লজ্জাও একটা আছে। কিন্তু একটা বড়ো-গোছের বুলি যদি কাহাকেও পাইয়া বসে, তবে তাহার পক্ষে নিষ্ঠুরতা ও অন্যায় সহজ হইয়া উঠে।

অনেক লোকে জন্তুকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে পীড়া বোধ করে। কিন্তু কষ্ট দেওয়ার একটা নাম যদি দেওয়া যায় "শিকার" তবে সে-ব্যক্তি আনন্দের সহিত হত-আহত নিরীহ পাখির তালিকা বৃদ্ধি করিয়া গৌরব বোধ করে। নিশ্চয়ই, বিনা-উপলক্ষ্যে যে-ব্যক্তি পাখির ডানা ভাঙিয়া দেয়, সে-ব্যক্তি শিকারির চেয়ে নিষ্ঠুর, কিন্তু পাখির তাহাতে বিশেষ সান্ত্বনা নাই। বরঞ্চ অসহায় পক্ষিকুলের পক্ষে স্বভাবনিষ্ঠুরের চেয়ে শিকারির দল অনেক বেশি নিদারুণ।

যাঁহারা ইম্পীরিয়লিজ্‌মের খেয়ালে আছেন, তাঁহারা দুর্বলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে অকাতরে নির্মম হইতে পারেন এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই, পৃথিবীর নানাদিকেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে।

রাশিয়া, ফিনল্যাণ্ড-পোল্যাণ্ডকে নিজের বিপুল কলেবরের সহিত একেবারে বেমালুম মিশাইয়া লইবার জন্য যে কী পর্যন্ত চাপ দিতেছে, তাহা সকলেই জানেন। এতদূর পর্যন্ত কখনোই সম্ভব হইত না যদি না রাশিয়া মনে করিত, তাহার অধীন দেশের স্বাভাবিক বৈষম্যগুলি জবরদস্তির সহিত দূর করিয়া দেওয়াই ইম্পীরিয়লিজম নামক একটা সর্বাঙ্গীণ বৃহৎ স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই স্বার্থকে রাশিয়া পোল্যাণ্ড-ফিনল্যাণ্ডেরও স্বার্থ বলিয়া গণ্য করে।

লর্ড কার্জনও সেই ভাবেই বলিতেছেন, জাতীয়তার কথা ভুলিয়া এম্পায়ারের স্বার্থকে তোমাদের নিজের স্বার্থ করিয়া তোলো।

কোনো শক্তিমানের কানে এ-কথা বলিলে তাহার ভয় পাইবার কারণ নাই; কেননা, শুধু কথায় সে ভুলিবে না। বস্তুতই তাহার স্বার্থ কড়ায় গণ্ডায় সপ্রমাণ হওয়া চাই। অর্থাৎ সে-স্থলে তাহাকে দলে টানিতে গেলে নিজের স্বার্থও যথেষ্টপরিমাণে

বিসর্জন না দিলে তাহার মন পাওয়া যাইবে না। অতএব, সেখানে অনেক মধু ঢালিতে হয়, অনেক তেল খরচ না করিয়া চলে না।

ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। ইংরেজ ক্রমাগতই তাহাদের কানে মন্ত্র আওড়াইতেছে, "যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব," কিন্তু তাহারা শুধু মন্ত্রে ভুলিবার নয়—পণের টাকা গনিয়া দেখিতেছে।

হতভাগ্য আমাদের বেলায় মন্ত্রেরও কোনো প্রয়োজন নাই, পণের কড়ি তো দূরে থাক!

আমাদের বেলায় বিচার্য এই যে, বিদেশীয়ের সহিত ভেদবুদ্ধি জাতীয়তার পক্ষে আবশ্যক কিন্তু ইম্পীরিয়লিজ্‌মের পক্ষে প্রতিকূল; অতএব সেই ভেদবুদ্ধির যে-সকল কারণ আছে, সেগুলাকে উৎপাটন করা কর্তব্য।

কিন্তু সেটা করিতে গেলে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে যে একটা ঐক্য জমিয়া উঠিতেছে, সেটাকে কোনোমতে জমিতে না দেওয়াই শ্রেয়। সে যদি খণ্ড খণ্ড চূর্ণ চূর্ণ অবস্থাতেই থাকে, তবে তাহাকে আত্মসাৎ করা সহজ।

ভারতবর্ষের মতো এতবড়ো দেশকে এক করিয়া তোলার মধ্যে একটা গৌরব আছে। ইহাকে চেষ্টা করিয়া বিচ্ছিন্ন রাখা ইংরেজের মতো অভিমানী জাতির পক্ষে লজ্জার কথা।

কিন্তু ইম্পীরিয়লিজ্‌ম-মন্ত্রে এই লজ্জা দূর হয়। ব্রিটিশ এম্পায়ারের মধ্যে এক হইয়া যাওয়াই ভারতবর্ষের পক্ষে যখন পরমার্থলাভ, তখন সেই মহদুদ্দেশে ইহাকে জাঁতায় পিষিয়া বিশ্লিষ্ট করাই "হিয়ুম্যানিটি"।

ভারতবর্ষের কোনো স্থানে তাহার স্বাধীন শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া ইংরেজ-সভানীতি অনুসারে নিশ্চয়ই লজ্জাকর; কিন্তু যদি মন্ত্র বলা যায় "ইম্পীরিয়লিজ্‌ম"—তবে যাহা মনুষ্যত্বের পক্ষে একান্ত লজ্জা তাহা রাষ্ট্রনীতিকতার পক্ষে চূড়ান্ত গৌরব হইয়া উঠিতে পারে।

নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের জন্য একটি বৃহৎ দেশের অসংখ্য লোককে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পৃথিবীর জনসমাজে সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব নিরুপায় করিয়া তোলা যে কতবড়ো অধর্ম, কী প্রকাণ্ড নিষ্ঠুরতা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই অধর্মের গ্লানি হইতে আপনার মনকে বাঁচাইতে হইলে একটা বড়ো বুলির ছায়া লইতে হয়।

সেসিল রোড্‌স একজন ইম্পীরিয়লবায়ুগ্রস্ত লোক ছিলেন; সেইজন্য দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে বোয়ারদের স্বাতন্ত্র্য লোপ করিবার জন্য তাঁহাদের দলের লোকের কিরূপ আগ্রহ ছিল, তাহা সকলেই জানেন।

ব্যক্তিগত ব্যবহারে যে-সকল কাজকে চৌর্য, মিথ্যাচার বলে, যাহাকে জাল, খুন, ডাকাতি নাম দেয়, একটা ইজ্‌ম্‌-প্রত্যয়যুক্ত শব্দে তাহাকে শোধন করিয়া কতদূর গৌরবের বিষয় করিয়া তোলে, বিলাতি ইতিহাসের মাণ্ডব্যক্তিদের চরিত্র হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

এইজন্য আমাদের কর্তাদের মুখ হইতে ইম্পীরিয়লিজমের আভাস পাইলে আমরা সুস্থির হইতে পারি না। এতবড়ো রথের চাকার তলে যদি আমাদের মর্মস্থান পিষ্ট হয়, তবে ধর্মের দোহাই দিলে কাহারও কর্ণগোচর হইবে না। কারণ, পাছে কাজ ভণ্ডুল করিয়া দেয়, এই ভয়ে মানুষ তাহার বৃহৎ ব্যাপারগুলিতে ধর্মকে আমল দিতে চাহে না।

প্রাচীন গ্রীসে প্রবল এথীনিয়ানগণ যখন দুর্বল মেলিয়ানদের দ্বীপটি অন্যায় নিষ্ঠুরতার সহিত গ্রহণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তখন উভয় পক্ষে কিরূপ বাদানুবাদ হইয়াছিল, গ্রীক ইতিহাসবেত্তা থুকিদিদীস তাহার একটা নমুনা দিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্‌-তত্ত্ব য়ুরোপে কত প্রাচীন—এবং যে-পলিটিকসের ভিত্তির উপরে য়ুরোপীয় সভ্যতা গঠিত, তাহার মধ্যে কিরূপ নিদারুণ ক্রূরতা প্রচ্ছন্ন আছে।

Athenians. But you and we should say what we really think, and aim only at what is possible, for we both alike know that into the discussion of human affairs the question of justice only enters where the pressure of necessity is equal, and that the powerful exact what they can, and the weak grant what they must. ... And we will now endeavour to show that we have come in the interests of our empire, and that in what we are about to say we are only seeking the preservation of your city. For we want to make you ours with the least trouble to ourselves and it is for the interest of us both that you should not be destroyed.

Mel. It may be your interest to be our masters, but how can it be ours to be your slaves ?

Ath. To you the gain will be that by submission you will avert the worst ; and we shall be all the richer for your preservation.

১৩১২

রাজভক্তি

রাজপুত্র আসিলেন। রাজ্যের যত পাত্রের পুত্র তাঁহাকে গণ্ডি দিয়া ঘিরিয়া বসিল—তাহার মধ্যে একটু ফাঁক পায় এমন সাধ্য কাহারও রহিল না। এই ফাঁক যতদূর সম্ভব সংকীর্ণ করিবার জন্য কোটালের পুত্র পাহারা দিতে লাগিল—সেজন্য সে শিরোপা পাইল। তাহার পর? তাহার পর বিস্তর বাজি পুড়াইয়া রাজপুত্র জাহাজে চড়িয়া চলিয়া গেলেন—এবং আমার কথাটি ফুরাল, নটেশাকটি মুড়াল।

ব্যাপারখানা কী? একটি কাহিনীমাত্র। রাজা ও রাজপুত্রের এই বহুদুর্লভ মিলন যত সুদূর, যত স্বল্প, যত নিরর্থক হওয়া সম্ভব তাহা হইল। সমস্ত দেশ পর্যটন করিয়া দেশকে যত কম জানা, দেশের সঙ্গে যত কম যোগস্থাপন হইতে পারে, তাহা বহু ব্যয়ে বহু নৈপুণ্য ও সমারোহসহকারে সমাধা হইল।

অবশ্যই রাজপুরুষেরা ইহার মধ্যে কিছু একটা পলিসি, কিছু একটা প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন—নহিলে এত বাজে খরচ করিবেন কেন? রূপকথার রাজপুত্র কোনো সুপ্ত রাজকন্যাকে জাগাইবার জন্য সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়াছিলেন; আমাদের রাজপুত্রও বোধ করি সুপ্ত রাজভক্তিকে জাগাইবার জন্যই যাত্রা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সোনার কাঠি কি মিলিয়াছিল?

নানা ঘটনায় স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আমাদের রাজপুরুষেরা সোনার কাঠির চেয়ে লোহার কাঠির উপরেই বেশি আস্থা রাখিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রতাপের আড়ম্বরটাকেই তাঁহারা বজ্রগর্ভ বিদ্যুতের মতো ক্ষণে ক্ষণে আমাদের চোখের উপর দিয়া ঝলকিয়া লইয়া যান। তাহাতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়া যায়, হৃৎকম্পও হইতে পারে কিন্তু রাজাপ্রজার মধ্যে অন্তরের বন্ধন দৃঢ় হয় না—পার্থক্য আরও বাড়িয়া যায়।

ভারতবর্ষের অদৃষ্টে এইরূপ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, এখানকার রাজাসনে যাঁহারা বসেন, তাঁহাদের মেয়াদ বেশিদিনকার নহে, অথচ এখানে রাজক্ষমতা যেরূপ অত্যুৎকট, স্বয়ং ভারতসম্রাটেরও সেরূপ নহে। বস্তুত ইংলণ্ডে রাজত্ব করিবার সুযোগ কাহারও নাই; কারণ, সেখানে প্রজাগণ স্বাধীন। ভারতবর্ষ যে অধীন রাজ্য, তাহা ইংরেজ এখানে পদার্পণ করিবামাত্র বুঝিতে পারে। সুতরাং এ-দেশে কর্তৃত্বের দম্ভ ক্ষমতার মত্ততা সহসা সংবরণ করা ক্ষুদ্রপ্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

বনিয়াদি রাজাকে রাজকীয় নেশায় টলাইতে পারে না। হঠাৎ-রাজার পক্ষে এই

নেশা একেবারে বিষ। ভারতবর্ষে যাঁহারা কর্তৃত্ব করিতে আসেন, তাঁহারা অধিকাংশই এই মদিরায় অভ্যস্ত নহেন। তাঁহাদের স্বদেশ হইতে এ-দেশের পরিবর্তন অত্যন্ত বেশি। যাঁহারা কোনোকালেই বিশেষ কেহ নহেন, এখানে তাঁহারা একমুহূর্তেই হর্তাকর্তা। এমন অবস্থায় নেশার ঝোঁকে এই নূতনলব্ধ প্রতাপটাকেই তাঁহারা সকলের চেয়ে প্রিয় এবং শ্রেয় জ্ঞান করেন।

প্রেমের পথ নম্রতার পথ। সামান্য লোকেরও হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে নিজের মাথাটাকে তাহার দ্বারের মাপে নত করিতে হয়। নিজের প্রতাপ ও প্রেস্টিজ সম্বন্ধে যে-ব্যক্তি হঠাৎ-নবাবের মতো সর্বদাই আপাদমস্তক সচেতন, সে-ব্যক্তির পক্ষে এই নম্রতা দুঃসাধ্য। ইংরেজের রাজত্ব যদি ক্রমাগতই আনা-গোনার রাজত্ব না হইত, যদি এ-দেশে তাহারা স্থায়ী হইয়া কর্তৃত্বের উগ্রতাটা কতকটা পরিমাণে সহ্য করিতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা আমাদের সঙ্গে হৃদয়ের যোগস্থাপনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের অখ্যাত প্রান্ত হইতে কয়েক দিনের জন্য এ-দেশে আসিয়া ইহারা কোনোমতেই ভুলিতে পারে না যে, আমরা কর্তা—এবং সেই ক্ষুদ্র দম্ভটাকেই সর্বদা প্রকাশমান রাখিবার জন্য তাহারা আমাদিগকে সকল বিষয়েই অহরহ দূরে ঠেকাইয়া রাখে এবং কেবলমাত্র প্রবলতার দ্বারা আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা যে তাহাদের রাজনীতিকে স্পর্শ করিতে পারে, এ-কথা তাহারা স্বীকার করিতে কুন্ঠিত হয়। এমন কি, তাহাদের কোনো বিধানে আমরা যে বেদনা অনুভব ও বেদনা প্রকাশ করিব, তাহাও তাহারা স্পর্ধা বলিয়া জ্ঞান করে।

কিন্তু স্বামী যতই কঠোর হউক না কেন সে স্ত্রীর কাছে যে কেবল বাধ্যতা চাহে তাহা নহে, স্ত্রীর হৃদয়ের প্রতিও তাহার ভিতরে ভিতরে আকাঙ্ক্ষা থাকে। অথচ হৃদয় অধিকার করিবার ঠিক পথটি সে গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার দুর্গম্য ঔদ্ধত্যে বাধা দেয়। যদি তাহার সন্দেহ জন্মে যে, স্ত্রী তাহার আধিপত্য সহ্য করে কিন্তু তাহাকে ভালোবাসে না, তবে সে তাহার কঠোরতার মাত্রা বাড়াইতেই থাকে। প্রীতি জন্মাইবার ইহা যে প্রকৃষ্ট উপায় নহে, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

সেইরূপ ভারতবর্ষের ইংরেজ-রাজারা আমাদের কাছ হইতে রাজভক্তির দাবিটুকুও ছাড়িতে পারে না। কিন্তু ভক্তির সম্বন্ধ হৃদয়ের সম্বন্ধ—সে-সম্বন্ধে দান-প্রতিদান আছে—তাহা কলের সম্বন্ধ নহে। সে-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলেই কাছে আসিতে হয়, তাহা শুদ্ধমাত্র জবরদস্তির কর্ম নহে। কিন্তু কাছেও ঘেঁষিব না, হৃদয়ও দিব না—

অথচ রাজভক্তিও চাই। শেষকালে সেই ভক্তিসম্বন্ধে যখন সন্দেহ জন্মে, তখন গুরখা লাগাইয়া, বেত চালাইয়া, জেলে দিয়া ভক্তি আদায় করিতে ইচ্ছা হয়।

ইংরেজ, শাসনের কল চালাইতে চালাইতে হঠাৎ এক-একবার রাজভক্তির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন, কার্জনের আমলে তাহার একটা নমুনা পাওয়া গিয়াছিল।

স্বাভাবিক আভিজাত্যের অভাবে লর্ড কার্জন কর্তৃত্বের নেশায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট অনুভব করা গিয়াছিল। এ গদি ছাড়িতে তাঁহার কিছুতেই মন সরিতেছিল না। এই রাজকীয় আড়ম্বর হইতে অবসৃত হইয়া তাঁহার অন্তরাত্মা "খোঁয়ারি"গ্রস্ত মাতালের মতো আজ যে-অবস্থায় আছে, তাহা যদি আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিতাম, তবে বাঙালিও বোধ হয় আজ তাঁহাকে দয়া করিতে পারিত। এরূপ আধিপত্য লোলুপতা বোধ করি ভারতবর্ষের আর-কোনো শাসনকর্তা এমন করিয়া প্রকাশ করেন নাই। এই লাটসাহেবটি ভারতবর্ষের পূর্বতন বাদশাহের ন্যায় দরবার করিবেন স্থির করিলেন—এবং স্পর্ধাপূর্বক দিল্লিতে সেই দরবারের স্থান করিলেন।

কিন্তু প্রাচ্যরাজামাত্রেই বুঝিতেন দরবার স্পর্ধাপ্রকাশের জন্য নহে; দরবার রাজার সহিত প্রজাদের আনন্দসম্মিলনের উৎসব। সেদিন কেবল রাজোচিত ঐশ্বর্যের দ্বারা প্রজাদিগকে স্তম্ভিত করা নয়, সেদিন রাজোচিত ঔদার্যের দ্বারা তাহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিবার দিন। সেদিন ক্ষমা করিবার, দান করিবার, রাজশাসনকে সুন্দর করিয়া সাজাইবার শুভ অবসর।

কিন্তু পশ্চিমের হঠাৎ-নবাব দিল্লির প্রাচ্য ইতিহাসকে সম্মুখে রাখিয়া এবং বদান্যতাকে সওদাগরি কার্পণ্যদ্বারা খর্ব করিয়া কেবল প্রতাপকেই উগ্রতর করিয়া প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বস্তুত ইংরেজের রাজশ্রী আমাদের কাছে গৌরব লাভ করে নাই। ইহাতে দরবারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেছে। এই দরবারে দুঃসহ দর্পে প্রাচ্যহৃদয় পীড়িত হইয়াছে, লেশমাত্র আকৃষ্ট হয় নাই। সেই প্রচুর অপব্যয় যদি কিছুমাত্র ফল রাখিয়া থাকে, তবে তাহা অপমানের স্মৃতিতে। লোহার কাঠির দ্বারা সোনার কাঠির কাজ সারিবার চেষ্টা যে নিষ্ফল তাহা নহে—তাহাতে উলটা ফল হইয়া থাকে।

এবারে রাজপুত্রকে ভারতবর্ষে আনা হইল। রাজনীতির তরফ হইতে পরামর্শ উত্তম হইয়াছে। কারণ, সাধারণত রাজবংশীয়ের প্রতি ভারতবর্ষীয় হৃদয়ের অভিমুখিতা বহুকালের প্রকৃতিগত। সেইজন্য দিল্লির দরবারে ড্যুক অফ কনট থাকিতে কার্জনের দরবারতক্ত গ্রহণ ভারতবর্ষীয়মাত্রকেই বাজিয়াছিল; এরূপ স্থলে ড্যুকের উপস্থিত থাকাই উচিত ছিল না। বস্তুত প্রজাগণের ধারণা হইয়াছিল যে কার্জন নিজের দম্ভ-প্রচার করিবার জন্যই ইচ্ছাপূর্বক দরবারে ড্যুক অফ কনটের উপস্থিতি ঘটাইয়াছিলেন।

আমরা বিলাতি কায়দা বুঝি না, বিশেষত দরবার ব্যাপারটাই যখন বিশেষভাবে প্রাচ্য, তখন এ উপলক্ষ্যে রাজবংশের প্রকাশ্ত অবমাননা অন্তত পলিসিসংগত হয় নাই।

যাই হ'ক ভারতবর্ষের রাজভক্তিকে নাড়া দিবার জন্ত একবার রাজপুত্রকে সমস্ত দেশের উপর দিয়া বুলাইয়া লওয়া উচিত; বোধ করি এইরূপ পরামর্শ হইয়া থাকিবে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইংরেজ হৃদয়ের কারবার কোনোদিন করে নাই। তাহারা এ-দেশকে হৃদয় দেয়ও নাই এ-দেশের হৃদয় চায়ও নাই, দেশের হৃদয়টা কোথায় আছে তাহার খবরও রাখে না। ইহারা রাজপুত্রের ভারতবর্ষে আগমনব্যাপারটাকে যত স্বল্পফলপ্রদ করা সম্ভব তাহা করিল। আজ রাজপুত্র ভারতবর্ষের মাটি ছাড়িয়া জাহাজে উঠিতেছেন আর আমাদের মনে হইতেছে যেন একটা স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, যেন একটা রূপকথা শেষ হইল। কিছুই হইল না—মনে রাখিবার কিছু রহিল না, যাহা যেমন ছিল তাহা তেমনি রহিয়া গেল।

ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত এ-কথা সত্য। হিন্দু-ভারতবর্ষের রাজভক্তির একটু বিশেষত্ব আছে। হিন্দুরা রাজাকে দেবতুল্য ও রাজভক্তিকে ধর্মস্বরূপে গণ্য করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যগণ এ-কথার যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন ক্ষমতার কাছে এইরূপ অবনত হওয়া আমাদের স্বাভাবিক দীন চরিত্রের পরিচয়।

সংসারের অধিকাংশ সম্বন্ধকেই হিন্দু দৈবসম্বন্ধ না মনে করিয়া থাকিতে পারে না। হিন্দুর কাছে প্রায় কিছুই আকস্মিক সম্বন্ধ নহে। কারণ, হিন্দু জানে, আমাদের কাছে প্রকাশ যতই বিচিত্র ও বিভিন্ন হউক না, মূলশক্তি একই। ভারতবর্ষে ইহা কেবলমাত্র একটা দার্শনিক তত্ত্ব নহে, ইহা ধর্ম,—ইহা পুঁথিতে লিখিবার কালেজে পড়াইবার নহে—ইহা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে উপলব্ধি ও জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহারে প্রতিফলিত করিবার। আমরা পিতামাতাকে দেবতা বলি, স্বামীকে দেবতা বলি, সতী স্ত্রীকে লক্ষ্মী বলি। গুরুজনকে পূজা করিয়া আমরা ধর্মকে তৃপ্ত করি। ইহার কারণ, যে-কোনো সম্বন্ধের মধ্য হইতে আমরা মঙ্গললাভ করি, সেই সম্বন্ধের মধ্যেই আমরা আদি মঙ্গলশক্তিকে স্বীকার করিতে চাই। সেই সকল উপলক্ষ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মঙ্গলময়কে সুদূর স্বর্গে স্থাপনপূর্বক পূজা করা ভারতবর্ষের ধর্ম নহে। পিতামাতাকে যখন আমরা দেবতা বলি, তখন এ মিথ্যাকে আমরা মনে স্থান দিই না যে, তাঁহারা বিশ্বভুবনের ঈশ্বর বা তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি আছে। তাঁহাদের দৈন্ত দুর্বলতা তাঁহাদের মনুষ্যত্ব সমস্তই আমরা নিশ্চিত জানি, কিন্তু ইহাও সেইরূপ নিশ্চিত জানি যে, ইঁহারা পিতামাতারূপে আমাদের যে কল্যাণ সাধন করিতেছেন,

সেই পিতৃমাতৃস্থ জগতের পিতামাতারই প্রকাশ। ইন্দ্র-চন্দ্র-অগ্নি-বায়ুকে যে বেদে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে তাহারও এই কারণ; শক্তিপ্রকাশের মধ্যে ভারতবর্ষ শক্তিমান্ পুরুষের সত্তা অনুভব না করিয়া কোনোদিন তৃপ্ত হয় নাই। এইজন্য বিশ্বভুবনে নানা উপলক্ষ্যে নানা আকারেই ভক্তিবিনম্র ভারতবর্ষের পূজা সমাহৃত হইয়াছে। জগৎ আমাদের নিকট সর্বদাই দেবশক্তিতে সজীব।

এ-কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা যে, আমরা দীনতাবশতই প্রবলতার পূজা করিয়া থাকি। সকলেই জানে গাভীকেও ভারতবর্ষ পূজা করিয়াছে। গাভী যে পশু তাহা সে জানে না, ইহা নহে। মানুষ প্রবল এবং গাভীই দুর্বল। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজ গাভীর নিকট হইতে নানাপ্রকার মঙ্গল লাভ করে। সেই মঙ্গল মানুষ যে নিজের গায়ের জোরে পশুর কাছ হইতে আদায় করিয়া লইতেছে, এই ঔদ্ধত্য ভারতবর্ষের নহে। সমস্ত মঙ্গলের মূলে সে দৈব অনুগ্রহকে প্রণাম করিয়া সকলের সঙ্গে আত্মীয়-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে তবে বাঁচে। কারিকর তাহার যন্ত্রকে প্রণাম করে, যোদ্ধা তাহার তরবারিকে প্রণাম করে, গুণী তাহার বীণাকে প্রণাম করে;—ইহারা যে যন্ত্রকে যন্ত্র বলিয়া জানে না তাহা নহে; কিন্তু ইহাও জানে যন্ত্র একটা উপলক্ষ্যমাত্র—যন্ত্রের মধ্য হইতে সে যে আনন্দ বা উপকার লাভ করিতেছে, তাহা কাঠ বা লোহার দান নহে, কারণ, আত্মাকে আত্মীয় ছাড়া কোনো সামগ্রীমাত্রে স্পর্শ করিতে পারে না। এইজন্য তাহাদের কৃতজ্ঞতা, তাহাদের পূজা যিনি বিশ্বযন্ত্রের যন্ত্রী তাঁহার নিকট এই যন্ত্রযোগেই সমর্পিত হয়।

এই ভারতবর্ষ রাজশাসন-ব্যাপারকে যদি পুরুষরূপে নহে, কেবল যন্ত্ররূপে অনুভব করিতে থাকে, তবে তাহার পক্ষে এমন পীড়াকর আর-কিছুই হইতে পারে না। জড়ের মধ্যেও আত্মার সম্পর্ক অনুভব করিয়া তবে যাহার তৃপ্তি হয়, রাষ্ট্রতন্ত্রের মতো এতবড়ো মানব-ব্যাপারের মধ্যে সে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবকে মূর্তিমান্ না দেখিয়া বাঁচে কিরূপে? আত্মার সঙ্গে আত্মীয়ের সম্বন্ধ যেখানে আছে সেখানেই নত হওয়া যায়—যেখানে তাহা নাই সেখানে নত হইতে অহরহ বাধ্য হইলে অপমান ও পীড়া বোধ হয়; অতএব রাষ্ট্রব্যাপারের মধ্যস্থলে আমরা দেবতার শক্তিকে মঙ্গলের প্রত্যক্ষস্বরূপকে রাজরূপে দেখিতে পাইলে শাসনের বিপুল ভার সহজে বহন করিতে পারি। নহিলে হৃদয় প্রতিক্ষণেই ভাঙিয়া যাইতে থাকে। আমরা পূজা করিতে চাই—রাজতন্ত্রের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সহিত আমাদের প্রাণের যোগ অনুভব করিতে চাই—আমরা বলকে কেবলমাত্র বলরূপে সহ্য করিতে পারি না।

অতএব ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত এ-কথা সত্য। কিন্তু সেই জন্য

রাজা তাহার পক্ষে শুদ্ধমাত্র তামাশার রাজা নহে। রাজাকে সে একটা অনাবশ্যক আড়ম্বরের অঙ্গরূপে দেখিতে ভালোবাসে না। সে রাজাকে যথার্থ সত্যরূপে অনুভব করিতেই ইচ্ছা করে। সে রাজাকে বহুকাল ধরিয়া পাইতেছে না বলিয়া উত্তরোত্তর পীড়িত হইয়া উঠিতেছে। ক্ষণস্থায়ী বহুরাজার দুঃসহভারে এই বৃহৎ দেশ কিরূপে মর্মে মর্মে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, প্রতিদিন কিরূপ নিরুপায়ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে, তাহা অন্তর্যামী ছাড়া কেহ দেখিবার নাই। যাহারা পথিকমাত্র, ছুটির দিকেই যাহাদের মন পড়িয়া আছে, যাহারা পেটের দায়ে নির্বাসনে দিন যাপন করিতেছে, যাহারা বেতন লইয়া এই শাসন-কারখানার কল চালাইয়া যাইতেছে, যাহাদের সহিত আমাদের সামাজিক কোনো সম্বন্ধ নাই—অহরহ পরিবর্তমান এমন উপেক্ষাপরায়ণ জনসম্প্রদায়ের হৃদয়-সম্পর্কশূন্য আপিসিশাসন নিরন্তর বহন করা যে কী দুর্বিষহ তাহা ভারতবর্ষই জানে। রাজভক্তিতে দীক্ষিত ভারতবর্ষের অন্তঃকরণ কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছে যে, হে ভারতের প্রতি বিমুখ ভগবান, আমি এই সকল ক্ষুদ্র রাজা ক্ষণিক রাজা অনেক রাজা আর সহিতে পারি না, আমাকে এক রাজা দাও। এমন রাজা দাও যিনি বলিতে পারিবেন, ভারতবর্ষ আমারই রাজ্য ; বণিকের নয়, খনিকের নয়, চা-করের নয়, ল্যাঙ্কাশিয়রের নয় ;—ভারতবর্ষ যাহাকে অন্তরের সহিত বলিতে পারিবে, আমারই রাজা ; হ্যালিডে রাজা নয়, ফুলর রাজা নয়, পায়োনিয়র-সম্পাদক রাজা নয়। রাজপুত্র আসুন, ভারতের রাজতক্তে বসুন, তাহা হইলে স্বভাবতই তাঁহার নিকট ভারতবর্ষই মুখ্য এবং ইংলণ্ড গৌণ হইয়া উঠিবে। তাহাতেই ভারতের মঙ্গল এবং ইংলণ্ডের স্থায়ী লাভ। কারণ, মানুষকে কল দিয়া শাসন করিব, তাহার সহিত হৃদয়ের সম্পর্ক সমাজের সম্পর্ক রাখিব না এ স্পর্ধা ধর্মরাজ কখনোই চিরদিন সহ্য করিতে পারেন না—ইহা স্বাভাবিক নহে, ইহা বিশ্ববিধানকে পীড়িত করিতে থাকে। সেইজন্য সুশাসনই বল, শান্তিই বল, কিছুর দ্বারাই এই দারুণ হৃদয়-দুর্ভিক্ষ পূরণ হইতে পারে না। এ-কথা শুনিয়া আইন ক্রুদ্ধ হইতে পারে, পুলিস-সর্প ফণা তুলিতে পারে ; কিন্তু যে ক্ষুধিত সত্য ত্রিশ কোটি প্রজার মর্মের মধ্যে হাহাকার করিতেছে, তাহাকে বলের দ্বারা উচ্ছেদ করিতে পারে এমন শাসনের উপায় কোনো মানবের হাতে নাই, কোনো দানবের হাতে নাই।

ভারতবর্ষীয় প্রজার এই যে হৃদয় প্রত্যহ ক্লিষ্ট হইতেছে, ইহাকেই কতকটা সান্ত্বনা দিবার জন্য রাজপুত্রকে আনা হইয়াছিল—আমাদিগকে দেখানো হইয়াছিল যে, আমাদেরও রাজা আছে। কিন্তু মরীচিকার দ্বারা সত্যকার তৃষ্ণা দূর হয় না।

বস্তুত আমরা রাজশক্তিকে নহে—রাজহৃদয়কে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে ও প্রত্যক্ষ

রাজাকে আমাদের হৃদয় অর্পণ করিতে চাই। ধনপ্রাণ সুরক্ষিত হওয়াই যে প্রজার চরম চরিতার্থতা, প্রভুগণ, এ-কথা মনেও করিয়ো না। তোমরা আমাদিগকে নিতান্ত অবজ্ঞা কর বলিয়াই তোমরা বলিয়া থাক, ইহারা শান্তিতে আছে তবু ইহারা আর কী চায়। ইহা জানিয়ো, হৃদয়ের দ্বারা মানুষের হৃদয়কে বশ করিলে সে ধনপ্রাণ স্বেচ্ছাপূর্বক ত্যাগ করিতে পারে, ভারতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। শান্তি নহে, মানুষ তৃপ্তি চাহে এবং দৈব আমাদের প্রতি যতই বিরূপ হউন, আমরা মানুষ। আমাদেরও ক্ষুধা দূর করিতে হইলে সত্যকার অন্নেরই প্রয়োজন হয়—আমাদের হৃদয় বশ করা ফুলর, প্যুনিটিভ পুলিস এবং জোর-জুলুমের কর্ম নহে।

দেবই হউন আর মানবই হউন, লাটই হউন আর জ্যাকই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, সেখানে ভীত হওয়া নত হওয়ার মতো আত্মাবমাননা, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা, আর নাই। হে ভারতবর্ষ, সেখানে তুমি তোমার চিরদিনের উদার অভয় ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে এই সমস্ত লাঞ্ছনার ঊর্ধ্বে তোমার মস্তককে অবিচলিত রাখো—এই সমস্ত বড়ো বড়ো নামধারী মিথ্যাকে তোমার সর্বান্তঃকরণের দ্বারা অস্বীকার করো, ইহারা যেন বিভীষিকার মুখোশ পরিয়া তোমার অন্তরাত্মাকে লেশমাত্র সংকুচিত করিতে না পারে। তোমার আত্মার দিব্যতা উজ্জ্বলতা পরমশক্তিমত্তার কাছে এই সমস্ত তর্জন গর্জন, এই সমস্ত উচ্চপদের অভিমান, এই সমস্ত শাসন-শোষণের আয়োজন-আড়ম্বর, তুচ্ছ ছেলেখেলামাত্র—ইহারা যদি বা তোমাকে পীড়া দেয় তোমাকে যেন ক্ষুদ্র করিতে না পারে। যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ সেইখানেই নত হওয়ায় গৌরব—যেখানে সে-সম্বন্ধ নাই সেখানে যাহাই ঘটুক, অন্তঃকরণকে মুক্ত রাখিয়ো, ঋজু রাখিয়ো, দীনতা স্বীকার করিয়ো না, ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়ো, নিজের প্রতি অক্ষুণ্ণ আস্থা রাখিয়ো। কারণ, নিশ্চয়ই জগতে তোমার একান্ত প্রয়োজন আছে—সেইজন্য বহুদুঃখেও তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হও নাই। অন্যের বাহ্য অনুকরণের চেষ্টা করিয়া তুমি যে এতকাল পরে একটা ঐতিহাসিক প্রহসন রচনা করিবার জন্য এতদিন বাঁচিয়া আছ, তাহা কখনোই নহে। তুমি যাহা হইবে যাহা করিবে অন্য দেশের ইতিহাসে তাহার নমুনা নাই—তোমার যথাস্থানে তুমি বিশ্বভুবনের সকলের চেয়ে মহৎ। হে আমার স্বদেশ, মহাপর্বতমালার পাদমূলে মহাসমুদ্রপরিবেষ্টিত তোমার আসন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে—এই আসনের সম্মুখে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান বৌদ্ধ বিধাতার আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া বহুদিন হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে, তোমার এই আসন তুমি যখন পুনর্বার একদিন গ্রহণ করিবে, তখন আমি নিশ্চয় জানি, তোমার মন্ত্রে কি জ্ঞানের, কি কর্মের, কি ধর্মের অনেক বিরোধ মীমাংসা হইয়া যাইবে এবং তোমার চরণপ্রান্তে

আধুনিক নিষ্ঠুর পোলিটিক্যাল কালভুজঙ্গের বিদ্বেষী বিষাক্ত দর্প পরিশান্ত হইবে। তুমি চঞ্চল হইয়ো না, লুব্ধ হইয়ো না, ভীত হইয়ো না, তুমি

আত্মানং বিদ্ধি

আপনাকে জানো। এবং

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

উঠ, জাগো, যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই পাইয়া প্রবুদ্ধ হও,

যাহা যথার্থ পথ তাহা ক্ষুরধারশাণিত দুর্গম দুরত্যয়, কবিরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

১৩১২

বহুরাজকতা

সাবেক কালের সঙ্গে এখনকার কালের তুলনা করিতে আমরা ছাড়ি না। সাবেক কাল যখন হাজির নাই, তখন একতরফা বিচারে যাহা হইতে পারে তাহাই ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ বিচারকের মেজাজ অনুসারে কখনো বা সেকালের ভাগ্যে যশ জোটে, কখনো বা একালের জিত হয়। কিন্তু এমন বিচারের উপরে ভরসা রাখা যায় না।

আমাদের পক্ষে মোগলের আমল সুখের ছিল কি ইংরেজের আমল সুখের, গোটাকতক মোটা মোটা সাক্ষীর কথা শুনিয়াই তাহার শেষ নিষ্পত্তি হইতে পারে না। নানা সূক্ষ্ম জিনিসের উপর মানুষের সুখদুঃখ নির্ভর করে—সে-সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখা সম্ভবপর নয়। বিশেষত যেকালটা গেছে সে আপনার অনেক সাক্ষীসাবুদ সঙ্গে লইয়া গেছে।

কিন্তু সেকাল-একালের একটা মস্ত প্রভেদ ছোটোবড়ো আর-সমস্ত প্রভেদের উপরে মাথা তুলিয়া আছে। এই প্রভেদটা যেমন সকলের চেয়ে বড়ো, তেমনি নিশ্চয়ই এই প্রভেদের ফলাফলও আমাদের দেশের পক্ষে সকলের চেয়ে গুরুতর। আমাদের এই ছোটো প্রবন্ধে আমরা সেই প্রভেদটির কথাই সংক্ষেপে পাড়িয়া দেখিতে চাই।

ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের সিংহাসনে একজন বাদশাহ ছিল, তাহার পরে একটি কোম্পানি বসিয়াছিল, এখন একটি জাতি বসিয়াছে। আগে ছিল এক, এখন হইয়াছে

অনেক। এ-কথাটা এতই সোজা যে ইহা প্রমাণ করিবার জন্ত কোনো সূক্ষ্ম তর্কের প্রয়োজন হয় না।

বাদশা যখন ছিলেন, তখন তিনি জানিতেন সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁরই, এখন ইংরেজজাত জানে ভারতবর্ষ তাহাদের সকলেরই। একটা রাজপরিবারমাত্র নহে, সমস্ত ইংরেজজাতটা এই ভারতবর্ষকে লইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

খুব সম্ভব বাদশাহের অত্যাচার যথেষ্ট ছিল—এখন অত্যাচার নাই কিন্তু বোঝা আছে। হাতির পিঠে মাহুত বসিয়া তাহাকে মাঝে মাঝে অঙ্কুশ দিয়া মারে, হাতির পক্ষে তাহা সুখকর নহে। কিন্তু মাহুতের বদলে যদি আর-একটা গোটা হাতিকে সর্বদা বহন করিতে হইত তবে বাহকটি অঙ্কুশের অভাবকেই আপনার একমাত্র সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিত না।

একটিমাত্র দেবতার পূজার থালায় যদি ফুল সাজাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা দেখিতে স্তূপাকার হইতে পারে এবং যে-ব্যক্তি ফুল আহরণ করিয়াছে তাহার পরিশ্রমটাও হয়তো অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে দেখা যায়। কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতাকে একটা করিয়া পাপড়িও যদি দেওয়া যায়, তবে তাহা চোখে দেখিতে যতই সামান্ত হউক না কেন, তলে তলে ব্যাপারখানা বড়ো কম হয় না। তবে কিনা, এই একটা একটা করিয়া পাপড়ির হিসাব এক জায়গায় সংগ্রহ করা কঠিন বলিয়া নিজের অদৃষ্টকে ছাড়া আর কাহাকেও দায়ী করার কথা মনেও উদয় হয় না।

কিন্তু এখানে কাহাকেও বিশেষরূপে দায়ী করিবার কথা হইতেছে না। মোগলের চেয়ে ইংরেজ ভালো কি মন্দ তাহার বিচার করিয়া বিশেষ কোনো লাভ নাই। তবে কিনা অবস্থাটা জানা চাই, তাহা হইলে অনেক বৃথা আশা ও বিফল চেষ্টার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, সেও একটা লাভ।

মনে করো,—এই যে আমরা আক্ষেপ করিয়া মরিতেছি দেশের বড়ো বড়ো চাকরি প্রায় ইংরেজের ভাগ্যে পড়িতেছে ইহার প্রতিকারটা কোন্‌খানে? আমরা মনে করিতেছি বিলাতে গিয়া যদি দ্বারে দ্বারে দুঃখ নিবেদন করিয়া ফিরি, তবে একটা সদ্‌গতি হইতে পারে।

কিন্তু এ-কথা মনে রাখিতে হইবে যাহার বিরুদ্ধে নালিশ, আমরা তাহার কাছেই নালিশ করিতে যাইতেছি।

বাদশাহের আমলে আমরা উজির হইয়াছি, সেনাপতি হইয়াছি, দেশ শাসন করিবার ভার পাইয়াছি, এখন যে তাহা আমাদের আশার অতীত হইয়াছে ইহার কারণ কী? অন্ত গূঢ় বা প্রকাণ্ড কারণ ছাড়িয়া দাও, একটা মোটা কারণ আছে সে তো স্পষ্টই

দেখিতেছি। ইংলণ্ড সমস্ত ইংরেজকে অন্ন দিতে পারে না—ভারতবর্ষে তাহাদের জন্য অন্নসত্র খোলা থাকা আবশ্যক। একটি জাতির অন্নের ভার অনেকটা পরিমাণে আমাদের স্কন্ধে পড়িয়াছে; সেই অন্ন নানারকম আকারে নানারকম পাত্রে জোগাইতে হইতেছে।

যদি সপ্তম এডোআর্ড যথার্থই আমাদের দিল্লির সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকে গিয়া বলিতে পারিতাম যে, হুজুর, অন্নের যদি বড়ো বড়ো গ্রাস সমস্তই বিদেশী লোকের পাতে পড়ে, তবে তোমার রাজ্য টেকে কী করিয়া।

তখন সম্রাটও বলিতেন, তাইতো আমার সাম্রাজ্য হইতে আমার ভোগের জন্য যাহা গ্রহণ করি তাহা শোভা পায়, কিন্তু তাই বলিয়া বারো ভূতে মিলিয়া পাত পাড়িয়া বসিলে চলিবে কেন?

তখন আমার রাজ্য বলিয়া তাঁহার দরদ বোধ হইত এবং অন্যের লুব্ধহস্ত ঠেকাইয়া রাখিতেন। কিন্তু আজ প্রত্যেক ইংরেজই ভারতবর্ষকে 'আমার রাজ্য' বলিয়া জানে। এ-রাজ্যে তাহাদের ভোগের খর্বতা ঘটিতে গেলেই তাহারা সকলে মিলিয়া এমনি কলরব তুলিবে যে, তাহাদের স্বদেশীয় কোনো আইনকর্তা এ-সম্বন্ধে কোনো বদল করিতে পারিবেই না।

এই আমাদের প্রকাণ্ড বহুসহস্রমুখবিশিষ্ট রাজার মুখের গ্রাসে ভাগ বসাইবার জন্য তাহারই কাছে দরবারে যাওয়া নিষ্ফল, এ-কথা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

মোটকথা,—একটা আস্ত জাত নিজের দেশে বাস করিয়া অন্য দেশকে শাসন করিতেছে ইতিপূর্বে এমন ঘটনা ইতিহাসে ঘটে নাই। অত্যন্ত ভালো রাজা হইলেও এ-রকম অবস্থায় রাজার বোঝা বহন করা দেশের পক্ষে বড়ো কঠিন। মুখ্যত অন্য দেশের এবং গৌণত আপনার স্বার্থ যে-দেশকে একসঙ্গে সামলাইতে হয়, তাহার অবস্থা বড়োই শোচনীয়। যে-দেশের ভারকেন্দ্র নিজের এতটা বাহিরে পড়িয়াছে সে মাথা তুলিবে কী করিয়া? না হয় চুরি ডাকাতি বন্ধ হইল, না হয় আদালতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুবিচারই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু বোঝা নামাইব কোথায়?

অতএব কনগ্রেসের যদি কোনো সংগত প্রার্থনা থাকে তবে তাহা এই যে, সম্রাট এডোআর্ডের পুত্রই হউন, স্বয়ং লর্ড কার্জন বা কিচেনারই হউন, অথবা ইংলিশম্যান-পায়োনিয়রের সম্পাদকই হউন, ভালো মন্দ বা মাঝারি যে-কোনো একজন ইংরেজ বাছিয়া পার্লামেন্ট আমাদের রাজা করিয়া দিল্লির সিংহাসনে বসাইয়া দিন। একটা দেশ যতই রসালো হউক না, একজন রাজাকেই পালিতে পারে, দেশসুদ্ধ রাজাকে পারে না।

১৩১২

পথ ও পাথেয়

জেলে প্রতিদিন জাল ফেলে তাহার জালে মাছ ওঠে। একদিন জাল ফেলিতেই হঠাৎ একটা ঘড়া উঠিল, এবং ঘড়ার মুখ যেমন খুলিল অমনি তাহার ভিতর হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার আকার ধরিয়া একটা দৈত্য বাহির হইয়া পড়িল, আরব্য উপন্যাসে এমনি একটা গল্প আছে।

আমাদের খবরের কাগজ প্রতিদিন খবর টানিয়া আনে; কিন্তু তাহার জালে যে সেদিন এমন একটা ঘড়া ঠেকিবে, এবং ঘড়ার মধ্য হইতে এতবড়ো একটা ত্রাসজনক ব্যাপার বাহির হইয়া পড়িবে তাহা আমরা কোনোদিন প্রত্যাশাও করিতে পারি নাই।

নিতান্তই ঘরের দ্বারের কাছ হইতে এমন একটা রহস্য হঠাৎ চক্ষের নিমেষে উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িলে সমস্ত দেশের লোকের মনে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় সেই সুদূরব্যাপী চাঞ্চল্যের সময় কথার এবং আচরণের সত্যতা রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। জলে যখন ঢেউ উঠিতে থাকে তখন ছায়াটা আপনি বিকৃত হইয়া যায়, সেজন্য কাহাকেও দোষ দিতে পারি না। অত্যন্ত ভয় এবং ভাবনার সময় আমাদের চিন্তা ও বাক্যের মধ্যে সহজেই বিকলতা ঘটে অথচ ঠিক এইরূপ সময়েই অবিচলিত এবং নির্বিকার সত্যের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি। প্রতিদিন অসত্য ও অর্ধসত্য আমাদের তত গুরুতর অনিষ্ট করে না কিন্তু সংকটের দিনে তাহার মতো শত্রু আর কেহ নাই।

অতএব ঈশ্বর করুন, আজ যেন আমরা ভয়ে, ক্রোধে, আকস্মিক বিপদে,দুর্বল চিত্তের অতিমাত্র আক্ষেপে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেকে বা অন্যকে ভুলাইবার জন্য কেবল কতকগুলা ব্যর্থ বাক্যের ধুলা উড়াইয়া আমাদের চারিদিকের আবিল আকাশকে আরও অস্বচ্ছ করিয়া না তুলি। তীব্র বাক্যের দ্বারা চাঞ্চল্যকে বাড়াইয়া তোলা হয়, ভয়ের দ্বারা সত্যকে কোনোপ্রকারে চাপা দিবার প্রবৃত্তি জন্মে—অতএব অদ্যকার দিনে হৃদয়াবেগপ্রকাশের উত্তেজনা সংবরণ করিয়া যথাসম্ভব শান্তভাবে যদি বর্তমান ঘটনাকে বিচার না করি, সত্যকে আবিষ্কার ও প্রচার না করি তবে আমাদের আলোচনা কেবল যে ব্যর্থ হইবে তাহা নহে, তাহাতে অনিষ্ট ঘটিবে।

আমাদের হীনাবস্থা বলিয়াই উপস্থিত বিভ্রাটের সময় কিছু অতিরিক্ত ব্যগ্রতার সহিত তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে ইচ্ছা করে, "আমি ইহার মধ্যে

নাই ; এ কেবল অমুক দলের কীর্তি ; এ কেবল অমুক লোকের অন্যায় ; আমি পূর্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি এ-সব ভালো হইতেছে না, আমি তো জানিতাম এমনি একটা ব্যাপার ঘটিবে ।"

কোনো আতঙ্কজনক দুর্ঘটনার পর এই প্রকার অশোভন উৎকণ্ঠার সহিত পরের প্রতি অভিযোগ বা নিজের সুবুদ্ধি লইয়া অভিমান আমার কাছে দুর্বলতার পরিচয় সুতরাং লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে হয় । বিশেষত আমরা প্রবলের শাসনাধীনে আছি এইজন্য রাজপুরুষদের বিরাগের দিনে অন্যকে গালি দিয়া নিজেকে ভালো-মানুষের দলে দাঁড় করাইতে গেলে তাহার মধ্যে কেমন একটা হীনতা আসিয়া পড়েই—অতএব দুর্বল পক্ষের এইরূপ ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ প্রকাশ করিতে না যাওয়াই ভালো ।

তাহার পরে, যাহারা অপরাধ করিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে, নির্মম রাজদণ্ড যাহাদের 'পরে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, আর-কিছু বিচার না করিয়া কেবলমাত্র বিপদ ঘটাইয়াছে বলিয়াই তাহাদের প্রতি তীব্রতা প্রকাশ করাও কাপুরুষতা । তাহাদের বিচারের ভার এমন হাতে আছে যে, অনুগ্রহ বা মমত্ব সেই হাতকে লেশমাত্র দণ্ডলাঘবতার দিকে বিচলিত করিবে না । অতএব ইহার উপরেও আমরা যেটুকু অগ্রসর হইয়া যোগ করিতে যাইব তাহাতে ভীরু স্বভাবের নির্দয়তা প্রকাশ পাইবে । ব্যাপারটাকে আমরা যেমনই দোষাবহ বলিয়া মনে করি না কেন, সে-সম্বন্ধে মতপ্রকাশের আগ্রহে আমরা আত্মসম্ভ্রমের মর্যাদা লঙ্ঘন করিব কেন ? সমস্ত দেশের মাথার উপরকার আকাশে যখন একটা রুদ্ররোষ রক্তবর্ণ হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে তখন সেই বজ্রধরের সম্মুখে আমাদের দায়িত্ববিহীন চাপল্য কেবল যে অনাবশ্যক তাহা নহে তাহা কেমন এক-প্রকার অসংগত ।

যিনি নিজেকে যতই দূরদর্শী বলিয়া মনে করুন না এ-কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঘটনা যে এতদূর আসিয়া পৌঁছিতে পারে তাহা দেশের অধিকাংশ লোক কল্পনা করে নাই । বুদ্ধি আমাদের সকলেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে কিন্তু চোর পালাইলে সেই বুদ্ধির যতটা বিকাশ হয় পূর্বে ততটা প্রত্যাশা করা যায় না ।

অবশ্য, ঘটনা যখন ঘটিয়াছে তখন এ-কথা বলা সহজ যে, ঘটনার সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই ঘটিয়াছে । এবং অমনি এই সুযোগে আমাদের মধ্যে যাঁহারা স্বভাবত কিছু অধিক উত্তেজনাশীল তাঁহাদিগকেও ভর্ৎসনা করিয়া বলা সহজ যে, তোমরা যদি এতটা দূর বাড়াবাড়ি না করিতে তবে ভালো হইত ।

আমরা হিন্দু, বিশেষত বাঙালি, বাক্যে যতই উত্তেজনা প্রকাশ করি কোনো দুঃসাহসিক কাজে কদাচ প্রবৃত্ত হইতে পারি না এই লজ্জার কথা দেশে বিদেশে রাষ্ট্র হইতে বাকি নাই। ইহা লইয়া বাবুসম্প্রদায় বিশেষভাবে ইংরেজের কাছে অহরহ দুঃসহ ভাষায় খোঁটা খাইয়া আসিয়াছে। সর্বপ্রকার উত্তেজনাবাক্য অন্তত বাংলাদেশে যে সম্পূর্ণ নিরাপদ এ সম্বন্ধে আমাদের শত্রুমিত্র কাহারও কোনো সন্দেহমাত্র ছিল না। তাই এ-পর্যন্ত কথায় বার্তায় ভাবে ভঙ্গিতে আমরা যতই বাড়াবাড়ি প্রকাশ করিয়াছি তাহা দেখিয়া কখনো বা পর কখনো বা আত্মীয় বিরক্ত হইয়াছে, রাগ করিয়াছে, আমাদের অসংযমকে প্রহসন বলিয়া উপহাস করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই। বস্তুত বাংলা কাগজে অথবা কোনো বাঙালি বক্তার মুখে যখন অপরিমিত স্পর্ধাবাক্য বাহির হইত তখন এই বলিয়াই বিশেষভাবে স্বজাতির জন্য লজ্জা অনুভব করিয়াছি যে, যাহারা দুঃসাহসিক কাজ করিবার জন্য বিখ্যাত নহে তাহাদের বাক্যের তেজ দীনতাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করে মাত্র। বস্তুত বহুদিন হইতে বাঙালিজাতি ভীরু অপবাদের দুঃসহ ভার বহন করিয়া নতশির হইয়াছে বলিয়াই বর্তমান ঘটনাসম্বন্ধে ন্যায় অন্যায় ইষ্ট অনিষ্ট বিচার অতিক্রম করিয়াও অপমান-মোচনের উপলক্ষ্যে বাঙালির মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই।

অতএব এ-কথাটা সত্য যে, বাংলাদেশের মনের জ্বালা দেখিতে দেখিতে ক্রমশই যে-প্রকার অগ্নিমূর্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইয়া উঠিয়াছে ইহাকে আমাদের দেশের বা অন্য দেশের কোনো জ্ঞানী পুরুষ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া কোনোদিন অনুমান করেন নাই। অতএব আজ আমাদের এই অকস্মাৎ-বুদ্ধিবিকাশের দিনে, যাহাকে আমার ভালো লাগে না তাহাকে ধরিয়া অসাবধানতার জন্য দায়ী করিতে বসা সুবিচারসংগত নহে। আমিও এই গোলমালের দিনে কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে নালিশ উত্থাপন করিতে চাই না। কিন্তু কেমন করিয়া কী ঘটিল এবং তাহার ফলাফলটা কী, সেটা নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করিয়া আমাদের পথ ঠিক করিয়া লইতেই হইবে; সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া যদি একজনের বা অনেকের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য প্রকাশ হয়, তবে দয়া করিয়া এ-কথা নিশ্চয় মনে রাখিবেন যে, আমার বুদ্ধির ক্ষীণতা থাকিতে পারে, আমার দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা থাকা সম্ভব, কিন্তু স্বদেশের হিতের প্রতি ঔদাসীন্য বা হিতৈষীদের প্রতি কিছুমাত্র বিরুদ্ধ ভাববশত যে আমি বিচারে ভুল করিতেছি ইহা কদাচ সত্য নহে। অতএব আমার কথাগুলি যদি বা গ্রাহ্য না-ও করেন আমার অভিপ্রায়ের প্রতি ধৈর্য ও শ্রদ্ধা রক্ষা করিবেন।

বাংলাদেশে কিছুকাল হইতে যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে তাহার সংঘটনে আমাদের কোন

বাঙালির কতটা অংশ আছে তাহার সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া এ-কথা নিশ্চয় বলা যায় যে, কায় বা মন বা বাক্যে ইহাকে আমরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো প্রকারে খাদ্য জোগাইয়াছি। অতএব যে-চিত্তদাহ কেবল পরিমিত স্থান লইয়া বদ্ধ থাকে নাই, প্রকৃতিভেদে যাহার উত্তেজনা আমরা প্রত্যেকে নানাপ্রকারে অনুভব ও প্রকাশ করিয়াছি, তাহারই একটা কেন্দ্রক্ষিপ্ত পরিণাম যদি এইপ্রকার গুপ্ত বিপ্লবের অদ্ভুত আয়োজন হয় তবে ইহার দায় এবং দুঃখ বাঙালিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। জ্বর যখন সমস্ত শরীরকে অধিকার করিয়াই হইয়াছিল তখন হাতের তেলো কপালের চেয়ে ঠাণ্ডা ছিল বলিয়াই মৃত্যুকালে নিজেকে সাধু ও কপালটাকেই যত নষ্টের গোড়া বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবে না। আমরা কী করিব কী করিতে চাই সে-কথা স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই; এই জানি, আমাদের মনে আগুন জ্বলিয়াছিল; সেই আগুন স্বভাবধর্মবশত ছড়াইয়া পড়িতেই ভিজা কাঠ ধোঁয়াইতে থাকিল, শুকনা কাঠ জ্বলিতে লাগিল এবং ঘরের কোণে কোন্খানে কেরোসিন ছিল সে আপনাকে ধারণ করিতে না পারিয়া টিনের শাসন বিদীর্ণ করিয়া একটা বিভীষিকা করিয়া তুলিল।

তা যাই হ'ক, কার্যকারণের পরম্পরের যোগে পরম্পরের ব্যাপ্তি যেমন করিয়াই ঘটুক না কেন, তাই বলিয়া অগ্নি যখন অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলে তখন সব তর্ক ছাড়িয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে এ-সম্বন্ধে মতভেদ হইলে চলিবে না।

বিশেষত কারণটা দেশ হইতে দূর হয় নাই; লোকের চিত্ত উত্তেজিত হইয়া আছে। উত্তেজনা এতই তীব্র যে, যে-সকল সাংঘাতিক ব্যাপার আমাদের দেশে অসম্ভব বলিয়া মনে করা যাইত তাহাও সম্ভবপর হইয়াছে। বিরোধবুদ্ধি এতই গভীর এবং সুদূরবিস্তৃতভাবে ব্যাপ্ত যে, কর্তৃপক্ষ ইহাকে বলপূর্বক কেবল স্থানে স্থানে উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করিয়া কখনোই নিঃশেষ করিতে পারিবেন না, বরঞ্চ ইহাকে আরও প্রবল ও প্রকাণ্ড করিয়া তুলিবেন।

বর্তমান সংকটে রাজপুরুষদের কী করা কর্তব্য তাহা আলোচনা করিতে গেলে তাঁহারা শ্রদ্ধা করিয়া শুনিবেন বলিয়া ভরসা হয় না। আমরা তাঁহাদের দণ্ডশালার দ্বারে বসিয়া তাঁহাদিগকে পোলিটিকাল প্রাজ্ঞতা শিক্ষা দিবার দুরাশা রাখি না। আমাদের বলিবার কথাও অতি পুরাতন এবং শুনিলে মনে হইবে ভয়ে বলিতেছি। তবু সত্য পুরাতন হইলেও সত্য এবং তাহাকে ভুল বুঝিলেও তাহা সত্য। কথাটি এই—শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা—কথা আরও একটু আছে, ক্ষমা শুধু শক্তের ভূষণ নহে সময়বিশেষে শক্তের ব্রহ্মাস্ত্রও ক্ষমা। কিন্তু আমরা যখন শক্তের দলে নহি তখন এই সাত্ত্বিক উপদেশটি লইয়া অধিক আলোচনা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না।

ব্যাপারটা দুই পক্ষকে লইয়া—অথচ দুই পক্ষের মধ্যে আপসে বোঝাপড়ার সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে; একদিকে প্রজার বেদনাকে উপেক্ষা করিয়া বল একান্ত প্রবল মূর্তি ধরিতেছে, অন্যদিকে দুর্বলের নিরাশ মনোরথ সফলতার কোনো পথ না পাইয়া প্রতিদিন মরিয়া হইয়া উঠিতেছে;—এ অবস্থায় সমস্যাটি ছোটো নহে। কারণ, আমরা এই দুই পক্ষের ব্যাপারে কেবল এক পক্ষকে লইয়া যেটুকু চেষ্টা করিতে পারি তাহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। ঝড়ের দিনে হালের মাঝি নিজের খেয়ালে চলিতেছে; আমরা দাঁড় দিয়া যেটুকু রক্ষা করিতে পারি অগত্যা তাহাই করিতে হইবে;—মাঝি সহায় যদি হয় তবে ভালোই, যদি না-ও হয় তবু দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; কারণ, যখন ডুবিতে বসিব তখন অন্যকে গালি পাড়িয়া কোনো সান্ত্বনা পাইব না।

এইরূপ দুঃসময়ে সত্যকে চাপাচুপি দিতে যাওয়া প্রলয়ক্ষেত্রে বসিয়া ছেলেখেলা করা মাত্র। আমরা গবর্মেন্টকে বলিবার চেষ্টা করিতেছি এ-সমস্ত কিছুই নয়, এ কেবল দুই-পাঁচ জন ছেলেমানুষের চিত্তবিকারের পরিচয়। আমি তো এ-প্রকার শূন্যগর্ভ সান্ত্বনাবাক্যের কোনোই সার্থকতা দেখি না। প্রথমত এরূপ ফুৎকারবায়ুমাত্রে আমরা গবর্মেন্টের পলিসির পালকে এক ইঞ্চিও ফিরাইতে পারিব না। দ্বিতীয়ত দেশের বর্তমান অবস্থায় কোথায় কী হইতেছে তাহা নিশ্চয় জানি বলিলে যে মিথ্যা বলা হয় তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গেছে। অতএব বিপদের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াই আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। দায়িত্ববোধবিহীন লঘু বাক্যের দ্বারা কোনো সত্যকার সংকটকে ঠেকানো যায় না—এখন কেবল সত্যের প্রয়োজন।

এখন আমাদের দেশের লোককে অকপট হিতৈষণা হইতে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে গবর্মেন্টের শাসননীতি যে-পন্থাই অবলম্বন করুক এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজের ব্যক্তিগত ব্যবহার আমাদের চিত্তকে যেমনই মথিত করিতে থাক আমাদের পক্ষে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করা তাহার প্রতিকার নহে।

যে কাল পড়িয়াছে এখন ধর্মের দোহাই দেওয়া মিথ্যা। কারণ, রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মনীতির স্থান আছে এ-কথা যে-ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাসে প্রকাশ করে লোকে তাহাকে হয় কাণ্ডজ্ঞানহীন নয় নীতিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া অবজ্ঞা করে। প্রয়োজনের সময় প্রবল পক্ষ ধর্মকে মান্য করা কার্যহন্তারক দীনতা বলিয়া মনে করে, পশ্চিম-মহাদেশের ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে; তৎসত্ত্বেও প্রয়োজনসাধনের উপলক্ষে যদি দুর্বলকে ধর্ম মানিতে উপদেশ দিই তবে উত্তেজনার অবস্থায় তাহারা উত্তর দেয়, এ তো ধর্ম মানা নয় এ ভয়কে মানা।

অল্পদিন হইল যে বোয়ার-যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে জয়লক্ষ্মী যে ধর্মবুদ্ধির পিছন পিছন চলেন নাই সে-কথা কোনো কোনো ধর্মভীরু ইংরেজের মুখ হইতেই শুনা গিয়াছে। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের মনে ভয় উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য তাহাদের গ্রামপল্লী উৎসাদিত করিয়া, ঘরদুয়ার জ্বালাইয়া, খাদ্যদ্রব্য লুটপাট করিয়া নির্বিচারে বহুতর নিরপরাধ নরনারীকে নিরাশ্রয় করিয়া দেওয়া যুদ্ধব্যাপারের একটা অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। "মার্শাল ল" শব্দের অর্থই প্রয়োজনকালে ন্যায়বিচারের বুদ্ধিকে একটা পরম বিঘ্ন বলিয়া নির্বাসিত করিয়া দিবার বিধি এবং তদুপলক্ষে প্রতিহিংসাপরায়ণ মানবপ্রকৃতির বাধামুক্ত পাশবিকতাকেই প্রয়োজনসাধনের সর্বপ্রধান সহায় বলিয়া ঘোষণা করা। প্যুনিটিভ পুলিসের দ্বারা সমস্ত নিরুপায় গ্রামের লোককে বলপূর্বক ভারাক্রান্ত করিবার নির্বিবেক বর্বরতাও এইজাতীয়। এই সকল বিধির দ্বারা প্রচার করা হয় যে, রাষ্ট্রকার্যে বিশুদ্ধ ন্যায়ধর্ম প্রয়োজনসাধনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে।

য়ুরোপের এই অবিশ্বাসী রাষ্ট্রনীতি আজ পৃথিবীর সর্বত্রই ধর্মবুদ্ধিকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। এমন অবস্থায় যখন বিশেষ ঘটনায় বিশেষ কারণে কোনো অধীন জাতি সহসা নিজেদের অধীনতার ঐকান্তিক মূর্তি দেখিয়া সর্বান্তঃকরণে পীড়িত হইয়া উঠে, অথচ নিজেদের সর্বপ্রকার নিরুপায়তার অপমানে উত্তপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে একদল অধীর অসহিষ্ণু ব্যক্তি যখন গোপন পন্থা অবলম্বন করিয়া কেবল ধর্ম-বুদ্ধিকে নহে কর্মবুদ্ধিকেও বিসর্জন দেয় তখন দেশের আন্দোলনকারী বক্তাদিগকেই এইজন্য দায়ী করা বলদর্পে-অন্ধ গায়ের জোরের মূঢ়তা মাত্র।

অতএব দেশের যে-সকল লোক গুপ্তপন্থাকেই রাষ্ট্রহিতসাধনের একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহাদিগকে গালি দিয়াও কোনো ফল হইবে না এবং তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দিতে গেলেও তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। আমরা যে-যুগে বর্তমান, এ-যুগে ধর্ম যখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নিকট প্রকাশ্য ভাবে কুণ্ঠিত, তখন এরূপ ধর্মভ্রংশতার যে-দুঃখ তাহা সমস্ত মানুষকেই নানা আকারে বহন করিতেই হইবে; রাজা ও প্রজা, প্রবল ও দুর্বল, ধনী ও শ্রমী কেহ তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। রাজাও প্রয়োজনের জন্য প্রজাকে দুর্নীতির দ্বারা আঘাত করিবে এবং প্রজাও প্রয়োজনের জন্য রাজাকেও দুর্নীতির দ্বারাই আঘাত করিতে চেষ্টা করিবে এবং যে-সকল তৃতীয় পক্ষের লোক এই সমস্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত নহে তাহাদিগকেও এই অধর্মসংঘর্ষের অগ্নিদাহ সহ্য করিতে হইবে। বস্তুত সংকটে পড়িয়া মানুষ যেদিন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, অধর্মকে বেতন দিতে গেলে সে যে কেবল এক পক্ষেরই বাঁধা গোলামি করে তাহা নহে, সে দুই পক্ষেরই নিমক খাইয়া

যখন সকল পক্ষেই সমান ভয়ংকর হইয়া উঠে তখন তাহার সহায়তাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে একযোগে নির্বাসিত করিয়া দিবার জন্য বিপন্ন সমাজে পরস্পরের মধ্যে রফা চলিতে থাকে। এমনি করিয়াই ধর্মরাজ নিদারুণ সংঘাতের মধ্য হইতেই ধর্মকে জয়ী করিয়া উদ্ধার করিয়া লইতেছেন। যতদিন তাহা সম্পূর্ণ না হয় ততদিন সন্দেহের সঙ্গে সন্দেহের, বিদ্বেষের সঙ্গে বিদ্বেষের এবং কপটনীতির সহিত কপটনীতির সংগ্রামে সমস্ত মানবসমাজ উত্তপ্ত হইতে থাকিবে।

অতএব বর্তমান অবস্থায় যদি উত্তেজিত দেশের লোককে কোনো কথা বলিতে হয় তবে তাহা প্রয়োজনের দিক হইতেই বলিতে হইবে। তাহাদিগকে এই কথা ভালো করিয়া বুঝাইতে হইবে যে, প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয়—কোনো সংকীর্ণ রাস্তা ধরিয়া কাজ সংক্ষেপে করিতে গেলে একদিন দিক হারাইয়া শেষে পথও পাইব না কাজও নষ্ট হইবে। আমার মনের তাগিদ অত্যন্ত বেশি বলিয়া জগতে কোনোদিন রাস্তাও নিজেকে ছাঁটিয়া দেয় না, সময়ও নিজেকে খাটো করে না।

দেশের হিতানুষ্ঠান-জিনিসটা যে কতই বড়ো এবং কতদিকেই যে তাহার অগণ্য শাখাপ্রশাখা প্রসারিত সে-কথা আমরা যেন কোনো সাময়িক আক্ষেপে ভুলিয়া না যাই। ভারতবর্ষের মতো নানা বৈচিত্র্য ও বিরোধগ্রস্ত দেশে তাহার সমস্যা নিতান্তই দুরূহ। ঈশ্বর আমাদের উপর এমন একটি সুমহৎ কর্মের ভার দিয়াছেন, আমরা মানবসমাজের এতবড়ো একটা প্রকাণ্ড জটিল জালের শতসহস্র গ্রন্থিচ্ছেদনের আদেশ লইয়া আসিয়াছি যে, তাহার মাহাত্ম্য যেন একমুহূর্তও বিস্মৃত হইয়া আমরা কোনো-প্রকার চাপল্য প্রকাশ না করি। আদিকাল হইতে জগতে যতগুলি বড়ো বড়ো শক্তির প্রবাহ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সকলগুলিরই কোনো-না-কোনো বৃহৎ ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক স্মৃতির অতীতকালে কোন্ নিগূঢ় প্রয়োজনের দুর্নিবার তাড়নায় যেদিন আর্যজাতি গিরিগুহামুক্ত স্রোতস্বিনীর মতো অকস্মাৎ সচল হইয়া বিশ্বপথে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদেরই এক শাখা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভারতবর্ষের অরণ্যচ্ছায়ায় যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন সেইদিন ভারতবর্ষের আর্যঅনার্যসম্মিলনক্ষেত্রে যে বিপুল ইতিহাসের উপক্রমণিকা গান আরম্ভ হইয়াছিল আজ কি তাহা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ক্ষান্ত হইয়া গিয়াছে? বিধাতা কি তাহা শিশুর ধুলাঘর নির্মাণের মতোই আজ হঠাৎ অনাদরে ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন? তাহার পরে এই ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্মের মিলনমন্ত্র করুণাজলভার-গম্ভীর মেঘমন্দ্রের মতো ধ্বনিত হইয়া এশিয়ার পূর্বসাগরতীরবাসী সমস্ত মঙ্গোলীয়

জাতিদিগকে জাগ্রত করিয়া দিল এবং ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অতিদূর জাপান পর্যন্ত ভিন্নভাষী অনাত্মীয়দিগকে ধর্মসম্বন্ধে ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্মা করিয়া দিয়াছে, ভারতক্ষেত্রে সেই মহৎ শক্তির অভ্যুদয় কি কেবল ভারতের ভাগ্যেই পরিণামহীন পণ্ডতাতেই পর্যবসিত হইয়াছে? তাহার পরে এশিয়ার পশ্চিমতম প্রান্তে দৈববলের প্রেরণায় মানবের আর-এক মহাশক্তি সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া ঐক্যমন্ত্র বহন করিয়া দারুণবেগে পৃথিবী প্লাবিত করিতে বাহির হইল; সেই শক্তিস্রোতকে বিধাতা যে কেবল ভারতবর্ষে আহ্বান করিয়াছেন তাহা নহে, এইখানেই তিনি তাহাকে চিরদিনের জন্য আশ্রয় দিয়াছেন। আমাদের ইতিহাসে এই ব্যাপার কি কোনো একটা আকস্মিক উৎপাত মাত্র? ইহার মধ্যে নিত্যসত্যের কোনো চিরপরিচয় নাই? তাহার পরে য়ুরোপের মহাক্ষেত্রে মানবশক্তি প্রাণের প্রাবল্যে, বিজ্ঞানের কৌতূহলে, পণ্যসংগ্রহের আকাঙ্ক্ষায় যখন বিশ্বাভিমুখী হইয়া বাহির হইল তখন তাহারও একটি বৃহৎ প্রবল ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়াই বিধাতার আহ্বান বহন করিয়া আমাদিগকে আঘাতের দ্বারা জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। এই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্লাবন অপসারিত হইয়া গেলে পর যখন খণ্ড খণ্ড দেশের খণ্ড খণ্ড ধর্মসম্প্রদায় বিরোধবিচ্ছিন্নতায় চতুর্দিককে কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছিল তখন শংকরাচার্য সেই সমস্ত খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতাকে একমাত্র অখণ্ড বৃহত্ত্বের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টায় ভারতবর্ষের প্রতিভারই পরিচয় দিয়াছিলেন। অবশেষে দার্শনিক জ্ঞানপ্রধান সাধনা যখন ভারতবর্ষে জ্ঞানী-অজ্ঞানী অধিকারী-অনধিকারীকে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল, তখন চৈতন্য, নানক, দাদু, কবীর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাতির অনৈক্য শাস্ত্রের অনৈক্যকে ভক্তির পরম ঐক্যে এক করিবার অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ধর্মগুলির বিচ্ছেদক্ষত প্রেমের দ্বারা মিলাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে—তাঁহারাই ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান প্রকৃতির মাঝখানে ধর্মসেতু নির্মাণ করিতেছিলেন। ভারতবর্ষ এখনই যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে তাহা নহে—রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী ইঁহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। অতীতকাল হইতে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের এই এক-একটি অধ্যায় ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রলাপমাত্র নহে,—ইহারা পরস্পর গ্রথিত, ইহারা কেহই একেবারে স্বপ্নের মতো অন্তর্ধান করে নাই,—ইহারা সকলেই রহিয়াছে; ইহারা সন্ধিতেই হউক সংগ্রামেই হউক ঘাতপ্রতিঘাতে বিধাতার অভিপ্রায়কে অপূর্ব বিচিত্ররূপে সংরচিত করিয়া

তুলিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে আর-কোনো দেশেই এতবড়ো বৃহৎ রচনার আয়োজন হয় নাই,—এত জাতি এত ধর্ম এত শক্তি কোনো তীর্থস্থলেই একত্র হয় নাই,—একান্ত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে প্রকাণ্ড সমন্বয়ে বাঁধিয়া তুলিয়া বিরোধের মধ্যেই মিলনের আদর্শকে পৃথিবীর মধ্যে জয়ী করিবার এমন সুস্পষ্ট আদেশ জগতের আর-কোথাও ধ্বনিত হয় নাই। আর সর্বত্র মানুষ রাজ্য বিস্তার করুক, পণ্য বিস্তার করুক, প্রতাপ বিস্তার করুক—ভারতবর্ষের মানুষ দুঃসহ তপস্যা দ্বারা এককে ব্রহ্মকে, জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে সমস্ত অনৈক্য ও সমস্ত বিরোধের মধ্যে স্বীকার করিয়া মানুষের কর্মশালার কঠোর সংকীর্ণতার মধ্যে মুক্তির উদার নির্মল জ্যোতিকে বিকীর্ণ করিয়া দিক—ভারত-ইতিহাসের আরম্ভ হইতেই আমাদের প্রতি এই অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছে। শ্বেত ও কৃষ্ণ, মুসলমান ও খ্রীস্টান, পূর্ব ও পশ্চিম কেহ আমাদের বিরুদ্ধ নহে,—ভারতের পুণ্যক্ষেত্রেই সকল বিরোধ এক হইবার জন্য শত শত শতাব্দী ধরিয়া অতিকঠোর সাধনা করিবে বলিয়াই অতি সুদূরকালে এখানকার তপোবনে একের তত্ত্ব উপনিষদ এমন আশ্চর্য সরল জ্ঞানের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন যে, ইতিহাস তাহাকে নানাদিক দিয়া ব্যাখ্যা করিতে করিতে আজও অন্ত পায় নাই।

তাই আমি অনুরোধ করিতেছিলাম অন্যান্য দেশে মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সংকীর্ণ করিয়া দেখিবেন না—ইহার মধ্যে যে বহুতর আপাতবিরোধ লক্ষিত হইতেছে তাহা দেখিয়া হতাশ হইয়া কোনো ক্ষুদ্র চেষ্টায় নিজেকে অন্ধভাবে নিযুক্ত করিবেন না—করিলেও কোনোমতেই কৃতকার্য হইবেন না এ-কথা নিশ্চয় জানিবেন। বিধাতার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করাই সফলতার একমাত্র উপায়—তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গেলেই ক্ষণিক কার্যসিদ্ধি আমাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া ভয়ংকর ব্যর্থতার মধ্যে ডুবাইয়া মারিবে।

যে-ভারতবর্ষ মানবের সমস্ত মহৎশক্তিপুঞ্জ দ্বারা ধীরে ধীরে এইরূপে বিরাটমূর্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে, সমস্ত আঘাত-অপমান সমস্ত বেদনা যাহাকে এই পরম-প্রকাশের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে, সেই মহাভারতবর্ষের সেবা আমাদের মধ্যে সজ্ঞানে সচেতনভাবে কে করিবেন, কে একান্ত অবিচলিত ভক্তির সহিত সমস্ত ক্ষোভ-অধৈর্য-অহংকারকে এই মহাসাধনায় বিলীন করিয়া দিয়া ভারতবিধাতার পদতলে নিজের নির্মল জীবনকে পূজার অর্ঘ্যের ন্যায় নিবেদন করিয়া দিবেন? ভারতের মহাজাতীয় উদ্‌বোধনের সেই আমাদের পুরোহিতবৃন্দ কোথায়? তাঁহারা যেখানেই থাকুন এ-কথা আপনারা ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিবেন, তাঁহারা চঞ্চল নহেন, তাঁহারা উন্মত্ত নহেন, তাঁহারা কর্মনির্দেশশূন্য স্পর্ধাবাক্যের দ্বারা দেশের

লোকের হৃদয়াবেগকে উত্তরোত্তর সংক্রামক বায়ুরোগে পরিণত করিতেছেন না— নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধি, হৃদয় এবং কর্মনিষ্ঠার অতি অসামান্য সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানের সুগভীর শান্তি ও ধৈর্য এবং ইচ্ছাশক্তির অপরাজিত বেগ ও অধ্যবসায় এই উভয়ের সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে।

কিন্তু যখন দেখা যায় কোনো একটা বিশেষঘটনামূলক উত্তেজনার তাড়নায়, একটা সাময়িক বিরোধের ক্ষুব্ধতায় দেশের অনেক লোক সহসা দেশের হিত করিতে হইবে বলিয়া একমুহূর্তে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত হয়, নিশ্চয় বুঝিতে হইবে হৃদয়াবেগকেই একমাত্র সম্বল করিয়া তাহারা দুর্গম পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা দেশের সুদূর ও সুবিস্তীর্ণ মঙ্গলকে শান্তভাবে সত্যভাবে বিচার করিতে অবস্থাগতিকেই অক্ষম। তাহারা তাহাদের উপস্থিত বেদনাকেই এত তীব্রভাবে অনুভব করে এবং তাহারই প্রতিকারচেষ্টাকে এত উগ্রভাবে মনে রাখে যে, আত্মসংবরণে অক্ষম হইয়া দেশের সমগ্র হিতকে আঘাত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না।

ইতিবৃত্তের শিক্ষাকে ঠিকমতো বিচার করিয়া লওয়া বড়ো কঠিন। সকল দেশের ইতিহাসেই কোনো বৃহৎ ঘটনা যখন মূর্তিগ্রহণ করিয়া দেখা দেয় তখন তাহার অব্যবহিত পূর্বেই আমরা একটা প্রবল আঘাত ও আন্দোলন দেখিতে পাই। রাষ্ট্রে বা সমাজে অসামঞ্জস্যের বোঝা অনেকদিন হইতে নিঃশব্দে পুঞ্জীভূত হইতে হইতে একদিন একটা আঘাতে হঠাৎ তাহা বিপ্লবে ভাঙিয়া পড়ে। সেই সময় দেশের মধ্যে যদি অনুকূল উপকরণ প্রস্তুত থাকে, পূর্ব হইতেই যদি তাহার ভাণ্ডারে নিগূঢ়ভাবে জ্ঞান ও শক্তির সম্বল সঞ্চিত থাকে তবেই সেই বিপ্লবের দারুণ আঘাতকে কাটাইয়া সে-দেশ আপনার নূতন জীবনকে নবীন সামঞ্জস্য দান করিয়া গড়িয়া তোলে। দেশের সেই আভ্যন্তরিক প্রাণসম্বল যাহা অন্তঃপুরের ভাণ্ডারে প্রচ্ছন্নভাবে উপচিত হয় তাহা আমরা দেখিতে পাই না বলিয়া আমরা মনে করি, বুঝি বিপ্লবের দ্বারাতেই দেশ সার্থকতা লাভ করিল; বিপ্লবই যেন মঙ্গলের মূলকারণ এবং মুখ্য উপায়।

ইতিহাসকে এইরূপে বাহ্যভাবে দেখিয়া এ-কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যে-দেশের মর্মস্থানে সৃষ্টি করিবার শক্তি ক্ষীণ হইয়াছে প্রলয়ের আঘাতকে সে কখনোই কাটাইয়া উঠিতে পারে না। গড়িয়া তুলিবার বাঁধিয়া তুলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাদের মধ্যে সজীবভাবে বিদ্যমান, ভাঙনের আঘাত তাহাদের সেই জীবনধর্মকেই তাহাদের সৃজনীশক্তিকেই সচেষ্ট সচেতন করিয়া তোলে। এইরূপে সৃষ্টিকেই নূতন বলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব। নতুবা শুদ্ধমাত্র ভাঙন, নির্বিচার বিপ্লব, কোনোমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।

পালে খুব দমকা হাওয়া লাগিতেই যে-জাহাজ জড়ত্ব দূর করিয়া হুহু করিয়া চলিয়া গেল নিশ্চয় বুঝিতে হইবে আর-কিছু না হউক সে-জাহাজের খোলের তক্তা-গুলার মধ্যে ফাঁক ছিল না; যদি বা পূর্বে ছিল এমন হয় তবে নিশ্চয়ই কোনো এক সময়ে জাহাজের মিস্ত্রি খোলের অন্ধকারে অলক্ষ্যে বসিয়া সেগুলা সারিয়া দিয়াছিল। কিন্তু যে জীর্ণ জাহাজকে একটু নাড়া দিলেই তাহার একটা আলগা তক্তার উপরে আর একটা আলগা তক্তা ঠকঠক করিয়া আঘাত করিতে থাকে ওই দমকা হাওয়া কি তাহার পালের পক্ষে সর্বনেশে জিনিস নয়? আমাদের দেশেও একটুমাত্র নাড়া খাইলেই হিন্দুতে মুসলমানে, উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে সংঘাত বাধিয়া যায় না কি? ভিতরে যখন এমন সব ফাঁক তখন ঝড় কাটাইয়া ঢেউ বাঁচাইয়া স্বরাজের বন্দরে পৌঁছিবার জন্য কি কেবল উত্তেজনাকে উন্মাদনায় পরিণত করাই পরিত্রাণের প্রশস্ত উপায়?

বাহির হইতে দেশ যখন অপমান লাভ করে, যখন আমাদের অধিকারকে বিস্তীর্ণ করিবার ইচ্ছা করিলেই কর্তৃপক্ষদের নিকট হইতে অযোগ্যতার অপবাদ প্রাপ্ত হইতে থাকি তখন আমাদের দেশের কোনো দুর্বলতা কোনো ত্রুটি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। তখন যে আমরা কেবল পরের কাছে মুখরক্ষা করিবার জন্যই গরিমা প্রকাশ করি তাহা নহে, আহত অভিমানে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধিও অন্ধ হইয়া যায়; আমরা যে অবজ্ঞার যোগ্য নহি তাহা চক্ষের পলকেই প্রমাণ করিয়া দিবার জন্য আমরা একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠি আমরা সবই পারি, আমাদের সমস্তই প্রস্তুত, শুদ্ধমাত্র বাহিরের বাধাতেই আমা-দিগকে অক্ষম করিয়া রাখিয়াছে এই কথাই কেবল অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলিবার চেষ্টা হয় তাহা নহে এইরূপ বিশ্বাসে কাজে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আমাদের লাঞ্ছিত হৃদয় উদ্দাম হইয়া উঠে। এই প্রকারে অত্যন্ত চিত্তক্ষোভের সময়েই ইতিহাসকে আমরা ভুল করিয়া পড়ি। মনে স্থির করি, যে-সকল অধীন দেশ স্বাধীন হইয়াছে তাহারা বিপ্লব করিয়াছে বলিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; এই স্বাধীনতাকে হাতে পাওয়া এবং হাতে রাখার জন্য আর কোনো গুণ থাকা আবশ্যক কি না তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া ভাবিতেই চাহি না, অথবা তাড়াতাড়ি করিয়া মনে করি সে-সমস্ত গুণ আমাদের আছে কিংবা উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সেগুলি আপনিই কোনোরকম করিয়া জোগাইয়া যাইবে।

এইরূপে মানুষের চিত্ত যখন অপমানে আহত হইয়া নিজের গৌরব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সমস্ত কঠিন বাধাকে উন্মত্তের মতো একেবারে অস্বীকার করিয়া অসাধ্য চেষ্টায় আত্মহত্যা করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে তখন তাহার মতো

মর্মান্তিক করুণাবহ ব্যাপার জগতে আর কী আছে। এই প্রকার দুশ্চেষ্টা অনিবার্য ব্যর্থতার মধ্যে লইয়া যাইবেই, তথাপি ইহাকে আমরা পরিহাস করিতে পারিব না। ইহার মধ্যে মানবপ্রকৃতির যে পরমদুঃখকর অধ্যবসায় আছে তাহা পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বকালেই নানা উপলক্ষ্যে নানা অসম্ভব প্রত্যাশায় অসাধ্যসাধনে বারংবার দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের ন্যায় নিশ্চিত পরাভবের বহ্নিশিখায় অন্ধভাবে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে।

যাই হ'ক, যেমন করিয়াই হ'ক, শক্তির অভিমান আঘাত পাইয়া জাগিয়া উঠিলে সেটা জাতির পক্ষে যে অনিষ্টকর, তাহা বলা যায় না। তবে কিনা বিরোধের ক্রুদ্ধ আবেগের দ্বারা আমাদের এই উদ্যম হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশের শক্তিকে বিরোধের মূর্তিতেই প্রকাশ করিবার দুর্বুদ্ধি অন্তরে পোষণ করিতেছেন। কিন্তু যাহারা সহজ অবস্থায় কোনোদিন স্বাভাবিক অনুরাগের দ্বারা দেশের হিতানুষ্ঠানে ক্রমান্বয়ে অভ্যস্ত হয় নাই, যাহারা উচ্চসংকল্পকে বহুদিনের ধৈর্যে নানা উপকরণে নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার কাজে নিজের প্রকৃতিকে প্রস্তুত করে নাই, অনেকদিন ধরিয়া রাষ্ট্রচালনার বৃহৎ কার্যক্ষেত্র হইতে দুর্ভাগ্যক্রমে বঞ্চিত হইয়া যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুসরণে সংকীর্ণভাবে জীবনের কাজ করিয়া আসিয়াছে তাহারা হঠাৎ বিষম রাগ করিয়া এক নিমেষে দেশের একটা মস্ত হিত করিয়া ফেলিবে ইহা কোনোমতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। ঠাণ্ডার দিনে নৌকার কাছেও ঘেঁষিলাম না, তুফানের দিনে তাড়াতাড়ি হাল ধরিয়া অসামান্য মাঝি বলিয়া দেশে বিদেশে বাহবা লইব এইরূপ আশ্চর্য ব্যাপার স্বপ্নে ঘটাই সম্ভব। অতএব আমাদিগকেও কাজ একেবারে সেই গোড়ার দিক হইতেই শুরু করিতে হইবে। তাহাতে বিলম্ব হইতে পারে—বিপরীত উপায়ে আরও অনেক বেশি বিলম্ব হইবে।

মানুষ বিস্তীর্ণ মঙ্গলকে সৃষ্টি করে তপস্যাদ্বারা। ক্রোধে বা কামে সেই তপস্যা ভঙ্গ করে, এবং তপস্যার ফলকে একমুহূর্তে নষ্ট করিয়া দেয়। নিশ্চয়ই আমাদের দেশেও কল্যাণময় চেষ্টা নিভৃতে তপস্যা করিতেছে; দ্রুত ফললাভের লোভ তাহার নাই, সাময়িক আশাভঙ্গের ক্রোধকে সে সংযত করিয়াছে; এমন সময় আজ অকস্মাৎ ধৈর্যহীন উন্মত্ততা যজ্ঞক্ষেত্রে রক্তবৃষ্টি করিয়া তাহার বহুদুঃখসঞ্চিত তপস্যার ফলকে কলুষিত করিয়া নষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে।

ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করে না; তাহাকে নিশ্চেষ্টতা বলিয়া মনে করে, তাহাকে নিজের আশু উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান অন্তরায় বলিয়া ঘৃণা করে; উৎপাতের দ্বারা সেই তপঃসাধনাকে চঞ্চল সুতরাং নিষ্ফল করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া প্রবৃত্ত হয়। ফলকে পাকিতে দেওয়াকেই সে ঔদাসীন্য বলিয়া জ্ঞান করে, টান দিয়া

ফলকে ছিঁড়িয়া লওয়াকেই সে একমাত্র পৌরুষ বলিয়া জানে; সে মনে করে যে-মালী প্রতিদিন গাছের তলায় জল সেচন করিতেছে গাছের ডালে উঠিবার সাহস নাই বলিয়াই তাহার এই দীনতা। এ-অবস্থায় মালীর উপর তাহার রাগ হয়, জল দেওয়াকে সে ছোটো কাজ মনে করে। উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ উত্তেজনাকেই জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো সত্য বলিয়া জানে, যেখানে তাহার অভাব দেখে সেখানে সে কোনো সার্থকতাই দেখিতে পায় না।

কিন্তু স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে শিখার যে-প্রভেদ উত্তেজনার সঙ্গে শক্তির সেই প্রভেদ। চকমকি ঠুকিয়া যে-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে তাহাতে ঘরের অন্ধকার দূর হয় না। তাহার আয়োজন স্বল্প তেমনি তাহার প্রয়োজনও সামান্য। প্রদীপের আয়োজন অনেক, তাহার আধার গড়িতে হয়, সলিতা পাকাইতে হয়, তাহার তেল জোগাইতে হয়। যখন যথাযথ মূল্য দিয়া সমস্ত কেনা হইয়াছে এবং পরিশ্রম করিয়া সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তখনই প্রয়োজন হইলে স্ফুলিঙ্গ প্রদীপের মুখে আপনাকে স্থায়ী শিখায় পরিণত করিয়া ঘরকে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। যখন উপযুক্ত চেষ্টার দ্বারা সেই প্রদীপরচনার আয়োজন করিবার উদ্যম জাগিতেছে না, যখন শুদ্ধমাত্র ঘন ঘন চকমকি ঠোকার চাঞ্চল্যমাত্রেই সকলে আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিতেছি তখন সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতেই হইবে, এমন করিয়া কখনোই ঘরে আলো জ্বলিবে না কিন্তু ঘরে আগুন লাগা অসম্ভব নহে।

কিন্তু শক্তিকে সুলভ করিয়া তুলিবার চেষ্টায় মানুষ উত্তেজনার আশ্রয় অবলম্বন করে। এ-কথা ভুলিয়া যায় যে, এই অস্বাভাবিক সুলভতা একদিকে মূল্য কমাইয়া আর-একদিক দিয়া এমন করিয়া কষিয়া মূল্য আদায় করিয়া লয় যে, গোড়াতেই তাহার দুর্মূল্যতা স্বীকার করিয়া লইলে তাহাকে অপেক্ষাকৃত সস্তায় পাওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশেও যখন দেশের হিতসাধনবুদ্ধি নামক দুর্লভ মহামূল্য পদার্থ একটি আকস্মিক উত্তেজনায় আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে অভাবনীয় প্রচুররূপে দেখা দিল তখন আমাদের মতো দরিদ্র জাতিকে পরমানন্দে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। তখন এ-কথা আমাদের মনে করিতেও প্রবৃত্তি হয় নাই যে, ভালো জিনিসের এত সুলভতা স্বাভাবিক নহে। এই ব্যাপক পদার্থকে কাজের শাসনের মধ্যে বাঁধিয়া সংযত সংহত করিতে না পারিলে ইহার প্রকৃত সার্থকতাই থাকে না। রাস্তাঘাটের লোক যুদ্ধ করিব বলিয়া মাতিয়া উঠিলেই তাহাদিগকে সৈন্য জ্ঞান করিয়া যদি সুলভে কাজ সারিবার আশ্বাসে উল্লাস করিতে থাকি তবে সত্যকার লড়াইয়ের বেলায় সমস্ত ধনপ্রাণ দিয়াও এই হঠাৎ-সস্তার সাংঘাতিক দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।

আসল কথা, মাতাল যেমন নিজের এবং মণ্ডলীর মধ্যে নেশাকে কেবলই বাড়াইয়া চলিতেই চায় তেমনি উত্তেজনার মাদকতা আমরা সম্প্রতি যখন অনুভব করিলাম তখন কেবলই সেটাকে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য আমাদের প্রবৃত্তি অসংযত হইয়া উঠিল। অথচ এটা যে একটা নেশার তাড়না সে-কথা স্বীকার না করিয়া আমরা বলিতে লাগিলাম, গোড়ায় ভাবের উত্তেজনারই দরকার বেশি; সেটা রীতিমতো পাকিয়া উঠিলে আপনিই তাহা কাজের দিকে ধাবিত হয়—অতএব দিনরাত যাহারা কাজ কাজ করিয়া বিরক্ত করিতেছে তাহারা ছোটো নজরের লোক, তাহারা ভাবুক নহে—আমরা কেবলই ভাবে দেশ মাতাইব। সমস্ত দেশ জুড়িয়া আমরা ভাবের ভৈরবীচক্র বসাইয়া দিলাম; মন্ত্র এই হইল—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্মো ন বিদ্যতে।

চেষ্টা নহে, কর্ম নহে, কিছুই গড়িয়া তোলা নহে, কেবল ভাবোচ্ছ্বাসই সাধনা, মত্ততাই মুক্তি।

অনেককেই আহ্বান করিলাম, অনেককেই সমবেত করিলাম, জনতার বিস্তার দেখিয়া আনন্দিত হইলাম কিন্তু এমন করিয়া কোনো কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলাম না যাহাতে উদ্‌বোধিত শক্তিকে সকলে সার্থক করিতে পারে। কেবল উৎসাহই দিতে লাগিলাম কাজ দিলাম না। মানুষের মনের পক্ষে এমন অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার আর কিছুই নাই। মনে করিলাম উৎসাহে মানুষকে নির্ভীক করে এবং নির্ভীক হইলে মানুষ কর্মের বাধাবিপত্তিকে লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এইরূপ লঙ্ঘন করিবার উত্তেজনাই তো কর্মসাধনের সর্বপ্রধান অঙ্গ নহে—স্থিরবুদ্ধি লইয়া বিচারের শক্তি, সংযত হইয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি যে তাহার চেয়ে বড়ো। এইজন্যই মাতাল হইয়া মানুষ খুন করিতে পারে কিন্তু মাতাল হইয়া কেহ যুদ্ধ করিতে পারে না। যুদ্ধের মধ্যে কিছু পরিমাণ মত্ততা নাই তাহা নহে কিন্তু অপ্রমত্ততাই প্রভু হইয়া তাহাকে চালিত করে। সেই স্থিরবুদ্ধি দূরদর্শী কর্মোৎসাহী প্রভুকেই বর্তমান উত্তেজনার দিনে দেশ খুঁজিয়াছে, আহ্বান করিয়াছে, ভাগ্যহীন দেশের দৈন্যবশত তাঁহার তো সাড়া পাওয়া যায় না। আমরা যাহারা ছুটিয়া আসি কেবল মদের পাত্রে মদই ঢালি। এঞ্জিনে স্টীমের দমই বাড়াইতে থাকি। যখন প্রশ্ন ওঠে, পথ সমান করিয়া রেল বসাইবার আয়োজন কে করিবে তখন আমরা উত্তর করি, এ-সমস্ত নিতান্ত খুচরা কাজের হিসাব লইয়া মাথা বকাইবার প্রয়োজন নাই—সময়কালে

আপনিই সমস্ত হইয়া যাইবে, মজুরদের কাজ মজুররাই করিবে কিন্তু আমরা যখন চালক তখন আমরা কেবল এঞ্জিনে দমই চড়াইতে থাকিব।

এ-পর্যন্ত যাঁহারা সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা হয়তো আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে কি বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে যে-উত্তেজনার উদ্রেক হইয়াছে তাহা হইতে কোনো শুভফল প্রত্যাশা করিবার নাই?

নাই এমন কথা আমি কখনোই মনে করি না। অসাড় শক্তিকে সচেষ্ট সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য এই উত্তেজনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সচেতন করিয়া তুলিয়া তাহার পরে কী করিতে হইবে? কাজ করাইতে হইবে, না মাতাল করিতেই হইবে? যে-পরিমাণ মদে ক্ষীণপ্রাণকে কাজের উপযোগী করিয়া তোলে তাহার চেয়ে বেশি মদে পুনশ্চ তাহার কাজের উপযোগিতা নষ্ট করিয়া দেয়; যে-সকল সত্যকর্মে ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন সে-কাজে মাতালের শক্তি এবং অভিরুচি বিমুখ হইয়া উঠে। ক্রমে উত্তেজনাই তাহার লক্ষ্য হয় এবং সে দায়ে পড়িয়া কাজের নামে এমন সকল অকাজের সৃষ্টি করিতে থাকে যাহা তাহার মত্ততারই আনুকূল্য করিতে পারে। এই সকল উৎপাত-ব্যাপারকে বস্তুত তাহারা মাদকস্বরূপেই ব্যবহার করে অথচ তাহাকে স্বদেশহিত নাম দিয়া উত্তেজনাকে উচ্চসুরেই বাঁধিয়া রাখে। হৃদয়াবেগ-জিনিসটা উপযুক্ত কাজের দ্বারা বহির্মুখ না হইয়া যখন কেবলই অন্তরে সঞ্চিত ও বর্ধিত হইতে থাকে তখন তাহা বিষের মতো কাজ করে—তাহার অপ্রয়োজনীয় উদ্যম আমাদের স্নায়ুমণ্ডলকে বিকৃত করিয়া কর্মসভাকে নৃত্যসভা করিয়া তোলে।

ঘুম হইতে জাগিয়া নিজের সচল শক্তিকে সত্য বলিয়া জানিবার জন্য প্রথম যে একটা উত্তেজনার আঘাত আবশ্যক তাহাতে আমাদের প্রয়োজন ছিল। মনে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম, ইংরেজ জন্মান্তরের সুকৃতি এবং জন্মকালের শুভগ্রহস্বরূপ আমাদের কর্মহীন জোড়করপুটে আমাদের সমস্ত মঙ্গল আপনি তুলিয়া দিবে। বিধাতানির্দিষ্ট আমাদের সেই বিনাচেষ্টার সৌভাগ্যকে কখনো বা বন্দনা করিতাম কখনো বা তাহার সঙ্গে কলহ করিয়া কাল কাটাইতাম। এই করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে যখন সমস্ত জগৎ আপিস করিতেছে তখন আমাদের সুখনিদ্রা প্রগাঢ় হইতেছিল।

এমন সময় কোথা হইতে একটা আঘাত লাগিল, ঘুমের ঘোরও কাটিল, আগেকার মতো পুনশ্চ সুখস্বপ্ন দেখিবার জন্য নয়ন মুদিবার ইচ্ছাও রহিল না, কিন্তু আশ্চর্য এই, আমাদের সেই স্বপ্নের সঙ্গে জাগরণের একটা বিষয়ে মিল রহিয়াই গেল।

তখন আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম যে, চেষ্টা না করিয়াই আমরা চেষ্টার ফল পাইতে থাকিব, এখনও ভাবিতেছি ফল পাইবার জন্য প্রচলিত পথে চেষ্টাকে

খাটাইবার প্রয়োজন আমরা যেন যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত করিয়া লইতে পারি। স্বপ্নাবস্থাতেও অসম্ভবকে আঁকড়িয়া পড়িয়া ছিলাম, জাগ্রত অবস্থাতেও সেই অসম্ভবকে ছাড়িতে পারিলাম না। শক্তির উত্তেজনা আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বেশি হওয়াতে অত্যাবশ্যক বিলম্বকে অনাবশ্যক বোধ হইতে লাগিল। বাহিরে সেই চিরপুরাতন দৈন্য রহিয়া গিয়াছে, অথচ অন্তরে নবজাগ্রত শক্তির অভিমান মাথা তুলিয়াছে, উভয়ের সামঞ্জস্য করিব কী করিয়া? ধীরে ধীরে? ক্রমে ক্রমে? মাঝখানের প্রকাণ্ড গহ্বরটাকে পাথরের সেতু দিয়া বাঁধিয়া? কিন্তু অভিমান দেরি সহিতে পারে না, মত্ততা বলে আমার সিঁড়ির দরকার নাই আমি উড়িব। সময় লইয়া সুসাধ্যসাধন তো সকলেই পারে, অসাধ্যসাধনে আমরা এখনই জগৎকে চমক লাগাইয়া দিব এই কল্পনা আমাদের উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ, প্রেম যখন জাগে তখন সে গোড়া হইতে সকল কাজই করিতে চায়, সে ছোটো হইতে বড়ো কিছুকেই অবজ্ঞা করে না, কোনো কর্তব্য পাছে অসমাপ্ত থাকে এই আশঙ্কা তাহার ঘুচে না। প্রেম নিজেকে সার্থক করিতেই চায় সে নিজেকে প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত নহে। কিন্তু অপমানের তাড়নায় কেবল আত্মাভিমানমাত্র যখন জাগিয়া উঠে তখন সে বুক ফুলাইয়া বলে, আমি হাঁটিয়া চলিব না আমি ডিঙাইয়া চলিব। অর্থাৎ পৃথিবীর অন্য সকলের পক্ষেই যাহা খাটে তার পক্ষে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই, ধৈর্যের প্রয়োজন নাই, অধ্যবসায়ের প্রয়োজন নাই, সুদূর উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া সুদীর্ঘ উপায় অবলম্বন করা অনাবশ্যক। ফলে দেখিতেছি পরের শক্তির প্রতি গতকল্য যেমন অন্ধভাবে প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া ছিলাম, নিজের শক্তির কাছে আজ তেমনি অন্ধ প্রত্যাশা লইয়া আস্ফালন করিতেছি। তখনও যথাবিহিত কর্মকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা ছিল এখনও সেই চেষ্টাই বর্তমান। কথামালার কৃষকের নিশ্চেষ্ট ছেলেরা যতদিন বাপ বাঁচিয়া ছিল খেতের ধারেও যায় নাই, বাপ চাষ করিত তাহারা দিব্য খাইত—বাপ যখন মরিল তখন খেতে নামিতে বাধ্য হইল কিন্তু চাষ করিবার জন্য নহে—তাহারা স্থির করিল মাটি খুঁড়িয়া একেবারেই দৈবধন পাইবে। বস্তুত চাষের ফসলই যে প্রকৃত দৈবধন এ-কথা শিখিতে তাহাদিগকে অনেক বৃথা সময় নষ্ট করিতে হইয়াছিল। আমরাও যদি এ-কথা সহজে না শিখি যে, দৈবধন কোনো অদ্ভুত উপায়ে গোপনে পাওয়া যায় না, পৃথিবীসুদ্ধ লোক সে-ধন যেমন করিয়া লাভ করিতেছে ও ভোগ করিতেছে আমাদিগকেও ঠিক তেমনি করিয়াই করিতে হইবে, তবে আঘাত এবং দুঃখ কেবল বাড়িয়াই চলিতে থাকিবে এবং বিপথে যতই অগ্রসর হইব ফিরিবার পথও ততই দীর্ঘ ও দুর্গম হইয়া উঠিবে।

অধৈর্য বা অজ্ঞানবশত স্বাভাবিক পন্থাকে অবিশ্বাস করিয়া অসামান্য কিছু একটাকে

ঘটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বেশি প্রবল হইয়া উঠিলে মানুষের ধর্মবুদ্ধি নষ্ট হয় ;—তখন সকল উপকরণকেই উপকরণ, সকল উপায়কেই উপায় বলিয়া মনে হয়—তখন ছোটো ছোটো বালকদিগকেও এই উন্মত্ত ইচ্ছার নিকট নির্মমভাবে বলি দিতে মনে কোনো দ্বিধা উপস্থিত হয় না। আমরা মহাভারতের সোমক রাজার ন্যায় অসামান্য উপায়ে সিদ্ধিলাভের প্রলোভনে আমাদের অতিসুকুমার ছোটো ছেলেটিকেই যজ্ঞের অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া বসিয়াছি—এই নির্বিচার নিষ্ঠুরতার পাপ চিত্রগুপ্তের দৃষ্টি এড়ায় নাই—তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, বালকদের জন্য বেদনায় সমস্ত দেশের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে—দুঃখ আরও কত সহ্য করিতে হইবে জানি না।

দুঃখ সহ্য করা তত কঠিন নহে কিন্তু দুর্মতিকে সংবরণ করা অত্যন্ত দুরূহ। অন্যায়কে অত্যাচারকে একবার যদি কর্মসাধনের সহায় বলিয়া গণ্য করি তবে অন্তঃকরণকে বিকৃতি হইতে রক্ষা করিবার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তি চলিয়া যায় ;—ন্যায়ধর্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে একবার ছাড়িলেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে, কর্মের স্থিরতা থাকে না—তখন বিশ্বব্যাপী ধর্মব্যবস্থার সঙ্গে আবার আমাদের ভ্রষ্ট জীবনের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য প্রচণ্ড সংঘাত অনিবার্য হইয়া উঠে।

সেই প্রক্রিয়া কিছুদিন হইতে আমাদের দেশে চলিতেছে এ-কথা নম্রহৃদয়ে দুঃখের সহিত আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। এই আলোচনা আমাদের পক্ষে একান্ত অপ্রিয়, তাই বলিয়া নীরবে ইহাকে গোপন করিয়া অথবা অত্যুক্তিদ্বারা ইহাকে ঢাকা দিয়া অনিষ্টকে সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে দেওয়া আমাদের কাহারও পক্ষে কর্তব্য নহে।

আমরা সাধ্যমতো বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার না করিয়া দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও উন্নতি সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিব ইহার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিব এমন আশঙ্কা করিবেন না। বহুদিন পূর্বে আমি যখন লিখিয়াছিলাম,

> নিজহস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে,
> তাই যেন রুচে,—
> মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে,
> তাহে লজ্জা ঘুচে ;—

তখন লর্ড কার্জনের উপর আমাদের রাগ করিবার কোনো কারণই ঘটে নাই এবং বহুকাল পূর্বে যখন স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া দেশী পণ্য প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তখন সময়ের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল।

তথাপি দেশে বিদেশী পণ্যের পরিবর্তে স্বদেশী পণ্য প্রচার যতবড়ো কাজই হউক

লেশমাত্র অন্যায়ের দ্বারা তাহার সমর্থন করিতে হইবে এ-কথা আমি কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারি না। বিলম্ব ভালো, প্রতিকূলতা ভালো, তাহাতে ভিত্তিকে পাকা, কর্মকে পরিণত করিয়া তুলে; কিন্তু এমন কোনো ইন্দ্রজাল ভালো নহে যাহা একরাত্রে কোঠা বানাইয়া দেয় এবং আশ্বাস দিয়া বলে আমাকে উচিত মূল্য নগদ তহবিল হইতে দিবার কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু হায়, মনে না কি ভয় আছে যে একমুহূর্তের মধ্যে ম্যাঞ্চেস্টরের কল যদি বন্ধ করিয়া দিতে না পারি তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুঃসাধ্য উদ্দেশ্য, অটল নিষ্ঠার সহিত বহন করিবার শক্তি আমাদের নাই; সেইজন্য এবং কোনোমতে হাতে হাতে পার্টিশনের প্রতিশোধ লইবার তাড়নায় আমরা পথ-বিপথ বিচার করিতেই চাই নাই। এইরূপে চারিদিক হইতে সাময়িক তাগিদের বধিরকর কলকলায় বিভ্রান্ত হইয়া নিজের প্রতি বিশ্বাসহীন দুর্বলতা, স্বভাবকে অশ্রদ্ধা করিয়া, শুভবুদ্ধিকে অমান্য করিয়া অতিসত্বর লাভ চুকাইয়া লইতে চায় এবং পরে অতিদীর্ঘকাল ধরিয়া ক্ষতির নিকাশ করিতে থাকে; মঙ্গলকে পীড়িত করিয়া মঙ্গল পাইব, স্বাধীনতার মূলে আঘাত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিব ইহা কখনো হইতেই পারে না—এ-কথা মনে আনিতেও তাহার ইচ্ছা হয় না।

আমরা অনেকে সম্পূর্ণ জানি না এবং অনেকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক যে, বয়কট-ব্যাপারটা অনেক স্থলে দেশের লোকের প্রতি দেশের লোকের অত্যাচারের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। আমি যেটাকে ভালো বুঝি দৃষ্টান্ত এবং উপদেশের দ্বারা অন্য সকলকে তাহা বুঝাইবার বিলম্ব যদি না সহে, পরের ন্যায্য অধিকারে বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করাকে অন্যায় মনে করিবার অভ্যাস যদি দেশ হইতে চলিয়া যাইতে থাকে তবে অসংযমকে কোনো সীমার মধ্যে আর ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কর্তব্যের নামে যখন অকর্তব্য প্রবল হয় তখন দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে। সেইজন্যই স্বাধীনতালাভের দোহাই দিয়া আমরা যথার্থ স্বাধীনতাধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছি;—দেশে মতের অনৈক্য ও ইচ্ছার বিরোধকে দণ্ড উত্তোলন করিয়া বলপূর্বক একাকার করিয়া দিতে হইবে এইরূপ দুর্মতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমি যাহা করিব সকলকেই তাহা করিতেই হইবে, আমি যাহা বলিব সকলকেই তাহা বলিতেই হইবে এইরূপ বলপ্রয়োগে দেশের সমস্ত মত, ইচ্ছা ও আচরণ-বৈচিত্র্যের অপঘাতমৃত্যুর দ্বারা পঞ্চত্বলাভকেই আমরা জাতীয় ঐক্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছি। মতান্তরকে আমরা সমাজে পীড়ন করিতেছি, কাগজে অতিকুৎসিত ভাবে গালি দিতেছি, এমন কি, শারীরিক আঘাতের দ্বারাও বিরুদ্ধ মতকে শাসন করিব বলিয়া ভয় দেখাইতেছি। আপনারা নিশ্চয় জানেন এবং আমি ততোধিক

নিশ্চয়তররূপে জানি, এরূপ বেনামি শাসনপত্র সময়বিশেষে আমাদের দেশের অনেক লোকেই পাইয়া থাকেন এবং দেশের প্রবীণ ব্যক্তিরাও অপমান হইতে রক্ষা পাইতেছেন না। জগতে অনেক মহাপুরুষ বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপ্রচারের জন্য নিজের প্রাণও বিসর্জন করিয়াছেন, আমরাও মত প্রচার করিতে চাই কিন্তু আর-সকলের দৃষ্টান্ত পরিহার করিয়া একমাত্র কালাপাহাড়কেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছি।

পূর্বেই বলিয়াছি যাহার ভিতরে গড়নের শক্তি নাই ভাঙন তাহার পক্ষে মৃত্যু। জিজ্ঞাসা করি আমাদের দেশে সেই গঠনতত্ত্বটি কোথায় প্রকাশ পাইতেছে? কোন্ সৃজন শক্তি আমাদের মধ্যে ভিতর হইতে কাজ করিয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া এক করিয়া তুলিতেছে? ভেদের লক্ষণই তো চারিদিকে। নিজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাই যখন প্রবল তখন কোনোমতেই আমরা নিজের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না। তাহা যখন পারি না তখন অন্যে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিবেই—কিছুতেই ঠেকাইতে পারিব না। অনেকে ভাবেন এ-দেশের পরাধীনতা মাথাধরার মতো ভিতরের ব্যাধি নহে, তাহা মাথার বোঝার মতো ইংরেজগবর্মেন্টরূপে বাহিরে আমাদের উপরে চাপিয়া আছে—ওইটেকেই যে-কোনোপ্রকারে হ্'ক টান মারিয়া ফেলিলেই পরমুহূর্তে আমরা হালকা হইব। এত সহজ নহে। ইংরেজগবর্মেন্ট আমাদের পরাধীনতা নয়, তাহা আমাদের গভীরতর পরাধীনতার প্রমাণমাত্র।

কিন্তু গভীরতর কারণগুলির কথাকে আমল দিবার মতো অবকাশ ও মনের ভাব আজকাল আমাদের নাই। ভারতবর্ষে এত জাতিবিভাগসত্ত্বেও কেমন করিয়া এক মহাজাতি হইয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিব এই প্রশ্ন যখন উঠে তখন আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ ত্বরান্বিত তাঁহারা এই বলিয়া কথাটা সংক্ষেপে উড়াইয়া দেন যে, সুইজরল্যাণ্ডেও তো একাধিক জাতির সমাবেশ হইয়াছে কিন্তু সেখানে কি তাহাতে স্বরাজের বাধা ঘটিয়াছে?

এমনতরো নজির দেখাইয়া আমরা নিজেদের ভুলাইতে পারি কিন্তু বিধাতার চোখে ধুলা দিতে পারিব না; বস্তুত জাতির বৈচিত্র্য থাকিলেও স্বরাজ চলিতে পারে কিনা সেটা আসল তর্ক নহে। বৈচিত্র্য তো নানাপ্রকারে থাকে—যে-পরিবারে দশজন মানুষ আছে সেখানে তো দশটা বৈচিত্র্য। কিন্তু আসল কথা সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব কাজ করিতেছে কিনা। সুইজরল্যাণ্ড যদি নানাজাতিকে লইয়াই এক হইয়া থাকে তবে ইহাই বুঝিতে হইবে সেখানে নানাত্বকে অতিক্রম করিয়াও একত্ব কর্তা হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। সেখানকার সমাজে এমন একটি ঐক্যধর্ম আছে। আমাদের দেশে বৈচিত্র্যই আছে কিন্তু ঐক্যধর্মের অভাবে বিশ্লিষ্টতাই ভাষা,

জাতি, ধর্ম, সমাজ ও লোকাচারে নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া এই বৃহৎ দেশকে ছোটো বড়ো বহুতর ভাগে বিভাগে শতধাবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

অতএব নজির পাড়িয়া তো নিশ্চিন্ত হইবার কিছু দেখি না। চক্ষু বুজিয়া এ-কথা বলিলে ধর্ম শুনিবে না যে, আমাদের আর-সমস্তই ঠিক হইয়া গিয়াছে এখন কেবল ইংরেজকে কোনোমতে বাদ দিতে পারিলেই বাঙালিতে পাঞ্জাবিতে মারাঠিতে মাদ্রাজিতে হিন্দুতে মুসলমানে মিলিয়া একমনে একপ্রাণে একস্বার্থে স্বাধীন হইয়া উঠিব।

বস্তুত আজ ভারতবর্ষে যেটুকু ঐক্য দেখিয়া আমরা সিদ্ধিলাভকে আসন্ন জ্ঞান করিতেছি তাহা যান্ত্রিক তাহা জৈবিক নহে। ভারতবর্ষের ভিন্ন জাতির মধ্যে সেই ঐক্য জীবনধর্মবশত ঘটে নাই—পরজাতির এক শাসনই আমাদিগকে বাহিরের বন্ধনে একত্র জোড়া দিয়া রাখিয়াছে।

সজীব পদার্থ অনেক সময় যান্ত্রিকভাবে একত্র থাকিতে থাকিতে জৈবিকভাবে মিলিয়া যায়। এমনি করিয়া ভিন্ন শ্রেণীর ডালে ডালে জুড়িয়া বাঁধিয়া কলম লাগাইতে হয়। কিন্তু যতদিন না কালক্রমে সেই সজীব জোড়টি লাগিয়া যায় ততদিন তো বাহিরের শক্ত বাঁধনটা খুলিলে চলে না। অবশ্য, দড়ার বাঁধনটা নাকি গাছের অঙ্গ নহে এইজন্য যেমনভাবেই থাক, যত উপকারই করুক, সে তো গাছকে পীড়া দিবেই কিন্তু বিভিন্নতাকে যখন ঐক্য দিয়া কলেবরবদ্ধ করিতে হইবে তখনই ওই দড়াটাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যতটুকু প্রয়োজন তাহার চেয়ে সে বেশি বাঁধিয়াছে এ-কথা সত্য হইতে পারে কিন্তু তাহার একমাত্র প্রতিকার—নিজের আভ্যন্তরিক সমস্ত শক্তি দিয়া ওই জোড়ের মুখে রসে রস মিলাইয়া, প্রাণে প্রাণ যোগ করিয়া জোড়টিকে একান্ত চেষ্টায় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলা। এ-কথা নিশ্চয় বলা যায় জোড় বাঁধিয়া গেলেই যিনি আমাদের মালী আছেন তিনি আমাদের দড়িদড়া সব কাটিয়া দিবেন। ইংরেজশাসন নামক বাহিরের বন্ধনটাকে স্বীকার করিয়া অথচ তাহার 'পরে জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া সেবার দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান নিরস্ত করার দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে এক করিয়া লইতে হইবে। একত্রসংঘটনমূলক সহস্রবিধ সৃজনের কাজে ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে স্বদেশ রূপে স্বহস্তে গড়িতে ও বিযুক্ত জনসমূহকে স্বজাতিরূপে স্বচেষ্টায় রচনা করিয়া লইতে হইবে।

শুনিয়াছি এমন কথাও কেহ কেহ বলেন যে, ইংরেজের প্রতি দেশের সর্বসাধারণের বিদ্বেষই আমাদিগকে ঐক্যদান করিবে। প্রাচ্য পরজাতীয়ের প্রতি স্বাভাবিক নির্মমতায় ইংরেজ ঔদাসীন্যে ও ঔদ্ধত্যে ভারতবর্ষের ছোটো বড়ো সকলকেই বাথিত করিয়া তুলিতেছে। যত দিন যাইতেছে এই বেদনার তপ্ত শেল গভীর ও গভীরতররূপে

আমাদের প্রকৃতির মধ্যে অনুবিদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। এই নিত্যবিস্তারপ্রাপ্ত বেদনার ঐক্যেই ভারতের নানা জাতি মিলিবার উপক্রম করিতেছে। অতএব এই বিদ্বেষকেই আমাদের প্রধান আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিতে হইবে।

এ-কথা যদি সত্যই হয় তবে বিদ্বেষের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে, ইংরেজ যখনই এ-দেশ ত্যাগ করিবে, তখন কৃত্রিম ঐক্যসূত্রটি তো এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন দ্বিতীয় বিদ্বেষের বিষয় আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইব? তখন আর দূরে খুঁজিতে হইবে না, বাহিরে যাইতে হইবে না, রক্তপিপাসু বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিব।

"ততদিনে যেমন করিয়াই হউক একটা-কিছু সুযোগ ঘটিয়া যাইবেই, আপাতত এই-ভাবেই চলুক" এমন কথা যিনি বলেন তিনি এ-কথা ভুলিয়া যান যে, দেশ তাঁহার একলার সম্পত্তি নহে; ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ ও ইচ্ছা-অনিচ্ছা লইয়া তিনি চলিয়া গেলেও এ-দেশ রহিয়া যাইবে। ট্রাস্টি যেমন সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায় ব্যতীত ন্যস্ত ধনকে নিজের ইচ্ছামতো যেমন-তেমন করিয়া খাটাইতে পারেন না তেমনি দেশ যখন বহুলোকের এবং বহুকালের, তাহার মঙ্গলকে কোনো সাময়িক ক্ষোভের বেগে অদূরদর্শী আপাতবুদ্ধির সংশয়াপন্ন ব্যবস্থার হাতে চক্ষু বুজিয়া সমর্পণ করিবার অধিকার আমাদের কাহারও নাই। স্বদেশের ভবিষ্যৎ যাহাতে দায়গ্রস্ত হইয়া উঠিতেও পারে এমনতরো নিতান্ত ঢিলা বিবেচনার কাজ বর্তমানের প্ররোচনায় করিয়া ফেলা কোনো লোকের পক্ষে কখনোই কর্তব্য হইতে পারে না। কর্মের ফল যে আমার একলার নহে, দুঃখ যে অনেকের।

তাই বারংবার বলিয়াছি এবং বারংবার বলিব—শত্রুতাবুদ্ধিকে অহোরাত্র কেবলই বাহিরের দিকে উদ্যত করিয়া রাখিবার জন্য উত্তেজনার অগ্নিতে নিজের সমস্ত সঞ্চিত সম্বলকে আহুতি দিবার চেষ্টা না করিয়া ওই 'পরের দিক হইতে ভ্রূকুটিকুটিল মুখটাকে ফিরাও, আষাঢ়ের দিনে আকাশের মেঘ যেমন করিয়া প্রচুর ধারাবর্ষণে তাপশুষ্ক তৃষ্ণাতুর মাটির উপরে নামিয়া আসে তেমনি করিয়া দেশের সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এস, নানাদিগভিমুখী মঙ্গলচেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্বপ্রকারে বাঁধিয়া ফেলো: কর্মক্ষেত্রকে সর্বত্র বিস্তৃত করো—এমন উদার করিয়া এতদূর বিস্তৃত করো যে, দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু মুসলমান ও খ্রীস্টান সকলেই যেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে। আমাদের প্রতি রাজার সন্দেহ ও প্রতিকূলতা আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিবে কিন্তু কখনোই আমাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিবে না,—আমরা জয়ী হইবই,—বাধার উপরে উন্মাদের মতো নিজের মাথা ঠুকিয়া নহে, অটল অধ্যবসায়ে তাহাকে শনৈঃ শনৈঃ

অতিক্রম করিয়া কেবল যে জয়ী হইব তাহা নহে, কার্যসিদ্ধির সত্যসাধনাকে দেশের মধ্যে চিরদিনের মতো সঞ্চিত করিয়া তুলিব—আমাদের উত্তরপুরুষদের জন্য শক্তি চালনার সমস্ত পথ একটি একটি করিয়া উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিব।

আজ ওই যে বন্দিশালায় লৌহশৃঙ্খলের কঠোর ঝংকার শুনা যাইতেছে, দণ্ডধারী পুরুষদের পদশব্দে কম্পমান রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে ইহাকেই অত্যন্ত বড়ো করিয়া জানিয়ো না। যদি কান পাতিয়া শোন তবে কালের মহাসংগীতের মধ্যে ইহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। কত যুগ হইতে বিপ্লবের আবর্ত, কত উৎপীড়নের মন্থন, এ-দেশের সিংহদ্বারে কত বড়ো বড়ো রাজপ্রতাপের প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের পরিপূর্ণতা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে, অদ্যকার ক্ষুদ্র দিন তাহার যে ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু ইহার সহিত মিলিত করিতেছে আর কিছুকাল পরে সমগ্রের মধ্যে তাহা কি কোথাও দৃষ্টিগোচর হইবে। ভয় করিব না, ক্ষুব্ধ হইব না, ভারতবর্ষের যে পরম মহিমা সমস্ত কঠোর দুঃখসংঘাতের মধ্যে বিশ্বকবির সৃজনানন্দকে বহন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে—ভক্ত সাধকের প্রশান্ত ধ্যাননেত্রে তাহার অখণ্ড মূর্তি উপলব্ধি করিব। চারিদিকের কোলাহল ও চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে সাধনাকে মহৎলক্ষ্যের দিকে অবিচলিত রাখিব। নিশ্চয় জানিব এই ভারতবর্ষে যুগযুগান্তরীয় মানবচিত্তের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাবেগ মিলিত হইয়াছে—এইখানেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের মন্থন হইবে, জাতির সহিত জাতির মিলন ঘটিবে। বৈচিত্র্য এখানে অত্যন্ত জটিল, বিচ্ছেদ এখানে অত্যন্ত প্রবল, বিপরীতের সমাবেশ এখানে অত্যন্ত বিরোধসংকুল—এত বহুত্ব এত বেদনা এত সংঘাত কোনো দেশই এত দীর্ঘকাল বহন করিয়া বাঁচিতে পারিত না—কিন্তু একটি অতিবৃহৎ অতিমহৎ সমন্বয়ের পরম অভিপ্রায়ই এই সমস্ত একান্ত বিরুদ্ধতাকে ধারণ করিয়া আছে, পরস্পরের আঘাতে কাহাকেও উৎসাদিত হইতে দেয় নাই। এই যে সমস্ত নানা বিচিত্র উপকরণ কালকালান্তর ও দেশদেশান্তর হইতে এখানে আহরিত হইয়াছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে গেলে আমরা নিজেই আহত হইব, তাহার কিছুই করিতে পারিব না। জানি, বাহির হইতে অন্যায় এবং অপমান আমাদের এমন প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতেছে, যাহা আঘাত করিতেই জানে, যাহা ধৈর্য মানে না, যাহা বিনাশ স্বীকার করিয়াও নিজের চরিতার্থতাকেই সার্থকতা বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু সেই আত্মাভিমানের প্রমত্ততাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে সুগম্ভীর আত্মগৌরব সঞ্চার করিবার অন্তরতর শক্তি কি ভারতবর্ষ আমাদিগকে দান করিবেন না? যাহারা নিকটে আসিয়া আমাদের পরিচয় গ্রহণ করিতে ঘৃণা করে, যাহারা দূর হইতে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ উদ্‌গার করে সেই সকল ক্ষণকালীন বায়ুদ্বারা স্ফীত সংবাদপত্রের

মর্মরধ্বনি, সেই বিলাতের টাইমস অথবা এ-দেশের টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার বিদ্বেষতীক্ষ্ণ বাণীই কি অঙ্কুশাঘাতের মতো আমাদিগকে বিরোধের পথে অন্ধবেগে চালনা করিবে? আর ইহা অপেক্ষা সত্যতর নিত্যতর বাণী আমাদের পিতামহদের পবিত্র মুখ দিয়া কি এ-দেশে উচ্চারিত হয় নাই—যে-বাণী দূরকে নিকট করিতে বলে, পরকে আত্মীয় করিতে আহ্বান করে? সেই সকল শান্তিগম্ভীর সনাতন কল্যাণবাক্যই আজ পরাস্ত হইবে? ভারতবর্ষে আমরা মিলিব এবং মিলাইব, আমরা সেই দুঃসাধ্য সাধনা করিব, যাহাতে শত্রুমিত্রভেদ লুপ্ত হইয়া যায়; যাহা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য, যাহা পবিত্রতার তেজে ক্ষমার বীর্যে প্রেমের অপরাজিত শক্তিতে পূর্ণ, আমরা তাহাকে কখনোই অসাধ্য বলিয়া জানিব না, তাহাকে নিশ্চিত মঙ্গল জানিয়া শিরোধার্য করিয়া লইব। দুঃখবেদনার একান্ত পীড়নের মধ্য দিয়াই যাত্রা করিয়া আজ উদার আনন্দে মন হইতে সমস্ত বিদ্রোহ ভাব দূর করিয়া দিব, জানিয়া এবং না জানিয়া বিশ্বের মানব এই ভারতক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের যে পরমাশ্চর্য মন্দির নানা ধর্ম, নানা শাস্ত্র, নানা জাতির সম্মিলনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই সাধনাতেই যোগদান করিব, নিজের অন্তরের সমস্ত শক্তিকে একমাত্র সৃষ্টিশক্তিতে পরিণত করিয়া এই রচনাকার্যে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব। তাহা যদি করিতে পারি, যদি জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে ভারতবর্ষের এই অভিপ্রায়ের মধ্যে সমস্ত প্রাণ দিয়া নিযুক্ত হইতে পারি তবেই মোহমুক্ত পবিত্র দৃষ্টিতে স্বদেশের ইতিহাসের মধ্যে সেই এক সত্য সেই নিত্য সত্যকে দেখিতে পাইব, ঋষিরা যাঁহাকে বলিয়াছেন

স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাম্—

তিনিই সমস্ত লোকের বিধৃতি, তিনিই সমস্ত বিচ্ছেদের সেতু এবং তাঁহাকেই বলা হইয়াছে

তস্য হবা এতস্য ব্রহ্মণোনাম সত্যম্—

সেই যে ব্রহ্ম, নিখিলের সমস্ত প্রভেদের মধ্যে ঐক্যরক্ষার যিনি সেতু ইঁহারই নাম সত্য।

১৩১৫

সমস্যা

আমি "পথ ও পাথেয়" নামক প্রবন্ধে আমাদের কর্তব্য এবং তাহার সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধটিকে সকলে যে অনুকূলভাবে গ্রহণ করিবেন এমন আমি আশা করি নাই।

কোন্‌টা শ্রেয় এবং তাহা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়টি কী তাহা লইয়া তো কোনো দেশেই আজও তর্কের অবসান হয় নাই। মানুষের ইতিহাসে এই তর্ক কত রক্তপাতে পরিণত হইয়াছে এবং একদিক হইতে তাহা বিলুপ্ত হইয়া আর-একদিক দিয়া বার বার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশে দেশহিত সম্বন্ধে মতভেদ এতকাল কেবল মুখে মুখে এবং কাগজে কাগজে, কেবল ছাপাখানায় এবং সভাক্ষেত্রে কথার লড়াইরূপেই সঞ্চরণ করিয়াছে। তাহা কেবল ধোঁয়ার মতো ছড়াইয়াছে, আগুনের মতো জ্বলে নাই।

কিন্তু আজ নাকি সকলেই পরস্পরের মতামতকে দেশের হিতাহিতের সঙ্গে আসন্ন ভাবে জড়িত মনে করিতেছেন, তাহাকে কাব্যালংকারের ঝংকারমাত্র বলিয়া গণ্য করিতেছেন না, সেইজন্য যাঁহাদের সহিত আমার মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে তাঁহাদের প্রতিবাদবাক্যে যদি কখনো পরুষতা প্রকাশ পায় তাহাকে আমি অসংগত বলিয়া ক্ষোভ করিতে পারি না। এ-সময়ে কোনো কথা বলিয়া কেহ অন্নের উপর দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়া যান না ইহা সময়ের একটা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

তবু তর্কের উত্তেজনা যতই প্রবল হ'ক যাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কোনো জায়গায় মতের অনৈক্য ঘটিতেছে দেশের হিতসাধনে তাঁহাদের আন্তরিক নিষ্ঠা আছে এই শ্রদ্ধা যখন নষ্ট হইবার কোনো কারণ দেখি না, তখন আমরা পরস্পর কী কথা বলিতেছি কী ইচ্ছা করিতেছি তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। গোড়াতেই রাগ করিয়া বসিলে অথবা বিরুদ্ধপক্ষের বুদ্ধির প্রতি সন্দেহ করিলে নিজের বুদ্ধিকে হয় তো প্রতারিত করা হইবে। বুদ্ধির তারতম্যেই যে মতের অনৈক্য ঘটে এ-কথা সকল সময়ে খাটে না। অধিকাংশ স্থলে প্রকৃতিভেদেই মতভেদ ঘটে। অতএব মতের ভিন্নতার প্রতি সম্মান রক্ষা করিলে যে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অসম্মান করা হয় তাহা কদাচই সত্য নহে।

এইটুকুমাত্র ভূমিকা করিয়া "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে যে আলোচনা উত্থাপিত করিয়াছিলাম তাহারই অনুবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংসারে বাস্তবের সঙ্গে আমাদিগকে কখনো আপস করিয়া কখনো বা লড়াই

করিয়া চলিতে হয়। অজ্ঞতা বা চাতুরীর জোরে বাস্তবকে লঙ্ঘন করিয়া আমরা অতি ছোটো কাজটুকুও করিতে পারি না।

অতএব দেশহিতের সংকল্প সম্বন্ধে যখন আমরা তর্ক করি তখন সেই তর্কের একটি প্রধান কথা এই যে, সংকল্পটি যতই বড় হ'ক এবং যতই ভাল হ'ক বাস্তবের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য আছে কিনা। কোন্ ব্যক্তির চেক-বহির পাতায় কতগুলা অঙ্ক পড়িয়াছে তাহা লইয়াই তাড়াতাড়ি উৎসাহ করিবার কারণ নাই, কোন্ ব্যক্তির চেক ব্যাঙ্কে চলে তাহাই দেখিবার বিষয়।

সংকটের সময় যখন কাহাকেও পরামর্শ দিতে হইবে তখন এমন পরামর্শ দিলে চলে না যাহা অত্যন্ত সাধারণ। কেহ যখন রিক্তপাত্র লইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে থাকে কেমন করিয়া তাহার পেট ভরিবে তখন তাহাকে এই কথাটি বলিলে তাহার প্রতি হিতৈষিতা প্রকাশ করা হয় না যে, ভালো করিয়া অন্নপান করিলেই ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই উপদেশের জন্যই সে এতক্ষণ কপালে হাত দিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল না। সত্যকার চিন্তার বিষয় যেটা, সেটাকে লঙ্ঘন করিয়া যতবড়ো কথাই বলি না কেন তাহা একেবারেই বাজে কথা।

ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও প্রধান প্রয়োজনটা কী সে-কথা আলোচনা উপলক্ষে আমরা যদি তাহার বর্তমান বাস্তব অভাব ও বাস্তব অবস্থাকে একেবারেই চাপা দিয়া একটা খুব মস্ত নীতিকথা বলিয়া বসি তবে শূন্য তহবিলের চেকের মতো সে-কথার কোনো মূল্য নাই; তাহা উপস্থিতমতো ঋণের দাবি শান্ত করিবার একটা কৌশলমাত্র হইতে পারে কিন্তু পরিণামে তাহা দেনদার বা পাওনাদার কাহারও পক্ষে কিছুমাত্র কল্যাণকর হইতে পারে না।

"পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে আমি যদি সেইরূপ ফাঁকি চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি তবে বিচার-আদালতের ক্ষমা প্রত্যাশা করিতে পারিব না। আমি যদি বাস্তবকে গোপন বা অস্বীকার করিয়া কেবল একটা ভাবের ভুয়া দলিল গড়িয়া থাকি তবে সেটাকে সর্বসমক্ষে খণ্ডবিখণ্ড করাই কর্তব্য। কারণ, ভাব যখন বাস্তবের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া দেখা দেয় তখন গাঁজা বা মদের মতো তাহা মানুষকে অকর্মণ্য এবং উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

কিন্তু বিশেষ অবস্থায় কোন্‌টা যে প্রকৃত বাস্তব তাহা নির্ণয় করা সোজা নহে। সেইজন্যই অনেক সময় মানুষ মনে করে যেটাকে চোখে দেখা যায় সেটাই সকলের চেয়ে বড়ো বাস্তব; যেটা মানবপ্রকৃতির নিচের তলায় পড়িয়া থাকে সেটাই আসল সত্য। কোনো ইংরেজ সাহিত্যসমালোচক রামায়ণের অপেক্ষা ইলিয়ডের শ্রেষ্ঠতা

প্রমাণ করিবার কালে বলিয়াছেন, ইলিয়ড কাব্য অধিকতর হিউম্যান, অর্থাৎ মানব-চরিত্রের বাস্তবকে বেশি করিয়া স্বীকার করিয়াছে;—কারণ উক্ত কাব্যে একিলিস নিহত শত্রুর মৃতদেহকে রথে বাঁধিয়া ট্রয়ের পথের ধুলায় লুটাইয়া বেড়াইয়াছেন আর, রামায়ণে রাম পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করিয়াছেন। ক্ষমা অপেক্ষা প্রতিহিংসা মানব-চরিত্রের পক্ষে অধিকতর বাস্তব এ-কথার অর্থ যদি এই হয় যে, তাহা পরিমাণে বেশি তবে তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু স্থূল পরিমাণই বাস্তবতা পরিমাপের একমাত্র বাটখারা এ-কথা মানুষ কোনোদিনই স্বীকার করিতে পারে না; এইজন্যই মানুষ ঘরভরা অন্ধকারের চেয়ে ঘরের কোণের একটি ক্ষুদ্র শিখাকেই বেশি মান্য করিয়া থাকে।

যাহাই হউক, এ-কথা সত্য যে, মানব-ইতিহাসের বহুতর উপকরণের মধ্যে কোন্‌টা প্রধান কোন্‌টা অপ্রধান, কোন্‌টা বর্তমানের পক্ষে একান্ত বাস্তব এবং কোন্‌টা নহে, তাহা একবার কেবল চোখে দেখিয়াই মীমাংসা করা যায় না। অবশ্য এ-কথা স্বীকার করিতে পারি, উত্তেজনার সময় উত্তেজনাটাকেই সকলের চেয়ে বড়ো সত্য বলিয়া মনে হয়। রাগের সময় এমন কোনো কথাকেই বাস্তবমূলক বলিয়া মনে হয় না যাহা রাগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়। এরূপ সময় মানুষ সহজেই বলিয়া উঠে, "রেখে দাও তোমার ধর্মকথা।" বলে যে, তাহার কারণ এ নয় যে, ধর্মকথাটাই বাস্তব প্রয়োজনের পক্ষে অযোগ্য এবং রুষ্ট বুদ্ধিই তদপেক্ষা উপযোগী। কিন্তু তাহার কারণ এই যে, বাস্তব উপযোগিতার প্রতি আমি দৃক্‌পাত করিতে চাই না, বাস্তব প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাকেই আমি মান্য করিতে চাই।

কিন্তু প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাতে বাস্তবের হিসাব অল্পই করিতে হয়, উপযোগিতায় তাহার চেয়ে অনেক বেশি করা আবশ্যক। মুাটিনির পর যে-ইংরেজরা ভারতবর্ষকে নির্দয়ভাবে দলন করিতে পরামর্শ দিয়াছিল তাহারা মানবচরিত্রের বাস্তবের হিসাবটাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করিয়াই প্রস্তুত করিয়াছিল; রাগের সময় এই প্রকার সংকীর্ণ হিসাব করাই যে স্বাভাবিক অর্থাৎ মাধ্যাগতিতে অধিকাংশ লোকই করিয়া থাকে তাহা ঠিক, কিন্তু লর্ড ক্যানিং ক্ষমার দিক দিয়া যে বাস্তবের হিসাব করিয়াছিলেন তাহা প্রতিহিংসার হিসাব অপেক্ষা বাস্তবকে অনেক বৃহৎপরিমাণে অনেক গভীর এবং দূরবিস্তৃতভাবেই গণনা করিয়াছিল।

কিন্তু যাহারা ক্রুদ্ধ তাহারা ক্যানিঙের ক্ষমানীতিকে সেন্টিমেন্টালিজ্‌ম্‌ অর্থাৎ বাস্তববর্জিত ভাববাতিকতা বলিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হয় নাই। চিরদিনই এইরূপ হইয়া আসিয়াছে। যে-পক্ষ অক্ষৌহিণী সেনাকেই গণনাগৌরবে বড়ো সত্য বলিয়া

মনে করে তাহারা নারায়ণকেই অবজ্ঞাপূর্বক নিজের পক্ষে না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু জয়লাভকেই যদি বাস্তবতার শেষ প্রমাণ বলিয়া জানি তবে নারায়ণ যতই একলা হ'ন এবং যতই ক্ষুদ্রমূর্তি ধরিয়া আসুন তিনিই জিতাইয়া দিবেন।

আমার এত কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, যথার্থ বাস্তব যে কোন্ পক্ষে আছে তাহা সাময়িক উত্তেজনার প্রাবল্য বা লোকগণনার প্রাচুর্য হইতে স্থির করা যায় না। কোনো একটা কথা শাস্ত্ররসাশ্রিত বলিয়াই যে তাহা বাস্তবিকতায় খর্ব, এবং যাহা মানুষকে এত বেগে তাড়না করে যে, পথ দেখিবার কোনো অবসর দেয় না তাহাই যে বাস্তবকে অধিক মান্য করিয়া থাকে এ-কথা আমরা স্বীকার করিব না।

"পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে আমি দুইটি কথার আলোচনা করিয়াছি। প্রথমত ভারতবর্ষের পক্ষে দেশহিতব্যাপারটা কী? অর্থাৎ তাহা দেশী কাপড় পরা বা ইংরেজ তাড়ানো বা আর-কিছু? দ্বিতীয়ত সেই হিতসাধন করিতে হইবে কেমন করিয়া।

ভারতবর্ষের পক্ষে চরম হিত যে কী তাহা বুঝিবার বাধা যে কেবল আমরা নিজেরা উপস্থিত করিতেছি তাহা নহে বস্তুত তাহার সর্বপ্রধান বাধা আমাদের প্রতি ইংরেজের ব্যবহার। ইংরেজ কোনোমতেই আমাদের প্রকৃতিকে মানবপ্রকৃতি বলিয়া গণ্য করিতেই চায় না। তাহারা মনে করে তাহারা যখন রাজা তখন জবাবদিহি কেবলমাত্র আমাদেরই, তাহাদের একেবারেই নাই। বাংলাদেশের একজন ভূতপূর্ব হর্তাকর্তা ভারতবর্ষের চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যতকিছু উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন সমস্তই ভারতবাসীর প্রতি। তাঁহার মত এই যে কাগজগুলাকে উচ্ছেদ করো, সুরেন্দ্রবাঁড়ুজ্যে-বিপিনপালকে দমন করিয়া দাও। দেশকে ঠাণ্ডা করিবার এই একমাত্র উপায় যাহারা অনায়াসে কল্পনা ও নিঃসংকোচে প্রচার করিতে পারে তাহাদের মতো ব্যক্তি যে আমাদের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল ইহাই কি দেশের রক্ত গরম করিয়া তুলিবার পক্ষে অন্তত একটা প্রধান কারণ নহে? ইংরেজের গায়ে জোর আছে বলিয়াই মানবপ্রকৃতিকে মানিয়া চলা কি তাহার পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক? ভারতবর্ষের চাঞ্চল্য নিবারণের পক্ষে ভারতের পেনশনভোগী এলিয়টের কি তাঁহার জাতভাইকে একটি কথাও বলিবার নাই? যাহাদের হাতে ক্ষমতা অজস্র তাহাদিগকেই আত্মসংবরণ করিতে হইবে না, আর যাহারা স্বভাবতই অক্ষম শমদমনিয়মসংযমের সমস্ত ব্যবস্থা কেবল তাহাদেরই জন্য! তিনি লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে ইংরেজের গায়ে যাহারা হাত তোলে তাহারা যাহাতে কোনোমতেই নিষ্কৃতি না পায় সেজন্য সতর্ক হইতে হইবে। আর যে-সকল ইংরেজ ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া কেবলই দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়া ব্রিটিশ বিচার সম্বন্ধে চিরস্থায়ী কলঙ্কের রেখা আগুন দিয়া ভারতবর্ষের চিত্তে দাগিয়া

দাগিয়া দিতেছে তাহাদের সম্বন্ধেই সতর্ক হইবার কোনো প্রয়োজন নাই? বলদর্পে অন্ধ ধর্মবুদ্ধিহীন এইরূপ স্পর্ধাই কি ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনকে এবং ইংরেজের প্রজাকে উভয়কেই ভ্রষ্ট করিতেছে না? অক্ষম যখন অস্থিমজ্জায় জলিয়া জলিয়া মরে, যখন হাতে হাতে অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার কাছে মানবধর্মের আর-কোনো উচ্চতর দাবি তাহার কাছে কোনোমতেই রুচিতে চাহে না তখন কেবল ইংরেজের রক্তচক্ষু পিনাল কোডই ভারতবর্ষে শান্তিবর্ষণ করিতে পারে এত শক্তি ভগবান ইংরেজের হাড়ে দেন নাই। ইংরেজ জেলে দিতে পারে, ফাঁসি দিতে পারে কিন্তু স্বহস্তে অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলিয়া তার পরে পদাঘাতের দ্বারা তাহা নিবাইয়া দিতে পারে না— যেখানে জলের দরকার সেখানে রাজা হইলেও তাহাকে জল ঢালিতে হইবে। তাহা যদি না করে, নিজের রাজদণ্ডকে যদি বিশ্ববিধানের চেয়ে বড়ো বলিয়া জ্ঞান করে, তবে সেই ভয়ংকর অন্ধতাবশতই দেশে পাপের বোঝা স্তূপীকৃত হইয়া একদিন সেই ঘোরতর অসামঞ্জস্য একটা নিদারুণ বিপ্লবে পরিণত না হইয়া থাকিতেই পারে না। প্রতিদিন দেশের অন্তরে অন্তরে যে-চিত্তবেদনা সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে তাহাকে কৃত্রিম বলিয়া আত্মপ্রসাদস্ফীত ইংরেজ উড়াইয়া দিতে পার—মর্লি তাহাকে না মানাই রাষ্ট্রনীতিক সুবুদ্ধিতা বলিয়া মনে করিতে পার এবং এলিয়ট তাহাকে পরাধীন জাতির স্পর্ধামাত্র মনে করিয়া বৃদ্ধবয়সেও দন্তের উপর দন্তঘর্ষণের অসংগত চেষ্টা করিতে পার কিন্তু তাই বলিয়া অক্ষমেরও এই বেদনার হিসাব কি কেহই রাখিতেছে না মনে কর? বলিষ্ঠ যখন মনে করে যে, নিজের অন্যায় করিবার অবাধ অধিকারকে সে সংযত করিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে অনিবার্য প্রতিকারচেষ্টা মানবহৃদয়ে ক্রমশই ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া জলিয়া উঠিতে থাকে তাহাকেই একমাত্র অপরাধী করিয়া দলিত করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিবে তখনই বলের দ্বারাই প্রবল আপনার বলের মূলে আঘাত করে;—কারণ তখন সে অশক্তকে আঘাত করে না—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে-শক্তি আছে সেই বজ্রশক্তির বিরুদ্ধে নিজের বদ্ধমুষ্টি চালনা করে। যদি এমন কথা তোমরা বল ভারতবর্ষে আজ যে ক্ষোভ নিরস্ত্রকেও নিদারুণ করিয়া তুলিতেছে, যাহা অক্ষমের ধৈর্যকেও অভিভূত করিয়া তাহাকে নিশ্চিত আত্মঘাতের অভিমুখে তাড়না করিতেছে তাহাতে তোমাদের কোনো হাত নাই—তোমরা ন্যায়কে কোথাও পীড়িত করিতেছ না, তোমরা স্বভাবসিদ্ধ অবজ্ঞা ও ঔদ্ধত্যের দ্বারা প্রতিদিন তোমাদের উপকারকে উপকৃতের নিকট নিতান্তই অরুচিকর করিয়া তুলিতেছ না, যদি কেবল আমাদেরই দিকে তাকাইয়া এই কথাই বল যে, অকৃতার্থের অসন্তোষ ভারতের পক্ষে অকারণ অপরাধ এবং অপমানের দুঃখদাহ ভারতের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অকৃতজ্ঞতা, তবে

সেই মিথ্যাবাক্যকে রাজতক্তে বসিয়া বলিলেও তাহা ব্যর্থ হইবে এবং তোমাদের টাইম্‌সের পত্রলেখক, ডেলি মেলের সংবাদরচয়িতা এবং পায়োনিয়র-ইংলিশম্যানের সম্পাদকে মিলিয়া তাহাকে ব্রিটিশ পশুরাজের ভীমগর্জনে পরিণত করিলেও সেই অসত্যের দ্বারা তোমরা কোনো শুভফল পাইবে না। তোমার গায়ে জোর আছে বটে তবু সত্যের বিরুদ্ধেও তুমি চক্ষু রক্তবর্ণ করিবে এত জোর নাই। নূতন আইনের দ্বারা নূতন লোহার শিকল গড়িয়া তুমি বিধাতার হাত বাঁধিতে পারিবে না।

অতএব মানবপ্রকৃতির সংঘাতে বিশ্বের নিয়মে যে-আবর্ত পাক খাইয়া উঠিতেছে তাহার ভীষণত্ব স্মরণ করিয়া আমার প্রবন্ধটুকুর দ্বারা তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিব এমন দুরাশা আমার নাই। দুর্বুদ্ধি যখন জাগ্রত হইয়া উঠে তখন এ-কথা মনে রাখিতে হইবে সেই দুর্বুদ্ধির মূলে বহুদিনের বহুতর কারণ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল; এ-কথা মনে রাখিতে হইবে, যেখানে এক পক্ষকে সর্বপ্রকারে অক্ষম ও অনুপায় করা হইয়াছে সেখানে ক্রমশই অপর পক্ষের বুদ্ধিভ্রংশ ও ধর্মহানি ঘটা একেবারেই অনিবার্য—যাহাকে নিয়তই অশ্রদ্ধা অসম্মান করি তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া মানুষ কদাচই আত্মসম্মানকে উজ্জ্বল রাখিতে পারে না—দুর্বলের সংস্রবে সবল হিংস্র হইয়া উঠে এবং অধীনের সংস্রবে স্বাধীন অসংযত হইতে থাকে;—স্বভাবের এই নিয়মকে কে ঠেকাইতে পারে? অবশেষে জমিয়া উঠিতে উঠিতে ইহার কি কোথাও কোনোই পরিণাম নাই? বাধাহীন কর্তৃত্বে চরিত্রের অসংযম যখন বুদ্ধির অন্ধতাকে আনয়ন করে তখন কি কেবল তাহা দরিদ্রেরই ক্ষতি এবং দুর্বলেরই দুঃখের কারণ হয়?

এইরূপে বাহিরের আঘাতে বহুদিন হইতে দেশের মধ্যে একটা উত্তেজনা ক্রমশই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সত্যটুকুকে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। এবং ইংরেজ সমস্ত শাসন ও সতর্কতা কেবল একটা দিকে কেবল দুর্বলের দিকে চাপান দিয়া যে একটা অসমতার সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে ভারতবাসীর সমস্ত বুদ্ধিকে সমস্ত কল্পনাকে সমস্ত বেদনাবোধকে অহরহ অতিরিক্ত পরিমাণে এই বাহিরের দিকেই, এই একটা নৈমিত্তিক উৎপাতের দিকেই উদ্রিক্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব এমন অবস্থায় দেশের কোন্ কথাটা সকলের চেয়ে বড়ো কথা তাহা যদি একেবারেই ভুলিয়া যাই তবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু যাহা প্রাকৃতিক তাহা দুর্নিবার হইলেও তাহা সকল সময়ে শ্রেয়স্কর হয় না। হৃদয়াবেগের তীব্রতাকেই পৃথিবীর সকল বাস্তবের চেয়ে বড়ো বাস্তব বলিয়া মনে করিয়া আমরা যে অনেক সময়েই ভয়ংকর ভ্রমে পড়িয়া থাকি, সংসারে এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনে

পদে পদে তাহার পরিচয় পাইয়া আসিয়াছি। জাতির ইতিহাসেও যে এ-কথা আরও অনেক বেশি খাটে তাহা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

"আচ্ছা, ভালো কথা, তুমি কোন্‌টাকে দেশের সকলের চেয়ে গুরুতর প্রয়োজন বলিয়া মনে কর" এই প্রশ্নটাই অনেকে বিশেষ বিরক্তির সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন ইহা আমি অনুভব করিতেছি। এই বিরক্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়াও আমাকে উত্তর দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের সম্মুখে বিধাতা যে-সমস্যাটি স্থাপিত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত দুরূহ হইতে পারে কিন্তু সমস্যাটি যে কী তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নহে। তাহা নিতান্তই আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে; অন্য দূরদেশের ইতিহাসের নজিরের মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইলে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

ভারতবর্ষের পর্বতপ্রান্ত হইতে সমুদ্রসীমা পর্যন্ত যে-জিনিসটি সকলের চেয়ে সুস্পষ্ট হইয়া চোখে পড়িতেছে সেটি কী? সেটি এই যে, এত ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আচার জগতে আর কোনো একটিমাত্র দেশে নাই।

পশ্চিমদেশের যে-সকল ইতিহাস ইস্কুলে পড়িয়াছি তাহার কোথাও আমরা এরূপ সমস্যার পরিচয় পাই নাই। য়ুরোপে যে-সকল প্রভেদের মধ্যে সংঘাত বাধিয়াছিল সে প্রভেদগুলি একান্ত ছিল না;—তাহাদের মধ্যে মিলনের এমন একটি সহজ তত্ত্ব ছিল যে, যখন তাহারা মিলিয়া গেল তখন তাহাদের মিলনের মুখে জোড়ের চিহ্নটুকু পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইল। প্রাচীন য়ুরোপে গ্রীক রোমক গথ প্রভৃতি জাতির মধ্যে বাহিরে শিক্ষাদীক্ষার পার্থক্য যতই থাক তাহারা প্রকৃতই একজাতি ছিল। তাহারা পরস্পরের ভাষা, বিদ্যা, রক্ত মিলাইয়া এক হইয়া উঠিবার জন্য স্বতই প্রবণ ছিল। বিরোধের উত্তাপে তাহারা গলিয়া যখনই মিলিয়া গেছে তখনই বুঝা গিয়াছে তাহারা এক ধাতুতেই গঠিত। ইংলণ্ডে একদিন স্যাকসন নর্মান ও কেল্টিক জাতির একত্র সংঘাত ঘটিয়াছিল কিন্তু ইহাদের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক ঐক্যতত্ত্ব ছিল যে জেতা জাতি জেতারূপে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারিল না; বিরোধ করিতে করিতেই কখন যে এক হইয়া গেল তাহা জানাও গেল না।

অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতায় মানুষের সঙ্গে মানুষকে যে ঐক্যে সংগত করিয়াছে তাহা সহজ ঐক্য। য়ুরোপ এখনও এই সহজ ঐক্যকেই মানে—নিজের সমাজের মধ্যে কোনো গুরুতর প্রভেদকে স্থান দিতেই চায় না, হয় তাহাকে মারিয়া ফেলে নয় তাড়াইয়া দেয়। য়ুরোপের যে-কোনো জাতি হ'ক না কেন সকলেরই কাছে ইংরেজের উপনিবেশ প্রবেশদ্বার উদ্‌ঘাটিত রাখিয়াছে আর এশিয়াবাসীমাত্রই

যাহাতে কাছে ঘেঁষিতে না পারে সেজন্য তাহাদের সতর্কতা সাপের মতো ফোঁস করিয়া ফণা মেলিয়া উঠিতেছে।

য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের এইখানেই গোড়া হইতেই অনৈক্য দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস যখনই শুরু হইল সেই মুহূর্তেই বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, আর্যের সঙ্গে অনার্যের বিরোধ ঘটিল। তখন হইতে এই বিরোধের দুঃসাধ্য সমন্বয়ের চেষ্টায় ভারতবর্ষের চিত্ত ব্যাপৃত রহিয়াছে। আর্যসমাজে যিনি অবতার বলিয়া গণ্য সেই রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যে আর্য উপনিবেশকে অগ্রসর করিয়া দিবার উপলক্ষ্যে যেদিন গুহক চণ্ডালরাজের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন, যেদিন কিষ্কিন্ধ্যার অনার্যগণকে উচ্ছিন্ন না করিয়া সহায়তায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং লঙ্কার পরাস্ত রাক্ষসরাজ্যকে নির্মূল করিবার চেষ্টা না করিয়া বিভীষণের সহিত বন্ধুতার যোগে শত্রুপক্ষের শত্রুতা নিরস্ত করিয়াছিলেন, সেইদিন ভারতবর্ষের অভিপ্রায় এই মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছিল। তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত এ-দেশে মানুষের যে-সমাবেশ ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে বৈচিত্র্যের আর অন্ত রহিল না। যে-উপকরণগুলি কোনোমতেই মিলিতে চায় না, তাহাদিগকে একত্রে থাকিতে হইল। এমন ভাবে কেবল বোঝা তৈরি হয় কিন্তু কিছুতেই দেহ বাঁধিয়া উঠিতে চায় না। তাই এই বোঝা ঘাড়ে করিয়াই ভারতবর্ষকে শত শত বৎসর ধরিয়া কেবলই চেষ্টা করিতে হইয়াছে, যাহারা বিচ্ছিন্ন কী উপায়ে সমাজের মধ্যে তাহারা সহযোগীরূপে থাকিতে পারে; যাহারা বিরুদ্ধ কী উপায়ে তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যরক্ষা করা সম্ভব হয়; যাহাদের ভিতরকার প্রভেদ মানবপ্রকৃতি কোনোমতেই অস্বীকার করিতে পারে না কিরূপ ব্যবস্থা করিলে সেই প্রভেদ যথাসম্ভব পরস্পরকে পীড়িত না করে;—অর্থাৎ কী করিলে স্বাভাবিক ভেদকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াও সামাজিক ঐক্যকে যথাসম্ভব মান্য করা যাইতে পারে।

নানা বিভিন্ন লোক যেখানে একত্রে আছে সেখানকার প্রতিমুহূর্তের সমস্যাই এই যে, এই পার্থক্যের পীড়া এই বিচ্ছেদের দুর্বলতাকে কেমন করিয়া দূর করা যাইতে পারে। একত্রে থাকিতেই হইবে অথচ কোনোমতেই এক হইতে পারিব না মানুষের পক্ষে এতবড়ো অমঙ্গল আর কিছুই হইতে পারে না। এমন অবস্থায় প্রথম চেষ্টা হয় প্রভেদকে সুনির্দিষ্ট গণ্ডিদ্বারা স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া;—পরস্পর পরস্পরকে আঘাত না করে সেইটি সামলাইয়া যাওয়া; পরস্পরের চিহ্নিত অধিকারের সীমা কেহ কোনোদিক হইতে লঙ্ঘন না করে সেইরূপ ব্যবস্থা করা।

কিন্তু এই নিষেধের গণ্ডিগুলি যাহা প্রথম অবস্থায় বহুবিচিত্রকে একত্রে অবস্থানে সহায়তা করে তাহাই কালক্রমে নানাকে এক হইয়া উঠিতে বাধা দিতে থাকে। তাহা

আঘাতকেও বাঁচায় তেমনি মিলনকেও ঠেকায়। অশান্তিকে দূরে খেদাইয়া রাখাই যে শান্তিকে প্রতিষ্ঠা করা তাহা নহে। বস্তুত তাহাতে অশান্তিকে চিরদিনই কোনো একটা জায়গায় জিয়াইয়া রাখা হয়; বিরোধকে কোনোমতে দূরে রাখিলেও তবু তাহাকে রাখা হয়—ছাড়া পাইলেই তাহার প্রলয়মূর্তি হঠাৎ আসিয়া দেখা দেয়।

শুধু তাই নয়। ব্যবস্থাবদ্ধভাবে একত্রে অবস্থানমাত্র মিলনের নেতিবাচক অবস্থা, ইতিবাচক নহে। তাহাতে মানুষ আরাম পাইতে পারে কিন্তু শক্তি পাইতে পারে না। শৃঙ্খলার দ্বারা কাজ চলে মাত্র, ঐক্যের দ্বারা প্রাণ জাগে।

ভারতবর্ষও এতকাল তাহার বহুতর অনৈক্য ও বিরুদ্ধতাকে একটি ব্যবস্থার মধ্যে টানিয়া প্রত্যেককে এক-একটি প্রকোষ্ঠে বদ্ধ করিবার চেষ্টাতেই নিযুক্ত ছিল। অন্য কোনো দেশেই এমন সত্যকার প্রভেদ একত্রে আসিয়া দাঁড়ায় নাই, সুতরাং অন্য কোনো দেশেরই এমন দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইবার কোনো প্রয়োজনই হয় নাই।

নানা বিশৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন সত্য যখন স্তূপাকার হইয়া জ্ঞানের পথরোধ করিবার উপক্রম করে তখন বিজ্ঞানের প্রথম কাজ হয় তাহাদিগকে গুণকর্ম অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ফেলা। কিন্তু কি বিজ্ঞানে কি সমাজে শ্রেণীবদ্ধ করা আরম্ভের কাজ, কলেবরবদ্ধ করাই চূড়ান্ত ব্যাপার। ইটকাঠ চুনসুরকি পাছে বিমিশ্রিত হইয়া পরস্পরকে নষ্ট করে এইজন্য তাহাদিগকে ভাগ ভাগ করিয়া সাজাইয়া রাখাই যে ইমারত নির্মাণ করা তাহা নহে।

আমাদের দেশেও শ্রেণীবিভাগ হইয়া আছে কিন্তু রচনাকার্য হয় আরম্ভ হয় নাই, নয় অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। একই বেদনার অনুভূতির দ্বারা আদ্যোপান্ত আবিষ্ট, প্রাণময় রসরক্তময় স্নায়ুপেশীমাংসের দ্বারা অস্থিরাশি যেমন করিয়া ঢাকা পড়ে তেমনি করিয়াই বিধিনিষেধের শুষ্ক কঠিন ব্যবস্থাকে একেবারে আচ্ছন্ন এবং অন্তরাল করিয়া দিয়া যখন একই সরস অনুভূতির নাড়িজাল সমগ্রের মধ্যে প্রাণের চৈতন্যকে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে তখনই জানিব মহাজাতি দেহধারণ করিয়াছে।

আমরা যে-সকল দেশের ইতিহাস পড়িয়াছি তাহারা বিশেষ বিশেষ পথ দিয়া নিজের সিদ্ধির সাধনা করিয়াছে। যে বিশেষ অমঙ্গল তাহাদের পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায়, তাহারই সঙ্গে তাহাদিগকে লড়িতে হইয়াছে। একদিন আমেরিকার একটি সমস্যা এই ছিল যে, ঔপনিবেশিকদল এক জায়গায়, আর তাহাদের চালকশক্তি সমুদ্রপারে,—ঠিক যেন মাথার সঙ্গে ধড়ের বিচ্ছেদ—এরূপ অসামঞ্জস্য কোনো জাতির পক্ষে বহন করা অসম্ভব। ভূমিষ্ঠ শিশু যেমন মাতৃগর্ভের সঙ্গে কোনো বন্ধনে বাঁধা থাকিতে পারে না—নাড়ি ছেদন করিয়া দিতে হয়—তেমনি আমেরিকার সম্মুখে যেদিন এই নাড়ি ছেদনের

প্রয়োজন উপস্থিত হইল সেদিন সে ছুরি লইয়া তাহা কাটিল। একদিন ফ্রান্সের সম্মুখে একটি সমস্যা এই ছিল যে, সেখানে শাসয়িতার দল ও শাসিতের দল যদিচ একই জাতিভুক্ত তথাপি তাহাদের পরস্পরের জীবনযাত্রা ও স্বার্থ এতই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে সেই অসামঞ্জস্যের পীড়ন মানুষের পক্ষে দুর্বহ হইয়াছিল। এই কারণে এই আত্মবিচ্ছেদকে দূর করিবার জন্য ফ্রান্সকে রক্তপাত করিতে হইয়াছিল।

বাহ্যত দেখিতে গেলে, সেই আমেরিকা ও ফ্রান্সের সমস্যার সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল আছে। ভারতবর্ষেও শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর অসংলগ্ন। তাহাদের পরস্পর সম-অবস্থা ও সমবেদনার কোনো যোগই নাই। এমন স্থলে শাসনপ্রণালীর মধ্যে সুব্যবস্থার অভাব না ঘটিতে পারে ;—কিন্তু কেবলমাত্র ব্যবস্থার অপেক্ষা মানুষের প্রয়োজন অনেক বেশি। যে-আনন্দে মানুষ বাঁচে এবং মানুষ বিকাশ লাভ করে, তাহা কেবল আইন-আদালত সুপ্রতিষ্ঠিত ও ধনপ্রাণ সুরক্ষিত হওয়া নহে। ফল কথা, মানুষ আধ্যাত্মিক জীব—তাহার শরীর আছে, মন আছে, হৃদয় আছে—তাহাকে তৃপ্ত করিতে গেলে তাহার সমস্তকেই তৃপ্ত করিতে হয়—যে-কোনো পদার্থে সজীব সর্বাঙ্গীণতার অভাব আছে তাহাতে সে পীড়িত হইবেই ;—তাহাকে কোন্ জিনিস দেওয়া গেল সেই হিসাবটাই তাহার পক্ষে একমাত্র হিসাব নহে, তাহাকে কেমন করিয়া দেওয়া হইল সেই হিসাবটা আরও বড়ো হিসাব। উপকার তাহার পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে যদি সেই উপকারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মশক্তির উপলব্ধি না থাকে। সে অত্যন্ত কঠিন শাসনও নীরবে সহ্য করিতে পারে, এমন কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বরণ করিতে পারে যদি তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার আনন্দ থাকে। তাই বলিতেছিলাম, একমাত্র সুব্যবস্থা মানুষকে পূর্ণ করিয়া রাখিতে পারে না।

অথচ যেখানে শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর দূরবর্তী হইয়া থাকে, উভয়ের মাঝখানে প্রয়োজনের অপেক্ষা উচ্চতর আত্মীয়তর কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হইতে বাধা পায়, সেখানে রাষ্ট্রব্যাপার যদি অত্যন্ত ভালোও হয় তবে তাহা বিশুদ্ধ আপিস-আদালত এবং নিতান্তই আইনকানুন ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষ কেন যে কেবলই কৃশ হইতে থাকে, তাহার অন্তর বাহির কেন যে আনন্দহীন হইয়া উঠে তাহা কর্তা কিছুতেই বুঝিতে চান না, কেবলই রাগ করেন—এমন কি, ভোক্তাও ভালো করিয়া নিজেই বুঝিতে পারে না। অতএব শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকাতে যে জীবনহীন শুষ্ক শাসনপ্রণালী ঘটা একেবারেই অনিবার্য, ভারতের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে সে-কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

তাহার পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের সঙ্গে বর্তমান ভারতের একটা মিল

আছে সে-কথাও মানিতে হইবে। আমাদের শাসনকর্তাদের জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়সাধ্য। তাঁহাদের খাওয়াপরা বিলাসবিহার, তাঁহাদের সমুদ্রের এপার ওপার দুই পারের রসদ জোগানো, তাঁহাদের এখানকার কর্মাবসানে বিলাতি অবকাশের আরামের আয়োজন এ-সমস্ত আমাদিগকে করিতে হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের বিলাসের মাত্রা কেবলই অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সমস্ত বিলাসের খরচা জোগাইবার ভার এমন ভারতবর্ষের, যাহার দুইবেলার অন্ন পুরা পরিমাণে জোটে না। এমন অবস্থায় যাহারা বিলাসী প্রবলপক্ষ, তাহাদের অন্তঃকরণ নির্মম হইয়া উঠিতে বাধ্য। যদি তাহাদিগকে কেহ বলে ওই দেখো এই হতভাগাগুলা খাইতে পায় না, তাহারা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হয় যে ইহাদের পক্ষে এইরূপ খাওয়াই স্বাভাবিক এবং ইহাই যথেষ্ট। যে-সব কেরানি পনেরো-কুড়ি টাকায় ভূতের খাটুনি খাটিয়া মরিতেছে মোটা মাহিনার বড়ো সাহেব ইলেকট্রিক পাখার নিচে বসিয়া একবার চিন্তা করিতেও চেষ্টা করে না যে, কেমন করিয়া পরিবারের ভার লইয়া ইহাদের দিন চলিতেছে। তাহারা মনকে শান্ত সুস্থির রাখিতে চায় নতুবা তাহাদের পরিপাকের ব্যাঘাত এবং যকৃতের বিকৃতি ঘটে। এ-কথা যখন নিশ্চিত যে অল্পে তাহাদের চলে না, এবং ভারতবর্ষের উপরেই তাহাদের নির্ভর তখন তাহাদের তুলনায় তাহাদের চারিদিকের লোকে কী খায় পরে কেমন করিয়া দিন কাটায় তাহা নিঃস্বার্থভাবে তাহারা বিচার কপনোই করিতে পারে না। বিশেষত এক-আধজন লোক তো নয়—কেবল তো একটি রাজা নয় একজন সম্রাট নয়—একেবারে একটি সমগ্র জাতির বাবুয়ানার সম্বল এই ভারতবর্ষকে জোগাইতে হইবে। যাহারা বহুদূরে থাকিয়া রাজার হালে বাঁচিয়া থাকিতে চায় তাহাদের জন্য আত্মীয়তা-সম্পর্কশূন্য অপরজাতিকে অন্নবস্ত্র সমস্ত সংকীর্ণ করিয়া আনিতে হইতেছে এই যে নিষ্ঠুর অসামঞ্জস্য ইহা যে প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিল তাহা কেবল তাঁহারাই অস্বীকার করিতেছেন যাঁহাদের পক্ষে আরাম অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব, একপক্ষে বড়ো বড়ো বেতন, মোটা পেনশন এবং লম্বা চাল, অন্যপক্ষে নিতান্ত ক্লেশে আধপেটা আহারে সংসারযাত্রা নির্বাহ।—অবস্থার এই অসংগতি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। শুধু অন্নবস্ত্রের হীনতা নহে, আমাদের তরফে সম্মানে লাঘব এত অত্যন্ত অধিক, পরস্পরের মূল্যের তারতম্য এত অতিমাত্র, যে, আইনের পক্ষেও পক্ষপাত বাঁচাইয়া চলা অসাধ্য; এমন স্থলে যত দিন যাইতেছে ভারতবর্ষের বক্ষের উপর বিদেশীর ভার ততই গুরুতর হইতেছে, উভয়পক্ষের মধ্যেকার অসাম্য নিরতিশয় অপরিমিত হইয়া উঠিতেছে ইহা আজ আর কাহারও বুঝিতে বাকি নাই।

ইহাতে একদিকে বেদনা যতই দুঃসহ হইতেছে আর-একদিকে অসাড়তা ও অবজ্ঞা ততই গভীরতা লাভ করিতেছে। এইরূপ অবস্থাই যদি টিকিয়া যায় তবে ইহাতে একদিন না একদিন ঝড় আনিয়া উপস্থিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইরূপ কতকটা ঐক্য থাকা সত্ত্বেও তথাপি আমাদিগকে বলিতে হইবে বিপ্লবের পূর্বে আমেরিকা ও ফ্রান্সের সম্মুখে যে একমাত্র সমস্যা বর্তমান ছিল—অর্থাৎ যে-সমস্যাটির মীমাংসার উপরেই তাহাদের মুক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করিত আমাদের সম্মুখে সেই সমস্যাটি নাই। অর্থাৎ আমরা যদি দরখাস্তের জোরে বা গায়ের জোরে ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইতে রাজি করিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের সমস্যার কোনো মীমাংসাই হয় না ;—তাহা হইলে হয় ইংরেজ আবার ফিরিয়া আসিবে, নয়, এমন কেহ আসিবে যাহার মুখের গ্রাস এবং পেটের পরিধি ইংরেজের চেয়ে হয়তো ছোটো না হইতে পারে।

এ-কথা বলাই বাহুল্য, যে-দেশে একটি মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই সে-দেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না। কারণ স্বাধীনতার "স্ব" জিনিসটা কোথায়? স্বাধীনতা কাহার স্বাধীনতা? ভারতবর্ষে বাঙালি যদি স্বাধীন হয় তবে দাক্ষিণাত্যের নায়র জাতি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে না এবং পশ্চিমের জাঠ যদি স্বাধীনতা লাভ করে তবে পূর্বপ্রান্তের আসামি তাহার সঙ্গে একই ফল পাইল বলিয়া গৌরব করিবে না। এক বাংলাদেশেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যে নিজের ভাগ্য মিলাইবার জন্য প্রস্তুত এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তবে স্বাধীন হইবে কে? হাতের সঙ্গে পা, পায়ের সঙ্গে মাথা যখন একেবারে পৃথক হইয়া হিসাব মিলাইতে থাকে তখন লাভ বলিয়া জিনিসটা কাহার?

এমন তর্কও শুনা যায় যে, যতদিন আমরা পরের কড়া শাসনের অধীন হইয়া থাকিব ততদিন আমরা জাত বাঁধিয়া তুলিতেই পারিব না পদে পদে বাধা পাইব এবং একত্র মিলিয়া যে-সকল বড়ো বড়ো কাজ করিতে করিতে পরস্পরে মিল হইয়া যায় সেই সকল কাজের অবসরই পাইব না। এ-কথা যদি সত্য হয় তবে এ সমস্যার কোনো মীমাংসাই নাই। কারণ, বিচ্ছিন্ন কোনোদিনই মিলিতের সঙ্গে বিরোধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারে না; বিচ্ছিন্নের মধ্যে সামর্থ্যের ছিন্নতা, উদ্দেশ্যের ছিন্নতা, অধ্যবসায়ের ছিন্নতা। বিচ্ছিন্ন জিনিস জড়ের মতো পড়িয়া থাকিলে তবু টিকিয়া থাকে কিন্তু কোনো উপায়ে কোনা বায়ুবেগে তাহাকে চালনা করিতে গেলেই সে ছড়াইয়া পড়ে, সে ভাঙিয়া যায়, তাহার এক অংশ অপর অংশকে আঘাত করিতে থাকে; তাহার অভ্যন্তরের সমস্ত দুর্বলতা নানা মূর্তিতে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বিনাশ

করিতে উদ্যত হয়। নিজেরা এক না হইতে পারিলে আমরা এমন কোনো এককে স্থানচ্যুত করিতে পারিব না যাহা কৃত্রিমভাবেও সেই ঐক্যের স্থান পূরণ করিয়া আছে।

শুধু পারিব না তাহা নহে, কোনো নিতান্ত আকস্মিক কারণে পারিলেও যে একটিমাত্র বাহ্যবন্ধনে আমরা বিধৃত হইয়া আছি তাহাও ছিন্ন হইয়া পড়িবে। তখন আমাদের নিজের মধ্যে বিরোধ বাধিলে, আমরা কোনো এক প্রকার করিয়া, কিছুকাল মারামারি-কাটাকাটির পর তাহার একটা-কিছু মীমাংসা করিয়া লইব ইহাও সম্ভব হইবে না। আমাদিগকে সেই সময়টুকুও কেহ দিবে না। কারণ, আমরাই যেন আমাদের সুযোগের সুবিধাটুকু লইবার জন্য প্রস্তুত না থাকিতে পারি, কিন্তু জগতে যে-সকল প্রবল জাতি সময়ে অসময়ে সর্বদাই প্রস্তুত হইয়া আছে তাহারা আমাদের ঘরাও যুদ্ধকাণ্ড, অভিনয়ের দর্শকদের মতো, দূরে বসিয়া দেখিবে না। ভারতবর্ষ এমন স্থান নহে, লুব্ধের চক্ষু যাহার উপর হইতে কোনোদিনই অপসারিত হইবে।

অতএব যে-দেশে বহু বিচ্ছিন্ন জাতিকে লইয়া এক মহাজাতি তৈরি হইয়া উঠে নাই সে-দেশে ইংরেজের কর্তৃত্ব থাকিবে কি না থাকিবে সেটা আলোচনার বিষয় নহে; সেই মহাজাতিকে গড়িয়া তোলাই সেখানে এমন একটি উদ্দেশ্য অন্য সমস্ত উদ্দেশ্যই যাহার কাছে মাথা অবনত করিবে—এমন কি, ইংরেজ রাজত্ব যদি এই উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করে তবে ইংরেজ-রাজত্বকেও আমাদের ভারতবর্ষেরই সামগ্রী করিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহা অন্তরের সহিত প্রীতির সহিত স্বীকার করিবার অনেক বাধা আছে। সেই বাধাগুলিকে দূর করিয়া ইংরেজ-রাজত্ব কী করিলে আমাদের আত্মসম্মানকে পীড়িত না করে, কী করিলে তাহার সহিত আমাদের গৌরবকর আত্মীয়-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে এই অতিকঠিন প্রশ্নের মীমাংসাভারও আমাদিগকে লইতে হইবে। রাগ করিয়া যদি বলি, "না আমরা চাই না" তবু আমাদিগকে চাহিতেই হইবে কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এক হইয়া মহাজাতি বাঁধিয়া উঠিতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজ-রাজত্বের যে-প্রয়োজন তাহা কখনোই সম্পূর্ণ হইবে না।

আমাদের দেশের সকলের চেয়ে বড়ো সমস্যা যে কী, অল্পদিন হইল বিধাতা তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত চেতনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা সেদিন মনে করিয়াছিলাম, পার্টিশন-ব্যাপারে আমরা যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি ইহাই ইংরেজকে দেখাইব, আমরা বিলাতি নিমকের সম্বন্ধ কাটিব এবং দেশের বিলাতি বস্ত্রহরণ না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। পরের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা যেমনি করিয়াছি অমনি ঘরের মধ্যে এমন একটা গোল বাধিল যে, এমনতরো আর কখনো দেখা যায় নাই। হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হঠাৎ অত্যন্ত মর্মান্তিকরূপে বীভৎস হইয়া উঠিল।

এই ব্যাপার আমাদের পক্ষে যতই একান্ত কষ্টকর হউক কিন্তু আমাদের এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। এ-কথা আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিতরূপেই জানা আবশ্যক ছিল, আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক এই বাস্তবটিকে বিস্মৃত হইয়া আমরা যে-কাজ করিতেই যাই না কেন এই বাস্তবটি আমাদিগকে কখনোই বিস্মৃত হইবে না। এ-কথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে, হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোনো পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।

ইংরেজ যদি মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধে সত্যই দাঁড় করাইয়া থাকে তবে ইংরেজ আমাদের একটি পরম উপকার করিয়াছে—দেশের যে একটি প্রকাণ্ড বাস্তব সত্যকে আমরা মূঢ়ের মতো না বিচার করিয়াই দেশের বড়ো বড়ো কাজের আয়োজনের হিসাব করিতেছিলাম, একেবারে আরম্ভেই তাহার প্রতি ইংরেজ আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়াছে। ইহা হইতে কোনো শিক্ষাই না লইয়া আমরা যদি ইংরেজের উপরেই সমস্ত রাগের মাত্রা চড়াইতে থাকি তবে আমাদের মূঢ়তা দূর করিবার জন্য পুনর্বার আমাদিগকে আঘাত সহিতে হইবে;—যাহা প্রকৃত যেমন করিয়াই হউক তাহাকে আমাদের বুঝিতেই হইবে;—কোনোমতেই তাহাকে এড়াইয়া চলিবার কোনো পন্থাই নাই।

এই সঙ্গে একটা কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান, অথবা হিন্দুদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা উচ্চ ও নীচ বর্ণের মধ্যে মিলন না হইলে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হইতেছে অতএব কোনোমতে মিলনসাধন করিয়া আমরা বল লাভ করিব এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড়ো কথা নয়, সুতরাং ইহাই সকলের চেয়ে সত্য কথা নহে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, কেবলমাত্র প্রয়োজনসাধনের সুযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি নহিলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না। যিশু বলিয়া গিয়াছেন মানুষ কেবলমাত্র রুটির দ্বারা জীবনধারণ করে না; তাহার কারণ, মানুষের কেবল শারীর জীবন নহে। সেই বৃহৎ জীবনের খাদ্যাভাব ঘটিতেছে বলিয়া ইংরেজ-রাজত্ব সকলপ্রকার সুশাসনসত্ত্বেও আমাদের আনন্দ শোষণ করিয়া লইতেছে।

কিন্তু এই যে খাদ্যাভাব এ যদি কেবল বাহির হইতেই ইংরেজ-শাসন হইতেই ঘটিত তাহা হইলে কোনোপ্রকারে বাহিরের সংশোধন করিতে পারিলেই আমাদের কায সমাধা হইয়া যাইত। আমাদের নিজের অন্তঃপুরের ব্যবস্থাতেও দীর্ঘকাল হইতেই এই উপবাসের ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। আমরা হিন্দু ও মুসলমান, আমরা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় হিন্দুজাতি এক জায়গায় বাস করিতেছি বটে কিন্তু মানুষ মানুষকে রুটির চেয়ে যে উচ্চতর খাদ্য জোগাইয়া প্রাণে শক্তিতে আনন্দে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে

আমরা পরস্পরকে সেই খাদ্য হইতেই বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছি। আমাদের সমস্ত হৃদয়বৃত্তি সমস্ত হিতচেষ্টা, পরিবার ও বংশের মধ্যে, এবং এক-একটি সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে এতই অতিশয় পরিমাণে নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মীয়তার যে বৃহৎ সম্বন্ধ তাহাকে স্বীকার করিবার সম্বল আমরা কিছুই উদ্‌বৃত্ত রাখি নাই। সেই কারণে আমরা দ্বীপপুঞ্জের মতোই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছি, মহাদেশের মতো ব্যাপ্ত বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই।

প্রত্যেক ক্ষুদ্র মানুষটি বৃহৎ মানুষের সঙ্গে নিজের ঐক্য নানা মঙ্গলের দ্বারা নানা আকারে উপলব্ধি করিতে থাকিবে। এই উপলব্ধি তাহার কোনো বিশেষ কার্যসিদ্ধির উপায় বলিয়াই গৌরবের নহে, ইহা তাহার প্রাণ, ইহাই তাহার মনুষ্যত্ব অর্থাৎ তাহার ধর্ম। এই ধর্ম হইতে সে যে-পরিমাণেই বঞ্চিত হয় সেই পরিমাণেই সে শুষ্ক হয়। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বহুদিন হইতেই ভারতবর্ষে আমরা এই শুষ্কতাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছি। আমাদের জ্ঞান, কর্ম, আচারব্যবহারের, আমাদের সর্বপ্রকার আদান-প্রদানের বড়ো বড়ো রাজপথ এক-একটা ছোটো ছোটো গণ্ডীর সম্মুখে আসিয়া খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, আমাদের হৃদয় ও চেষ্টা প্রধানত আমাদের নিজের ঘর নিজের গ্রামের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, তাহা বিশ্বমানবের অভিমুখে নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবার অবসর পায় নাই। এই কারণে আমরা পারিবারিক আরাম পাইয়াছি, ক্ষুদ্র সমাজের সহায়তা পাইয়াছি কিন্তু বৃহৎ মানুষের শক্তি ও সম্পূর্ণতা হইতে আমরা অনেকদিন হইতে বঞ্চিত হইয়া দীনহীনের মতো বাস করিতেছি।

সেই প্রকাণ্ড অভাব পূরণ করিবার উপায় আমরা নিজের মধ্যে হইতেই যদি বাঁধিয়া তুলিতে না পারি তবে বাহির হইতে তাহা পাইব কেমন করিয়া? ইংরেজ চলিয়া গেলেই আমাদের এই ছিদ্র পূরণ হইবে আমরা এ কল্পনা কেন করিতেছি? আমরা যে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করি নাই, সহায়তা করি নাই, আমরা যে পরস্পরকে চিনিবার মাত্রও চেষ্টা করি নাই, আমরা যে এতকাল "ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ" করিয়া বসিয়া আছি;—পরস্পর সম্বন্ধে আমাদের সেই ঔদাসীন্য, অবজ্ঞা, সেই বিরোধ আমাদিগকে যে একান্তই ঘুচাইতে হইবে সে কি কেবলমাত্র বিলাতি কাপড় ত্যাগ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, সে কি কেবলমাত্র ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট নিজের শক্তি প্রচার করিবার উদ্দেশে? এ নহিলে আমাদের ধর্ম পীড়িত হইতেছে, আমাদের মনুষ্যত্ব সংকুচিত হইতেছে; এ নহিলে আমাদের বুদ্ধি সংকীর্ণ হইবে, আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হইবে না—আমাদের দুর্বল চিত্ত শত শত অন্ধসংস্কারের দ্বারা জড়িত হইয়া থাকিবে—আমরা আমাদের অন্তর-বাহিরের সমস্ত অধীনতার বন্ধন ছেদন করিয়া

নির্ভয়ে নিঃসংকোচে বিশ্বসমাজের মধ্যে মাথা তুলিতে পারিব না। সেই নির্ভীক নির্বাধ বিপুল মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবার জন্যই আমাদিগকে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে ধর্মের বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। ইহা ছাড়া মানুষ কোনোমতেই বড়ো হইতে পারে না, কোনোমতেই সত্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষে যে-কেহ আছে যে-কেহ আসিয়াছে, সকলকে লইয়াই আমরা সম্পূর্ণ হইব—ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হইবে। সে-সমস্যা এই যে, পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে, ভাষায় স্বভাবে আচরণে ধর্মে বিচিত্র—নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট—সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব। পার্থক্যকে নির্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে কিন্তু সর্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি দ্বারা; মানবের প্রতি সর্বসহিষ্ণু পরমপ্রেমের দ্বারা; উচ্চনীচ আত্মীয়পর সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা স্বীকার করিয়া। আর কিছু নহে শুভচেষ্টার দ্বারা দেশকে জয় করিয়া লও—যাহারা তোমাকে সন্দেহ করে তাহাদের সন্দেহকে জয় করো, যাহারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে তাহাদের বিদ্বেষকে পরাস্ত করো। রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করো, বারংবার আঘাত করো—কোনো নৈরাশ্যে কোনো আত্মাভিমানের ক্ষুণ্ণতায় ফিরিয়া যাইয়ো না; মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়কে চিরদিন কখনোই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।

ভারতবর্ষের আহ্বান আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছে। সেই আহ্বান যে সংবাদপত্রের ক্রুদ্ধ গর্জনের মধ্যেই ধ্বনিত হইয়াছে বা হিংস্র উত্তেজনার মুখরতার মধ্যেই তাহার যথার্থ প্রকাশ এ-কথা আমরা স্বীকার করিব না কিন্তু সেই আহ্বান যে আমাদের অন্তরাত্মাকে উদ্‌বোধিত করিতেছে তাহা তখনই বুঝিতে পারি যখন দেখি আমরা জাতি-বর্ণ-নির্বিচারে দুর্ভিক্ষকাতরের দ্বারে অন্নপাত্র বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছি, যখন দেখি ভদ্রাভদ্র বিচার না করিয়া প্রবাসে সমাগত যাত্রীদের সহায়তার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি, যখন দেখি রাজপুরুষদের নির্মম সন্দেহ ও প্রতিকূলতার মুখেও অত্যাচার-প্রতিরোধের প্রয়োজনকালে আমাদের যুবকদিগকে কোনো বিপদের সম্ভাবনা বাধা দিতেছে না। সেবায় আমাদের সংকোচ নাই, কর্তব্যে আমাদের ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে, পরের সহায়তায় আমরা উচ্চনীচের বিচার বিস্মৃত হইয়াছি, এই যে সুলক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহা হইতে বুঝিয়াছি, এবার আমাদের উপরে যে-আহ্বান আসিয়াছে তাহাতে সমস্ত সংকীর্ণতার অন্তরাল হইতে আমাদিগকে বাহিরে আনিবে—ভারতবর্ষে এবার মানুষের দিকে মানুষের টান পড়িয়াছে। এবারে, যেখানে যাহার কোনো অভাব তাহা পূরণ করিবার জন্য আমাদিগকে যাইতে হইবে;—অন্ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিতরণের জন্য আমাদিগকে নিভৃত পল্লীর প্রান্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে; আমাদিগকে

আর কেহই নিজের স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। বহুদিনের শুষ্কতা ও অনাবৃষ্টির পর বর্ষা যখন আসে তখন সে ঝড় লইয়াই আসে—কিন্তু নববর্ষার সেই আরম্ভকালীন ঝড়টাই এই নূতন আবির্ভাবের সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গ নহে, তাহা স্থায়ীও হয় না। বিদ্যুতের চাঞ্চল্য বজ্রের গর্জন এবং বায়ুর উন্মত্ততা আপনি শান্ত হইয়া আসিবে,—তখন মেঘে মেঘে জোড়া লাগিয়া আকাশের পূর্বপশ্চিম স্নিগ্ধতায় আবৃত হইয়া যাইবে—চারিদিকে ধারাবর্ষণ হইয়া তৃষিতের পাত্রে জল ভরিয়া উঠিবে এবং ক্ষুধিতের ক্ষেত্রে অন্নের আশা অঙ্কুরিত হইয়া দুই চক্ষু জুড়াইয়া দিবে। মঙ্গলে পরিপূর্ণ সেই বিচিত্র সফলতার দিন বহুকাল প্রতীক্ষার পরে আজ ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছে এই কথা নিশ্চয় জানিয়া আমরা যেন আনন্দে প্রস্তুত হই। কিসের জন্য? ঘর ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে নামিবার জন্য, মাটি চষিবার জন্য, বীজ বুনিবার জন্য, তাহার পরে সোনার ফসলে যখন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে তখন সেই লক্ষ্মীকে ঘরে আনিয়া নিত্যোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য।

১৩১৫

সমূহ

সমূহ

দেশনায়ক

সৈন্যদল যখন রণক্ষেত্রে যাত্রা করে, তখন যদি পাশের গলি হইতে তাহাদিগকে কেহ গালি দেয় বা গায়ে ঢিল ছুঁড়িয়া মারে তবে তখনই ছত্রভঙ্গ হইয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা পাশের গলিতে ছুটিয়া যায় না। এ অপমান তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না—কারণ, তাহাদের সম্মুখে বৃহৎ সংগ্রাম, তাহাদের সম্মুখে মহৎ মৃত্যু। তেমনি যদি আমরা যথার্থভাবে আমাদের এই বৃহৎ দেশের কাজ করিবার দিকে যাত্রা করি, তবে তাহারই মাহাত্ম্যে ছোটোবড়ো বহুতর বিক্ষোভ আমাদিগকে স্পর্শই করিতে পারে না—তবে ক্ষণে ক্ষণে এক-একটা রাগারাগির ছুতা লইয়া ছুটাছুটি করিয়া বৃথা যাত্রাভঙ্গ করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

আমাদের দেশে সম্প্রতি যে-সকল আন্দোলন-আলোচনার ঢেউ উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকটা আছে যাহা কলহমাত্র। নিঃসন্দেহই দেশবৎসল লোকেরা এই কলহের জন্য অন্তরে-অন্তরে লজ্জা অনুভব করিতেছেন। কারণ, কলহ অক্ষমের উত্তেজনাপ্রকাশ, তাহা অকর্মণ্যের একপ্রকার আত্মবিনোদন।

একবার দেশের চারিদিকে চাহিয়া দেখিবেন, এত দুঃখ এমন নিঃশব্দে বহন করিয়া চলিয়াছে, এরূপ করুণ দৃশ্য জগতের আর কোথাও নাই। নৈরাশ্য ও নিরানন্দ, অনশন ও মহামারী এই প্রাচীন ভারতবর্ষের মন্দিরভিত্তির প্রত্যেক গ্রন্থি বিদীর্ণ করিয়া শিকড় বিস্তার করিয়াছে। দুঃখের মতো এমন কঠোর সত্য, এমন নিদারুণ পরীক্ষা আর কী আছে? তাহার সঙ্গে খেলা চলে না—তাহাকে ফাঁকি দিবার জো কী, তাহার মধ্যে কৃত্রিম কাল্পনিকতার অবকাশমাত্র নাই—সে শত্রুমিত্র সকলকেই শক্ত করিয়া বাজাইয়া লয়। এই দেশব্যাপী ভীষণ দুঃখের সম্বন্ধে আমরা কিরূপ ব্যবহার করিলাম, তাহাতেই আমাদের মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিচয়। এই দুঃখের কৃষ্ণকঠিন নিকষপাথরের উপরে আমাদের দেশানুরাগ যদি উজ্জ্বল রেখাপাত করিয়া না থাকে, তবে আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, তাহা খাঁটি সোনা নহে। যাহা খাঁটি নহে, তাহার মূল্য আপনারা কাহার কাছে প্রত্যাশা করেন? ইংরেজজাত যে এ-সম্বন্ধে জহরি, তাহাকে ফাঁকি দিবেন কী

করিয়া? আমাদের দেশহিতৈষণার উদ্‌যোগ তাহাদের কাছে শ্রদ্ধালাভ করিবে কী উপায়ে? আমরা নিজে দান করিলে তবেই দাবি করিতে পারি। কিন্তু সত্য করিয়া বলুন, কে আমরা কী করিয়াছি? দেশের দারুণ দুর্যোগের দিনে আমাদের মধ্যে যাহাদের সুখের সম্বল আছে, তাহারা সুখেই আছি; যাহাদের অবকাশ আছে, তাহাদের আরামের লেশমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই; ত্যাগ যেটুকু করিয়াছি, তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে; কষ্ট যেটুকু সহিয়াছি, আর্তনাদ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশিমাত্রায় করা হইয়াছে।

ইহার কারণ কী? ইহার কারণ এই যে, এতকাল পরের দ্বারে আমরা মাথা কুটিয়া মরিবার চর্চা করিয়া আসিয়াছি, স্বদেশসেবার চর্চা করি নাই। দেশের দুঃখ দূর, হয় বিধাতা নয় গবর্মেন্ট করিবেন, এই ধারণাকেই আমরা সব-উপায়ে প্রশ্রয় দিয়াছি। আমরা যে দলবদ্ধ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নিজে এই কাযে ব্রতী হইতে পারি, এ-কথা আমরা অকপটভাবে নিজের কাছেও স্বীকার করি নাই। ইহাতে দেশের লোকের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ থাকে না, দেশের দুঃখের সঙ্গে আমাদের চেষ্টার যোগ থাকে না, দেশানুরাগ বাস্তবতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না— সেইজন্যই চাঁদার খাতা মিথ্যা ঘুরিয়া মরে এবং কাজের দিনে কাহারও সাড়া পাওয়া যায় না।

আজ ঠিক কুড়িবৎসর হইল, প্রেসিডেন্সি-কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের বাড়িতে ছাত্রসম্মিলন উপলক্ষ্যে যে-গান রচিত হইয়াছিল, তাহার এক অংশ উদ্ধৃত করি—

মিছে কথার বাঁধুনি কাঁদুনির পালা,
চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
ব'হে ব'হে নতশির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছিছি এ কী লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারির সাজ,
আপনি করি নে আপনার কাজ,
পরের 'পরে অভিমান।

ওগো আপনি নামাও কলঙ্কপসরা,
যেয়ো না পরের দ্বার।

পরের পায়ে ধ'রে মানভিক্ষা করা
সকল ভিক্ষার ছার।
দাও দাও ব'লে পরের পিছু-পিছু
কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না তো কিছু
যদি মান চাও যদি প্রাণ চাও
প্রাণে আগে করো দান।

সেদিন হইতে কুড়িবৎসরের পরবর্তী ছাত্রগণ আজ নিঃসন্দেহে বলিবেন যে, এখন আমরা আবেদনের থালা নামাইয়া তো হাত খোলসা করিয়াছি, আজ তো আমরা নিজের কাজ নিজে করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। যদি সত্যই হইয়া থাকি তো ভালোই, কিন্তু পরের 'পরে অভিমানটুকু কেন রাখিয়াছি—যেখানে অভিমান আছে, সেইখানেই যে প্রচ্ছন্নভাবে দাবি রহিয়া গেছে। আমরা পুরুষের মতো বলিষ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া না লই কেন যে, আমরা বাধা পাইবই, আমাদিগকে প্রতিকূলতা অতিক্রম করিতে হইবেই; কথায়-কথায় আমাদের দুই চক্ষু এমন ছলছল করিয়া আসে কেন। আমরা কেন মনে করি, শত্রুমিত্র সকলে মিলিয়া আমাদের পথ সুগম করিয়া দিবে। উন্নতির পথ যে সুদুস্তর, এ-কথা জগতের ইতিহাসে সর্বত্র প্রসিদ্ধ—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

কেবল কি আমরাই—এই দুরত্যয় পথ যদি অপরে সহজ করিয়া সমান করিয়া না দেয় —তবে নালিশ করিয়া দিন কাটাইব, এবং মুখ অন্ধকার করিয়া বলিব, তবে আমরা নিজের তাঁতের কাপড় নিজে পরিব, নিজের বিদ্যালয়ে নিজে অধ্যয়ন করিব। এ-সমস্ত কি অভিমানের কথা।

আমি জিজ্ঞাসা করি, সর্বনাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাহারও কি অভিমান মনে আসে —মৃত্যুশয্যার শিয়রে বসিয়া কাহারও কি কলহ করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে। আমরা কি দেখিতেছি না, আমরা মরিতে শুরু করিয়াছি। আমি রূপকের ভাষায় কথা কহিতেছি না,—আমরা সত্যই মরিতেছি। যাহাকে বলে বিনাশ, যাহাকে বলে বিলোপ, তাহা নানা বেশ ধারণ করিয়া এই পুরাতন জাতির আবাসস্থলে আসিয়া দেখা দিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় শতসহস্র লোক মরিতেছে এবং যাহারা মরিতেছে না তাহারা জীবন্মৃত হইয়া পৃথিবীর ভারবৃদ্ধি করিতেছে। এই ম্যালেরিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে, প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। প্লেগ একরাত্রির অতিথির মতো আসিল, তার পরে বৎসরের পর বৎসর যায়, আজও তাহার নররক্তপিপাসার

নিবৃত্তি হইল না। যে-বাঘ একবার মনুষ্যমাংসের স্বাদ পাইয়াছে, সে যেমন কোনোমতে সে-প্রলোভন ছাড়িতে পারে না, দুর্ভিক্ষ তেমনি করিয়া বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া আমাদের লোকালয়কে জনশূন্য করিয়া দিতেছে। ইহাকে কি আমরা দৈবদুর্ঘটনা বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিব? সমস্ত দেশের উপরে মৃত্যুর এই যে অবিচ্ছিন্ন জালনিক্ষেপ দেখিতেছি, ইহাকে কি আমরা আকস্মিক বলিতে পারি?

ইহা আকস্মিক নহে। ইহা বদ্ধমূল ব্যাধির আকার ধারণ করিতেছে। এমনি করিয়া অনেক জাতি মারা পড়িয়াছে—আমরাও যে দেশব্যাপী মৃত্যুর আক্রমণ হইতে বিনা-চেষ্টায় নিষ্কৃতি পাইব, এমন তো কোনো কারণ দেখি না। আমরা চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছি যে, যে-সব জাতি সুস্থ-সবল, তাহারাও প্রাণরক্ষার জন্য প্রতিক্ষণে লড়াই করিতেছে—আর আমরা আমাদের জীর্ণতার উপরে মৃত্যুর পুনঃপুন নখরাঘাতসত্ত্বেও বিনাপ্রয়াসে বাঁচিয়া থাকিব?

এ-কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ম্যালেরিয়া-প্লেগ-দুর্ভিক্ষ কেবল উপলক্ষ্য-মাত্র, তাহারা বাহ্যলক্ষণমাত্র—মূল ব্যাধি দেশের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা এতদিন একভাবে চলিয়া আসিতেছিলাম—আমাদের হাটে বাটে গ্রামে পল্লীতে আমরা একভাবে বাঁচিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, আমাদের সে-ব্যবস্থা বহুকালের পুরাতন। তাহার পরে আজ বাহিরের সংঘাতে আমাদের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। এই নূতন অবস্থার সহিত এখনও আমরা সম্পূর্ণ আপস করিয়া লইতে পারি নাই—এক জায়গায় মিলাইয়া লইতে গিয়া আর-এক জায়গায় অঘটন ঘটিতেছে। যদি এই নূতনের সহিত আমরা কোনোদিন সামঞ্জস্য করিয়া লইতে না পারি, তবে আমাদিগকে মরিতেই হইবে। পৃথিবীতে যে-সকল জাতি মরিয়াছে, তাহারা এমনি করিয়াই মরিয়াছে।

ম্যালেরিয়ার কারণ দেশে নূতন হইয়াছে, এমন নহে। চিরদিনই আমাদের দেশ জলা-দেশ—বনজঙ্গল এখনকার চেয়ে বরং পূর্বে বেশিই ছিল, এবং কোনোদিন এখানে মশার অভাব ছিল না। কিন্তু দেশ তখন সচ্ছল ছিল। যুদ্ধ করিতে গেলে রসদের দরকার হয়—সর্বপ্রকার গুপ্ত মারীশত্রুর সহিত লড়াইয়ে সেদিন আমাদের রসদের অভাব ছিল না। আমাদের পল্লীর অন্নপূর্ণা সেদিন নিজের সন্তানদিগকে অর্ধভুক্ত রাখিয়া টাকার লোভে পরের ছেলেকে স্তন্য দিতে যাইতেন না। শুধু তাই নয়, তখনকার সমাজব্যবস্থায় পল্লীর জলাশয় খনন ও সংস্কারের জন্য কাহারও অপেক্ষা করিতে হইত না—পল্লীর ধর্মবুদ্ধি পল্লীর অভাবমোচনে নিয়ত জাগ্রত ছিল। আজ বাংলার গ্রামে গ্রামে কেবল যে জলকষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে, প্রাচীন জলাশয়গুলি দূষিত

হইয়াছে। এইরূপে শরীর যখন অন্নাভাবে হীনবল এবং পানীয় জল যখন শোধনাভাবে রোগের নিকেতন, তখন বাঁচিবার উপায় কী? এইরূপে প্লেগও সহজেই আমাদের দেশ অধিকার করিয়াছে—কোথাও সে বাধা পাইতেছে না, কারণ পুষ্টি-অভাবে আমাদের শরীর অরক্ষিত।

পুষ্টির অভাব ঘটিবার প্রধান কারণ, নানা নূতন নূতন প্রণালীযোগে অন্ন বাহিরের দিকে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে—আমরা যাহা খাইয়া এতদিন মানুষ হইয়াছিলাম, তাহা যথেষ্টপরিমাণে পাইতেছি না। আজ পাড়াগাঁয়ে যান, সেখানে দুধ দুর্লভ, ঘি দুর্মূল্য, তেল কলিকাতা হইতে আসে, তাহাকে পূর্ব-অভ্যাসবশত সরিষার তেল বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিই—তা ছাড়া, যেখানে জলকষ্ট সেখানে মাছের প্রাচুর্য নাই, সে-কথা বলা বাহুল্য। সস্তার মধ্যে সিংকোনা সস্তা হইয়াছে। এইরূপে একদিনে নহে, দিনে দিনে সমস্ত দেশের জীবনীশক্তির মূলসঞ্চয় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। যেমন মহাজনের কাছে যখন প্রথম দেনা করিতে আরম্ভ করা যায়, তখনও শোধ করিবার সম্বল ও সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু সম্পত্তি যখন ক্ষীণ হইতে থাকে, তখন যে-মহাজন একদা কেবল নৈমিত্তিক ছিল, সে নিত্য হইয়া উঠে—আমাদের দেশেও ম্যালেরিয়া প্লেগ ওলাউঠা দুর্ভিক্ষ একদিন আকস্মিক ছিল, কিন্তু এখন ক্রমে আর কোনোকালে তাহাদের দেনা শোধ করিবার উপায় দেখা যায় না, আমাদের মূলধন ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে, এখন তাহারা আর কেবল ক্ষণে ক্ষণে তাগিদ করিতে আসে না, তাহারা আমাদের জমিজমাতে আমাদের ঘরবাড়িতে নিত্য হইয়া বসিয়াছে। বিনাশ যে এমনি করিয়াই ঘটে, বৎসরে বৎসরে তাহার কি হিসাব পাওয়া যাইতেছে না?

এমন অবস্থায় রাজার মন্ত্রণাসভায় দুটো প্রশ্ন উত্থাপন করিতে ইচ্ছা কর যদি তো করো, তাহাতে আমি আপত্তি করিব না। কিন্তু সেইখানেই কি শেষ? আমাদের গরজ কি তাহার চেয়ে অনেক বেশি নহে? ঘরে আগুন লাগিলে কি পুলিসের থানাতে খবর পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? ইতিমধ্যে চোখের সামনে যখন স্ত্রীপুত্র পুড়িয়া মরিবে, তখন দারোগার শৈথিল্যসম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করিবার জন্য বিরাট সভা আহ্বান করিয়া কি বিশেষ সান্ত্বনালাভ করা যায়? আমাদের গরজ যে অত্যন্ত বেশি। আমরা যে মরিতেছি। আমাদের অভিমান করিবার, কলহ করিবার, অপেক্ষা করিবার আর অবসর নাই। যাহা পারি, তাহাই করিবার জন্য এখনই আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে। চেষ্টা করিলেই যে সকল সময়েই সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা না হইতেও পারে, কিন্তু কাপুরুষের নিষ্ফলতা যেন না ঘটিতে দিই—চেষ্টা না করিয়া যে-ব্যর্থতা, তাহা পাপ, তাহা কলঙ্ক।

আমি বলিতেছি, আমাদের দেশে যে-দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহার কারণ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে, এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের ছাড়া আর কাহারও দ্বারা কোনোদিন সাধ্য হইতে পারে না। আমরা পরের পাপের ফলভোগ করিতেছি, ইহা কখনোই সত্য নহে এবং নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সুকৌশলে পরকে দিয়া করাইয়া লইব, ইহাও কোনোমতে আশা করিতে পারি না।

সৌভাগ্যক্রমে আজ দেশের নানাস্থান হইতে এই প্রশ্ন উঠিতেছে—"কী করিব, কেমন করিয়া করিব?" আজ আমরা কর্ম করিবার ইচ্ছা অনুভব করিতেছি, চেষ্টায়ও প্রবৃত্ত হইতেছি—এই ইচ্ছা যাহাতে নিরাশ্রয় না হয়, এই চেষ্টা যাহাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে, প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি যাহাতে বিচ্ছিন্ন-কণা-আকারে বিলীন হইয়া না যায়, আজ আমাদিগকে সেইদিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হইবে। রেলগাড়ির ইস্টীম উচ্চস্বরে বাঁশি বাজাইবার জন্য হয় নাই, তাহা গাড়ি চালাইবার জন্যই হইয়াছে। বাঁশি বাজাইয়া তাহা সমস্তটা ফুঁকিয়া দিলে ঘোষণার কাজটা জমে বটে, কিন্তু অগ্রসর হইবার কাজটা বন্ধ হইয়া যায়। আজ দেশের মধ্যে যে-উদ্যম উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে একটা বেষ্টনের মধ্যে না আনিতে পারিলে তাহা নিজের মধ্যে কেবল বিরোধ করিতে থাকিবে, নূতন নূতন দলের সৃষ্টি করিবে এবং নানা সাময়িক উদ্বেগের আকর্ষণে তুচ্ছ কাজকে বড়ো করিয়া তুলিয়া নিজের অপব্যয় সাধন করিবে।

দেশের সমস্ত উদ্যমকে বিক্ষেপের ব্যর্থতা হইতে একের দিকে ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায় আছে—কোনো একজনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করা। দশে মিলিয়া যেমন করিয়া বাদবিবাদ করা যায়, দশে মিলিয়া ঠিক তেমন করিয়া কাজ করা চলে না। ঝগড়া করিতে গেলে হট্টগোল করা সাজে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলে সেনাপতি চাই। কথা চালাইতে গেলে নানা লোকে মিলিয়া স্ব স্ব কণ্ঠস্বরকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উৎক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু জাহাজ চালাইতে গেলে একজন কাপ্তেনের প্রয়োজন।

আজ অনুনয়সহকারে আমার দেশবাসিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, আপনারা ক্রোধের দ্বারা আত্মবিস্মৃত হইবেন না—কেবল বিরোধ করিয়া ক্ষোভ মিটাইবার চেষ্টা করিবেন না। ভিক্ষা করিতে গেলেও যেমন পরের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, বিরোধ করিতে গেলেও সেইরূপ পরের দিকে সমস্ত মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। জয়ের পন্থা ইহা নহে। এ-সমস্ত সবলে উপেক্ষা করিয়া মঙ্গলসাধনের মহৎ গৌরব লইয়া আমরা জয়ী হইব।

আপনারা ভাবিয়া দেখুন, বাংলার পার্টিশনটা আজ খুব একটা বড়ো ব্যাপার নহে।

আমরা তাহাকে ছোটো করিয়া ফেলিয়াছি। কেমন করিয়া ছোটো করিয়াছি? এই পার্টিশনের আঘাত-উপলক্ষ্যে আমরা সমস্ত বাঙালি মিলিয়া পরম বেদনার সহিত স্বদেশের দিকে যেমনি ফিরিয়া চাহিলাম, অমনি এই পার্টিশনের কৃত্রিম রেখা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হইয়া গেল আমরা যে আজ সমস্ত মোহ কাটাইয়া স্বহস্তে স্বদেশের সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছি, ইহার কাছে পার্টিশনের আঁচড়টা কতই তুচ্ছ হইয়া গেছে। কিন্তু আমরা যদি কেবল পিটিশন ও প্রোটেস্ট, বয়কট ও বাচালতা লইয়াই থাকিতাম, তবে এই পার্টিশনই বৃহৎ হইয়া উঠিত,—আমরা ক্ষুদ্র হইতাম, পরাভূত হইতাম। কার্লাইলের শিক্ষা-সর্কুলার আজ কোথায় মিলাইয়া গেছে। আমরা তাহাকে নগণ্য করিয়া দিয়াছি। গালাগালি করিয়া নয়, হাতাহাতি করিয়াও নয়। গালাগালি-হাতাহাতি করিতে থাকিলে তো তাহাকে বড়ো করাই হইত। আজ আমরা নিজেদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছি—ইহাতে আমাদের অপমানের দাহ আমাদের আঘাতের ক্ষতযন্ত্রণা একেবারে জুড়াইয়া গেছে। আমরা সকল ক্ষতি সকল লাঞ্ছনার উপরে উঠিয়া গেছি। কিন্তু ওই লইয়া যদি আজ পর্যন্ত কেবলই বিরাট সভার বিরাট ব্যর্থতায় দেশের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটিয়া বেড়াইতাম, আমাদের সানুনাসিক নালিশকে সমুদ্রের এপার হইতে সমুদ্রের ওপার পর্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া তুলিতাম, তবে ছোটোকে ক্রমাগতই বড়ো করিয়া তুলিয়া নিজেরা তাহার কাছে নিতান্ত ছোটো হইয়া যাইতাম। সম্প্রতি বরিশালের রাস্তায় আমাদের গোটাকতক মাথাও ভাঙিয়াছে এবং আমাদিগকে কিঞ্চিৎ দণ্ডও দিতে হইয়াছে কিন্তু এই ব্যাপারটার উপরে বুক দিয়া পড়িয়া বেত্রাহত বালকের ন্যায় আর্তনাদ করিতে থাকিলে আমাদের গৌরব নষ্ট হইবে। ইহার অনেক উপরে না উঠিতে পারিলে অশ্রুসেচনে কেবল লজ্জাই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। উপরে উঠিবার একটা উপায়—আমরা যাঁহাকে নায়কপদে বরণ করিব তাঁহাকে রাজ-অট্টালিকার তোরণদ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আমাদের কুটির-প্রাঙ্গণের পুণ্যবেদিকায় স্বদেশের ব্রতপতিরূপে অভিষিক্ত করা। ক্ষুদ্রের সঙ্গে হাতাহাতি করিয়া দিন-যাপনকেই জয়লাভের উপায় বলে না—তাহার চেয়ে উপরে ওঠাই জয়। আমরা আজ আমাদের স্বদেশের কোনো মনস্বীর কর্তৃত্ব যদি আনন্দের সহিত গৌরবের সহিত স্বীকার করিতে পারি, তবে এমার্সন কবে আমাদের কার সহিত কী ব্যবহার করিয়াছে, কেম্পের আচরণ বেআইনি হইয়াছে কি না, তাহা তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতর হইয়া সাময়িক ইতিহাসের কলক হইতে একেবারে মুছিয়া যাইবে। বস্তুত এই ঘটনাকে অকিঞ্চিৎকর করিয়া না ফেলিলে আমাদের অপমান দূর হইবে না।

স্বদেশের হিতসাধনের অধিকার কেহ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয় নাই—তাহা ঈশ্বরদত্ত—স্বায়ত্তশাসন চিরদিনই আমাদের স্বায়ত্ত। ইংরেজ রাজা সৈন্ত লইয়া পাহারা দিন, কৃষ্ণ বা রক্ত গাউন পরিয়া বিচার করুন, কখনো বা অনুকূল কখনো বা প্রতিকূল হউন, কিন্তু নিজের দেশের কল্যাণ নিজে করিবার যে স্বাভাবিক কর্তৃত্ব-অধিকার, তাহা বিলুপ্ত করিবার শক্তি কাহারও নাই। সে-অধিকার নষ্ট আমরা নিজেরাই করি। সে-অধিকার গ্রহণ যদি না করি, তবেই তাহা হারাই। নিজের সেই স্বাভাবিক অধিকার হারাইয়া যদি কর্তব্যশৈথিল্যের জন্ম অপরের প্রতি দোষারোপ করি, তবে তাহা লজ্জার উপরে লজ্জা। মঙ্গল করিবার স্বাভাবিক সম্বন্ধ যাহাদের নাই, যাহারা দয়া করিতে পারে মাত্র, তাহাদের নিকটই সমস্ত মঙ্গল সমস্ত-স্বার্থসংকোচ প্রত্যাশা করিব, আর নিজেরা ত্যাগ করিব না, কাজ করিব না, এরূপ দীনতার ধিক্‌কার অনুভব করা কি এতই কঠিন।

তাই আমি বলিতেছি, স্বদেশের মঙ্গলসাধনের কর্তৃত্বসিংহাসন আমাদের সম্মুখে শূন্ত পড়িয়া আমাদিগকে প্রতিমুহূর্তে লজ্জা দিতেছে। হে স্বদেশসেবকগণ, এই পবিত্র সিংহাসনকে ব্যর্থ করিয়ো না, ইহাকে পূর্ণ করো। রাজার শাসন অস্বীকার করিবার কোনো প্রয়োজন নাই—তাহা কখনো শুভ কখনো অশুভ, কখনো স্থখের কখনো অস্থখের আকারে আমাদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইবে, কিন্তু আমাদের নিজের প্রতি নিজের যে-শাসন, তাহাই গভীর, তাহাই সত্য, তাহাই চিরস্থায়ী। সেই শাসনেই জাতি যথার্থ ভাঙে-গড়ে, বাহিরের শাসনে নহে। সেই শাসন অগ্ন আমরা শান্তসমাহিত পবিত্রচিত্তে গ্রহণ করিব।

যদি তাহা গ্রহণ করি, তবে প্রত্যেকে স্বস্বপ্রধান হইয়া অসংযত হইয়া উঠিলে চলিবে না। একজনকে মানিয়া আমরা যথার্থভাবে আপনাকে মানিব। একজনের মধ্যে আমাদের সকলকে স্বীকার করিব। একজনের দক্ষিণ-হস্তকে আমাদের সকলের শক্তিতে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব। আমাদের সকলের চিন্তা তাঁহার মন্ত্রণাগারে মিলিত হইবে এবং তাঁহার আদেশ আমাদের সকলের আদেশরূপে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

যাঁহারা পিটিশন বা প্রোটেস্ট, প্রণয় বা কলহ করিবার জন্ম রাজবাড়ির বাঁধা-রাস্তাটাতেই ঘনঘন দৌড়াদৌড়ি করাকেই দেশের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করেন, আমি সে-দলের লোক নই, সে-কথা পুনশ্চ বলা বাহুল্য। আজ পর্যন্ত যাঁহারা দেশহিত-ব্রতীদের নায়কতা করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা রাজপথের শুষ্কবালুকায় অশ্রু ও ঘর্ম সেচন করিয়া তাহাকে উর্বরা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাও জানি।

ইহাও দেখিয়াছি, মৎস্যবিরল জলে যাহারা ছিপ ফেলিয়া প্রত্যহ বসিয়া থাকে, অবশেষে তাহাদের, মাছ পাওয়া নয়, ওই আশা করিয়া থাকাই একটা নেশা হইয়া যায়, ইহাকে নিঃস্বার্থ নিষ্ফলতার নেশা বলা যাইতে পারে, মানবস্বভাবে ইহারও একটা স্থান আছে। কিন্তু এজন্য নায়কদিগকে দোষ দিতে পারি না, ইহা আমাদের ভাগ্যেরই দোষ। দেশের আকাঙ্ক্ষা যদি মরীচিকার দিকে না ছুটিয়া জলাশয়ের দিকেই ছুটিত, তবে তাঁহারা নিশ্চয় তাহাকে সেইদিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন, তাহার বিরুদ্ধপথে চলিতে পারিতেন না।

তবে নায়ক হইবার সার্থকতা কী, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। নায়কের কর্তব্য চালনা করা,—ভ্রমের পথেই হউক, আর ভ্রমসংশোধনের পথেই হউক। অভ্রান্ত তত্ত্বদর্শীর জন্য দেশকে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা কোনো কাজের কথা নহে। দেশকে চলিতে হইবে; কারণ, চলা স্বাস্থ্যকর, বলকর। এতদিন আমরা যে পোলিটিকাল অ্যাজিটেশনের পথে চলিয়াছি, তাহাতে অন্য ফললাভ যতই সামান্য হউক, নিশ্চয়ই বললাভ করিয়াছি,—নিশ্চয়ই ইহাতে আমাদের চিত্ত সজাগ হইয়াছে, আমাদের জড়ত্ব-মোচন হইয়াছে। কখনোই উপদেশের দ্বারা ভ্রমের মূল উৎপাটিত হয় না, তাহা বারংবার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে থাকে। ভোগের দ্বারাই কর্মক্ষয় হয়, তেমনি ভ্রম করিতে দিলেই যথার্থভাবে ভ্রমের সংশোধন হইতে পারে, নহিলে তাহার জড় মরিতে পারে না। ভুল করাকে আমি ভয় করি না, ভুলের আশঙ্কায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাকেই আমি ভয় করি। দেশের বিধাতা দেশকে বারংবার অপথে ফেলিয়াই তাহাকে পথ চিনাইয়া দেন—গুরুমহাশয় পাঠশালায় বসিয়া তাহাকে পথ চিনাইতে পারেন না। রাজপথে ছুটাছুটি করিয়া যতটা ফল পাওয়া যায় সেই সময়টা নিজের মাঠ চষিয়া অনেক বেশি লাভের সম্ভাবনা, এই কথাটা সম্পূর্ণ বুঝিবার জন্য বহুদিনের বিফলতা গুরুর মতো কাজ করে। সেই গুরুর শিক্ষা যখন হৃদয়ংগম হইবে, তখন যাহারা পথে ছুটিয়াছিল, তাহারাই মাঠে চলিবে—আর যাহারা ঘরে পড়িয়া থাকে, তাহারা বাটেরও নয়, মাঠেরও নয়, তাহারা অবিচলিত প্রাজ্ঞতার ভড়ং করিলেও, সকল আশার সকল সদ্গতির বাহিরে।

অতএব দেশকে চলিতে হইবে। চলিলেই তাহার সকল শক্তি আপনি জাগিবে, আপনি খেলিবে। কিন্তু রীতিমত চলিতে গেলে চালক চাই। পথের সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদিগকে দল বাঁধিতে হইবে, স্বতন্ত্র পাথেয়গুলিকে একত্র করিতে হইবে, একজনের বাধ্যতা স্বীকার করিয়া দৃঢ় নিয়মের অধীনে নিজেদের মতবিভিন্নতাকে যথাসম্ভব সংযত করিতে হইবে,—নতুবা আমাদের সার্থকতা-অন্বেষণের

এই মহাযাত্রা দীর্ঘকাল কেবল ছুটাছুটি-দৌড়াদৌড়ি, ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকিতেই নষ্ট হইতে থাকিবে।

১৩১৩

সভাপতির অভিভাষণ

পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী

অদ্যকার এই মহাসভায় সভাপতির আসনে আহ্বান করিয়া আপনারা আমাকে যে-সম্মান দান করিয়াছেন, আমি তাহার অযোগ্য এ-কথার উল্লেখমাত্রও বাহুল্য। বস্তুত এরূপ সম্মান গ্রহণ করা সহজ, বহন করাই কঠিন। অযোগ্য লোককে উচ্চপদে বসানো তাহাকে অপদস্থ করিবারই উপায়।

অন্য সময় হইলে এতবড়ো দুঃসাধ্য দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিতাম। কিন্তু বর্তমানে আমাদের আত্মবিচ্ছেদের সংকটকালে যখন ডাঙায় বাঘ ও জলে কুমির, যখন রাজপুরুষ কালপুরুষের মূর্তি ধরিয়াছেন এবং আত্মীয়সমাজেও পরস্পরের প্রতি কেহ ধৈর্য অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না—যখন নিশ্চয় জানি অদ্যকার দিনে সভাপতির আসন সুখের আসন নহে এবং হয়তো ইহা সম্মানের আসনও না হইতে পারে—অপমানের আশঙ্কা চতুর্দিকেই পুঞ্জীভূত—তখন আপনাদের এই আমন্ত্রণ বিনয়ের উপলক্ষ্য করিয়া আজ আর কাপুরুষের মতো ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না এবং বিশ্ব-জগতের সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধের মাঝখানে "য একঃ" যিনি এক, "অবর্ণঃ" মানব-সমাজের বিবিধ জাতির মাঝখানে জাতিহীন যিনি বিরাজমান, যিনি "বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি" বহুধা শক্তির দ্বারা নানা জাতির নানা প্রয়োজন বিচিত্ররূপে সম্পাদন করিতেছেন, "বিচৈতিচান্তে বিশ্বমাদৌ" বিশ্বের সমস্ত আরম্ভেও যিনি, সমস্ত পরিণামেও যিনি, "স দেবঃ, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু" সেই দেবতা, তিনি আমাদের এই মহাসভায় শুভবুদ্ধিস্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষুদ্রতা অপসারিত করিয়া দিন, আমাদের চিত্তকে পরিপূর্ণ প্রেমে সম্মিলিত এবং আমাদের চেষ্টাকে সুমহৎ লক্ষ্যে নিবিষ্ট করুন, একান্তমনে এই প্রার্থনা করিয়া, অযোগ্যতার বাধা সত্ত্বেও এই মহাসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেছি।

বিশেষত জানি এমন সময় আসে যখন অযোগ্যতাই বিশেষ যোগ্যতার স্বরূপ হইয়া উঠে।

এতদিন আমি দেশের রাষ্ট্রসভায় স্থান পাইবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করি নাই। ইহাতে আমার ক্ষমতার অভাব এবং স্বভাবেরও ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে।

সেই ত্রুটিবশতই আমি সকল দলের বাহিরে পড়িয়া থাকাতে আমাকেই সকলের চেয়ে নিরীহ জ্ঞান করিয়া সভাপতির উচ্চ আসনটিকে নিরাপদ করিবার জন্যই আমাকে আপনারা এইখানে বসাইয়া দিয়াছেন। আপনাদের সেই ইচ্ছা যদি সফল হয় তবেই আমি ধন্য হইব। কিন্তু রামচন্দ্র সত্যপালনের জন্য নির্বাসনে গেলে পর, ভরত যে-ভাবে রাজ্যরক্ষার ভার লইয়াছিলেন আমিও তেমনি আমার নমস্য জ্যেষ্ঠগণের খড়মজোড়াকেই মনের সম্মুখে রাখিয়া নিজেকে উপলক্ষ্যস্বরূপ এখানে স্থাপিত করিলাম।

রাষ্ট্রসভার কোনো দলের সহিত আমার যোগ ঘনিষ্ঠ নহে বলিয়াই সম্প্রতি কনগ্রেসে যে আত্মবিপ্লব ঘটিয়াছে তাহাকে আমি দূর হইতে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। যাঁহারা ইহার ভিতরে ছিলেন তাঁহারা স্বভাবতই এই ব্যাপারটাকে এতই উৎকট করিয়া দেখিয়াছেন ও ইহা হইতে এতই গুরুতর অহিতের আশঙ্কা করিতেছেন যে, এখনও তাঁহাদের মনের ক্ষোভ দূর হইতে পারিতেছে না।

কিন্তু ঘটনায় যাহা নিঃশেষ হইয়াছে বেদনায় তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা বলিষ্ঠ প্রকৃতির লক্ষণ নহে। কবি বলিয়াছেন, যথার্থ প্রেমের স্রোত অব্যাহতভাবে চলে না। যথার্থ জীবনের স্রোতও সেইরূপ, যথার্থ কর্মের স্রোতেরও সেই দশা। দেশের নাড়ির মধ্যে প্রাণের বেগ চঞ্চল হইয়া উঠাতেই কর্মে যদি মাঝে মাঝে এরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়া পড়ে তবে ইহাতে হতাশ না হইয়া এই কথাই মনে রাখিতে হইবে যে, যে-জীবনধর্মের অতিচাঞ্চল্যে কনগ্রেসকে একবার আঘাত করিয়াছে সেই জীবনধর্মই এই আঘাতকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া কনগ্রেসের মধ্যে নূতন স্বাস্থ্যের সঞ্চার করিবে। মৃত পদার্থই আপনার কোনো ক্ষতিকে ভুলিতে পারে না। শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন ভাঙে তেমনি ভাঙাই থাকে কিন্তু সজীব গাছ নূতন পাতায় নূতন শাখায় সর্বদাই আপনার ক্ষতি পূরণ করিয়া বাড়িয়া উঠিতে থাকে।

অতএব সুস্থ দেহ যেমন নিজের ক্ষতকে শীঘ্রই শোধন করিতে পারে তেমনি আমরা অতিসত্বর কনগ্রেসের আঘাতক্ষতকে আরোগ্যে লইয়া যাইব এবং সেই সঙ্গে এই ঘটনার শিক্ষাটুকুও নম্রভাবে গ্রহণ করিব।

সে-শিক্ষাটুকু এই যে, যখন কোনো প্রবল আঘাতে মানুষের মন হইতে ঔদাসীন্য ঘুচিয়া যায় এবং সে উত্তেজিত অবস্থায় জাগিয়া উঠে তখন তাহাকে লইয়া যে-কাজ করিতে হইবে সে-কাজে মতের বৈচিত্র্য এবং মতের বিরোধ সহিষ্ণুভাবে স্বীকার করিতেই

হইবে। যখন দেশের চিত্ত নির্জীব ও উদাসীন থাকে তখনকার কাজের প্রণালী যেরূপ, বিপরীত অবস্থায় সেরূপ হইতেই পারে না।

এই সময়ে, যাহা অপ্রিয় তাহাকে বলপূর্বক বিধ্বস্ত এবং যাহা বিরুদ্ধ তাহাকে আঘাতের দ্বারা নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা কোনোমতেই চলে না। এমন কি, এইরূপ সময়ে হার মানিয়াও জয়লাভ করিতে হইবে, জিতিবই পণ করিয়া বসিলে সে-জিতের দ্বারা যাহাকে পাইতে ইচ্ছা করি তাহাকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব।

সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধকে একটা বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধিয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো শিক্ষা। এই শিক্ষা যদি আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে তবে স্বায়ত্তশাসন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। যথার্থ স্বায়ত্তশাসনের অধীনে মতবৈচিত্র্য দলিত হয় না, সকল মতই আপনার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং বিরোধের বেগেই পরস্পরের শক্তিকে পরিপূর্ণরূপে সচেতন করিয়া রাখে।

য়ুরোপের রাষ্ট্রকার্যে সর্বত্রই বহুতর বিরোধী দলের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। প্রত্যেক দলই প্রধান্যলাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। লেবার পার্টি, সোশ্যালিস্ট প্রভৃতি এমন সকল দলও রাষ্ট্রসভায় স্থান পাইয়াছে যাহারা বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে নানাদিকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে চায়।

এত অনৈক্য কিসের বলে এক হইয়া আছে এবং এত বিরোধ মিলনকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে না কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, এই সকল জাতির চরিত্রে এমন একটি শিক্ষা সুদৃঢ় হইয়াছে যাহাতে সকল পক্ষই নিয়মের শাসনকে মান্য করিয়া চলিতে পারে। নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া তাহারা প্রার্থিত ফলকে ছিন্ন করিয়া লইতে চায় না, নিয়মকে পালন করিয়াই জয়লাভ করিবার জন্য ধৈর্য অবলম্বন করিতে জানে। এই সংযম তাহাদের বলেরই পরিচয়। এই কারণেই এত বিচিত্র ও বিরুদ্ধ মতিগতির লোককে একত্রে লইয়া, শুধু তর্ক ও আলোচনা নহে, বড়ো বড়ো রাজা রাজ্য ও সাম্রাজ্য চালনার কার্য সম্ভবপর হইয়াছে।

আমাদের কনগ্রেসের পশ্চাতে রাজ্য-সাম্রাজ্যের কোনো দায়িত্বই নাই—কেবলমাত্র একত্র হইয়া দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় দেশের ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার জন্যই এই সভাকে বহন করিতেছেন। এই উপায়ে দেশের ইচ্ছা ক্রমশ পরিস্ফুট আকার ধারণ করিয়া বল লাভ করিবে এবং সেই ইচ্ছাশক্তি ক্রমে কর্মশক্তিতে পরিণত হইয়া দেশের আত্মোপলব্ধিকে সত্য করিয়া তুলিবে, এই আমাদের লক্ষ্য। সমস্ত দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টা যে-মহাসভায় আমাদের ইচ্ছাশক্তির বোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে এমন ঔদার্য যদি না থাকে যাহাতে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সকল শ্রেণী ও সকল

মতের লোকই সেখানে স্থান পাইতে পারেন তবে তাহাতে আমাদের ক্ষমতার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়।

এই মিলনকে সম্ভবপর করিবার জন্য মতের বিরোধকে বিলুপ্ত করিতে হইবে এরূপ ইচ্ছা করিলেও তাহা সফল হইবে না এবং সফল হইলেও তাহাতে কল্যাণ নাই। বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি পরস্পর প্রতিঘাতী অথচ এক নিয়মের শাসনাধীন বলিয়াই বিচিত্র সৃষ্টি বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। রাষ্ট্রসভাতেও, নিয়মের দ্বারা সংযত হইয়াও প্রত্যেক মতকেই প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করিতে না দিলে এরূপ সভার স্বাস্থ্য নষ্ট, শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও ভবিষ্যৎ পরিণতি সংকীর্ণ হইতে থাকিবে। অতএব মতবিরোধ যখন কেবলমাত্র অবশ্যম্ভাবী নহে, তাহা মঙ্গলকর, তখন মিলিতে গেলে নিয়মের শাসন অমোঘ হওয়া চাই। নতুবা বরযাত্রী ও কন্যাপক্ষে উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিবাদ করিয়া শেষকালে বিবাহটাই পণ্ড হইতে থাকে। যেমন বাষ্পসংঘাতকে লোহার বয়লারের মধ্যে বাঁধিতে পারিলে তবেই কল চলিতে পারে তেমনি আমাদের মতসংঘাতের আশঙ্কা যতই প্রবল হইবে আমাদের নিয়ম-বয়লারও ততই বজ্রের ন্যায় কঠিন হইলে তবেই কর্ম অগ্রসর হইবে নতুবা অনর্থপাত ঘটিতে বিলম্ব হইবে না।

আমরা এ-পর্যন্ত কনগ্রেসের ও কনফারেন্সের জন্য প্রতিনিধিনির্বাচনের যথারীতি নিয়ম স্থির করি নাই। যতদিন পর্যন্ত, দেশের লোক উদাসীন থাকাতে, রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোনো মতের দ্বৈধ ছিল না ততদিন এরূপ নিয়মের শৈথিল্যে কোনো ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু যখন দেশের মনটা জাগিয়া উঠিয়াছে তখন দেশের কর্মে সেই মনটা পাইতে হইবে, তখন প্রতিনিধিনির্বাচনকালে সত্যভাবে দেশের সম্মতি লইতে হইবে। এইরূপ শুধু নির্বাচনের নহে, কনগ্রেসের ও কনফারেন্সের কার্যপ্রণালীরও বিধি সুনির্দিষ্ট হওয়ার সময় আসিয়াছে।

এমন না করিয়া কেবল বিবাদ বাঁচাইয়া চলিবার জন্য দেশের এক-এক দল যদি এক-একটি সাম্প্রদায়িক কনগ্রেসের সৃষ্টি করেন তবে কনগ্রেসের কোনো অর্থই থাকিবে না। কনগ্রেস সমগ্র দেশের অখণ্ড সভা—বিঘ্ন ঘটিবামাত্রই সেই সমগ্রতাকেই যদি বিসর্জন দিতে উদ্যত হই তবে কেবলমাত্র সভার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আমাদের এমনিই কী লাভ হইবে।

এ-পর্যন্ত আমরা কোনো কাজ বা ব্যবসায়, এমন কি আমোদের জন্য দল বাঁধিয়া যখনই অনৈক্য ঘটিয়াছে তখনই ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছি। বিরোধ ঘটিবামাত্র আমরা মূল জিনিসটাকে, হয় নষ্ট নয় পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বৈচিত্র্যকে

ঐক্যের মধ্যে বাঁধিয়া তাহাকে নানা-অঙ্গবিশিষ্ট কলেবরে পরিণত করিবার জীবনীশক্তি আমরা দেখাইতে পারিতেছি না। আমাদের সমস্ত দুর্গতির কারণই তাই। কনগ্রেসের মধ্যেও যদি সেই রোগটা ফুটিয়া পড়ে, সেখানেও যদি উপরিতলে বিরোধের আঘাত-মাত্রেই ঐক্যের মূল ভিত্তিটা পর্যন্ত বিদীর্ণ হইতে থাকে তবে আমরা কোনো পক্ষই দাঁড়াইব কিসের উপরে? যে-সরষের দ্বারা ভূত ঝাড়াইব সেই সরষেকেই ভূতে পাইয়া বসিলে কী উপায়।

বঙ্গবিভাগকে রহিত করিবার জন্য আমরা যেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি এই আসন্ন আত্মবিভাগকে নিরস্ত করিবার জন্য আমাদিগকে তাহা অপেক্ষাও আরও বেশি চেষ্টা করিতে হইবে। পরের নিকটে যে দুর্বল, আত্মীয়ের নিকট সে প্রচণ্ড হইয়া যেন নিজেকে প্রবল বলিয়া সান্ত্বনা না পায় পরে যে-বিচ্ছেদ সাধন করে তাহাতে অনিষ্টমাত্র ঘটে, নিজে যে-বিচ্ছেদ ঘটাই তাহাতে পাপ হয়, এই পাপের অনিষ্ট অন্তরের গভীরতম স্থানে নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষায় সঞ্চিত হইতে থাকে।

আমাদের যে-সময় উপস্থিত হইয়াছে এখন আত্মবিস্মৃত হইলে কোনোমতেই চলিবে না, কারণ এখন আমরা মুক্তির তপস্যা করিতেছি; ইন্দ্রদেব আমাদের পরীক্ষার জন্য এই যে তপোভঙ্গের উপলক্ষ্যকে পাঠাইয়াছেন ইহার কাছে হার মানিলে আমাদের সমস্ত সাধনা নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব ভ্রাতৃগণ, যে-ক্রোধে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই হাত তুলিতে চায় সে-ক্রোধ দমন করিতেই হইবে— আত্মীয়কৃত সমস্ত বিরোধকে বারংবার ক্ষমা করিতে হইবে—পরস্পরের অবিবেচনার দ্বারা যে-সংঘাত ঘটিয়াছে তাহার সংশোধন করিতে ও তাহাকে ভুলিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলে চলিবে না। আগুন যখন আমাদের নিজের ঘরেই লাগিয়াছে তখন দুই পক্ষ দুই দিক হইতে এই অগ্নিকে উক্তবাক্যের বায়ু-বীজন করিয়া ইহাকে প্রতিকারের অতীত করিয়া তুলিলে তাহার চেয়ে মূঢ়তা আমাদের পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারিবে না। পরের কৃত বিভাগ লইয়া দেশে যে-উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে শেষে আত্মকৃত বিভাগই যদি তাহার পরিণাম হয়, ভারতের শনিগ্রহ যদি এবার লর্ড কার্জনমূর্তি পরিহার করিয়া আত্মীয়মূর্তি ধরিয়াই দেখা দেয়, তবে বাহিরের তাড়নায় অস্থির হইয়া ঘরের মধ্যেও আশ্রয় লইবার স্থান পাইব না।

এদিকে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়্গ দেশের মাথার উপর ঝুলিতেছে। কত শত বৎসর হইয়া গেল আমরা হিন্দু ও মুসলমান একই দেশমাতার দুই জানুর উপরে বসিয়া একই স্নেহ উপভোগ করিয়াছি, তথাপি আজও আমাদের মিলনে বিঘ্ন ঘটিতেছে।

এই দুর্বলতার কারণ যতদিন আছে ততদিন আমাদের দেশের কোনো মহৎ আশাকে

সম্পূর্ণ সফল করা সম্ভবপর হইবে না ; আমাদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্তব্যপালনই পদে পদে দুরূহ হইতে থাকিবে।

বাহির হইতে এই হিন্দুমুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না—আমাদের নিজের ভিতরে যে-ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব। এই উত্তেজনা কালক্রমে আপনিই মরিতে বাধ্য। কারণ, এই আগুনে নিয়ত কয়লা জোগাইবার সাধ্য গবর্মেণ্টের নাই। এ আগুনকে প্রশ্রয় দিতে গেলে শীঘ্রই ইহা এমন সীমায় গিয়া পৌঁছিবে যখন দমকলের জন্য ডাক পাড়িতেই হইবে। প্রজার ঘরে আগুন ধরিলে কোনোদিন কোনোদিক হইতে তাহা রাজবাড়িরও অত্যন্ত কাছে গিয়া পৌঁছিবে। যদি এ-কথা সত্য হয় যে, হিন্দুদিগকে অসংগত প্রশ্রয় দিবার চেষ্টা হইতেছে, অন্তত ভাবগতিক দেখিয়া মুসলমানদের মনে যদি সেইরূপ ধারণা দৃঢ় হইতে থাকে, তবে এই শনি, এই কলি, এই ভেদনীতি রাজাকেও ক্ষমা করিবে না। কারণ, প্রশ্রয়ের দ্বারা আশাকে বাড়াইয়া তুলিলে তাহাকে পূরণ করা কঠিন হয়। যে ক্ষুধা স্বাভাবিক তাহাকে একদিন মেটানো যায়, যোগ্যতার স্বাভাবিক দাবিরও সীমা আছে, কিন্তু প্রশ্রয়ের দাবির তো অন্ত নাই। তাহা ফুটা কলসীতে জল ভরার মতো। আমাদের পুরাণে কলকভঞ্জনের যে-ইতিহাস আছে তাহারই দৃষ্টান্তে গবর্মেণ্ট, প্রেয়সীর প্রতি প্রেমবশতই হউক অথবা তাহার বিপরীত পক্ষের প্রতি রাগ করিয়াই হউক, অযোগ্যতার ছিদ্রঘট ভরিয়া তুলিতে পারিবেন না। অসন্তোষকে চিরবুভুক্ষু করিয়া রাখিবার উপায় প্রশ্রয়। এ সমস্ত শাঁখের করাতের নীতি, ইহাতে শুধু একা প্রজা কাটে না, ইহা ফিরিবার পথে রাজাকেও আঘাত দেয়।

এই ব্যাপারের মধ্যে যেটুকু ভালো তাহাও আমাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা গোড়া হইতে ইংরেজের ইস্কুলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া গবর্মেণ্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনোমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না, আমাদের মাঝখানে একটা অসূয়ার অন্তরাল থাকিয়া যাইবে। মুসলমানেরা যদি যথেষ্টপরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্যবশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুরপরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্নমনে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই প্রসাদের যেখানে

সীমা সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, যখন বুঝিবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে-লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন, যে-একদেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্মহানি হয় এবং ধর্মহানি হইলে কখনোই স্বার্থরক্ষা হইতে পারে না তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।

যাই হউক, হিন্দু ও মুসলমান, ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান ভাগকে এক রাষ্ট্রসম্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্য যে ত্যাগ, যে সহিষ্ণুতা, যে সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। এই প্রকাণ্ড কর্মক্ষণই যখন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট তখন দোহাই সুবুদ্ধির, দোহাই ধর্মের, প্রাণধর্মের নিয়মে দেশে যে নূতন নূতন দল উঠিবে তাহারা প্রত্যেকেই এক-একটি বিরোধরূপে উঠিয়া যেন দেশকে বহুভাগে বিদীর্ণ করিতে না থাকে ; তাহারা যেন একই তরুকাণ্ডের উপর নব নব সতেজ শাখার মতো উঠিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় চিত্তকে পরিণতিদান করিতে থাকে।

পুরাতন দলের ভিতর দিয়া যখন একটা নূতন দলের উদ্ভব হয় তখন তাহাকে প্রথমটা অনাহূত বলিয়া ভ্রম হয়। কার্যকারণপরম্পরার মধ্যে তাহার যে একটা অনিবার্য স্থান আছে অপরিচয়ের বিরক্তিতে তাহা আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। এই কারণে নিজের স্বত্বপ্রমাণের চেষ্টায় নূতন দলের প্রথম অবস্থায় স্বাভাবিকতার শান্তি থাকে না, সেই অবস্থায় আত্মীয় হইলেও তাহাকে বিরুদ্ধ মনে হয়।

কিন্তু এ-একথা নিশ্চিত সত্য যে, দেশে নূতন দল, বীজ বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুরের মতো, বাধা ভেদ করিয়া স্বভাবের নিয়মেই দেখা দেয়। পুরাতনের সঙ্গেই এবং চতুর্দিকের সঙ্গে তাহার অন্তরের সম্বন্ধ আছে।

এই তো আমাদের নূতন দল ; এ তো আমাদের আপনার লোক। ইহাদিগকে লইয়া কখনো ঝগড়াও করিব আবার পরক্ষণেই সুখে দুঃখে, ক্রিয়াকর্মে ইহাদিগকেই কাছে টানিয়া একসঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া কাজের ক্ষেত্রে পাশাপাশি দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু ভ্রাতৃগণ, একস্ট্রিমিস্ট, বা চরমপন্থী, বা বাড়াবাড়ির দল বলিয়া দেশে একটি দল উঠিয়াছে, এইরূপ যে একটা রটনা শুনা যায়, সে-দলটা কোথায় ? জিজ্ঞাসা করি, এ-দেশে সকলের চেয়ে বড়ো এবং মূল একস্ট্রিমিস্ট কে ? চরমপন্থিত্বের ধর্মই এই যে, একদিক চরমে উঠিলে অন্যদিক সেই টানেই আপনি চরমে চড়িয়া যায়। বঙ্গবিভাগের জন্য সমস্ত বাংলাদেশ যেমন বেদনা অনুভব করিয়াছে এবং যেমন দারুণ দুঃখভোগের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছে ভারতবর্ষে এমন বোধ হয় আর কখনো হয়

নাই। কিন্তু প্রজাদের সেই সত্য বেদনায় রাজপুরুষ যে কেবল উদাসীন তাহা নহে, তিনি ক্রুদ্ধ, খড়্গহস্ত। তাহার পরে ভারতশাসনের বর্তমান ভাগ্যবিধাতা, যাঁহার অভ্যুদয়ের সংবাদমাত্রেই ভারতবর্ষের চিত্তচকোর তাহার সমস্ত তৃষিতচঞ্চু ব্যাদান করিয়া একেবারে আকাশে উড়িয়াছিল, তিনি তাঁহার সুদূর স্বর্গলোক' হইতে সংবাদ পাঠাইলেন—যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা একেবারেই চূড়ান্ত, তাহার আর অন্যথা হইতে পারে না।

এতই বধিরভাবে সমস্ত বাংলাদেশের চিত্তবেদনাকে একেবারে চূড়ান্ত করিয়া দেওয়া ইহাই কি রাজ্যশাসনের চরমপন্থা নহে? ইহার কি একটা প্রতিঘাত নাই? এবং সে প্রতিঘাত কি নিতান্ত নির্জীবভাবে হইতে পারে?

এই স্বাভাবিক প্রতিঘাত শান্ত করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ তো কোনো শান্তনীতি অবলম্বন করিলেন না—তিনি চরমের দিকেই চড়িতে লাগিলেন। আঘাত করিয়া যে-ঢেউ তুলিয়াছিলেন সেই ঢেউকে নিরস্ত করিবার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে কেবলই দণ্ডের উপর দণ্ড চালনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহারা যে বলিষ্ঠ এ প্রমাণ হইতে পারে কিন্তু স্বভাব তো এই প্রবল রাজাদের প্রজা নহে। আমরা দুর্বল হই আর অক্ষম হই বিধাতা আমাদের যে একটা হৃৎপিণ্ড গড়িয়াছিলেন সেটা তো নিতান্তই একটা মৃৎপিণ্ড নহে, আমরাও সহসা আঘাত পাইলে চকিত হইয়া উঠি; সেটা একটা স্বাভাবিক প্রতি-বৃত্তিক্রিয়া,—যাহাকে ইংরেজিতে বলে রিফ্লেক্স অ্যাকশন। এটাকে রাজসভায় যদি অবিনয় বলিয়া জ্ঞান করেন তবে আঘাতটা সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হয়। যাহার শক্তি আছে সে অনায়াসেই দুইয়ের পশ্চাতে আরও একটা দুই যোগ করিতে পারে কিন্তু তাহার পরে ফলের ঘরে চা দেখিলেই উন্মত্ত হইয়া উঠা বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

স্বভাবের নিয়ম যখন কাজ করে তখন কিছু অসুবিধা ঘটিলেও, সেটাকে দেখিয়া বিমর্ষ হইতে পারি না। বিদ্যুতের বেগ লাগাইলে যদি দেখি দুর্বল স্নায়ুতেও প্রবলভাবে সাড়া পাওয়া যাইতেছে তবে বড়ো কষ্টের মধ্যে সেটা আশার কথা।

অতএব এদিকে যখন লর্ড কার্জন, মর্লি, ইবেটসন; গুর্খা, প্যুনিটিভ পুলিস ও পুলিসরাজকন্যা; নির্বাসন, জেল ও বেত্রদণ্ড; দলন, দমন ও আইনের আত্মবিস্মৃতি; তখন অপর পক্ষে প্রজাদের মধ্যেও যে ক্রমশই উত্তেজনাবৃদ্ধি হইতেছে, যে-উত্তাপটুকু অল্পকাল পূর্বে কেবলমাত্র তাহাদের রসনার প্রান্তভাগে দেখা দিয়াছিল তাহা যে ক্রমশই ব্যাপ্ত ও গভীর হইয়া তাহাদের অস্থিমজ্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে; তাহারা যে বিভীষিকার সম্মুখে অভিভূত না হইয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে ইহাতে আমাদের যথেষ্ট

অসুবিধা ও আশঙ্কা আছে তাহা মানিতেই হইবে, কিন্তু সেই সঙ্গে এইটুকু আশার কথা না মনে করিয়া থাকিতে পারি না যে, বহুকালের অবসাদের পরেও স্বভাব বলিয়া একটা পদার্থ এখনও আমাদের মধ্যে রহিয়া গেছে; প্রবলভাবে কষ্ট পাইবার ক্ষমতা এখনও আমাদের যায় নাই—এবং জীবনধর্মে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার নিয়ম বর্তমান এখনও আমাদের মধ্যে তাহা কাজ করিতেছে।

চরমনীতি বলিতেই বুঝায় হালছাড়া নীতি, সুতরাং ইহার গতিটা যে কখন কাহাকে কোথায় লইয়া গিয়া উত্তীর্ণ করিয়া দিবে তাহা পূর্ব হইতে কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। ইহার বেগকে সর্বত্র নিয়মিত করিয়া চলা এই পন্থার পথিকদের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। তাহাকে প্রবর্তন করা সহজ, সংবরণ করাই কঠিন।

এই কারণেই আমাদের কর্তৃপক্ষ যখন চরমনীতিতে দম লাগাইলেন তখন তাঁহারা যে এতদূর পর্যন্ত পৌঁছিবেন তাহা মনেও করেন নাই। আজ ভারতশাসনকার্যে পুলিসের সামান্য পাহারাওআলা হইতে ন্যায়দণ্ডধারী বিচারক পর্যন্ত সকলেরই মধ্যে স্থানে স্থানে যে অসংযম ফুটিয়া বাহির হইতেছে, নিশ্চয়ই তাহা ভারতশাসনের কর্ণধারগণের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু গবর্মেণ্ট তো একটা অলৌকিক ব্যাপার নহে, শাসনকার্য যাহাদিগকে দিয়া চলে তাহারা তো রক্তমাংসের মানুষ, এবং ক্ষমতা-মত্ততাও সেই মানুষগুলির প্রকৃতিতে অল্পাধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। যে-সময়ে প্রবীণ সারথির প্রবল রাশ ইহাদের সকলকে শক্ত করিয়া টানিয়া রাখে তখনও যদিচ ইহাদের উচ্চগ্রীবা যথেষ্ট বক্র হইয়া থাকে তথাপি সেটা রাজবাহনের পক্ষে অশোভন হয় না; কিন্তু তখন ইহারা মোটের উপরে সকলেই এক সমান চালে পা ফেলে; তখন পদাতিকের দল একটু যদি পাশ কাটাইয়া চলিতে পারে তবে তাহাদের আর অপঘাতের আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু চরমনীতি যখনই রাশ ছাড়িয়া দেয় তখনই এই বিরাট শাসনতন্ত্রের মধ্যে অবারিত জীব-প্রকৃতি দেখিতে দেখিতে বিচিত্র হইয়া উঠে। তখন কোন্ পাহারাওআলার যষ্টি যে কোন্ ভালোমানুষের কপাল ভাঙিবে এবং কোন্ বিচারকের হাতে আইন যে কিরূপ ভয়ংকর বক্রগতি অবলম্বন করিবে তাহা কিছুই বুঝিবার উপায় থাকে না। তখন প্রজাদের মধ্যে যে বিশেষ অংশ প্রশ্রয় পায় তাহারাও বুঝিতে পারে না তাহাদের প্রশ্রয়ের সীমা কোথায়। চতুর্দিকে শাসননীতির এইরূপ অদ্ভুত দুর্বলতা প্রকাশ হইতে থাকিলে গবর্মেণ্ট নিজের চালে নিজেই কিছু কিছু লজ্জাবোধ করিতে থাকেন;—তখন লজ্জানিবারণের কমিশন রিপোর্টের তালি দিয়া শাসনের ছিন্নতা ঢাকিতে চায়, যাহারা আর্ত তাহাদিগকে মিথ্যুক বলিয়া অপমানিত করে এবং যাহারা উচ্ছৃঙ্খল তাহাদিগকেই উৎপীড়িত বলিয়া মার্জনা করে। কিন্তু এমন করিয়া লজ্জা কি ঢাকা পড়ে? অথচ

এই সমস্ত উদ্দাম উৎপাত সংবরণ করাকেও ত্রুটিস্বীকার বলিয়া মনে হয় এবং দুর্বলতাকে প্রবলভাবে সমর্থন করাকেই রাজপুরুষ শক্তির পরিচয় বলিয়া ভ্রম করেন।

অন্যপক্ষে আমাদের মধ্যেও চরমনীতিকে সর্বদা ঠিকমতো সংবরণ করিয়া চলা দুঃসাধ্য। আমাদের মধ্যেও নিজের দলের দুর্বারতা দলপতিকেও টলাইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় কাহার আচরণের জন্য যে কাহাকে দায়ী করা যাইবে এবং কোন্ মতটা যে কতটা পরিমাণে কাহার, তাহা নিশ্চয় করিয়া নির্ণয় করে এমন কে আছে।

এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। একস্ট্রিমিস্ট নাম দিয়া আমাদের মাঝখানে যে একটা সীমানার চিহ্ন টানিয়া দেওয়া হইয়াছে সেটা আমাদের নিজের দত্ত নহে। সেটা ইংরেজের কালো কালির দাগ। সুতরাং এই জরিপের চিহ্নটা কখন কতদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে বলা যায় না। দলের গঠন অনুসারে নহে, সময়ের গতি ও কর্তৃজাতির মর্জি অনুসারে এই রেখার পরিবর্তন হইতে থাকিবে।

অতএব ইংরেজ তাহার নিজের প্রতি আমাদের মনের ভাব বিচার করিয়া যাহাকে একস্ট্রিমিস্ট দল বলিয়া নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে সেটা কি একটা দল, না দলের চেয়ে বেশি—তাহা দেশের একটা লক্ষণ? কোনো একটা দলকে চাপিয়া মারিলে এই লক্ষণ আর-কোনো আকারে দেখা দিবে অথবা ইহা বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবে।

কোনো স্বাভাবিক প্রকাশকে যখন আমরা পছন্দ না করি তখন আমরা বলিতে চেষ্টা করি যে, ইহা কেবল সম্প্রদায়বিশেষের চক্রান্ত মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে একটা ধুয়া উঠিয়াছিল যে, ধর্মজিনিসটা কেবল স্বার্থপর ধর্মযাজকদের কৃত্রিম সৃষ্টি; পাদ্রিদিগকে উচ্ছিন্ন করিলেই ধর্মের আপদটাকেই একেবারে দূর করিয়া দেওয়া যায়। হিন্দুধর্মের প্রতি যাহারা অসহিষ্ণু তাহারা অনেকে বলিয়া থাকে এটা যেন ব্রাহ্মণের দল পরামর্শ করিয়া নিজেদের জীবিকার উপায় স্বরূপে তৈরি করিয়া তুলিয়াছে—অতএব ভারতবর্ষের বাহিরে কোনো গতিকে ব্রাহ্মণের ডিপোর্টেশন ঘটাইতে পারিলেই হিন্দুধর্মের উপদ্রব সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত থাকা যাইবে। আমাদের রাজারাও সেইরূপ মনে করিতেছেন একস্ট্রিমিজম বলিয়া একটা উৎক্ষেপক পদার্থ দুষ্টের দল তাহাদের ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করিয়া তুলিতেছে অতএব কয়েকটা দলপতি ধরিয়া পুলিস ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে সমর্পণ করিয়া দিলেই উৎপাত শান্তি হইতে পারিবে।

কিন্তু আসল কথাটা ভিতরের কথা। সেটা চোখে দেখার জিনিস নহে, সেটা তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

যে-সত্য অব্যক্ত ছিল সেটা হঠাৎ প্রথম ব্যক্ত হইবার সময় নিতান্ত মৃদুমন্দ মধুরভাবে হয় না। তাহা একটা ঝড়ের মতো আসিয়া পড়ে, কারণ অসামঞ্জস্যের সংঘাতই তাহাকে জাগাইয়া তোলে।

আমাদের দেশে কিছুকাল হইতেই ইতিহাসের শিক্ষায়, যাতায়াত ও আদানপ্রদানের সুযোগে, এক রাজশাসনের ঐক্যে, সাহিত্যের অভ্যুদয়ে এবং কনগ্রেসের চেষ্টায় আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝিতেছিলাম যে, আমাদের দেশটা এক, আমরা একই জাতি, সুখে দুঃখে আমাদের এক দশা, এবং পরস্পরকে পরমাত্মীয় বলিয়া না জানিলে ও অত্যন্ত কাছে না টানিলে আমাদের কিছুতে মঙ্গল নাই।

বুঝিতেছিলাম বটে কিন্তু এই অখণ্ড ঐক্যের মূর্তিটি প্রত্যক্ষ সত্যের মতো দেখিতে পাইতেছিলাম না—তাহা যেন কেবলই আমাদের চিন্তার বিষয় হইয়াই ছিল। সেইজন্য সমস্ত দেশকে এক বলিয়া নিশ্চয় জানিলে, মানুষ দেশের জন্য যতটা দিতে পারে, যতটা সহিতে পারে, যতটা করিতে পারে আমরা তাহার কিছুই পারি নাই।

এই ভাবেই আরও অনেকদিন চলিত। এমন সময় লর্ড কার্জন যবনিকার উপর এমন একটা প্রবল টান মারিলেন যে, যাহা নেপথ্যে ছিল তাহার আর কোনো আচ্ছাদন রহিল না।

বাংলাকে যেমনি দুইখানা করিবার হুকুম হইল অমনি পূর্ব হইতে পশ্চিমে একটিমাত্র ধ্বনি জাগিয়া উঠিল—আমরা যে বাঙালি, আমরা যে এক! বাঙালি কখন যে বাঙালির এতই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, রক্তের নাড়ি কখন বাংলার সকল অঙ্গকেই এমন করিয়া এক চেতনার বন্ধনে বাঁধিয়া তুলিয়াছে তাহা তো পূর্বে আমরা এমন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

আমাদের এই আত্মীয়তার সজীব শরীরে বিভাগের বেদনা যখন এত অসহ্য হইয়া বাজিল তখন ভাবিয়াছিলাম সকলে মিলিয়া রাজার দ্বারে নালিশ জানাইলেই দয়া পাওয়া যাইবে। কেবলমাত্র নালিশের দ্বারা দয়া আকর্ষণ ছাড়া আর যে আমাদের কোনো গতিই আছে তাহাও আমরা জানিতাম না।

কিন্তু নিরুপায়ের ভরসাস্থল এই পরের অনুগ্রহ যখন চূড়ান্তভাবেই বিমুখ হইল তখন যে-ব্যক্তি নিজেকে পঙ্গু জানিয়া বহুকাল অচল হইয়া ছিল ঘরে আগুন লাগিতেই নিতান্ত অগত্যা দেখিতে পাইল তাহারও চলৎশক্তি আছে। আমরাও একদিন অন্তঃকরণের অত্যন্ত একটা তাড়নায় দেখিতে পাইলাম, এই কথাটা আমাদের জোর করিয়া বলিবার শক্তি আছে যে, আমরা বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করিব না।

আমাদের এই আবিষ্কারটি অন্যান্য সমস্ত সত্য আবিষ্কারেরই ন্যায় প্রথমে একটা

সংকীর্ণ উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে দেখিতে দেখিতে আমরা বুঝিতে পারিলাম উপলক্ষ্যটুকুর অপেক্ষা ইহা অনেক বৃহৎ। এ যে শক্তি। এ যে সম্পদ। ইহা অন্যকে জব্দ করিবার নহে ইহা নিজেকে শক্ত করিবার। ইহার আর কোনো প্রয়োজন থাক বা না থাক ইহাকে বক্ষের মধ্যে সত্য বলিয়া অনুভব করাই সকলের চেয়ে বড়ো প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

শক্তির এই অকস্মাৎ অনুভূতিতে আমরা যে একটা মস্ত ভরসার আনন্দ পাইয়াছি সেই আনন্দটুকু না থাকিলে এই বিদেশী-বর্জনব্যাপারে আমরা এত অবিরাম দুঃখ কখনোই সহিতে পারিতাম না। কেবলমাত্র ক্রোধের এত সহিষ্ণুতা নাই। বিশেষত প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের ক্রোধ কখনোই এত জোরের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারে না।

এদিকে দুঃখ যতই পাইতেছি সত্যের পরিচয়ও ততই নিবিড়তর সত্য হইয়া উঠিতেছে। যতই দুঃখ পাইতেছি আমাদের শক্তি গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। আমাদের এই বড় দুঃখের ধন ক্রমেই আমাদের হৃদয়ের চিরন্তন সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে। অগ্নিতে দেশের চিত্তকে বার বার গলাইয়া এই যে ছাপ দেওয়া হইতেছে ইহা তো কোনোদিন আর মুছিবে না। এই রাজমোহরের ছাপ আমাদের দুঃখ সহার দলিল হইয়া থাকিবে ;—দুঃখের জোরে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহার জোরেই দুঃখ সহিতে পারিব।

এইরূপে সত্য জিনিস পাইলে তাহার আনন্দ যে কত জোরে কাজ করে এবার তাহা স্পষ্ট দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছি। কতদিন হইতে জ্ঞানী লোকেরা উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন যে, হাতের কাজ করিতে ঘৃণা করিয়া, চাকরি করাকেই জীবনের সার বলিয়া জানিলে কখনোই আমরা মানুষ হইতে পারিব না। যে শুনিয়াছে সেই বলিয়াছে, হাঁ, কথাটা সত্য বটে। অমনি সেই সঙ্গেই চাকরির দরখাস্ত লিখিতে হাত পাকাইতে বসিয়াছে। এতবড়ো চাকরিপিপাসু বাংলাদেশেও এমন একটা দিন আসিল যেদিন কিছু না বলিতেই ধনীর ছেলে নিজের হাতে তাঁত চালাইবার জন্য তাঁতির কাছে শিষ্যবৃত্তি অবলম্বন করিল, ভদ্রঘরের ছেলে নিজের মাথায় কাপড়ের মোট তুলিয়া দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণের ছেলে নিজের হাতে লাঙল বহা গৌরবের কাজ বলিয়া স্পর্ধা প্রকাশ করিল। আমাদের সমাজে ইহা যে সম্ভবপর হইতে পারে আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই। তর্কের দ্বারা তর্ক মেটে না ; উপদেশের দ্বারা সংস্কার ঘোচে না ; সত্য যখন ঘরের একটি কোণে একটু শিখার মতো দেখা দেন তখনই ঘরভরা অন্ধকার আপনি কাটিয়া যায়।

পূর্বে দেশের বড়ো প্রয়োজনের সময়েও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া অর্থের অপেক্ষা

ব্যর্থতাই বেশি করিয়া পাইতাম কিন্তু সম্প্রতি একদিন যেমনি একটা ডাক পড়িল অমনি দেশের লোক কোনো অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করিয়া কেবলমাত্র নির্বিচারে ত্যাগ করিবার জন্যই নিজে ছুটিয়া গিয়া দান করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে।

তাহার পরে জাতীয় বিদ্যালয় যে কোনোদিন দেশের মধ্যে স্থাপন করিতে পারিব, সে কেবল দুটি-একটি অত্যুৎসাহিকের ধ্যানের মধ্যেই ছিল। কিন্তু দেশে শক্তির অনুভূতি একটুও সত্য হইবামাত্রই সেই দুর্লভ ধ্যানের সামগ্রী দেখিতে দেখিতে আকার পরিগ্রহ করিয়া দেশকে বরদান করিবার জন্য উদ্যত দক্ষিণ হস্তে আজ আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

একত্রে মিলিয়া বড়ো কারখানা স্থাপন করিব বাঙালির এমন না ছিল শিক্ষা, না ছিল অভিজ্ঞতা, না ছিল অভিরুচি,—তাহা সত্ত্বেও বাঙালি একটা বড়ো মিল খুলিয়াছে, তাহা ভালো করিয়াই চালাইতেছে এবং আরও এইরূপ অনেকগুলি ছোটোবড়ো উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

দেশের ইচ্ছা একটিমাত্র উপলক্ষ্যে যেই আপনাকে সফল করিয়াছে, যেই আপনার শক্তিকে দুঃখ ও ক্ষতির উপরেও জয়ী করিয়া দেখাইয়াছে অমনি তাহা নানা ধারায় জাতীয় জীবনযাত্রার সমস্ত বিচিত্র ব্যাপারেই যে নিজেকে উপলব্ধি করিবার জন্য সহজে ধাবিত হইবে ইহা অনিবার্য।

কিন্তু যেমন একদিকে সহসা দেশের এই শক্তির উপলব্ধি আমাদের কাছে সত্য হইল তেমনি সেই কারণেই আমরা নিজেদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অভাব অনুভব করিলাম। দেখিলাম এতবড়ো শক্তিকে বাঁধিয়া তুলিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে নাই। স্টীম নানাদিকে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাকে এইবেলা আবদ্ধ করিয়া যথার্থপথে খাটাইবার উপায় করিতে পারিলে তাহা আমাদের চিরকালের সম্বল হইয়া উঠিত—এই ব্যাকুলতায় আমরা কষ্ট পাইতেছি।

ভিতরে একটা গভীর অভাব বা পীড়া থাকিলে যখন তাহাকে ভালো করিয়া ধরিতে বা তাহার ভালোরূপ প্রতিকার করিতে না পারি তখন তাহা নানা অকারণ বিরক্তির আকার ধারণ করিতে থাকে। শিশু অনেক সময় বিনা হেতুতেই রাগ করিয়া তাহার মাকে মারে ; তখন বুঝিতে হইবে সে-রাগ বাহ্যত তাহার মাতার প্রতি কিন্তু বস্তুত তাহা শিশুর একটা কোনো অনির্দেশ্য অস্বাস্থ্য। সুস্থ শিশু যখন আনন্দে থাকে তখন বিরক্তির কারণ ঘটিলেও সেটাকে সে অনায়াসে ভুলিয়া যায়। সেইরূপ দেশের আন্তরিক যে-আক্ষেপ আমাদিগকে আত্মকলহে লইয়া যাইতেছে তাহা আর কিছুই নহে তাহা ব্যবস্থাবন্ধনের অভাবজনিত ব্যর্থ উদ্যমের অসন্তোষ। শক্তিকে অনুভব করিতেছি

অথচ তাহাকে সম্পূর্ণ খাটাইতে পারিতেছি না বলিয়াই সেই অস্বাস্থ্যে ও আত্মগ্লানিতে আমরা আত্মীয়দিগকেও সহ্য করিতে পারিতেছি না।

যখন একদিনের চেষ্টাতেই আমরা দেখিয়াছি যে, জাতীয় ভাণ্ডারে টাকা আসিয়া পড়া এই বহুপরিবারভারগ্রস্ত দরিদ্র দেশেও দুঃসাধ্য নহে তখন এই আক্ষেপ কেমন করিয়া ভুলিব যে, কেবলমাত্র ব্যবস্থা করিতে না পারাতেই এই একদিনের উদ্‌যোগকে আমরা চিরদিনের ব্যাপার করিয়া তুলিতে পারিলাম না। এমন কি, যে-টাকা আমাদের হাতে আসিয়া জমিয়াছে তাহা লইয়া কী যে করিব তাহাই আজ পর্যন্ত ঠিক করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই জমা টাকা মাতৃস্তনের নিরুদ্ধ দুগ্ধের মতো আমাদের পক্ষে একটা বিষম বেদনার বিষয় হইয়া রহিল। দেশের লোক যখন ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে, আমরা দিতে চাই আমরা কাজ করিতে চাই, কোথায় দিব কী করিব তাহার একটা কিনারা হইয়া উঠিলে বাঁচিয়া যাই; তখনও যদি দেশের এই উদ্যত ইচ্ছাকে সার্থক করিবার জন্য কোনো একটা যজ্ঞক্ষেত্র নির্মিত না হয়, তখনও যদি সমস্ত কাজ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবেই হইতে থাকে তবে এমন অবস্থায় এমন খেদে মানুষ আর কিছু না পারিলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করিয়া আপনার কর্মভ্রষ্ট উদ্যম ক্ষয় করে।

তখন ঝগড়ার উপলক্ষ্যও তেমনি অসংগত হয়। আমাদের মধ্যে কেহ বা বলি আমি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত স্বায়ত্তশাসন চাহি, কেহ বা বলি আমি সাম্রাজ্যনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যই চাহি। অথচ এ-সমস্ত কেবল মুখের কথা এবং এতই দূরের কথা যে, ইহার সঙ্গে আমাদের উপস্থিত দায়িত্বের কোনো যোগ নাই।

দেবতা যখন কলোনিয়াল সেল্ফ-গবর্মেণ্ট এবং অটনমি এই দুই বর দুই হাতে লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন এবং যখন তাঁহার মুহূর্তমাত্র বিলম্ব সহিবে না তখন কোন্ বরটা তুলিয়া লইতে হইবে হাতে হাতে তাহার নিষ্পত্তি করিতে পরস্পর হাতাহাতি করাই যদি অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে তবে অগত্যা তাহা করিতে হইবে। কিন্তু যখন মাঠে চাষ দেওয়াও হয় নাই তখন কি ফসলভাগের মামলা তুলিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে?

ব্যক্তিই বল, জাতিই বল, মুক্তিই সকলের চরম সিদ্ধি। কিন্তু শাস্ত্রে বলে, নিজের মধ্যেই মুক্তির নিগূঢ় বাধা আছে, সেইগুলা আগে কর্মের দ্বারা ক্ষয় না করিলে কোনো-মতেই মুক্তি নাই। আমাদের জাতীয় মুক্তিরও প্রধান বিঘ্নসকল আমাদের অভ্যন্তরেই নানা আকারে বিদ্যমান,—কর্মের দ্বারা সেগুলার যদি ধ্বংস না হয় তবে তর্কের দ্বারা হইবে না এবং বিবাদের দ্বারা তাহা বাড়িতেই থাকিবে। অতএব, কি কয় প্রকারের

আছে, সাযুজ্য-মুক্তিই ভালো না স্বাতন্ত্র্য-মুক্তিই শ্রেয়, শান্তিরক্ষা করিয়া তাহার আলোচনা অনায়াসেই চলিতে পারে, কিন্তু সাযুজ্যই বল, আর স্বাতন্ত্র্যই বল, গোড়াকার কথা একই অর্থাৎ তাহা কর্ম। সেখানে উভয় দলকে একই পথ দিয়া যাত্রা করিতে হইবে। যে-সকল প্রকৃতিগত কারণে আমরা দরিদ্র ও দুর্বল, আমরা বিভক্ত বিরুদ্ধ ও পরতন্ত্র, সেই কারণ ঘোচাইবার জন্য আমরা যদি সত্যসত্যই মন দিই তবে আমাদের সকল মতের লোককে একত্রে মিলিতেই হইবে।

এই কর্মক্ষেত্রেই যখন আমাদের সকলের একত্রে মিলন নিতান্তই চাই তখন সেই মিলনের জন্য একটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন—তাহা অমত্ততা। আমরা যদি যথার্থ বলিষ্ঠমনা ব্যক্তির ন্যায় কথায় ও ব্যবহারে, চিন্তায় ও প্রকাশে পরিমাণরক্ষা করিয়া না চলিতে পারি তবে মিলনই আমাদের পক্ষে বিরোধের হেতু হইবে—এবং কর্মের চেষ্টায় লাভ না হইয়া বারংবার ক্ষতি ঘটাইতে থাকিবে।

এই বিষয়ে আজকালকার ভারতীয় রাজপুরুষদের সমান চালে চলিবার চেষ্টা করিলে আমাদের অনিষ্টই হইবে। বর্তমান ভারতশাসনব্যাপারে একটা উৎকট হিস্টীরিয়ার আক্ষেপ হঠাৎ থাকিয়া থাকিয়া কখনো পাঞ্জাবে, কখনো মাদ্রাজে, কখনো বাংলায় যেরূপ অসংযমের সহিত প্রকাশ পাইয়া উঠিতেছে সেটা কি আমাদের পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত?

যাহার হাতে বিরাট শক্তি আছে, সে যদি অসহিষ্ণু হইয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করাকেই পৌরুষের পরিচয় বলিয়া কল্পনা করে এবং নিজের রচনাকে নিজে বিপর্যস্ত করিয়া সান্ত্বনা পায় তবে তাহার সেই চিত্তবিকার আমাদের মতো দুর্বলতর পক্ষকে যেন অনুকরণে উত্তেজিত না করে। বস্তুত প্রবলই হউক আর দুর্বলই হউক যে-ব্যক্তি বাক্যে ও আচরণে অন্তরের ভাবাবেগকে যথেষ্ট পরিমাণে সংযত করিতে না পারিয়াছে সেই ব্যক্তি সকল কর্মের অন্তরায় এ-কথাটা ক্ষোভবশত আমরা যখনই ভুলি ইহার সত্যতাও তখনই সবেগে সপ্রমাণ হইয়া উঠে।

সম্প্রতি দেশের কর্ম বলিতে কী বুঝায় এবং তাহার যথার্থ গতিটা কোন্ দিকে সে-সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে সত্যকার কোনো মতভেদ আছে এ-কথা আমি মনে করিতেই পারি না।

কর্মের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র উপস্থিত একটা কোনো ফললাভ নহে। শক্তিকে খাটাইবার জন্যও কর্মের প্রয়োজন। কর্মের উপযুক্ত সুযোগ পাইলেই এই শক্তি নানা আশ্চর্য ও অভাবনীয় রূপে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। এমন যদি উপায় থাকিত যাহাতে ফলটা পাওয়া যায় অথচ শক্তিটার কোনো প্রয়োজনই হয় না তবে তাহাকে আমরা সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারিতাম না।

তেমন উপায় পৃথিবীতে নাইও। আমরা কোনো শ্রেয় পদার্থকেই পরের কৃপার দ্বারা পাই না, নিজের শক্তির দ্বারাই লই। ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। কারণ, বিধাতা বরঞ্চ আমাদিগকে হনন করিতে পারেন কিন্তু মনুষ্যত্বকে অপমানিত হইবার পথে কোনো প্রশ্রয় দেন না।

সেইজন্যই দেখিতে পাই গবর্মেণ্টের দানের সঙ্গে যেখানেই আমাদের শক্তির কোনো সহযোগিতা নাই সেখানে সেই দানই বক্র হইয়া উঠিয়া আমাদের কত না বিপদ ঘটাইতে পারে। প্রশ্রয়প্রাপ্ত পুলিস যখন দস্যুবৃত্তি করে তখন প্রতিকার অসম্ভব হইয়া উঠে; গবর্মেণ্টের প্রসাদভোগী পঞ্চায়েত যখন গুপ্তচরের কাজ আরম্ভ করে তখন গ্রামের পক্ষে তাহা যে কতবড়ো উপদ্রবের কারণ হইতে পারে তাহা কিছুই বলা যায় না; গবর্মেণ্টের চাকরি যখন শ্রেণীবিশেষকেই অনুগ্রহভাজন করিয়া তোলে তখন ঘরের লোকের মধ্যেই বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠে এবং রাজমন্ত্রিসভায় যখন সম্প্রদায়বিশেষের জন্যই আসন প্রশস্ত হইতে থাকে তখন বলিতে হয় আমার উপকারে কাজ নাই তোমার অনুগ্রহ ফিরাইয়া লও। আমাদের নিজের মধ্যে সতেজ শক্তি থাকিলে এই সমস্ত বিকৃতি কিছুতেই ঘটিতে পারিত না—আমরা দান গ্রহণ করিবার ও তাহাকে রক্ষা করিবার অধিকারী হইতাম—দান আমাদের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই বলিদান হইয়া উঠিত না।

অতএব আমি যাহা বলিতেছি তাহাতে এ বোঝায় না যে, আমাদের কর্মের কোনো উপকরণ আমরা গবর্মেণ্টের নিকট হইতে লইব না, কিন্তু ইহাই বুঝায় যে, নিজের সম্পূর্ণ সাধ্যমত যদি কর্মে প্রবৃত্ত হই তবেই তাহার উপকরণ আমরা সকল স্থান হইতেই অসংকোচে সংগ্রহ করিবার অধিকারী হইব। নতুবা আমাদের সেই গল্পের দশা ঘটিবে। আমরা মা কালীর কাছে মহিষ মানত করিবার বেলা চিন্তা করিব না বটে কিন্তু পরে তিনি যখন অনেক ক্ষমা করিয়াও একটিমাত্র পতঙ্গ দাবি করিবেন তখন বলিব, মা, ওটা তুমি নিজে ক্ষেত্রে গিয়া ধরিয়া লও গে। আমরাও কথার বেলায় বড়ো বড়ো করিয়াই বলিব কিন্তু অবশেষে দেশের একটি সামান্য হিতসাধনের বেলাতেও অন্যের উপরে বরাত দিয়া দায় সারিবার ইচ্ছা করিব।

কাজে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, রাগ করিয়া, গর্ব করিয়া, বা অন্য কারণে, যে-জিনিসটা নিশ্চিত আছে তাহাকে নাই বলিয়া হিসাব হইতে বাদ দিয়া বসিলে চলিবে না। ভারতে ইংরেজ-গবর্মেণ্ট যেন একেবারেই নাই এমনভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা শয়নাগারেই চলে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সেরূপভাবে চলিলেই নিশ্চয় ঠকিতে হইবে।

অবশ্য এ-কথাও সত্য, ইংরেজও, যতদূর সম্ভব, এমনভাবে চলিতেছে যেন আমরা কোথাও নাই। আমাদের ত্রিশ কোটি লোকের মাঝখানে থাকিয়াও তাহারা বহুদূরে।

সেইজন্যই আমাদের সম্বন্ধে তাহাদের পরিমাণবোধ একেবারেই চলিয়া গেছে। সেই-জন্যই পনেরো বৎসরের একটি ইস্কুলের ছেলেরও একটু তেজ দেখিলে তাহারা জেলের মধ্যে তাহাকে বেত মারিতে পারে; মানুষ সামান্য একটু নড়িলে-চড়িলেই প্যুনিটিভ পুলিসের চাপে তাহাকে সম্পূর্ণ নিশ্চল করিয়া ফেলিতে মনে তাহাদের ধিক্‌কার বোধ হয় না; এবং দুর্ভিক্ষে মরিবার মুখে লোকে যখন বিলাপ করিতে থাকে সেটাকে অত্যুক্তি বলিয়া অগ্রাহ্য করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়; সেইজন্যই বাংলার বিভাগব্যাপারে সমস্ত বাঙালিকেই বাদ দিয়া মর্লে সেটাকে "সেট্‌ল্‌ড ফ্যাক্ট" বলিয়া গণ্য করিতে পারিয়াছেন। এইরূপে আচারে বিচারে এবং রাষ্ট্রবিধানে যখন দেখিতে পাই ইংরেজের খাতায় হিসাবের অঙ্কে আমরা কতবড়ো একটা শূন্য তখন ইহার পালটাই দিবার জন্য আমরাও উহাদিগকে যতদূর পারি অস্বীকার করিবার ভঙ্গি করিতে ইচ্ছা করি।

কিন্তু খাতায় আমাদিগকে একেবারে শূন্যের ঘরে বসাইয়া গেলেও আমরা তো সত্যই একেবারে শূন্য নহি। ইংরেজের শুমারনবিস ভুল হিসাবে যে অঙ্কটা ক্রমাগতই হরণ করিয়া চলিতেছে তাহাতে তাহার সমস্ত খাতা দূষিত হইয়া উঠিতেছে। গায়ের জোরে হাঁ-কে না করিলে গণিতশাস্ত্র ক্ষমা করিবার লোক নয়।

একপক্ষে এই ভুল করিতেছে বলিয়া রাগ করিয়া আমারও কি সেই ভুলটাই করিব? পরের উপর বিরক্ত হইয়া নিজের উপরেই তাহার প্রতিশোধ তুলিব? ইহা তো কাজের প্রণালী নহে।

বিরোধমাত্রই একটা শক্তির ব্যয়—অনাবশ্যক বিরোধ অপব্যয়। দেশের হিতব্রতে যাঁহারা কর্মযোগী, অত্যাবশ্যক কণ্টকক্ষত তাঁহাদিগকে পদে পদে সহ্য করিতেই হইবে; কিন্তু শক্তির ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করিবার জন্য স্বদেশের যাত্রাপথে নিজের চেষ্টায় কাঁটার চাষ করা কি দেশহিতৈষিতা!

আমরা এই যে বিদেশী-বর্জনব্রত গ্রহণ করিয়াছি ইহারই দুঃখ তো আমাদের পক্ষে সামান্য নহে। স্বয়ং য়ুরোপেই ধনী আপন ধনবৃদ্ধির পথ অব্যাহত রাখিবার জন্য শ্রমীকে কিরূপ নাগপাশে বেষ্টন করিয়া ফেলিতেছে এবং তাহা লইয়া সেখানে কতই কঠিন আঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছে। আমাদের দেশে সেই ধনী শুধু ধনী নন জেলের দারোগা, লিভারপুলের নিমক খাইয়া থাকে।

অতএব এ-দেশের যে-ধন লইয়া পৃথিবীতে তাঁহারা ঐশ্বর্যের চূড়ায় উঠিয়াছেন সেই ধনের রাস্তায় আমরা একটা সামান্য বাধা দিলেও তাঁহারা তো আমাদিগকে সহজে ছাড়িবেন না। এমন অবস্থায় যে-সংঘাত আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তাহা খেলা নহে,—তাহাতে আরাম-বিশ্রামের অবকাশ নাই, তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি ও সহিষ্ণুতার

প্রয়োজন আছে। ইহার উপরেও যাঁহারা অনাহত ঔদ্ধত্য ও অনাবশ্যক উগ্রবাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাদের কর্মের দুরূহতাকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা কি দেশের কাছে অপরাধী নহেন? কাজের কঠোরতাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিব, কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিব না—দেশের শিল্পবাণিজ্যকে স্বাধীন করিয়া নিজের শক্তি অনুভব করিব, দেশের বিদ্যাশিক্ষাকে স্বায়ত্ত করিব, সমাজকে দেশের কর্তব্যসাধনের উপযোগী বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব;—ইহা করিতে গেলে ঘরে পরে দুঃখ ও বাধার অবধি থাকিবে না, সেজন্য অপরাজিতচিত্তে প্রস্তুত হইব কিন্তু বিরোধকে বিলাসের সামগ্রী করিয়া তুলিব না। দেশের কাজ নেশার কাজ নহে, তাহা সংযমীর দ্বারা যোগীর দ্বারাই সাধ্য।

মনে করিবেন না, ভয় বা সংকোচ বশত আমি এ-কথা বলিতেছি। দুঃখকে আমি জানি, দুঃখকে আমি মানি, দুঃখ দেবতারই প্রকাশ; সেইজন্যই ইহার সম্বন্ধে কোনো চাপল্য শোভা পায় না। দুঃখ দুর্বলকেই হয় স্পর্ধায় নয় অভিভূতিতে লইয়া যায়। প্রচণ্ডতাকেই যদি প্রবলতা বলিয়া জানি, কলহকেই যদি পৌরুষ বলিয়া গণ্য করি, এবং নিজেকে সর্বত্র ও সর্বদাই অতিমাত্র প্রকাশ করাকেই যদি আত্মোপলব্ধির স্বরূপ বলিয়া স্থির করি তবে দুঃখের নিকট হইতে আমরা কোনো মহৎ শিক্ষা প্রত্যাশা করিতে পারিব না।

দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ করিব? উচ্চ চূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদের কর্মশক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই তবে প্রত্যেক জেলা হইতে তাহার ভিত গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। প্রভিনশ্যাল কনফারেন্সের ইহাই সার্থকতা।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক প্রতিনিধিসভা স্থাপিত হইবে। এই সভা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে আপনার শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন করিবে—প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সর্বাংশের সকলপ্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে—কারণ কর্মের ভূমিকাই জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে সর্বাগ্রে তাহার সমস্ত অবস্থা জানা চাই।

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক-একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাবমোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য

হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্ম ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে সেখানে কর্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিসের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।

জোতদার ও চাষা রায়ত যতদিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকিয়া চাষবাস করিবে ততদিন তাহাদের অসচ্ছল অবস্থা কিছুতেই ঘুচিবে না। পৃথিবীতে চারিদিকে সকলেই জোট বাঁধিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছে; এমন অবস্থায় যাহারাই বিচ্ছিন্ন এককভাবে থাকিবে তাহাদিগকে চিরদিনই অন্যের গোলামি ও মজুরি করিয়া মরিতেই হইবে।

অদ্যকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে সমস্ত একত্র মিলাইয়া বাঁধ বাঁধিবার সময় আসিয়াছে। এ না হইলে ঢালু পথ দিয়া আমাদের ছোটো ছোটো সামর্থ্য ও সম্বলের ধারা বাহির হইয়া গিয়া অন্যের জলাশয় পূর্ণ করিবে। অন্ন থাকিতেও আমরা অন্ন পাইব না এবং আমরা কী কারণে কেমন করিয়া যে মরিতেছি তাহা জানিতেও পারিব না। আজ যাহাদিগকে বাঁচাইতে চাই তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে।

য়ুরোপে আমেরিকায় কৃষির নানাপ্রকার মিতশ্রমিক যন্ত্র বাহির হইয়াছে—নিতান্ত দারিদ্র্যবশত সে-সমস্ত আমাদের কোনো কাজেই লাগিতেছে না—অল্প জমি ও অল্প শক্তি লইয়া সে-সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নহে। যদি এক-একটি মণ্ডলী অথবা এক-একটি গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া নিজেদের সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া দিয়া কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে অনেক খরচ বাঁচিয়া ও কাজের সুবিধা হইয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে। যদি গ্রামের উৎপন্ন সমস্ত ইক্ষু তাহারা এক কলে মাড়াই করিয়া লয় তবে দামি কল কিনিয়া লইলে তাহাদের লাভ বই লোকসান হয় না—পাটের খেত সমস্ত এক করিয়া লইলে প্রেসের সাহায্যে তাহারা নিজেরাই পাট বাঁধাই করিয়া লইতে পারে—গোয়ালারা একত্র হইয়া জোট করিলে গোপালন ও মাখন ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সস্তায় ও ভালোমতে সম্পন্ন হয়। তাঁতিরা জোট বাঁধিয়া নিজের পল্লীতে যদি কল আনে এবং প্রত্যেকে তাহাতে আপনার খাটুনি দেয় তবে কাপড় বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেকেরই সুবিধা ঘটে।

শহরে ধনী মহাজনের কারখানায় মজুরি করিতে গেলে শ্রমীদিগের মনুষ্যত্ব কিরূপ নষ্ট হয় সকলেই জানেন। বিশেষত আমাদের যে-দেশের সমাজ গৃহের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে গৃহনীতি বিচলিত হইলে ধর্মের প্রধান অবলম্বন জীর্ণ হইয়া পড়ে ও সমাজের

মর্মস্থানে বিষসঞ্চার হইতে থাকে সে-দেশে বড়ো বড়ো কারখানা যদি শহরের মধ্যে আবর্ত রচনা করিয়া চারিদিকের গ্রামপল্লী হইতে দরিদ্র গৃহস্থদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনে তবে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত, বাসস্থান হইতে বিশ্লিষ্ট স্ত্রীপুরুষগণ নিরানন্দকর কলের কাজে ক্রমশই কিরূপ দুর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত হইতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। কলের দ্বারা কেবল জিনিসপত্রের উপচয় করিতে গিয়া মানুষের অপচয় করিয়া বসিলে সমাজের অধিকদিন তাহা সহিবে না। অতএব পল্লীবাসীরাই একত্রে মিলিলে যে-সকল যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভবপর হয় তাহারই সাহায্যে স্বস্থানেই কর্মের উন্নতি করিতে পারিলে সকলদিক রক্ষা হইতে পারে। শুধু তাই নয় দেশের জনসাধারণকে ঐক্যনীতিতে দীক্ষিত করিবার এই একটি উপায়। প্রাদেশিক সভা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা একটি মণ্ডলীকেও যদি এইরূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন তবে এই দৃষ্টান্তের সফলতা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

এমনি করিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষের দেশগুলির মধ্যে তাহার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়া উঠিবে এবং সেই দৈশিক কেন্দ্রগুলি একটি মাহাদেশিক কেন্দ্রচূড়ায় পরিণত হইবে। তখনই সেই কেন্দ্রটি ভারতবর্ষের সত্যকার কেন্দ্র হইবে। নতুবা পরিধি যাহার প্রস্তুতই হয় নাই সেই কেন্দ্রের প্রামাণিকতা কোথায়? এবং যাহার মধ্যে দেশের কর্মের কোনো উদ্‌যোগ নাই কেবলমাত্র দুর্বল জাতির দাবি এবং দায়িত্বহীন পরামর্শ সে-সভা দেশের রাজকর্মসভার সহযোগী হইবার আশা করিবে কোন্ সত্যের এবং কোন্ শক্তির বলে?

কল আসিয়া যেমন তাঁতকে মারিয়াছে তেমনি ব্রিটিশশাসনও সর্বগ্রহ ও সর্বব্যাপী হইয়া আমাদের গ্রাম্যসমাজের সহজ ব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কালক্রমে প্রয়োজনের বিস্তারবশত ছোটো ব্যবস্থা যখন বড়ো ব্যবস্থায় পরিণত হয় তখন তাহাতে ভালো বই মন্দ হয় না—কিন্তু তাহা স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া চাই। আমাদের যে গ্রাম্যব্যবস্থা ছিল, ছোটো হইলেও তাহা আমাদেরই ছিল, ব্রিটিশ ব্যবস্থা যতবড়োই হউক তাহা আমাদের নহে। সুতরাং তাহাতে যে কেবল আমাদের শক্তির জড়তা ঘটিয়াছে তাহা নহে তাহা আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ঠিকমতো করিয়া পূরণ করিতে পারিতেছে না। নিজের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া পরের চক্ষু দিয়া কাজ চালানো কখনোই ঠিকমতো হইতে পারে না।

এখন তাই দেখা যাইতেছে গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোনো লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্বে ছিল আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে, কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচারণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোনো উপায় নাই; যে দেবালয় ছিল তাহা

সংস্কারের কোনো শক্তি নাই; যে-সকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গণ্ডমূর্খ ছেলেরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবসায় ধরিয়াছে; যে-সকল ধনিগৃহে ক্রিয়াকর্মে যাত্রায় গানে সাহিত্যরস ও ধর্মের চর্চা হইত তাঁহারা সকলেই শহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন; যাঁহারা দুর্বলের সহায়, শরণাগতের আশ্রয় ও দুষ্কৃতকারীর দণ্ডদাতা ছিলেন তাঁহাদের স্থান পুলিসের দারোগা আজ কিরূপভাবে পূরণ করিতেছে তাহা কাহারও অগোচর নাই; লোকহিতের কোনো উচ্চ আদর্শ, পরার্থে আত্মত্যাগের কোনো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রামের মাঝখানে আর নাই; কোনো বিধিনিষেধের শক্তি ভিতর হইতে কাজ করিতেছে না, আইনে যে কৃত্রিম বাঁধ দিতে পারে তাহাই আছে মাত্র; পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্দমায় গ্রাম উন্মাদের মতো নিজের নখে নিজেকে ছিন্ন করিতেছে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেহ নাই; জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; আকাল পড়িলে পরবর্তী ফসল পর্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া বাঁচিবে এমন সঞ্চয় নাই; ডাকাত অথবা পুলিস চুরি অথবা চুরি-তদন্ত জন্য ঘরে ঢুকিলে ক্ষতি ও অপমান হইতে আপনার গৃহকে বাঁচাইবে এমন পরস্পর-ঐক্যমূলক সাহস নাই; তাহার পর যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কী অবস্থা। ঘি দূষিত, দুধ দুর্মূল্য, মৎস্য দুর্লভ, তৈল বিষাক্ত; যে-কয়টা স্বদেশী ব্যাধি ছিল তাহারা আমাদের যকৃৎ-প্লীহার উপর সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে; তাহার উপর বিদেশী ব্যাধিগুলা অতিথির মতো আসে এবং কুটুম্বের মতো রহিয়া যায়;—ডিপথিরিয়া, রাজযক্ষ্মা, টাইফয়েড সকলেই এই রক্তহীনদের প্রতি এক্সপ্লয়টেশন-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই, আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি। ইহার কারণ কী। ইহার কারণ এই, সমস্ত দেশ যে-শিকড় দিয়া রস আকর্ষণ করিবে সেই শিকড়ে পোকা ধরিয়াছে, যে-মাটি হইতে বাঁচিবার খাদ্য পাইবে সেই মাটি পাথরের মতো কঠিন হইয়া গিয়াছে—যে গ্রামসমাজ জাতির জন্মভূমি ও আশ্রয়স্থান তাহার সমস্ত ব্যবস্থাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; এখন সে ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো নবীনকালের নির্দয় বন্যার মুখে ভাসিয়া যাইতেছে।

দেশের মধ্যে পরিবর্তন বাহির হইতে আসিলে পুরাতন আশ্রয়টা যখন অব্যবহারে ভাঙিয়া পড়ে, এবং নূতন কালের উপযোগী কোনো নূতন ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে না তখন সেইরূপ যুগান্তকালে বহুতর পুরাতন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আমরাও কি দিনে দিনে উদাস দৃষ্টির সম্মুখে স্বজাতিকে লুপ্ত হইতে দেখিব ? ম্যালেরিয়া, মারী, দুর্ভিক্ষ—এগুলি কি আকস্মিক ? এগুলি কি আমাদের সান্নিপাতিকের মজ্জাগত দুর্লক্ষণ নহে ? সকলের চেয়ে ভয়ংকর দুর্লক্ষণ সমগ্র দেশের হৃদয়নিহিত হতাশ নিশ্চেষ্টতা। কিছুরই যে প্রতিকার আমাদের নিজের হাতে আছে, কোনো ব্যবস্থাই যে আমরা নিজে করিতে পারি সেই বিশ্বাস যখন চলিয়া যায়, যখন কোনো জাতি কেবল করুণভাবে ললাটে করস্পর্শ করে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে তাকায় তখন কোনো সামান্য আক্রমণও সে আর সহিতে পারে না, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষত দেখিতে দেখিতে তাহার পক্ষে বিষক্ষত হইয়া উঠে। তখন সে মরিলাম মনে করিয়াই মরিতে থাকে।

কিন্তু কালরাত্রি বুঝি পোহাইল,—রোগীর বাতায়নপথে প্রভাতের আলোক আশা বহন করিয়া আসিয়াছে; আজ আমরা দেশের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী—যাহারা একদিন সুখে দুঃখে সমস্ত জনসাধারণের সঙ্গী ও সহায় ছিলাম এবং আজ যাহারা ভদ্রতা ও শিক্ষার বিলাস বশতই চিন্তায় ভাষায় ভাবে আচারে কর্মে সর্ববিষয়েই সাধারণ হইতে কেবলই দূরে চলিয়া যাইতেছি, আমাদিগকে আর-একবার উচ্চনীচ সকলের সঙ্গে মঙ্গল-সম্বন্ধে একত্র মিলিত হইয়া সামাজিক অসামঞ্জস্যের ভয়ংকর বিপদ হইতে দেশের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের শক্তিকে দেশের কল্যাণকর ও দেশের শক্তিকে আমাদের কর্মের সহযোগী করিয়া তুলিবার সময় প্রত্যহ বহিয়া যাইতেছে। যাহারা স্বভাবতই এক অঙ্গ তাহাদের মাঝখানে বাধা পড়িয়া যদি এক রক্ত এক প্রাণ অবাধে সঞ্চারিত হইতে না পারে তবে যে একটা সাংঘাতিক ব্যাধি জন্মে সেই ব্যাধিতেই আজ আমরা মরিতে বসিয়াছি। পৃথিবীতে সকলেই আজ ঐক্যবদ্ধ হইতেছে, আমরাই কেবল সকলদিকে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছি আমরা টিকিতে পারিব কেমন করিয়া ?

আমাদের চেতনা জাতীয় অঙ্গের সর্বত্রই যে প্রসারিত হইতেছে না—আমাদের বেদনাবোধ যে অতিশয় পরিমাণে কেবল শহরে, কেবল বিশিষ্ট সমাজেই বদ্ধ তাহার একটা প্রমাণ দেখুন। স্বদেশী-উদ্‌যোগটা তো শহরের শিক্ষিতমণ্ডলীই প্রবর্তন করিয়াছেন কিন্তু মোটের উপরে তাঁহারা বেশ নিরাপদেই আছেন। যাহারা বিপদে পড়িয়াছে তাহারা কাহারা ?

জগদ্দল পাথর বুকের উপরে চাপাইয়া দেওয়া যে একটা দণ্ডবিধি তাহা রূপকথায় শুনিয়াছিলাম। বর্তমান রাজশাসনে রূপকথার সেই জগদ্দল পাথরটা প্যুনিটিভ পুলিসের বাস্তব মূর্তি ধরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু এই পাথরটা অসহায় গ্রামের উপরে চাপিয়াছে বলিয়াই ইহার চাপ আমাদের

সকলের বুকে পড়িতেছে না কেন? বাংলাদেশের এই বক্ষের ভারকে আমরা সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া লইয়া বেদনাকে সমান করিয়া তুলিব না কেন? স্বদেশী-প্রচার যদি অপরাধ হয় তবে প্যুনিটিভ পুলিসের ব্যয়ভার আমরা সকল অপরাধীই বাঁটিয়া লইব। এই বেদনা যদি সকল বাঙালির সামগ্রী হইয়া উঠে তবে ইহা আর বেদনাই থাকিবে না, আনন্দই হইয়া উঠিবে।

এই উপলক্ষে দেশের জমিদারের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, বাঙলার পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চারের জন্য তাঁহারা উদ্‌যোগী না হইলে এ-কাজ কখনোই সুসম্পন্ন হইবে না। পল্লী সচেতন হইয়া নিজের শক্তি নিজে অনুভব করিতে থাকিলে জমিদারের কর্তৃত্ব ও স্বার্থ খর্ব হইবে বলিয়া আপাতত আশঙ্কা হইতে পারে—কিন্তু এক পক্ষকে দুর্বল করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারের শক্তিকে কেবলই বাধাহীন করিতে থাকা আর ডাইনামাইট বুকের পকেটে লইয়া বেড়ানো একই কথা—একদিন প্রলয়ের অস্ত্র বিমুখ হইয়া অস্ত্রীকেই বধ করে। রায়তদিগকে এমনভাবে সবল ও শিক্ষিত করিয়া রাখা উচিত যে, ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় করিবার প্রলোভনমাত্র জমিদারের মনে না উঠিতে পারে। জমিদার কি বণিকের মতো কেবল দীনভাবে আদায় করিবার পথগুলিই সর্বপ্রকারে মুক্ত রাখিবেন? কিন্তু সেইসঙ্গে মহৎভাবে স্বার্থত্যাগ করিবার সম্বন্ধ যদি একান্ত যত্নে না রক্ষা করেন, উচিত ক্ষতি উদারভাবে স্বীকার করিবার শক্তি যদি তাঁহার না থাকে তবে তাঁহার আত্মসম্মান কেমন করিয়া থাকিবে? রাজহাটে উপাধি কিনিবার বেলায় তিনি তো লোকসানকে লোকসান জ্ঞান করেন না? কিন্তু যথার্থ রাজা হইবার একমাত্র স্বাভাবিক অধিকার আছে তাঁহার রায়তদের কাছে। তিনি যে বহুতর লোকের প্রভু, বন্ধু ও রক্ষক, বহুলোকের মঙ্গলবিধানকর্তা, পৃথিবীতে এতবড়ো উচ্চপদলাভ করিয়া এ-পদের দায়িত্ব রক্ষা করিবেন না?

এ-কথা যেন না মনে করি যে, দূরে বসিয়া টাকা ঢালিতে পারিলেই রায়তের হিত করা যায়। এ-সম্বন্ধে একটি শিক্ষা কোনোদিন ভুলিব না। একসময়ে আমি মফস্বলে কোনো জমিদারি তত্ত্বাবধানকালে সংবাদ পাইলাম, পুলিসের কোনো উচ্চ কর্মচারী কেবল যে একদল জেলের গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে তাহা নহে, তদন্তের উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদের গ্রামে গৃহস্থদের মধ্যে বিষম অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে। আমি উৎপীড়িত জেলেদের ডাকিয়া বলিলাম, তোরা উৎপাতকারীর নামে দেওয়ানি ও ফৌজদারি যেমন ইচ্ছা নালিশ কর আমি কলিকাতা হইতে বড়ো কৌঁসুলি আনাইয়া মকদ্দমা চালাইব। তাহারা হাত জোড় করিয়া কহিল, কর্তা, মামলায় জিতিয়া লাভ কী? পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে আমরা ভিটায় টিকিতেই পারিব না।

আমি ভাবিয়া দেখিলাম দুর্বল লোক জিতিয়াও হারে ; চমৎকার অস্ত্রচিকিৎসা হয় কিন্তু ক্ষীণরোগী চিকিৎসার দায়েই মারা পড়ে। তাহার পর হইতে এই কথা আমাকে বারংবার ভাবিতে হইয়াছে আর-কোনো দান দানই নহে, শক্তিদানই একমাত্র দান।

একটা গল্প আছে, ছাগশিশু একবার ব্রহ্মার কাছে গিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল, "ভগবান, তোমার পৃথিবীতে আমাকে সকলেই খাইতে চায় কেন?" তাহাতে ব্রহ্মা উত্তর করিয়াছিলেন "বাপু, অন্যকে দোষ দিব কী, তোমার চেহারা দেখিলে আমারই খাইতে ইচ্ছা করে।"

পৃথিবীতে অক্ষম বিচার পাইবে, রক্ষা পাইবে এমন ব্যবস্থা দেবতাই করিতে পারেন না। ভারতমন্ত্রসভা হইতে আরম্ভ করিয়া পার্লামেন্ট পর্যন্ত মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও ইহার যথার্থ প্রতিবিধান হইতে পারে না। সাধু ইচ্ছা এখানে অশক্ত। দুর্বলতার সংস্রবে আইন আপনি দুর্বল হইয়া পড়ে, পুলিস আপনি বিভীষিকা হইয়া উঠে। এবং যাঁহাকে রক্ষাকর্তা বলিয়া দোহাই পাড়ি স্বয়ং তিনিই পুলিসের ধর্মবাপ হইয়া দাঁড়ান।

এদিকে প্রজার দুর্বলতা সংশোধন আমাদের কর্তৃপক্ষদের বর্তমান রাজনীতির বিরুদ্ধ। যিনি পুলিস-কমিশনে বসিয়া একদিন ধর্মবুদ্ধির জোরে পুলিসকে অত্যাচারী বলিয়া কটুবাক্য বলেন তিনিই লাটের গদিতে বসিয়া কর্মবুদ্ধির ঝোঁকে সেই পুলিসের বিষদাঁতে সামান্য আঘাতটুকু লাগিলেই অসহ্য বেদনায় অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন। তাহার কারণ আর-কিছুই নহে, কচি পাঁঠাটিকে অন্যের হাত হইতে রক্ষাযোগ্য করিতে গেলে পাছে সে তাঁহার নিজের চতুর্মুখের পক্ষেও কিছুমাত্র শক্ত হইয়া উঠে এ আশঙ্কা তিনি ছাড়িতে পারেন না। দেবা দুর্বলঘাতকাঃ।

তাই দেশের জমিদারদিগকে বলিতেছি, হতভাগ্য রায়তদিগকে পরের হাত এবং নিজের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষিত, সুস্থ ও শক্তিশালী করিয়া না তুলিলে কোনো ভালো আইন বা অনুকূল রাজশক্তির দ্বারা ইহারা কদাচ রক্ষা পাইতে পারিবে না। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সকলেরই জিহ্বা লালায়িত হইবে। এমনি করিয়া দেশের অধিকাংশ লোককেই যদি জমিদার, মহাজন, পুলিস, কানুনগো, আদালতের আমলা, যে ইচ্ছা সে অনায়াসেই মারিয়া যায় ও মারিতে পারে তবে দেশের লোককে মানুষ হইতে না শিখাইয়াই রাজা হইতে শিখাইব কী করিয়া?

অবশেষে বর্তমানকালে আমাদের দেশের যে-সকল দৃঢ়নিষ্ঠ যুবক সমস্ত সংকট উপেক্ষা করিয়াও স্বদেশহিতের জন্য স্বেচ্ছাব্রত ধারণ করিতেছেন অদ্য এই সভাস্থলে তাঁহারা সমস্ত বঙ্গদেশের আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। রক্তবর্ণ প্রত্যূষে তোমরাই সর্বাগ্রে জাগিয়া উঠিয়া অনেক দ্বন্দ্বসংঘাত এবং অনেক দুঃখ সহ্য করিলে। তোমাদের সেই

পৌরুষের উদ্‌বোধন কেবলমাত্র বজ্রঝংকারে ঘোষিত হইয়া উঠে নাই, আজ করুণাবর্ষণে তৃষ্ণাতুর দেশে প্রেমের বাদল আনিয়া দিয়াছে। সকলে যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছে, অপমানে যাহারা অভ্যস্ত, যাহাদের সুবিধার জন্য কেহ কোনোদিন এতটুকু স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই, গৃহের বাহিরে যাহারা কাহারও কাছে কোনো সহায়তা প্রত্যাশা করিতেও জানে না তোমাদের কল্যাণে আজ তাহারা দেশের ছেলেদিগকে ভাই বলিতে শিখিল। তোমাদের শক্তি আজ যখন প্রীতিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তখন পাষাণ গলিয়া যাইবে, মরুভূমি উর্বরা হইয়া উঠিবে, তখন ভগবান আর আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন থাকিবেন না। তোমরা ভগীরথের স্থায় তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছ; ইহার প্রবল পুণ্যস্রোতকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারিবে না, এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্বপুরুষের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। হে তরুণতেজে উদ্দীপ্ত, ভারতবিধাতার প্রেমের দূতগুলি, আমি আজ তোমাদের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া এই নিবেদন করিতেছি যে, দেশে অর্ধোদয় যোগ কেবল একদিনের নহে। স্বদেশের অসহায় অনাথগণ যে বঞ্চিত, পীড়িত ও ভীত হইতেছে সে কেবল কোনো বিশেষ স্থানে বা বিশেষ উপলক্ষে নহে, এবং তাহাদিগকে যে কেবল তোমাদের নিজের শক্তিতেই রক্ষা করিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিবে সে-দুরাশা করিয়ো না।

তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক-একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ করো। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহারসামগ্রীসম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত করো; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার করো, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্‌ভাবিত করো। এ-কর্মে খ্যাতির আশা করিয়ো না এমন কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো বিরোধ নাই, কোনো ঘোষণা নাই, কেবল ধৈর্য এবং প্রেম, নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে, দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।

বাংলাদেশের প্রভিনশ্যাল কনফারেন্স যদি বাংলার জেলায় জেলায় এইরূপ প্রাদেশিক সভা স্থাপন করিয়া তাহাকে পোষণ করিয়া তুলিবার ভার গ্রহণ করেন, এবং এই প্রাদেশিক সভাগুলি গ্রামে পল্লীতে আপন ফলবান ও ছায়াপ্রদ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া দেন তবেই স্বদেশের প্রতি আমাদের সত্য অধিকার জন্মিবে এবং স্বদেশের সর্বাঙ্গ

হইতে নানাধমনীযোগে জীবনসঞ্চারের বলে কনগ্রেস দেশের স্পন্দমান হৃৎপিণ্ডস্বরূপ মর্মপদার্থ হইয়া ভারতবর্ষের বক্ষের মধ্যে বাস করিবে।

সভাপতির অভিভাষণে সভার কার্যতালিকা অবলম্বন করিয়া আমি কোনো আলোচনা করি নাই। দেশের সমস্ত কার্যই যে-লক্ষ্য ধরিয়া চলিবে আমি তাহার মূলতত্ত্ব কয়টি নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। সে-কয়টি এই—

প্রথম, বর্তমানকালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতে হইবে। বর্তমানের সেই প্রকৃতিটি—জোট বাঁধা, ব্যূহবদ্ধতা, অর্গ্যানিজেশন। সমস্ত মহৎগুণ থাকিলেও ব্যূহের নিকট কেবলমাত্র সমূহ আজ কিছুতেই টিকিতে পারিবে না। অতএব গ্রামে গ্রামে আমাদের মধ্যে যে বিশ্লিষ্টতা, যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে গ্রামগুলিকে সত্বর ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে।

দ্বিতীয়, আমাদের চেতনা জাতীয়-কলেবরের সর্বত্র গিয়া পৌঁছিতেছে না। সেইজন্য স্বভাবতই আমাদের সমস্ত চেষ্টা এক জায়গায় পুষ্ট ও অন্য জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জনসমাজের সহিত শিক্ষিতসমাজের নানাপ্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।

তৃতীয়, এই ঐক্যবোধ কোনোমতেই কেবল উপদেশ বা আলোচনার দ্বারা সত্য হইতেই পারে না। শিক্ষিতসমাজ গণসমাজের মধ্যে তাঁহাদের কর্মচেষ্টাকে প্রসারিত করিলে তবেই আমাদের প্রাণের যোগ আপনিই সর্বত্র অবাধে সঞ্চারিত হইতে পারিবে।

সর্বসাধারণকে একত্র আকর্ষণ করিয়া একটি বৃহৎ কর্মব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষিতসমাজে নিজের মধ্যে বিরোধ করিয়া তাহা কখনো সম্ভবপর হইবে না। মতভেদ আমাদের আছেই, থাকিবেই এবং থাকাই শ্রেয় কিন্তু দূরের কথাকে দূরে রাখিয়া এবং তর্কের বিষয়কে তর্কসভায় রাখিয়া সমস্ত দেশকে বিনাশ ও বিচ্ছেদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল মতের লোককেই আজ এখনই একই কর্মের দুর্গম পথে একত্র যাত্রা করিতে হইবে, এ-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতেই পারে না। যদি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে দেশের যে সাংঘাতিক দশা ঘটিয়াছে তাহা আমরা চোখ মেলিয়া দেখিতেছি না অথবা ওই সাংঘাতিক দশার যেটি সর্বাপেক্ষা দুর্লক্ষণ—নৈরাশ্যের ঔদাসীন্য—তাহা আমাদিগকেও দুরারোগ্যরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

ভ্রাতৃগণ, জগতের যে-সমস্ত বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে মানবজাতি আপন মহত্তম স্বরূপকে পরম দুঃখ ও ত্যাগের মধ্যে প্রকাশ করিয়া তুলিয়াছে, সেই উদার উন্মুক্ত ভূমিতেই আজ আমাদের চিত্তকে স্থাপিত করিব;—যে-সমস্ত মহাপুরুষ দীর্ঘকালের কঠোরতম সাধনায়

যারা স্বজাতিকে সিদ্ধির পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই আজ আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিব, তাহা হইলেই অদ্য যে-মহাসভায় সমগ্র বাংলা-দেশের আকাঙ্ক্ষা আপন সফলতার জন্য দেশের লোকের মুখের দিকে চাহিয়াছে তাহার কর্ম যথার্থভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে। নতুবা সামান্য কথাটুকুর কলহে আত্মবিস্মৃত হইতে কতক্ষণ? নহিলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয়তো উদ্দেশ্যের পথে কাঁটা দিয়া উঠিবে এবং দলের অভিমানকেই কোনোমতে জয়ী করাকে স্বদেশের জয় বলিয়া ভুল করিয়া বসিব।

আমরা এক-এক কালের লোক কালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া যাইব—কোথায় থাকিবে আমাদের যত ক্ষুদ্রতা মান-অভিমান তর্কবিতর্ক বিরোধ—কিন্তু বিধাতার নিগূঢ় চালনায় আমাদের জীবনের কর্ম নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে স্তরে-স্তরে আকৃতি দান করিয়া আমাদের দেশকে উপরের দিকে গড়িয়া তুলিবে। অন্ধকার দীনতার শ্রীহীনতার মধ্য দিয়া সেই মেঘবিমুক্ত সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভ্যুদয়কে এইখানেই আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করো যেদিন আমাদের পৌত্রগণ সগৌরবে বলিতে পারিবে, এ-সমস্তই আমাদের, এ-সমস্তই আমরা গড়িয়াছি। আমাদের মাঠকে আমরা উর্বর করিয়াছি, জলাশয়কে নির্মল করিয়াছি, বায়ুকে নিরাময় করিয়াছি, বিদ্যাকে বিস্তৃত করিয়াছি ও চিত্তকে নির্ভীক করিয়াছি। বলিতে পারিবে আমাদের এই পরম সুন্দর দেশ—এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা মাতৃভূমি, এই জ্ঞানে ধর্মে কর্মে প্রতিষ্ঠিত বাঁধে বিধৃত জাতীয় সমাজ এ আমাদেরই কীর্তি—যেদিকে চাহিয়া দেখি সমস্তই আমাদের চিন্তা, চেষ্টা ও প্রাণের দ্বারা পরিপূর্ণ, আনন্দগানে মুখরিত এবং নূতন নূতন আশাপথের যাত্রীদের অক্লান্ত পদভারে কম্পমান।

১৩১৪

সদুপায়

বরিশালের কোনো এক স্থান হইতে বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাইলাম যে, যদিও আজকাল করকচ লবণ বিলাতি লবণের চেয়ে সস্তা হইয়াছে তবু আমাদের সংবাদদাতার পরিচিত মুসলমানগণ অধিক দাম দিয়াও বিলাতি লবণ খাইতেছে। তিনি বলেন যে, সেখানকার মুসলমানগণ আজকাল সুবিধা বিচার করিয়া বিলাতি কাপড় বা লবণ ব্যবহার করে না। তাহারা নিতান্তই জেদ করিয়া করে।

অনেক স্থলে নমশূদ্রদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

আমরা পার্টিশন-ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া একদিন দেশকে বিলাতি কাপড় ছাড়াইব ইহাই পণ করিয়াছিলাম, ইহা অপেক্ষা বড়ো কথা এবং দূরের কথা আমরা ভাবি নাই।

যদি জিজ্ঞাসা কর ইহা অপেক্ষা বড়ো কথাটা কী তবে আমি এই উত্তর দিব যে, বাংলাদেশকে দুইভাগ করার দ্বারা যে আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে সেই কারণটাকেই দূর করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা—রাগ প্রকাশ করা তাহার কাছে গৌণ।

পার্টিশনে আমাদের প্রধান আশঙ্কার কারণ কী? সে-কথা আমরা নিজেরা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি; এমন কি, আমাদের মনে এই ধারণা আছে যে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কর্তৃপক্ষ বাংলাকে পূর্ব ও অপূর্ব এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া বঙ্গকে ব্যঙ্গ অর্থাৎ বিকলাঙ্গ করিয়াছেন।

বাংলাদেশের পূর্বভাগে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ধর্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশি—সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাহাদের মধ্যে নিহিত হইয়া আছে। এই মুসলমান-অংশ, ভাষা সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতির একত্ব-বশত হিন্দুদের সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধনে বদ্ধ আছে। যদি বাংলাকে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমান-প্রধান এই দুই অংশে একবার ভাগ করা যায়, তবে ক্রমে ক্রমে হিন্দুমুসলমানের সকল বন্ধনই শিথিল করিয়া দেওয়া সহজ হয়।

ম্যাপে দাগ টানিয়া হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে পৃথক করিয়া দেওয়া কঠিন। কারণ বাঙালি হিন্দুর মধ্যে সামাজিক ঐক্য আছে। কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিয়া গেছে। সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই;—দুই পক্ষে একরকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম।

কিন্তু যে-ভেদটা আছে রাজা যদি চেষ্টা করিয়া সেই ভেদটাকে বড়ো করিতে চান, এবং দুইপক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া তোলেন তবে কালক্রমে হিন্দুমুসলমানের দূরত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষাবিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আসল কথা, আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া কিছুই শক্ত নহে, মিলন ঘটাইয়া তোলাই কঠিন। বেহারিগণ বাঙালির প্রতিবেশী এবং বাঙালি অনেক দিন হইতেই বেহারিগণের সঙ্গে কারকারবার করিতেছে কিন্তু বাঙালির সঙ্গে বেহারির সৌহৃদ্য নাই সে-কথা বেহারবাসী বাঙালিমাত্রেই জানেন। শিক্ষিত উড়িয়াগণ বাঙালি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া দাঁড় করাইতে উৎসুক এবং আসামিদেরও সেইরূপ অবস্থা। অতএব উড়িষ্যা আসাম বেহার ও বাংলা জড়াইয়া আমরা যে-দেশকে বহুদিন হইতে বাংলাদেশ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি তাহার সমস্ত অধিবাসী আপনাদিগকে

বাঙালি বলিয়া কখনো স্বীকার করে নাই এবং বাঙালিও বেহারি উড়িয়া এবং আসামিকে আপন করিয়া লইতে কখনো চেষ্টামাত্র করে নাই বরঞ্চ তাহাদিগকে নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া অবজ্ঞাদ্বারা পীড়িত করিয়াছে।

অতএব বাংলাদেশের যে-অংশের লোকেরা আপনাদিগকে বাঙালি বলিয়া জানে সে-অংশটি খুব বড়ো নহে এবং তাহার মধ্যেও যে ভূভাগ ফলে শস্যে উর্বর, ধনে ধান্যে পূর্ণ, যেখানকার অধিবাসীর শরীরে বল আছে, মনে তেজ আছে, ম্যালেরিয়া এবং দুর্ভিক্ষ যাহাদের প্রাণের সার শুষিয়া লয় নাই সেই অংশটিই মুসলমানপ্রধান—সেখানে মুসলমান-সংখ্যা বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া চলিয়াছে, হিন্দু বিরল হইয়া পড়িতেছে।

এমন অবস্থায় এই বাঙালির বাংলাটুকুকেও এমন করিয়া যদি ভাগ করা যায় যাহাতে মুসলমান-বাংলা ও হিন্দু-বাংলাকে মোটামুটি স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে বাংলাদেশের মতো এমন খণ্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর-একটিও থাকিবে না।

এমন স্থলে বঙ্গবিভাগের জন্য আমরা ইংরেজরাজের প্রতি যতই রাগ করি না কেন এবং সেই ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতি বর্জন আমাদের পক্ষে যতই একান্ত আবশ্যক হউক না, তাহার চেয়ে বড়ো আবশ্যক আমাদের পক্ষে কী ছিল? না, রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের মধ্যে যাহাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায় তাহারই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা।

সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বয়কট-ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে-কোনোপ্রকারেই হ'ক বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশিমাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গবিভাগের যে-পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।

আমরা ধৈর্য হারাইয়া সাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুবিধা-অসুবিধা বিচারমাত্র না করিয়া বিলাতি লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কারসাধনের কাছে আর-কোনো ভালোমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না। ক্রমশ লোকের সম্মতিকে জয় করিয়া লইবার বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না, ইংরেজকে হাতে হাতে তাহার কর্মফল দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

এই উপলক্ষে আমরা দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম সে-কথা স্বীকার করিতে আমাদের ভালো লাগে না কিন্তু কথাটাকে মিথ্যা বলিতে পারি না।

তাহার ফল এই হইয়াছে, বাসনার অত্যুগ্রতা দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের

এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছি। তাহাদিগকে আমাদের মনের মতো কাপড় পরাইতে কতদূর পারিলাম তাহা জানি না কিন্তু তাহাদের মন খোয়াইলাম। ইংরেজের শত্রুতাসাধনে কতটুকু কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না, দেশের মধ্যে শত্রুতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমরা যে সকল স্থানেই মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের অসুবিধা ঘটাইয়া বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছি এ-কথা সত্য নহে। এমন কি, যাহারা বয়কটের কল্যাণে বিশেষ লাভবান হইয়াছে তাহারাও যে আমাদের বিরুদ্ধ হইয়াছে এমন প্রমাণও আছে। ইহার কারণ, আমরা ইহাদিগকে কাজে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টার পূর্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মন পাই নাই, মন পাইবার প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করি নাই, আমাদের প্রতি ইহাদের অবিশ্বাস ও দূরত্ব দূর করি নাই। আমরা ইহাদিগকে নিজের মতে চালাইবার এবং কাজে লাগাইবারই চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু ইহাদিগকে কাছে টানি নাই। সেইজন্য সহসা একদিন ইহাদের সুপ্তপ্রায় ঘরের কাছে আসিয়া ইহাদিগকে নাড়া দিতে গিয়া ইহাদের সন্দেহকে বিরোধকেই জাগাইয়া তুলিয়াছি। ইহাদিগকে আত্মীয় করিয়া না তুলিয়াই ইহাদের নিকট হইতে আত্মীয়তা দাবি করিয়াছি। এবং যে-উৎপাত আপন লোক কোনোমতে সহ্য করিতে পারে সেই উৎপাতের দ্বারা ইহাদিগকে পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ দূরে ফেলিয়াছি।

এবারে এতকাল পরে আমাদের বক্তারা ইংরেজি সভার উচ্চমঞ্চ ছাড়িয়া দেশের সাধারণ লোকের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেশের লোকের মনে একটা প্রশ্ন উদয় হইল—এ কী ব্যাপার; হঠাৎ আমাদের জন্য বাবুদের এত মাথাব্যথা হইল কেন?

বস্তুতই তাহাদের জন্য আমাদের মাথাব্যথা পূর্বেও অত্যন্ত বেশি ছিল না, এখনও একমুহূর্তে অত্যন্ত বেশি হইয়া উঠে নাই। আমরা এই কথা মনে লইয়া তাহাদের কাছে যাই নাই যে, দেশী কাপড় পরিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে এইজন্যই আমাদের দিনে আহার নাই এবং রাত্রে নিদ্রার অবকাশ ঘটিতেছে না। আমরা এই বলিয়াই গিয়াছিলাম যে, ইংরেজকে জব্দ করিতে চাই কিন্তু তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলে বয়কট সম্পূর্ণ হইবে না অতএব ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তোমাদিগকে দেশী কাপড় পরিতে হইবে।

কখনো যাহাদের মঙ্গলচিন্তা ও মঙ্গলচেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, ক্ষতিস্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না।

সাড়া যখন না পাই তখন রাগ হয়। মনে এই হয় যে, কোনোদিন যাহাদিগকে গ্রাহ্যমাত্র করি নাই আজ তাহাদিগকে এত আদর করিয়াও বশ করিতে পারিলাম না! উলটা ইহাদের গুমর বাড়িয়া যাইতেছে।

যাহারা উপরে থাকে, যাহারা নিজেদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, নিচের লোকদের সম্বন্ধে তাহাদের এইরূপ অধৈর্য ঘটে। অশ্রদ্ধাবশতই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তাহাদের অপরিচয় জন্মে। ইংরেজও ঠিক এই কারণবশতই আমাদের দ্বারা তাহার কোনো অভিপ্রায়সাধনের ব্যাঘাত ঘটিলেই কার্যকারণ বিচার না করিয়া একেবারে রাগিয়া উঠে ;—আমরা যখন নিচে আছি তখন উপরওআলার ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছা দ্বারা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে বাধা পাইলেও সেটাকে অবিমিশ্র স্পর্ধা বলিয়া মনে হয়।

ময়মনসিং প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষি-সম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। এ-কথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জন-সাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোনো প্রমাণ কোনোদিন দিই নাই, অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতিস্বীকার করিয়া থাকে বটে কিন্তু ভাই বলিয়া একজন খামকা আসিয়া দাঁড়াইলেই যে অমনি তখনই কেহ তাহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতরো ঘটে না। আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোকে জানে না এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত জাগরূক আমাদের ব্যবহারে এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি সত্য কথাটা এই যে, ইংরেজের উপরে রাগ করিয়াই আমরা দেশের লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম, দেশের লোকের প্রতি ভালোবাসাবশতই যে গিয়াছিলাম তাহা নহে। এমন অবস্থায় "ভাই" শব্দটা আমাদের কণ্ঠে ঠিক বিশুদ্ধ কোমল সুরে বাজে না—যে কড়ি সুরটা আর-সমস্ত স্বরগ্রাম ছাপাইয়া কানে আসিয়া বাজে সেটা অন্যের প্রতি বিদ্বেষ।

আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া "মা" শব্দটাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি। এই শব্দের দ্বারা আমাদের হৃদয়াবেগ এতই জাগিয়া উঠে যে, আমরা মনে করিতে পারি না দেশের মধ্যে মাকে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই। আমরা মনে করি কেবল গানের দ্বারা কেবল ভাবোন্মাদের দ্বারা মা সমস্ত দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। এইজন্য দেশের সাধারণ গণ-সমাজ যদি স্বদেশের মধ্যে মাকে অনুভব না করে তবে আমরা অধৈর্য হইয়া মনে করি সেটা হয় তাহাদের ইচ্ছাকৃত

অন্ধতার ভান, নয় আমাদের শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে মাতৃবিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু আমরাই যে মাকে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নাই এই অপরাধটা আমরা কোনোমতেই নিজের স্কন্ধে লইতে রাজি নহি। ছাত্রকে মাস্টার পড়া বুঝাইয়া দেয় নাই, বুঝাইবার ক্ষমতাও তাহার নাই, অথচ ছাত্র যখন পড়া বলিতে পারে না তখন রাগিয়া তাহাকে মারিতে যাওয়া যেমন এও তেমনি। আমরাই দেশের সাধারণ লোককে দূরে রাখিয়াছি, অথচ প্রয়োজনের সময় তাহারা দূরে থাকে বলিয়া আমরাই রাগ করি।

অবশেষে যাহারা আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই যোগ দিতে পারে নাই, যাহারা বরাবর যে-পথে চলিয়া আসিতেছিল সেই চিরাভ্যস্ত পথ হইতে হঠাৎ ইংরেজি-পড়া বাবুদের কথায় সরিতে ইচ্ছা করিল না, আমরা যথাসাধ্য তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছি, তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য আমাদের জেদ বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছি, যাহারা আত্মহিত বুঝে না বলপূর্বক তাহাদিগকে আত্মহিতে প্রবৃত্ত করাইব।

আমাদের দুর্ভাগ্যই এই, আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মতো ধৈর্য আমাদের নাই;—আমরা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে দ্রুতবেগে পদানত করিবার জন্য চেষ্টা করি। পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করিবার ভয়, ধোবানাপিত বন্ধ করিবার শাসন, ঘরে অগ্নিপ্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা, এ সমস্তই দাসবৃত্তিকে অন্তরের মধ্যে চিরস্থায়ী করিয়া দিবার উপায়;—কাজ ফাঁকি দিবার জন্য পথ বাঁচাইবার জন্য আমরা যখনই এই সকল উপায় অবলম্বন করি তখনই প্রমাণ হয়, বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের পক্ষে কী অমূল্য ধন তাহা আমরা জানি না। আমরা মনে করি আমার মতে সকলকে চালানোই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয়, অতএব সকলে যদি সত্যকে বুঝিয়া সে-পথে চলে তবে ভালোই, যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে অথবা চালনার সকলের চেয়ে সহজ উপায় আছে জবরদস্তি।

বয়কটের জেদে পড়িয়া আমরা এই সকল সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া হিতবুদ্ধির মূলে আঘাত করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। অল্পদিন হইল মফস্বল হইতে পত্র পাইয়াছি সেখানকার কোনো একটি বড়ো বাজারের লোকে নোটিস পাইয়াছে যে, যদি তাহারা বিলাতি জিনিস পরিত্যাগ করিয়া দেশী জিনিসের আমদানি না করে তবে নির্দিষ্ট কালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই বাজারে আগুন লাগিবে। সেই সঙ্গে স্থানীয় ও নিকটবর্তী জমিদারের আমলাদিগকে প্রাণহানির ভয় দেখানো হইয়াছে।

এইরূপভাবে নোটিস দিয়া কোথাও কোথাও আগুন লাগানো হইয়াছে। ইতিপূর্বে জোর করিয়া মাল আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং খরিদদারদিগকে বলপূর্বক বিলাতি জিনিস খরিদ করিতে নিরস্ত করা হইয়াছে। ক্রমে এখন সেই উৎসাহ ঘরে আগুন লাগানো এবং মানুষ মারাতে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ উৎপাতকে আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোক আজও অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছেন না—তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, দেশের হিতসাধনের উপলক্ষে এরূপ উপদ্রব করা যাইতে পারে।

ইঁহাদের নিকট ন্যায়ধর্মের দোহাই পাড়া মিথ্যা;—ইঁহারা বলেন, মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য যাহা করা যাইবে তাহা অধর্ম হইতে পারে না। কিন্তু অধর্মের দ্বারা যে মাতৃভূমির মঙ্গল কখনোই হইবে না সে-কথা বিমুখ বুদ্ধির কাছেও বারবার বলিতে হইবে।

জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি আমরা বিলাতি কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশী কাপড় পরাইয়া ইহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী করিয়া তুলি না? দেশের যে-সম্প্রদায়ের লোক স্বদেশী প্রচারের ব্রত লইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি এই সকল লোকের বিদ্বেষকে কি চিরস্থায়ী করা হয় না?

এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না? "যাহারা কখনো বিপদে আপদে সুখে দুঃখে আমাদিগকে স্নেহ করে নাই, আমাদিগকে যাহারা সামাজিক ব্যবহারে পশুর অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করে তাহারা আজ কাপড় পরানো বা অন্য যে-কোনো উপলক্ষে আমাদের প্রতি জবরদস্তি প্রকাশ করিবে, ইহা আমরা সহ্য করিব না" দেশের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এবং নমশূদ্রের মধ্যে এইরূপ অসহিষ্ণুতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারা জোর করিয়া, এমন কি, ক্ষতিস্বীকার করিয়াও বিলাতি সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে।

তাই বলিতেছি, বিলাতি দ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মতো এতবড়ো অহিত আর কিছুই নাই। দেশের এক পক্ষ প্রবল হইয়া কেবলমাত্র জোরের দ্বারা অপর ক্ষীণ পক্ষকে নিজের মতশৃঙ্খলে দাসের মতো আবদ্ধ করিবে ইহার মতো ইষ্টহানিও আর কিছু হইতে পারে না। এমন করিয়া, বন্দে মাতরম্‌ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও মাতার বন্দনা করা হইবে না—এবং দেশের লোককে মুখে ভাই বলিয়া কাজে ভ্রাতৃদ্রোহিতা করা হইবে। সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না,—ভয় দেখাইয়া, এমন কি, কাগজে কুৎসিত গালি দিয়া মতের অনৈক্য নিরস্ত করাকেও জাতীয় ঐক্য সাধন বলে না।

এ-সকল প্রণালী দাসত্বেরই প্রণালী। যাহারা এইরূপ উপদ্রবকে দেশহিতের উপায় বলিয়া প্রচার করে তাহারা স্বজাতির লজ্জাকর হীনতারই পরিচয় দেয় এবং এইপ্রকার উৎপাত করিয়া যাহাদিগকে দলন দমন করিয়া দেওয়া যায় তাহাদিগকেও হীনতাতেই দীক্ষা দেওয়া হয়।

সেদিন কাগজে দেখিতেছিলাম, মর্লিকে যখন বলা হইয়াছিল যে প্রাচ্যগণ কোনো-প্রকার আপসে অধিকারপ্রাপ্তির মূল্য বোঝে না, তাহারা জোরকেই মানে—তখন তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে পারে কিন্তু আমরা তো প্রাচ্য নই আমরা পাশ্চাত্য।

কথাটা শুনিয়া মনের মধ্যে আক্ষেপ বোধ হইয়াছিল। আক্ষেপের কারণ এই যে, আমাদের ব্যবহারে আমরা প্রাচ্যদের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অপবাদের সমর্থন করিয়া থাকি। অন্যকে জোরের দ্বারা অভিভূত করিয়া চালনা করিব এই অতি হীনবুদ্ধিকে আমরা কিছুতে ছাড়িতে চাহি না। যেখানে আমরা মুখে স্বাধীনতা চাই সেখানেও আমরা নিজের কর্তৃত্ব অন্যের প্রতি অবৈধ বলের সহিত খাটাইবার প্রবৃত্তিকে খর্ব করিতে পারি না। উহার প্রতি জোর না খাটাইলে উহার মঙ্গল হইবে না অতএব যেমন করিয়া পারি আমাকে উহার উপরে কর্তা হইতে হইবে। হিতানুষ্ঠানের উপায়ের দ্বারাও আমরা মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি এবং এই প্রকার অশ্রদ্ধার ঔদ্ধত্য দ্বারা আমরা নিজের এবং অন্য পক্ষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিতে থাকি।

যদি মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে লোকের ঘরে আগুন লাগানো এবং মারধর করিয়া গুণ্ডামি করিতে আমাদের কদাচই প্রবৃত্তি হইবে না; তবে আমরা পরম ধৈর্যের সহিত মানুষের বুদ্ধিকে হৃদয়কে মানুষের ইচ্ছাকে মঙ্গলের দিকে ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিতে প্রাণপাত করিতে পারিব। তখন আমরা মানুষকেই চাহিব, মানুষ কী কাপড় পরিবে বা কী নুন খাইবে তাহাই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া চাহিব না। মানুষকে চাহিলে মানুষের সেবা করিতে হয়, পরস্পরের ব্যবধান দূর করিতে হয়—নিজেকে নম্র করিতে হয়। মানুষকে যদি চাই তবে যথার্থভাবে মানুষের সাধনা করিতে হইবে; তাহাকে কোনোমতে আমার মতে ভিড়াইবার আমার দলে টানিবার জন্য টানাটানি-মারামারি না করিয়া আমাকে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সে যখন বুঝিবে আমি তাহাকে আমার অনুবর্তী অধীন করিবার জন্য বলপূর্বক চেষ্টা করিতেছি না, আমি নিজেকে তাহারই মঙ্গলসাধনের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি তখনই সে বুঝিবে, আমি মানুষের সঙ্গে মনুষ্যোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি—তখনই সে বুঝিবে, বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের দ্বারা আমরা সেই মাকে বন্দনা করিতেছি দেশের ছোটোবড়ো

সকলেই যাঁহার সন্তান। তখন মুসলমানই কি আর নমশূদ্রই কি, বেহারি উড়িয়া অথবা অন্ত যে-কোনো ইংরেজিশিক্ষায় পশ্চাদ্‌বর্তী জাতিই কি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমান লইয়া কাহাকেও ব্যবহারে বা বাক্যে বা চিন্তায় অপমানিত করিব না। তখনই সকল মানুষের সেবা ও সম্মানের দ্বারা, যিনি সকল প্রজার প্রজাপতি, তাঁহার প্রসন্নতা এই ভাগ্যহীন দেশের প্রতি আকর্ষণ করিতে পারিব। নতুবা, আমার রাগ হইয়াছে বলিয়াই দেশের সকল লোককে আমি রাগাইয়া তুলিব, অথবা আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়া দেশের সকল লোকের ইচ্ছাকে আমার অনুগত করিব ইহা কোনো বাগ্মিতার দ্বারা কদাচ ঘটিবে না। ক্ষণকালের জন্য একটা উৎসাহের উত্তাপ জাগাইয়া তুলিতে পারি কিন্তু তাহা সত্যকার ইন্ধনের অভাবে কখনোই স্থায়ী হইতে পারিবে না। সেই সত্যপদার্থ মানুষ—সেই সত্যপদার্থ মানুষের হৃদয় বুদ্ধি, মানুষের মনুষ্যত্ব, স্বদেশী মিলের কাপড় অথবা করকচ লবণ নহে। সেই মানুষকে প্রত্যহ অপমানিত করিয়া মিলের কাপড়ের পূজা করিতে থাকিলে আমরা দেবতার বর পাইব না। বরঞ্চ উলটা ফলই পাইতে থাকিব।

একটি কথা আমরা কখনো ভুলিলে চলিবে না যে, অন্যায়ের দ্বারা, অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। তখন কে কাহাকে কিসের দোহাই দিয়া কোন্‌ সীমার মধ্যে সংযত করিবে? দেশহিতের নাম করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অন্যায়কেও ন্যায়ের আসনে বসাই তবে কাহাকে কোন্‌খানে ঠেকাইব? শিশুও যদি দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে বিচারক হইয়া উঠে এবং উন্মত্তও যদি দেশের উন্নতি-সাধনের ভারগ্রহণ করে তবে সেই উচ্ছৃঙ্খলতা সংক্রামক হইতে থাকিবে, মহামারীর ব্যাপ্তির মতো তাহাকে রোধ করা কঠিন হইবে। তখন দেশহিতৈষীর ভয়ংকর হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে দুঃখকর সমস্যা হইয়া পড়িবে। দুর্বুদ্ধি স্বভাবতই কোনো বন্ধন স্বীকার করে না; বৃহৎভাবে সকলের সহিত যুক্ত হইয়া বৃহৎ কাজ করিতে সে সহজেই অক্ষম। দুঃস্বপ্ন যেমন দেখিতে দেখিতে অসংগত অসংলগ্নভাবে এক বিভীষিকা হইতে আর-এক বিভীষিকায় লাফ দিয়া চলিতে থাকে তেমনি মঙ্গলবুদ্ধির অরাজকতার দিনে নিতান্তই সামান্য কারণে চন্দননগরের মেয়রকে হত্যা করিবার আয়োজন হয়, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ কুষ্টিয়ার নিতান্ত নিরপরাধ পাদ্রির পৃষ্ঠে গুলি বর্ষিত হয়, কেন যে ট্রামগাড়ির প্রতি সাংঘাতিক আক্রমণের উদ্‌যোগ হয় তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না; বিভীষিকা অত্যন্ত তুচ্ছ উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন মত্ততা মাতৃভূমির

হৃৎপিণ্ডকেই বিদীর্ণ করিয়া দেয়।[1] এইরূপ ধর্মহীন ব্যাপারে প্রণালীর ঐক্য থাকে না, প্রয়োজনের গুরুলঘুতা বিচার চলিয়া যায়, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সুসংগতি স্থান পায় না, একটা উদ্‌ভ্রান্ত দুঃসাহসিকতাই লোকের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। অদ্য বারবার দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, অধ্যবসায়ই শক্তি এবং অধৈর্যই দুর্বলতা; প্রশস্ত ধর্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা, তাহাই মানবের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা, মানবের মনুষ্যধর্মের প্রতি অবিশ্বাস। অসংযম নিজেকে প্রবল বলিয়া অহংকার করে; কিন্তু তাহার প্রবলতা কিসে? সে কেবল আমাদের যথার্থ অন্তরতর বলের সম্বলকে অপহরণ করিবার বেলায়। এই বিকৃতিকে যে-কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই একবার প্রশ্রয় দিলে শয়তানের কাছে মাথা বিকাইয়া রাখা হয়। প্রেমের কাজে সৃজনের কাজে পালনের কাজেই যথার্থভাবে আমাদের সমস্ত শক্তির বিকাশ ঘটে; কোনো একটা দিকে আমরা মঙ্গলের পথ নিজের শক্তিতে একটুমাত্র কাটিয়া দিলেই তাহা অভাবনীয়রূপে শাখায় প্রশাখায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে;—একটা কিছুকে গড়িয়া তুলিলে কতকটা কৃতকার্য হইবামাত্র সেই আনন্দে আমাদের শক্তি অচিন্তনীয়রূপে নবনব সৃষ্টিদ্বারা নিজেকে চরিতার্থ করিতে থাকে। এই মিলনের পথ সৃজনের পথই ধর্মের পথ। কিন্তু ধর্মের পথ দুর্গম—দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। এই পথেই আমাদের সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন, ইহার পাথেয় সংগ্রহ করিতেই আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে; ইহার পারিতোষিক অহংকারতৃপ্তিতে নহে, অহংকারবিসর্জনে; ইহার সফলতা অন্যকে পরাস্ত করিয়া নহে, নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া।

১৩১৫

[1] কাঁকিনাড়ার কারখানার ইংরেজ কর্মচারীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রেলগাড়িতে বোমা ছুড়িবার পূর্বে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়। কোনো ছিদ্রে পাপ একবার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে ক্রমশই মানুষকে তাহা কিরূপে বিকৃতিতে লইয়া যায় এই লজ্জাকর শোচনীয় ঘটনাই তাহার প্রমাণ।

পরিশিষ্ট

সার লেপেল গ্রিফিন

কুক্কুর-সম্প্রদায়ের মধ্যে খেঁকি কুকুর বলিয়া একটা বিশেষ জাত আছে, তাহাদের খেঁই খেঁই আওয়াজের মধ্যে কোনোপ্রকার গাম্ভীর্য অথবা গৌরব নাই কিন্তু সিংহের জাতে খেঁকি সিংহ কখনো শুনা যায় নাই। সার লেপেল গ্রিফিন জুন মাসের ফর্টনাইটলি রিভিয়ু পত্রে বাঙালিদের বিরুদ্ধে যে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে ভারি একটা খেঁই খেঁই আওয়াজ দিতেছে, ইহাতে লেখকের জাতি নিরূপণ করা কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু লেখকের অভিপ্রায় যেমনই হউক বাঙালিদের তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ, উক্ত আওয়াজে আর কোনো ফল না হউক আমাদিগকে সজাগ করিয়া রাখে। যে-সময় একটুখানি নিদ্রাকর্ষণ হইয়া আসে ঠিক সেই সময়ে যদি এই রকম একটা করিয়া বিদেশী হঠাৎ আমাদের প্রতি খেঁকাইয়া আসে তাহাতে চট করিয়া আমাদের তন্দ্রা ভাঙিয়া যাইতে পারে।

একটু যেন ঢুলুনি আসিয়াছিল—কনগ্রেসের মাথাটা তাহার স্কন্ধের উপর একটু যেন টলটল করিতেছিল, নানাকারণে তাহার স্নায়ু এবং পেশী যেন শিথিল হইতেছিল এমন সময়ে কেবল বন্ধুর উৎসাহ পাওয়ার অপেক্ষা শত্রুপক্ষের নিকট হইতে দুই-একটা ধাক্কা খাইলে বেশি কাজ দেখে। এজন্য গ্রিফিন সাহেব ধন্য।

তিনি আরও ধন্য যে, তিনি কোনো যুক্তি না দিয়া গালি দিয়াছেন। আমরা একটা জাতি নূতন শিক্ষা পাইয়া একটা নূতন উচ্চ আশার আকর্ষণে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছি, অবশ্যই আমাদের নানাপ্রকার ত্রুটি, অক্ষমতা এবং অপরিপকতা পদে পদে প্রকাশ পাইবার কথা এবং রাজনীতিবিশারদ ইংরেজের চক্ষে সেগুলি ধরা পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু সেই দুর্বল ভাগে আমাদিগকে আক্রমণ না করিয়া গ্রিফিন যখন কেবল গালিমন্দ দিয়াছেন তখন আমরা বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি।

গালি-জিনিসটাও যে নিতান্ত সামান্য তাহা নহে, কিন্তু গালিবিশেষ আছে। গ্রিফিন আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার দেওয়াও যা আর বানরকে দেওয়াও তা। একজন স্কুলের ছাত্রও চেষ্টা করিলে ইহা অপেক্ষা সুনিপুণ গালি দিতে পারে। গ্রিফিন যে-জন্তুটার উল্লেখ করিয়াছেন সে-বেচারার কিচিমিচিপূর্বক মুখবিকার করা ছাড়া আক্রোশ প্রকাশের অন্য উপায় নাই—কিন্তু ভদ্রলোকের হাতে এত প্রকার ভদ্রোচিত অস্ত্র আছে যে, অশিষ্ট মুখভঙ্গিমা তাহার পক্ষে নিতান্তই

অনাবশ্যক। গ্রিফিন যখন সেই অশিষ্টতা অবলম্বন করিয়াছেন তখন আমরা তাহা হইতে কেবল কৌতুক লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া তাহার অনুকরণে ক্ষান্ত হইব।

গালমন্দ বাদ দিয়া সমস্ত প্রবন্ধে গ্রিফিন সাহেবের একমাত্র কথা এই যে, বাঙালি দুর্বল অতএব রাজ্যতন্ত্রে বাঙালির কোনো স্থান থাকিতে পারে না। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক বাঙালি জিলা শাসনের ভার পাইয়াছে এবং অনেক বাঙালি মন্ত্রী-আসনও অধিকার করিয়াছে, যদি তাহাদের কোনো অযোগ্যতা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে তবে প্রবন্ধে তাহার প্রমাণ দিলে তাঁহার যুক্তি পাকা হইত। ঘরে বসিয়া অনেক মূলতত্ত্ব গড়া যায়, কিন্তু সত্যের সঙ্গে যখন তাহার অনৈক্য হয় তখন স্বরচিত হইলেও তাহাকে বিসর্জন দেওয়া কর্তব্য। আমি একটা তত্ত্ব বাঁধিয়াছিলাম যে, ইংরেজ পুরুষের লেখায় যদি বা কোনো কারণে উদারতার অভাব লক্ষিত হয় তথাপি তাহার মধ্যে একটা সংযত আত্ম-মর্যাদা থাকে; কারণ যে-লোক সৌভাগ্যবান এবং ক্ষমতাবান তাহার লেখার মধ্যে একটি বিনয় এবং সেই বিনয়ের মধ্যেই একটি প্রবল পৌরুষ থাকে—আমাদের মতো যাহারা দুর্ভাগ্য, যাহাদের মুখ ছাড়া আর কিছু নাই সময়ে সময়ে অক্ষম আক্রোশে তাহারা অমিতভাষী হইয়া আপনার নিরুপায় দৌর্বল্যেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু গ্রিফিনের লেখা ইংরেজি বড়ো কাগজে বাহির হইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে আমার প্রিয়তত্ত্বটিকে বিসর্জন দিতে হয়।

গ্রিফিন বাঙালিকে রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার পূর্বে নিজেদের পার্লামেণ্টে একটা নূতন নিয়ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিবেন। এবার হইতে বক্তৃতামঞ্চে বাগ্‌যুদ্ধে পার্লামেণ্টের মেম্বর নির্বাচিত না হইয়া মল্লভূমে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সভ্য স্থির হইবে। তাহা হইলে ইংরেজ মন্ত্রী-সভায় কেবল বীরমণ্ডলীই অধিকার লাভ করিবে এবং যাহারা শুদ্ধমাত্র কলম চালাইতে জানে তাহারা ফর্টনাইটলি রিভিয়ুতে অত্যন্ত ঝগড়াটে সুরে প্রবন্ধ লিখিবে।

১২৯৯

ইংরেজের আতঙ্ক

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু মহাজনদের দ্বারা একান্ত উৎপীড়িত হইয়া গবর্মেণ্টের নিকট নালিশ করিবার জন্ম সাঁওতালগণ তাহাদের অরণ্য-আবাস ছাড়িয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। তখন ইংরেজ সাঁওতালকে ভালো করিয়া চিনিত না;—তাহারা কী চায়, কেন বাহির হইয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিল না। এদিকে পথের মধ্যে পুলিস তাহাদের সহিত লাগিল—আহারও ফুরাইয়া গেল—পেটের জ্বালায় লুটপাট আরম্ভ হইল। অবশেষে গবর্মেণ্টের ফৌজ আসিয়া তাহাদিগকে দলকে-দল গুলি করিয়া ভূমিসাৎ করিতে লাগিল।

এই ঘটনার উপলক্ষে হাণ্টার সাহেব বলেন, ভারতবর্ষে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের সংখ্যা অল্প এবং তাহারা বহুসংখ্যক ভিন্নজাতীয় অধিবাসীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এরূপ অবস্থায় সামান্ত সূত্রপাতেই বিপদের আশঙ্কাটা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। তখন পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধীরভাবে বিবেচনা করিবার সময় থাকে না—অতিসত্বর সবলে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি জন্মে। যখন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ এইরূপ কোনো কারণে অকস্মাৎ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে তখনই গবর্মেণ্টের মাথা ঠাণ্ডা রাখা বিশেষরূপে আবশ্যক হয়। হাণ্টার বলেন, এরূপ উত্তেজনার সময় ভারত-গবর্মেণ্টকে প্রায়ই ঠাণ্ডা থাকিতে দেখা গিয়াছে।

উপরি-উক্ত সাঁওতাল-উপপ্লবে কাটাকুটির কার্যটা বেশ রীতিমতো সমাধা করিয়া এবং বীরভূমের রাঙা মাটি সাঁওতালের রক্তে লোহিততর করিয়া দিয়া তাহার পরে ইংরেজরাজ হতভাগ্য বন্যদিগের দুঃখনিবেদনে কর্ণপাত করিলেন। যখন বন্দুকের আওয়াজটা বন্ধ করিয়া তাহাদের সকল কথা ভালো করিয়া শুনিলেন তখন বুঝিলেন তাহাদের প্রার্থনা অন্যায় নহে। তখন তাহাদের আবশ্যকমতো আইনের সংশোধন, পুলিসের পরিবর্তন এবং যথোপযুক্ত বিচারশালার প্রতিষ্ঠা করা হইল।

কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের উষ্মা তখনও নিবারণ হইল না। বিদ্রোহীদের প্রতি নিরতিশয় নির্দয় শাস্তিবিধান না করিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইতে চাহে না। তাহারা বলিল, বিদ্রোহীরা যাহা চাহিয়াছিল সকলই যদি পাইল তবে তো তাহাদের বিদ্রোহের সার্থকতাসাধন করিয়া একপ্রকার পোষকতা করাই হইল। ক্যালকাটা রিভিয়ুপত্রের কোনো ইংরেজ লেখক এই শান্তিপ্রিয় নিরীহ সাঁওতালদিগকে বনের ব্যাঘ্র, রক্তপিপাসু বর্বর প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিলেন, তাহাতে, কেবল

দোষীদিগকে নহে, বিদ্রোহী জেলার অধিবাসিবর্গকে একেবারে সর্বসমেত সমুদ্রপারে দ্বীপান্তরিত করিয়া দিবার জন্য গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিলেন।

মনে একবার ভয় ঢুকিলে বিচারও থাকে না, দয়াও থাকে না। আমাদের সংস্কৃত-শাস্ত্রে আছে—শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। কেবল ভূষণ কেন, তাহা স্বাভাবিক বলিলেও নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। যেখানে মনে মনে আত্মশক্তির অভাব আশঙ্কা হয়, সেখানে মানুষ, হয় অগত্যা ক্ষমা করে, নয় লেশমাত্র ক্ষমা করে না, নিষ্ঠুরভাবে অন্যকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করে। অনেক সময় হিংস্র পশু যে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করে, সকলেই জানেন ভয়ই তাহার মূল কারণ, হিংস্রতা নহে।

ইংরেজ যখন কোনো কারণে আমাদিগকে ভয় করে তখনই সেটা আমাদের পক্ষে বড়ো ভয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়—তখনই ভয়ের কম্পনে দয়ামায়া সুবিচার আপাদমস্তক টলমল করিতে থাকে।

ইংরেজ হঠাৎ কনগ্রেসের মূর্তি দেখিয়া প্রথমটা আচমকা ডরাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কারণ, মানুষ চিরসংস্কারবশত স্বদেশী জুজুকে যতটা ভয় করে, বিদেশী বিভীষিকাকে ততটা নহে। এইজন্য ভারতবর্ষের সুপ্তশয়নাগারে হঠাৎ সেই পোলিটিকাল জুজুর আবির্ভাব দেখিয়া ইংরেজের সুস্থ প্লীহাও চমকিয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু কনগ্রেসটার উপরে প্রত্যক্ষভাবে কোনোরূপে আঘাত করা হয় নাই। তাহার কারণ, ঢাকের উপরে ঘা মারিলে ঢাক আরও বেশি করিয়া বাজিয়া উঠে। কনগ্রেসের আর-কোনো ক্ষমতা থাক্ বা না থাক্ গলার জোর আছে, তাহার শব্দ সমুদ্রপার পর্যন্ত গিয়া পৌঁছে।

সুতরাং এই নবনির্মিত জাতীয় জয়ঢাকটার উপরে কাঠি না মারিয়া তাহাকে তলে তলে ছিদ্র করিবার আয়োজন করা হইল। মুসলমানেরা প্রথমে কনগ্রেসে যোগ দিবার উপক্রম করিয়া সহসা যে বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল তাহার কারণ বোঝা নিতান্ত কঠিন নহে—এবং পাঠকদের নিকট সে-কারণ স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা অনাবশ্যক বোধ করি।

কিন্তু এতদিনে ইংরেজ এ-কথা কতকটা বুঝিয়া থাকিবে যে, হিন্দুর হস্তে পলিটিক্‌স তেমন মারাত্মক নহে। আবহমান কালের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষে পোলিটিকাল ঐক্যের কোনো লক্ষণ কোনোকালে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐক্য কাহাকে বলে মুসলমান তাহা জানে এবং পলিটিক্‌সও তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে; মুসলমান যদি দূরে থাকে তবে কনগ্রেস হইতে আশু আশঙ্কার কোনো কারণ নাই।

হিন্দুজাতির প্রতি পলিটিক্‌সের প্রভাব যে তেমন প্রবল নহে কনগ্রেসই তাহার

প্রমাণস্থল হইবার উপক্রম করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে ততই কনগ্রেস অর্থাভাবে দরিদ্র এবং উৎসাহাভাবে দুর্বলের মতো প্রতিভাত হইতেছে। ইংরেজও সম্প্রতি কিছু যেন নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজের ভারতশাসনক্ষেত্রে আর-একটা নূতন ভয় আসিয়া দেখা দিয়াছে। সেটা আর কিছু নয়, গোরক্ষণী সভা। যাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এই সভাটা স্থাপন করা হইয়াছে তাহারা যতটা নিরীহ, সভাটাকে ততটা নিরীহ বলিয়া ইংরেজের ধারণা হইল না।

কারণ, ইংরেজ ইহা বুঝিয়াছে যে, স্বদেশ ও স্বজাতি রক্ষার জন্য যে-হিন্দু এক হইতে পারে না, গোষ্ঠ এবং গোজাতি রক্ষার জন্য চাই কি তাহারা এক হইতেও পারে। স্বাধীনতা, স্বদেশ, আত্মসম্মান, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি অনেক শ্রেষ্ঠতর পদার্থের অপেক্ষা গোরুকে রক্ষা করা যে আমাদের পরমতর কর্তব্য এ-কথা হিন্দু ভূপতি হইতে কৃষক পর্যন্ত সকলেই সহজে বুঝিবে। গোহত্যা-নিবারণ সম্বন্ধে নেপালের গুর্খা হইতে পঞ্জাবের শিখ পর্যন্ত একমত।

এই কারণে গোরক্ষণী সভাটা ইংরেজের পক্ষে কিছু বিশেষ আতঙ্কজনক হইতে পারে। ফলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রমাণ দেওয়া কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি ভ্রমণোপলক্ষে পশ্চিম ভারতে গিয়া দেখিয়াছি, গোরক্ষার জন্য লোকে আর ততটা ব্যস্ত নহে—এখন গোরক্ষকগণ রক্ষা পাইলে হয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সকলে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে বটে, তবু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেছে না। যে-সকল কথা ঘরে ঘরে আলোচিত হইতেছে সে-সকল কথা যদি প্রকাশ হইত তবে কী হইত? যে প্রকাশ করিত তাহাকে সম্ভবত নির্দিষ্ট রাজ-অট্টালিকায় রাজপ্রহরিগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া বাস করিতে হইত। গোরুও সময়ে সময়ে সকরুণ হাম্বারব করে, বাঙালিও সময় সময় দেশী-বিদেশী ভাষায় আর্তনাদ করিয়া থাকে, কিন্তু পশ্চিম-ভারত একেবারে মূক।

তবে বাহির হইতে একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। গাজিপুরের জজ কক্স সাহেব ন্যায়পরায়ণ বলিয়া সাধারণের নিকট সুবিদিত। গোহত্যাসম্বন্ধীয় মকদ্দমার আপীল হাইকোর্ট তাঁহার নিকট হইতে তুলিয়া লইয়াছে।

কক্স সাহেব হিন্দু নহেন; গোজাতির এবং গোবৎসলজাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ পক্ষপাত থাকিবার কোনো কারণ দেখা যায় না। গোসম্প্রদায়ের প্রতি যদি তাঁহার কোনো পক্ষপাত থাকে সেও কেবল খাদকভাবে।

দ্বিতীয়ত, এই গোহত্যাসম্বন্ধীয় দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রতি গবর্মেন্টের তীব্র দৃষ্টি রহিয়াছে,

এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণও বিশেষ ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন—এমন কি,বিলাতের স্পেক্টেটর পত্রও এইরূপ উপদ্রবগুলিকে সতেজে দমন, সবলে দলন করিয়া ফেলিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এরূপ স্থলে অন্যান্য সাধারণ মকদ্দমার অপেক্ষা এরূপ মকদ্দমা ইংরেজ বিচারক বিশেষ সতর্কভাবেই বিচার করিয়া থাকেন।

এমন অবস্থাতেও যদি গবর্মেণ্ট জজ সাহেবের বিচারে সন্তুষ্ট না হন, তবে তো তাঁহার হাতে সামান্য শসা-চুরির মকদ্দমাও রাখা উচিত হয় না।

এই সকল লক্ষণ দেখিয়াই মনে হইতেছে গবর্মেণ্ট কিছু বেশি ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা ভয় পাইলেই আমাদের সর্বনাশ।

কিন্তু ভয় করিতে আরম্ভ করিলে কোথাও নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই। ভারতবর্ষকে শিক্ষা দিয়াও ভয় হয়, আবার মূর্খ করিয়া রাখিলেও ভয় আছে।

ইংরেজি শিখিয়া আমরা আত্মদুঃখ নিবেদন করিতে শিখি এবং সাধারণ অভাব-মোচনের উপলক্ষে সাধারণের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের সূত্রপাত হয়। আবার যেখানে ইংরেজি শিক্ষা নাই সেখানে যে কোন্ অন্ধসংস্কারের কৃষ্ণবর্ণ বারুদে কোন্‌খান হইতে কণামাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লাগিয়া অকস্মাৎ একটা প্রলয় দিগ্‌দাহ উপস্থিত করে তাহা বলা যায় না।

কিন্তু গবর্মেণ্টের ভয়টা দেখিতে ভালো নহে। কড়া শাসন, অর্থাৎ যখন বিচার-প্রণালীর মধ্যে ন্যায় অপেক্ষা বলের প্রয়োগ বেশি দেখা যায় এবং যখন চতুর্দিক হইতে খোঁচাখুঁচি লাগাইয়া তাড়াতাড়ি দেশের লোককে ভয় পাওয়াইয়া দিবার চেষ্টা দেখিতে পাই তখনই বুঝিতে পারি গবর্মেণ্টের হৃৎস্পন্দন কিছু অযথা বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেরূপ উগ্রতায় গবর্মেণ্টের বলিষ্ঠতা প্রকাশ পায় না, কেবল ভয় প্রকাশ হয় মাত্র।

মণিপুরেই গবর্মেণ্টের নিজবুদ্ধিদোষে বিভ্রাট ঘটুক আর ভারতের অন্যত্রই হিন্দু-মুসলমানের অন্ধ আক্রোশবশত ভ্রাতৃবিরোধের সূত্রপাত হউক, গবর্মেণ্টের সর্বদা মনে রাখা উচিত, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা এবং অবিচলিত অপক্ষপাত এবং প্রশান্ত ন্যায়পরতা।

কিন্তু গবর্মেণ্ট বলিতে যে কাহাকে বুঝায় আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। এই হিন্দু-মুসলমান-বিপ্লবে বড়োকর্তা ল্যান্সডাউন, মেজোকর্তা ক্রসথোয়েট, এবং জেলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোটোকর্তাগুলি সকলেই এক পলিসি অবলম্বন করিয়া একভাবে কাজ করিতেছেন কিনা জানি না। সার ওয়েডারবর্ন লিখিয়াছেন, এই সমস্ত উপদ্রবে গবর্মেণ্টের কিছু হাত আছে—ল্যান্সডাউন বলেন, এমন কথা যে বলে সে অত্যন্ত দুষ্ট। আমরা ইহার একটা সামঞ্জস্য করিয়া লই।

আমরা বলি, গবর্মেণ্টের পলিসি যেমনই থাক্, ইংরেজ কর্মচারিগণ গবর্মেণ্টের যন্ত্র

নহে; তাহারা মানুষ। আপন অধিকারের মধ্যে তাহাদের বিরাগ-অনুরাগ মতামত খাটাইবার যথেষ্ট অবসর আছে। কনগ্রেস এবং শিক্ষিত বাবুদের আচরণে তাহাদের যদি এমন ধারণা হয় যে, হিন্দু-মুসলমানদিগকে পৃথক করিয়া রাখা আবশ্যক, তবে তাহারা ছোটোবড়ো এত উপায় অবলম্বন করিয়া বিদ্বেষবীজ বপন করিতে পারে যে, গবর্মেন্টের পরম উদার সদভিসন্ধি তাহার নিকট হার মানে।

গবর্মেন্টের আইন কাহাকেও ঘৃণা করে না, ভয় করে না, পক্ষপাত করে না, কিন্তু ইংরেজ করে। পায়োনিয়র ইংলিশম্যান প্রভৃতি ইংরেজি কাগজগুলা যখন কনগ্রেসের প্রতি চক্ষু রক্তবর্ণ করে এবং বাবুদের প্রতি সরোষ অবজ্ঞাবর্ষণের চেষ্টা করে, তখন ইংরেজ জজ-ম্যাজিস্ট্রেটগণ যে অবিচলিতচিত্তে থাকে তাহা নহে। এই সমস্ত বিদ্বেষভাব সর্বসাধারণ ইংরেজের মধ্যে প্রতিদিন ব্যাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে এবং যাহার হাতে কোনো ক্ষমতা আছে সে যে নানা উপায়ে কার্যত সেই ভাবকে প্রকাশ করে এবং একটা গোপন পলিসি অবলম্বন করিয়া কনগ্রেস প্রভৃতিকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু-মুসলমানে যে বিরোধ সম্প্রতি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ইহা গবর্মেন্টের পলিসি-সম্মত না হইতে পারে কিন্তু গবর্মেন্টের অন্তর্গত বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরেজ বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুৎকারে যে এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করিয়া দিয়াছে আমাদের দেশের লোকের এইরূপ বিশ্বাস। তুলার বস্তার মধ্যে আগুন ফেলিয়া যখন সমস্তটা ধরিয়া উঠিবার উপক্রম হইল তখন প্রবল পদাঘাতের দ্বারা সেটা নির্বাণ করা হইতেছে; তুলা বেচারি একে তো পুড়িল, তাহার পরে লাথিটাও অপর্যাপ্ত পরিমাণে খাইতে হইল।

কেবল, ইংরেজের মনে অকস্মাৎ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত ব্যাপার-গুলি ঘটিতেছে।

১৩০০

রাজা ও প্রজা

সিভিলিয়ান রাভীচি সাহেব আইনলঙ্ঘনপূর্বক উড়িষ্যার কোনো এক জমিদারকে অপমান ও পীড়ন করাতে তৎকালীন লেফটেনাণ্ট গবর্নর ম্যাকডোনেল সাহেব অন্যায়কারীকে এক বৎসরের জন্য নিগৃহীত করিয়াছিলেন।

ভাবিয়া দেখিলে ব্রিটিশ শাসনাধীনে এরূপ ঘটনা আশাতীত বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হওয়া উচিত ছিল না—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সাধারণের নিকট এই ন্যায়বিচারটি আশাতীত বিস্ময়জনক বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। এই কারণে মূঢ়মতি সাধারণ কিছু সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

অনতিকাল পরেই ম্যাকডোনেল সাহেব যখন যথাসময়ে এলিয়ট সাহেবকে তাঁহার গদি ছাড়িয়া দিলেন তখন এলিয়ট আসিয়া ম্যাকডোনেলের বিচার লঙ্ঘনপূর্বক রাভীচিকে নিগ্রহ হইতে মুক্ত করিয়া উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এখন আবার মূঢ়মতি সাধারণ সবিশেষ শোক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কর্তার ইচ্ছা কর্ম। কর্তাই জানেন এমন প্রথাবিরুদ্ধ কাজ কেন করিলেন, আমরা কেবল অন্ধকারে অনুমান করিয়া মরিতেছি মাত্র। এমন হইতে পারে যে, সিভিলিয়ানের প্রেস্টিজ সিভিলিয়ান রক্ষা করিলেন। কিন্তু সেটা ঠিক হইল না। কারণ, এই ঘটনায় সাধারণের নিকট ম্যাকডোনেলের, এমন কি, গবর্মেণ্টের প্রেস্টিজ, নষ্ট হইল।

অনুমান করিতে গিয়া নানা লোক নানা কথা বলিতেছে—তাহার সব কথাই মিথ্যা হইতে পারে। মোটের উপর এইটুকু বলা যায় যে, গবর্মেণ্টের পলিসি গবর্মেণ্টই জানেন, আমরা সেই পলিসির দ্বারা পরিচালিত অন্ধ পুত্তলিকামাত্র।

সেই কারণে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের কর্তৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তির ন্যায়ান্যায়-বিচারে আমরা যে অকস্মাৎ অতিমাত্র হর্ষশোক প্রকাশ করিয়া থাকি সে আমাদের মোহবশত। যেখানে কর্তার ইচ্ছা কর্ম, যেখানে ব্যক্তিবিশেষের স্বভাব এবং মর্জির উপরে আমাদের শুভাশুভ অনেকটা নির্ভর করিতেছে সেখানে ভালো এবং মন্দ, ন্যায় এবং অন্যায় উভয়ই আকস্মিক ক্ষণিক ঘটনামাত্র। ম্যাকডোনেল সাহেব যাহা করিলেন সেও তাঁহার নিজগুণে, এলিয়ট সাহেব যাহা করিলেন সেও তাঁহার নিজগুণে, আমরা নিতান্তই উপলক্ষ্য।

তথাপি আঘাতে ব্যথিত এবং আদরে সুখী না হইয়া আমরা থাকিতে পারি না।

কিন্তু কিরূপ হইলে আমাদের যথার্থ সুখের এবং জাতীয় গৌরবের কারণ হয় তাহা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য।

সে আর কিছুই নহে,—যখন আমাদের সাধারণের মধ্যে ন্যায়ান্যায়বোধ এমন সুতীব্র এবং সচেতন হইয়া উঠিবে যে, অপমানে অন্যায়ে আমরা সকলে মিলিয়া যথার্থ বেদনা বোধ করিতে থাকিব এবং সেই ন্যায়ান্যায়বোধের খাতির রক্ষা করা গবর্মেন্টের একটা পলিসির মধ্যে দাঁড়াইয়া যাইবে তখন আমরা যথার্থ আনন্দ করিতে পারিব।

সাধারণত, ধর্মবুদ্ধি কর্মবুদ্ধি লোকনিন্দা সব-কটায় মিলিয়া আমাদিগকে কর্তব্যপথে চালনা করে। আমাদের গবর্মেন্টের কর্তব্যনীতি অনেকটা পরিমাণে কেবলমাত্র ধর্মবুদ্ধি ও কর্মবুদ্ধির উপরেই নির্ভর করিতেছে, প্রজাদিগের ন্যায়ান্যায়বোধের সহিত তাহার যোগ অতিশয় অল্প।

সকলেই জানেন ধর্মবুদ্ধির সহিত কর্মবুদ্ধির বিরোধ বাধিলে অনেক সময় শেষোক্ত শক্তিটিরই জয় হইয়া থাকে, সেই দ্বন্দ্বের সময় বাহিরের লোকের ন্যায়ান্যায়বোধ ধর্মের সহায় হইয়া তাহাকে সবল করিয়া তোলে। যখন দেখিব প্রজার নিন্দা নামক শক্তি গবর্মেন্টের রাজকার্যের মধ্যে আপনার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে তখন আমরা আনন্দ প্রকাশ করিব।

এই প্রজানিন্দা না থাকাতে ভারতবর্ষীয় ইংরেজের কর্তব্যবুদ্ধি ক্রমে অলক্ষিতভাবে এত শিথিল ও বিকৃত হইয়া আসে যে, ইংলণ্ডবাসী ইংরেজের নৈতিক আদর্শ হইতে তাহাদের আদর্শের বিজাতীয় প্রভেদ হইতে থাকে। সেই কারণে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষীয় ইংরেজ একদিকে আমাদিগকে ঘৃণা করে অপরদিকে স্বদেশীয় ইংরেজের মতামতের প্রতিও অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে, যেন উভয়েই তাহার অনাত্মীয়।

ইহার অনেকগুলি কারণ থাকিতে পারে, তাহার মধ্যে একটি কারণ এই যে, ইংলণ্ডে যে-সমাজনিন্দা ইংরেজকে সর্বদাই বিশেষ কর্তব্যপথ নির্দেশ করিয়া দিতেছে ভারতবর্ষে তাহা অত্যন্ত দূরবর্তী হওয়াতে ভারতবর্ষীয় ইংরেজ তাহার প্রভাব বিস্মৃত হইয়া যায়। ইহার উপরে আবার আমাদের সহিত ইংরেজের অনেকটা স্বার্থের সম্পর্ক, এবং আমাদের প্রতি তাহাদের স্বজাতীয়ত্বের মমতাবন্ধন নাই, সুতরাং এখানে কর্তব্যবুদ্ধির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা ইংরেজের পক্ষে নানাকারণে কঠিন হইয়া পড়ে। সেইজন্য স্বার্থের সহিত, ক্ষমতাগর্বের সহিত পরাধীন দুর্বল জাতির নৈতিক আদর্শের সহিত, পরজাতি-শাসনতন্ত্রের বিবিধ কুটিলতার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ভারতবর্ষীয়

ইংরেজের একটা বিশেষ স্বতন্ত্র নূতন কর্তব্যনীতি গঠিত হইতে থাকে, তাহাকে অনেক সময় ইংলণ্ডের ইংরেজ ভালো করিয়া চেনে না।

কোনো কোনো প্রতিভাসম্পন্ন ভারতবর্ষীয় ইংরেজ এই নূতন পদার্থটিকে ইংলণ্ডে ভালোরূপে পরিচিত করাইবার ভার লইয়াছেন। তাঁহারা প্রতিভাবলে দেখাইতেছেন, এই নূতন পদার্থের নূতনত্বের একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে রাডইয়ার্ড কিপলিঙের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা। সেই ক্ষমতাবলে তিনি ইংরেজের কল্পনাচক্ষে প্রাচ্যদেশকে একটি বৃহৎ পশুশালার মতো দাঁড় করাইয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডের ইংরেজকে বুঝাইতেছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্ট একটি সার্কস কম্পানি। তাঁহারা নানাজাতীয় বিচিত্র অপরূপ জন্তুকে সভ্যজগৎসমক্ষে সুনিপুণভাবে নৃত্য করাইতেছেন। একবার সতর্ক অনিমেষ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেই সব-কটা ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িবে। সুতীক্ষ্ণ কৌতূহলের সহিত এই জন্তুদিগের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে, যথাপরিমাণে চাবুকের ভয় এবং অস্থিখণ্ডের প্রলোভন রাখিতে হইবে এবং কিয়ৎপরিমাণে পশুবাৎসল্যেরও আবশ্যক আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে নীতি প্রীতি সভ্যতা আনিতে গেলে সার্কস রক্ষা করা দুষ্কর হইবে এবং অধিকারীমহাশয়ের পক্ষেও বিপদের সম্ভাবনা।

কেবলমাত্র প্রাণশক্তির বলে প্রবল মনুষ্যজন্তুদিগকে শাসনে সংযত রাখিয়া কেবলমাত্র অঙ্গুলির নির্দেশে তাহাদিগকে নিরীহ নৃত্যে প্রবৃত্ত করার ছবিটি ইংরেজের কাছে কৌতুকজনক মনোরম বলিয়া প্রতিভাত হইবার কথা। ইহাতে ইংরেজের মনে নূতনত্বের কৌতূহল এবং স্বজাতিগর্বের সঞ্চার করে এবং আসন্ন বিপদকে শাসনে রাখিবার যে-একটি সুতীব্র আনন্দ আছে তাহাও ইংরেজপ্রকৃতির নিকট পরম উপাদেয়রূপে প্রতীয়মান হয়।

এদিকে ইংলণ্ডে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের দলও দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতেছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের সাহিত্যও বিস্তারলাভ করিতেছে। ইংলণ্ডের ভূমিতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের মত ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া শাখাপল্লবিত হইতেছে। এই স্থলে ন্যায়ানুরোধে এ-কথাও বলিয়া রাখা উচিত, অনেক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভারতকার্য হইতে অবসর লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া নিঃসহায় ভারতবাসীদের প্রতি পরম হিতৈষিতাচরণ করিতেছেন।

এই সকল কারণে স্বদেশস্থ ইংরেজের মধ্যেও একদল সন্দেহ করিতেছেন যে, তাঁহারা নিজেদের সম্বন্ধে যে-সকল কর্তব্য পালন করিয়া চলেন তাহার অধিকাংশই প্রাচ্যদেশীয়

ভিন্নজাতীয় জীবসকলের প্রতি প্রয়োগ করিতে গেলে কুইক্সটোচিত বাতুলতার পরিচয় দেওয়া হয় কিনা, তাহাতে দ্বীপবাসী সভ্যজাতির বোধশক্তির সংকীর্ণতা এবং অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় কিনা এবং সম্ভবত তাহাতে ভিন্নজাতীয় জীবের অনিষ্ট হয় কিনা। হার্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি ইংরেজ দার্শনিকের মত এই যে, সভ্যতার তারতম্য অনুসারে নৈতিক আদর্শের তারতম্য কেবল যে অবশ্যম্ভাবী তাহা নহে, অভিব্যক্তির নিয়মে তাহা আবশ্যক।

এই সকল মতের সত্যাসত্য অন্য সময় বিচার হইবে আপাতত এইটুকু বলিতে পারি ইহার ফল আমাদের পক্ষে বড়ো পীড়াজনক। বেহার প্রদেশে গাছে ছাপ হইতে বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া অনেক ইংরেজি কাগজে এমন কথা বলা হইয়াছে যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির মধ্যে কোনোকালেই যথার্থ প্রেমের সম্মিলন সম্ভব নহে। উহাদিগকে কেবলমাত্র গায়ের জোরে ভয় দেখাইয়া বশে রাখিতে হইবে। এ-সকল কথা পূর্বাপেক্ষা আজকাল যেন অধিকতর মুক্তকণ্ঠে বলা হইতেছে।

আমাদের বক্তব্য এই, যদি বা স্বীকার করা যায় যে স্বাধীনতাপ্রিয় য়ুরোপের কর্তব্য-নীতি চিরপরাধীন প্রাচ্যদেশে সর্বথা উপযোগী নহে তথাপি যখন আমাদের রাজা য়ুরোপীয় তখন প্রাচ্যদেশের স্বাভাবিক গতিকে অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের পক্ষে দুরাশামাত্র। আমাদের দেশ যদি স্বাধীন হইত তবে এই প্রাচ্যদেশে স্বাভাবিক নিয়মে যে-রাজ্যতন্ত্র উদ্‌ভাবিত হইয়া উঠিত তাহা বর্তমান ইংরেজ-রাজ্যতন্ত্র হইতে নিশ্চয়ই অনেক বিষয়ে ভিন্ন প্রকারের হইত। হয়তো একদিক হইতে দেখিতে গেলে রাজার যথেচ্ছ প্রতাপ এখনকার অপেক্ষা অধিক মনে হইত, তেমনি আবার অন্যদিকে রাজার প্রতাপ খর্ব করিয়া প্রজাদের ইচ্ছাচালনার পথ ভিন্ন আকারে নানা উপায়ে প্রকাশ পাইত। স্বাভাবিক সামঞ্জস্য কেবল স্বাভাবিক নিয়মেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। ইংরেজ হাজার ইচ্ছা করিলেও কেবল পলিসির দ্বারা তাহা ঘটাইতে পারে না।

অতএব ইংরেজ আমাদের সহিত কেবল ইংরেজের মতোই ব্যবহার করিতে পারেন; যদি ইচ্ছাপূর্বক তাহা বিকৃত করেন তবে সে কেবল দুর্ব্যবহার হইবে কোনোকালেই ভারতবর্ষীয় ব্যবহারে পরিণত হইতে পারিবে না। তাঁহাদের নিজের আদর্শ তাঁহারা ভাঙিতে পারেন কিন্তু তাহার স্থলে গড়িবেন কী এবং গড়িবেন কী করিয়া? মাঝে হইতে চিরাভ্যস্ত স্বদেশীয় আদর্শচ্যুত ইংরেজ আমাদের পক্ষে বড়ো একটি ভয়ংকর প্রাণী হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা। রাডইয়ার্ড কিপলিং প্রভৃতি লেখকের লেখার মধ্যে যে একটি বল-দর্পমিশ্রিত নিষ্ঠুরতার আভাস অনুভব করা যায় তাহা হইতে মনে হয় মানব মধ্যে মধ্যে

সভ্যতার শততন্তুনির্মিত সূক্ষ্ম সুদৃঢ় জাল ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া আদিম আরণ্য প্রকৃতির বর্বরতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে ইচ্ছা করে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ ভারতবর্ষে আসিয়া যে এক সুতীব্র ক্ষমতা-মদিরার আস্বাদন পায় তাহাতে এই প্রচণ্ড মত্ততার সৃষ্টি করিতে পারে। এই প্রেমহীন কঠিন ক্ষমতাদম্ভ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের লেখনীতে অকৃত্রিম অসংকোচ পৌরুষ-আকারে একপ্রকার ভীষণ রমণীয়তা ধারণ করে তাহা ইংরেজের পক্ষে সাহিত্য কিন্তু আমাদের পক্ষে মৃত্যুর নিদান।

দ্বিতীয় কথা এই, আজকালকার উপন্যাসে লেখকেরা প্রাচ্য প্রকৃতিকে পাশ্চাত্য-দেশের নিকট যতটা রহস্যময় বলিয়া বর্ণনা করেন তাহার অনেকটা কাল্পনিক। আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহস্র যোগ আছে। অন্তরের সাদৃশ্য অনেক সময় বাহ্য বৈসদৃশ্যে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে মাত্র। আধুনিক লেখকগণ সেই বাহ্য বৈসদৃশ্যগুলির নূতনত্বকে পাঠকদের মনোরঞ্জনার্থে রঞ্জিত অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিতে থাকেন এবং সুগভীর সাদৃশ্যগুলি উদ্ধার করিবার চেষ্টাও পান না ক্ষমতাও রাখেন না।

আমার এত কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, কেবল ভারতবর্ষে নহে ইংলণ্ডেও ক্রমে ক্রমে এই ধারণা বিস্তৃত হইতেছে যে, য়ুরোপের নীতি কেবল য়ুরোপের জন্য। ভারতবর্ষীয়েরা এতই স্বতন্ত্র জাতি যে, সভ্যনীতি তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে।

এরূপ অবস্থায় আমাদের ন্যায়ান্যায়বোধ প্রবল হইয়া উঠিলে ইংরেজের রাজনীতি বিপথগামী হইতে পারিবে না। ইংরেজ যখন জানিবে সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার কাজের বিচার করিতেছে তখন ভারতবর্ষকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতে পারিবে না।

সম্প্রতি তাহার লক্ষণ কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। ইংরেজের কোনো অন্যায় দেখিলে ভারতবর্ষ আপন দুর্বলকণ্ঠে সভ্যতা ও নীতির দোহাই পাড়িতে থাকে। সেজন্য ইংরেজ রাগ করে বটে কিন্তু তাহাকে কিঞ্চিৎ সতর্ক থাকিতেও হয়।

তথাপি এখনও সম্পূর্ণ ফল ফলে নাই। আমাদের সম্বন্ধে সকল সময়ে সকল অবস্থায় নীতি মানিয়া চলাকে ইংরেজ দুর্বলতা স্বীকার বলিয়া দেখে। আমাদের প্রতি অপরাধ করিয়া তাঁহাদের কেহ ন্যায়বিচারে দণ্ডনীয় হয় ইহা তাঁহারা লজ্জাজনক ও ক্ষতিজনক বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহারা মনে করেন ভারতবর্ষীয়ের নিকট ইহাতে ইংরেজের জোর কমিয়া যায়।

রাজপুরুষদিগের মনের ভাব ঠিক করিয়া নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য, কিন্তু বোধ করি রাভীচি সাহেবের অসময়ে পদোন্নতি উপরি-উক্ত পলিসিবশত। বিশেষত যখন দেখা যায় এমন ঘটনা বারংবার ঘটিয়াছে, তখন সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। গবর্মেণ্ট যেন নীরবে বলিতেছেন যে, তোমাদিগের কাহাকেও অন্যায় উৎপীড়ন ও অপমান করিয়া

কোনো কর্তৃপুরুষের লাঞ্ছনা হইতে পারে ইহা মনে করাই তোমাদের পক্ষে স্পর্ধা, সেই স্পর্ধায় পদাঘাত করিবার জন্য যদি বা প্রথা উল্লঙ্ঘন যদি বা রাজশাসনের অনাদর করিতে হয় তবে তাহাও শ্রেয়। ইংরেজ ন্যায়পরতার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ধর্মবিচারেরও অতীত।

সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে যে, সম্প্রতি দুই-একটি ঘটনায় দেখা গিয়াছে, গবর্মেণ্ট কেবল ইংরেজ নহে নিজের কর্মচারীমাত্রকেই ন্যায়বিচারের কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে তুলিয়া রাখিতে চাহেন। বালাধন হত্যাকাণ্ডের মকদ্দমায় ইংরেজ জজ হইতে বাঙালি পুলিস কর্মচারী পর্যন্ত যে কেহ লিপ্ত ছিল, হাইকোর্টের বিচারে যাহারা প্রত্যেকে প্রকাশ্যে নিন্দিত হইয়াছে তাহারা সকলেই বাংলা গবর্মেণ্ট কর্তৃক পুরস্কৃত এবং উৎসাহিত হইয়াছে।

আমরা বাহিরের লোক, রাজনীতির ভিতরকার কথা কিছুই জানি না। হয়তো ইহার মধ্যে কোনো গোপন কারণ থাকিতে পারে। হয়তো কর্তার এমন ধারণা হইতে পারে যে, বালাধনের মকদ্দমায় স্থানীয় জজের বিচার অন্যায় হয় নাই; যেমন করিয়া হউক গোটা পাঁচ-সাত লোকের ফাঁসি যাওয়া উচিত ছিল। তাঁহাদের এমন সংস্কার হইতে পারে যে, আদালতে টিকিবার যোগ্য প্রমাণ না থাকিলেও ঘটনাটা প্রকৃতপক্ষে সত্য এবং সে-সত্য স্থানীয় বিচারকই কেবল নির্ণয় করিতে পারে, হাইকোর্টের জজের পক্ষে অসাধ্য।

আমাদের বক্তব্য এই যে, দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে প্রকাশ্যে যাহাদের ব্যবহার নিন্দিত হইয়াছে, সাধারণের নিকটে যাহারা অন্যায়কারী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, শাস্তি দেওয়া দূরে থাক তাহাদিগকে প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করিলে জনসাধারণের ন্যায়ান্যায়-জ্ঞানের প্রতি একান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়। সকলকে বলা হয়, তোমাদের কাছে কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে কোনোরূপ কৈফিয়ত দিবার কোনো আবশ্যক দেখি না—তোমরা ভালোই বল মন্দই বল তাহাতে গবর্মেণ্টের কোনো মাথাব্যথা নাই। আমাদের ভারি স্ট্রং গবর্মেণ্ট।

যে গবর্নর প্রজার মর্মবেদনার উপর প্রজার ন্যায়ান্যায়বোধের উপর জুতার গোড়ালি ফেলিয়া ফেলিয়া চলেন এবং সেই মচমচ শব্দে দুর্বল কণ্ঠের আর্তস্বর নিমগ্ন করিয়া দেন তিনি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ায় স্ট্রং গবর্নর।

কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বলপ্রকাশ পায়, না, আমাদের যৎপরোনাস্তি দুর্বলতার সূচনা করে তাহা কাহাকেও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক করে না। গবর্মেণ্টের এরূপ উদ্ধত অবজ্ঞায় ইহাই প্রকাশ পায় যে, তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের ন্যায়ান্যায়বোধ

এমন প্রবল নহে যে, তাহার নিকট সংকোচ অনুভব করা যায়। বরঞ্চ এই চিরনিপীড়িত জাতির নিকট নিঃসংকোচ স্বেচ্ছাচারই যথার্থ বলের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

আমরা যদি রাজপুরুষগণকে এমন কথা বুঝাইতে পারি যে, ন্যায়পথ লঙ্ঘন করিলে সেটাকে আমরা বাহাদুরি জ্ঞান করি না, অন্যায় যতই বলিষ্ঠ দেখিতে হউক আমাদের প্রাচ্য স্বভাবেও তাহা ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় বলিয়া অনুভূত হয়, এবং সুদৃঢ় নিরপেক্ষভাবে সর্বত্র সর্বলোকের প্রতি যথোচিত ন্যায়দণ্ড বিধান করিবার সাহস না থাকা আমাদের নিকট দুর্বলতা বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে তবে আমাদের সেই কর্তব্যজ্ঞানের আদর্শকে ইংরেজ সম্মান না করিয়া থাকিতে পারিবেন না, কারণ সে-আদর্শের সহিত তাঁহাদের নিজেদের আদর্শের ঐক্য দেখিতে পাইবেন।

যখন আমরা বহুকালব্যাপী পরাধীনতার বিষময় শিক্ষা ভুলিতে পারিব, যখন প্রবলের অন্যায়াচরণকে বিধির বিধানের স্বরূপ নীরবে অবশ্যসহ্য বলিয়া স্থির করিব না, যখন অন্যায়ের প্রতিবিধানচেষ্টা নিষ্ফল হইলেও তাহাকে কর্তব্য বলিয়া জানিব এবং সেজন্য ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ হইব না, তখন আমাদের যথার্থ আনন্দের দিন উপস্থিত হইবে। তখন ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ন্যায়পরতা কদাচ স্বার্থ পলিসি এবং ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হইবে না, অটল পর্বতের ন্যায় প্রজা-হৃদয়ের দৃঢ়ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন ইংরেজের সদ্‌ব্যবহার শুভদৈবক্রমে ক্ষণিক অনুগ্রহের ন্যায় আমাদের নত মস্তকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবে না, সম্মানের ন্যায় আমাদের নিকট আহরিত হইবে,—আজ যাহা ভিক্ষাস্বরূপে প্রাপ্ত হইতেছি তখন তাহা অধিকারের ন্যায় গ্রহণ করিব।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, উপদেশ সহজ, কিন্তু উপায়টা কী? তাহার উত্তরে বলিতে হয়, কোনো যথার্থ মঙ্গল কলকৌশলের দ্বারা পাওয়া যায় না, তাহার যা মূল্য তাহা সমস্তটাই দিতে হইবে। প্রত্যেককে প্রাণপণ করিতে হইবে, ঘরে ঘরে ভ্রাতা এবং সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, পরিবার এবং সমাজের মধ্যে ন্যায়াচরণের অটল আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে, নিজের ব্যবহারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সমস্ত ভালো কথার ন্যায় এ-কথাটিও শুনিতে সহজ, করিতে কঠিন এবং অত্যন্ত পুরাতন। কিন্তু এই পুরাতন সুদীর্ঘ প্রকাশ্য পথ ছাড়া স্থায়ী কল্যাণের আর কোনো নূতন সংক্ষিপ্ত গূঢ় পথ আবিষ্কৃত হয় নাই।

১৩০১

প্রসঙ্গ-কথা

১

কলিকাতায় প্লেগ-রেগুলেশন যে উগ্রমূর্তিধারণ করিয়া উঠে নাই, সেজন্য আমাদের নব বঙ্গাধিপের প্রতি বঙ্গদেশের কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

যমদূতের উৎপীড়নের সহিত রাজদূতের বিভীষিকার যোগ হইলে প্রজাগণ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িত। কিন্তু সেইটে নিবারণ হইয়াছে বলিয়াই যে একমাত্র আনন্দ তাহা নহে; ইহা অপেক্ষা গুরুতর সুখের কথা আছে।

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, প্রজারা যখন কোনো একটা বিষয়ে একটু বেশি জিদ করিয়া বসে তখন গবর্মেণ্ট তাহাদের অনুরোধ পালন করিতে বিশেষ কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন, পাছে প্রজা প্রশ্রয় পায়।

সেইজন্য আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যে-সমস্ত কোলাহলকে পোলিটিকাল অ্যাজিটেশন নাম দিয়া থাকেন তাহাকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে আমরা সদুপায় বলিয়া মনে করি না। কারণ, গবর্মেণ্ট এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজগণ যখন এই সকল অ্যাজিটেশনওআলাকে আপনাদের বিরুদ্ধদল বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছেন, তখন তাঁহাদের সংগত প্রস্তাবেও কর্ণপাত করিতে কর্তৃপক্ষের দ্বিধা হয়, মনে হয়, এ-কথা পাছে সাধারণে মনে করে যে, আমরা দায়ে পড়িয়া হার মানিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে কয়েকজন উদ্ধত লোকের বাক্শক্তিদ্বারা চালিত হইলাম, পাছে কেহ ভুলিয়া যায় যে, ভারতবর্ষে আমাদের ইচ্ছাই শেষ ইচ্ছা।

অ্যাজিটেশনকারিগণও ভিতরে ভিতরে তাহার আভাস পাইয়াছেন তাঁহাদের ব্যবহারে এরূপ অনুমান করা যায়। কারণ, এবারে যে নিদারুণ আইনের দ্বারা নাটু-হরণ ব্যাপার ঘটিল সে-সম্বন্ধে আমাদের দেশের বাগ্মী-সভাসমূহ অভূতপূর্ব বিজ্ঞতাসহকারে সুদীর্ঘকাল নিস্তব্ধ ছিলেন। আমরা গোল করিতে বসিলেই পাছে গবর্মেণ্টের মন আরও বিগড়িয়া যায় হয়তো এ-আশঙ্কা তাঁহাদের ছিল।

যাহাই হউক বর্তমান ব্যাপারে আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, গবর্মেণ্ট প্রজাদের মন রক্ষা করিতে লজ্জা বা সংকোচ বোধ করেন নাই। গবর্মেণ্ট এবং এ-দেশী ইংরেজসম্প্রদায় বলিতেছেন যে, প্রজারা যখন পুর-মহিলাদের, এবং পরিবারমণ্ডলীর প্রতি হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে উহাদের যখন এতই দৃঢ়সংস্কার তখন সেটা বিবেচনা করিয়া এবং যথাসম্ভব বাঁচাইয়া কাজ করাই রাজার কর্তব্য।

আমাদের বিস্ময় এবং কৃতজ্ঞতার কারণ এই যে, প্লেগদমন একমাত্র ভারতবর্ষের হিতের জন্য নহে। তাহাতে ইংরেজের ভয় আছে, বাণিজ্যের ক্ষতি আছে। এরূপ স্থলে প্রজাদের পুব-দেশী সংস্কার বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে গণ্য হওয়ায় প্রাচীলক্ষ্মীর সকরুণ নেত্রযুগল আনন্দাশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এমন অকস্মাৎ সৌভাগ্য আমরা আশাও করি নাই। কারণ, যে দুর্ভিক্ষ-ভূকম্প-মহামারীর প্রলয়পীড়নে অন্য কোনো দেশ আসন্ন মৃত্যুর ভীষণ নৈরাশ্যে উদ্দাম হইয়া উঠিত, ভারতবর্ষ তাহা অবিচলিত ধৈর্যসহকারে সহ্য করিয়াও কর্তৃপক্ষের করুণা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। দেশের এই পরম দুঃসময়ে গবর্মেণ্ট উপর্যুপরি তাঁহার কঠোরতম বিধি ও শাসনের দ্বারা ভারতবর্ষীয় সহিষ্ণুতার অগ্নিপরীক্ষা সৃজন করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এইরূপ দুর্যোগই বিদেশী রাজার পক্ষে প্রজাদের হৃদয়জয়ের দুর্লভ অবকাশ। এই সময়েই রাজা প্রমাণ করিতে পারেন যে, আমরা পর হইয়াও পর নহি। এই সময়েই তাঁহাদের পক্ষে ক্ষমা ধৈর্য ও সমবেদনা ফৌজ কেল্লা ও গুলিগোলার অপেক্ষা রাজশক্তির যথার্থ পরিচয়স্থল।

পরন্তু এই সময়ে পতিতের উপর পদপ্রহার, ব্যথিতের উপর জবরদস্তি ভয়ের নিষ্ঠুরতামাত্র। ইহাতে রাজার রাজশক্তি নহে বিদেশীর দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এবার প্যুনিটিভ পুলিস, নাটু-নিগ্রহ, সিডিশন বিলের দ্বারা গবর্মেণ্ট উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমরা স্বল্পসংখ্যক বিদেশী, আমরা ক্ষমা করিতে সাহস করি না।

মারীগ্রস্ত পুনা যখন গোরাসৈন্যের আতঙ্কে মুহুর্মুহু কাতরোক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল তখন কর্তৃপক্ষ সেই আর্তনাদকে প্রজার স্পর্ধা বলিয়া গণ্য করিলেন। তখন তাঁহারা প্রবলজনোচিত ঔদার্য অবলম্বন করিলেন না, সকরুণচিত্তে এটুকু বিবেচনা করিলেন না যে, দুর্ভাগাগণের অন্তিমশয্যা হইতে অন্তত একটা অসংগত বিভীষিকা দূর করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। স্বীকার করিলাম গোরাসৈন্যগণ শিষ্ট শান্ত সংযত, এবং দেশীয় লোকদের প্রতি স্নেহশীল। কিন্তু দেশের মূঢ় লোকের যদি এমন একটা সুদৃঢ় অন্ধ সংস্কার জন্মিয়াই থাকে যে, গোরাসৈন্য দুর্দান্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং শ্রদ্ধা অভাবে দেশীয় লোকের প্রতি অবিবেকী তবে সেই চরম সংকটের সময় বিপন্ন ব্যক্তিদের একটা অনুনয় রক্ষা করিলে দুর্বলতা নহে মহত্ত্ব প্রকাশ পাইত।

দেখিলাম গবর্মেণ্টের উত্তরোত্তর রাগ ও জেদ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। যেখানে যত বেদনা শাসনকর্তা সেখানে তত আঘাত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ভারতবর্ষের আভ্যন্তমধ্যে অশান্তির আক্ষেপ কোথাও প্রকাশ্যে ফুটিবার উপক্রম করিল কোথাও

গোপনে গুমরিয়া উঠিল। এ-দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে এরূপ ক্ষুব্ধ অবস্থা আর কখনো দেখা যায় নাই।

ইতিমধ্যে কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিল। ভাবিলাম শংকরের অপেক্ষা তাঁহার ভূতপ্রেতগুলার ভয় বেশি—এবং ভারতগবর্মেন্টের যেরূপ মেজাজ তাহাতে প্লেগ অপেক্ষা প্লেগ-রেগুল্যেশন বেশি রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া উঠিবে। সতর্ক থাকিলে প্লেগের হস্ত অনেকে এড়াইবে কিন্তু রেগুলেশনের হস্তে কাহারও রক্ষা নাই।

এমন সময় বুডবর্ন সাহেব মাভৈঃধ্বনি ঘোষণা করিলেন। বুঝিলাম বাংলাদেশে রাজার অভ্যুদয় হইয়াছে, এখানে রেগুল্যেশন নামক এঞ্জিনের শাসন নহে, রাজার রাজ্য। ইহাতেই রাজভক্তি জাগিয়া উঠে। রাজার ইচ্ছা আমার ইচ্ছার সহিত একভাবে মিলিতে পারে ইহা জানিতে পারিলে রাজাকেও মনুষ্য বলিয়া প্রীতি করি এবং আপনার প্রতিও মনুষ্য বলিয়া শ্রদ্ধা জন্মে।

এ-কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, আজকাল কিপলিং প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকগণের উপন্যাসে ভারতবর্ষ ও তাহার অধিবাসিবর্গ যেরূপ বর্ণে চিত্রিত হইতেছে এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজদের মধ্যে এদেশীয়দের বিরুদ্ধে ক্রমশই যে একটা সাম্প্রদায়িক সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে এবং যাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিঘাতস্বরূপে উত্তরোত্তর ভারতবাসীর মনে ইংরেজ ও সর্বপ্রকার ইংরেজি প্রভাবের প্রতিকূলে যে একটা পরাঙ্মুখভাব বৃদ্ধি পাইতেছে অল্পে অল্পে তাহার প্রতিকার সাধন করিতে পারেন পশ্চিমের ম্যাকডোনেল এবং আশা করি আমাদের বুডবর্ন সাহেবের ন্যায় ক্ষমা-ধৈর্যপরায়ণ সহৃদয় শাসনকর্তৃগণ। কঠিন আইন ও জবরদস্তিতে সম্পূর্ণ উলটা ফল ফলিবে। ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

এখন এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, ইংরেজ এবং দেশী উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ভুল বুঝিবার, অন্যায় বিচার করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

কিন্তু ক্ষমতা যাহার হস্তে, বিচারের শেষ ফল সেই দিতে পারে। আমাদের মন বিগড়াইয়া গেলে আমরা কাগজে দু-চার কথা বলিতে পারি, কিন্তু কর্তৃপক্ষের মন বিগড়াইয়া গেলে তাঁহারা আমাদের কাগজের গলা চাপিয়া ধরিতে পারেন। আমরা ক্ষুব্ধ হইলে তাহা রাজবিদ্রোহ কিন্তু রাজারা রুখিয়া থাকিলে তাহা কি প্রজাবিদ্রোহ নহে? উভয়েরই ফল কি রাজ্যের পক্ষে সমান অমঙ্গলজনক নহে?

কিন্তু দুইদিক বিচার করা কাজটা কঠিন, বিশেষত দুইদিকের মধ্যে একদিক যখন নিজের দিক। তথাপি নীতিতত্ত্ববিৎমাত্রেই বলিয়া থাকেন পরের অপেক্ষা নিজেকে কঠিন বিচারাধীনে আনিলে নিজের পক্ষেই মঙ্গল। ঈসপের কথামালায় আছে কানা

হরিণ পরপারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঘাস খাইত—তাহার নিজপারের দিক হইতেই ব্যাধের শর তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছিল। নিজের দিকে সকলে কানা এই জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুতর অকল্যাণ সেইদিকেই প্রবল হইয়া উঠে।

আমাদেরও সেই দশা, ইংরেজেরও তাই। যাহা সর্বাগ্রে আমাদের নিজের কর্তব্য তাহার প্রতি আমরা উদাসীন এবং গবর্মেণ্টের কর্তব্যের প্রতি আমাদের শত চক্ষু এবং সহস্র জিহ্বা। ইংরেজেরও প্রজার সামান্যমাত্র চাঞ্চল্যের প্রতি রুদ্ররূপ, কিন্তু নিজে যে প্রতিদিন ঔদ্ধত্য ও অবমাননার দ্বারা প্রজাসাধারণকে নানা আকারে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছেন তাহার বিষময়তার প্রতি কর্তৃপক্ষের শৈথিল্য থাকাতে তাহা প্রশ্রয় পাইয়া বিরাটমূর্তি ধারণ করিতেছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা একটা উদাহরণ দিতেছি। অনিচ্ছার কারণ এই, বারংবার নিজেদের এই সকল হীনতার দৃষ্টান্ত আলোচনা করিতে সংকোচ বোধ হয়। মাঝে মাঝে প্রায়ই শুনা যায় গোরা সৈন্য শিকার উপলক্ষ্যে এ-দেশী গ্রামবাসীর হত্যার কারণ হইয়া পড়ে। মান্দ্রাজে ঘণ্টাকুলের হত্যাব্যাপারে দেশীয় দ্বাররক্ষীর মহত্ত্ববিবরণ এমন জড়িত রহিয়াছে যে, তাহা বিস্মৃত হওয়া ভারতবাসীর পক্ষে সুকঠিন।

দেশীয় লোককে হত্যা করিয়া এ-পর্যন্ত বাংলাদেশে কেবল বহুকাল পূর্বে একজন ইংরেজের ফাঁসি হইয়াছিল। অভিযুক্তগণ খালাস পাইয়াছে, অবশ্য, সেটা প্রমাণ এবং ইংরেজ জজ ও জুরির বিচার ও বিশ্বাসের কথা। কিন্তু এরূপ দুর্ঘটনা বারংবার না ঘটিতে পারে গবর্মেণ্ট তজ্জন্য কোনো বিশেষ বিধান করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অথচ ইহাতে করিয়া কোনো পোলিটিকাল কুফল সঞ্চিত হইতেছে না এমন কে বলিতে পারে?

সম্প্রতি ব্যারাকপুরে একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালি ভদ্রলোক তিনজন গোরা সৈন্যের দ্বারা যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত হইয়াছেন তাহা পাঠকগণ জানেন। অবশ্য ইহার বিচার হইবে, এবং দোষিগণ দণ্ড পাইবে এমনও আশা করা যাক। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজচালিত কোনো খবরের কাগজে এই নিদারুণ ঘটনা উপলক্ষ্যে কিছুমাত্র বিরক্তি খেদ অথবা রোষ প্রকাশ হইয়াছে? প্রমাণের ত্রুটি অবলম্বন করিয়া আদালতের হস্ত হইতে দোষী নিষ্কৃতি পাইতে পারে কিন্তু ইংরেজসাধারণের ক্ষুব্ধ ন্যায়ানুরাগ যদি এই পাপ-কার্যকে লেশমাত্র লাঞ্ছিত না করে তবে তাহা হইতে কী প্রমাণ হয়?

অথচ, হাওড়ায় কোনো একটি য়ুরোপীয় হত্যা লইয়া সেই সকল ইংরেজি কাগজের ইংরেজ পত্রপ্রেরকগণ কিরূপ উত্তেজনা ও আক্রোশ প্রকাশ করিতেছেন?

হাওড়ার এই হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও শোচনীয় সন্দেহ নাই এবং তাহার বিচার

কঠিন ও দণ্ড সুকঠোর হইবে না এমন আশঙ্কাও কেহ মনে স্থান দিতে পারে না। কিন্তু উভয় হত্যার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। জনসাধারণ যখন অমূলক অথবা সমূলক আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া উঠে তখন তাহারা যেরূপ ভীষণমূর্তি ধারণ করে তাহা অন্য দেশের তুলনায় এ-দেশে কিছুই নহে। সেইরূপ উত্তেজিত অবস্থায় যে দুই-একটা অন্যায় হত্যা সংঘটিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কী আছে? কিন্তু ব্যারাকপুরে বিনা-কারণে যে হত্যা ঘটিয়াছে তাহার মূলে বহুকালের স্পর্ধা ও প্রশ্রয় আছে,—প্লেগঘটিত উত্তেজনা কচিৎ-সম্ভাব্য কিন্তু শেষোক্ত কারণজনিত দুর্ঘটনা ধারাবাহিক। তাহার বিষবীজ সংক্রামক এবং স্থায়ী।

একটি গোরা পুনা-রাজপথে বায়ু-বন্দুক ছুঁড়িয়া আমোদ করিতেছিল তাহার বিবরণ কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনজনের গায়ে গুলি লাগে। আঘাত অতি সামান্য, এবং সে-হিসাবে অপরাধ গুরুতর নহে। কিন্তু এই খেলার মধ্যে যে একটা নিষ্ঠুর অবজ্ঞা অবহেলা আছে তাহা ভারতবাসীর পক্ষে বিপজ্জনক এবং কর্তৃপুরুষের পক্ষেও চিন্তার কারণ হওয়া উচিত ছিল। অপরাধী স্বীকার করিয়াছে যে, "He fired at a coffee shop sweeper for a lark" অর্থাৎ সে কেবলমাত্র মজা করিয়া একজন কফি-দোকানের ঝাড়ুদারকে গুলি করিয়াছিল। এই গুলি ঝাড়ুদারের গাত্রে অধিকদূর প্রবেশ করে নাই কিন্তু এইরূপ মজা ভারতবর্ষের মর্মের মধ্যে গভীররূপে নিহিত হইয়া থাকে।

এ-কথা অস্বীকার করিতে পারি না যে, যে-জাতি অতিমাত্রায় নিরীহ তাহাকে পদে পদে আঘাত ও অপমান হইতে রক্ষা করিতে কোনো গবর্মেণ্টই কৃতকার্য হইতে পারে না। এই সকল ক্ষুদ্র বিপদ হইতে নিজের পৌরুষই নিজেকে উদ্ধার করে। ইহার জন্য কাহারও কাছে কাঁদিয়া গিয়া পড়ার মতো লজ্জা আর নাই।

সেইজন্য ছোটোখাটো উপদ্রব এবং অপমানের কথায় নিজেদেরই প্রতি ধিক্কার জন্মে। সেতারার স্কুলমাস্টারের কুণ্ঠিত সেলাম সাহেবের পক্ষে যথোপযুক্ত না হওয়ায় যে একটা লাঞ্ছনা ও নালিশের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আমরা লজ্জাজনক জ্ঞান করি। প্রত্যক্ষ অপমান যে-দেশে সুমন্দ গতিতে সুদূর নালিশে গিয়া গড়ায় সে-দেশের অপমানেরও শেষ নাই।

কিন্তু যাহারা সুদীর্ঘকাল শান্তভাবে সহ্য করে, তাহারাই যে অকস্মাৎ একদিন তাহাদের চিরসঞ্চিত নীরব নালিশ অন্তর্জ্বালার সহিত উদ্‌গীর্ণ করিতে পারে এ-কথা সকলেই ভুলিয়া যায়—এমন কি, তাহারা নিজেরাও পূর্বে হইতে বলিতে পারে না। এইজন্য যখন তাহারা হঠাৎ সামান্য উপলক্ষ্যে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে তখন তাহাদের নিরর্থক

আচরণ অত্যন্ত অসংগত বলিয়া বোধ হয়। লোকে ভুলিয়া যায় বহুকালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদনা, অবিচার, অবিশ্বাস, অপমান হঠাৎ একটা তুচ্ছ মন্ত্রবলে বিরাট আকার ধারণ করিয়া উঠে। মনে হয় সে যেন একটা আকস্মিক অতিপ্রাকৃত দৈবসৃষ্টি, কেহ যেন পূর্বে হইতে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু তাহা আকস্মিক নহে. অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া অতিশয় মন্দগতিতেই প্রাকৃত নিয়মের রাজপথ দিয়া সে চলিয়া আসে, তাহার মৌন দীনভাব দেখিয়া কেহ তাহাকে লক্ষ্য করে না।

পূর্বদেশীয়দের এই নীরব সহিষ্ণুতা যাহাতে পশ্চিমদেশীয়দিগকে অলক্ষ্যে অসতর্কতা ও ঔদ্ধত্যে লইয়া যায়, ইহাই প্রাচ্য প্রজা ও পাশ্চাত্য রাজা উভয়েরই পক্ষে বিপদের মূল। ইহা হইতেই গোরা সৈন্যদের মজার খেলা ও কালা আদমিদের অকস্মাৎ উন্মত্ততার সৃষ্টি হয়।

যাহা হউক, এইরূপ সংঘটন এবং সংঘর্ষে প্রজাদের আন্তরিক সন্তাপ যে কিরূপ বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা পরিমাণ করিবার উপায় নাই। যে-সকল ইংরেজ কথায় কথায় ঘুষা লাথি চড় এবং শুয়র নিগর সম্ভাষণ প্রয়োগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত তাঁহারা প্রত্যহই ভারতবর্ষে কী প্রকার বিপৎপাতের ভিত্তি রচনা করিতেছেন তাহা তাঁহারা জানেন না, এবং যে ইংরেজসমাজ এইরূপ রূঢ়তা ও অবজ্ঞাপরতার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার নৈতিক বাধা প্রদান করেন না তাঁহারা যে-শাখায় বসিয়া আছেন সেই শাখা ছেদনে প্রবৃত্ত।

আমাদের প্রতি সাধারণ ইংরেজের এইপ্রকার ভাবই প্রজাবিদ্রোহের ভাব। তাঁহারা আচারে ব্যবহারে ভাষায় ভঙ্গিতে সর্বদাই আমাদের মর্মস্থানকে ক্ষুব্ধ করিতেছেন। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে এমন মূঢ়চেতারও অভাব নাই যাঁহারা অসহ্য অবজ্ঞার আঘাতে প্রজা-হৃদয়ে অপমানক্ষত সর্বদা জাগাইয়া রাখাই রাজনৈতিক হিসাবে কর্তব্য জ্ঞান করেন। তাঁহারা পথে চলিতে চাবুক তুলিয়া সেলাম শিখাইতে শিখাইতে অগ্রসর হন।

ইহাকেই বলে প্রজাবিদ্রোহ। এবং নিয়ত এই বিদ্রোহেই প্রজার হইয়া প্রজা-পতির কালাগ্নি উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইতে থাকে। ইংরেজ কি সেই চিরজাগ্রত প্রজাপালকের বিশ্বনিয়মের প্রতিও প্রভুত্বমদোদ্ধত ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিবেন? প্রজাদের সংবাদপত্র, সভাসমিতি, এবং বাগ্মিবর্গ আছে, রুদ্রমূর্তি রাজা মুহূর্তের মধ্যে তাহাদের বাগ্‌রোধ করিয়া দিতে পারেন কিন্তু প্রজাপতির সভা নিঃশব্দ নীরব এবং তাঁহার বিচার সুচির কিন্তু সুনিশ্চিত।

১৩০৫

২

পরজাতীয়ের প্রতি বিদ্বেষ যে স্বাভাবিক এবং কিয়ৎপরিমাণে তাহার সার্থকতা আছে এ-সম্বন্ধে সম্প্রতি ইংরেজি স্পেক্টেটর পত্রে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

একটা জাতি বাঁধিয়া তুলিতে অনেক সময় যায়। আজ যাহারা ইংরেজজাতি বলিয়া খ্যাত তাহারা জুলিয়স সীজারের আক্রমণকাল হইতে এডওআর্ড দি কনফেসরের রাজত্বকাল পর্যন্ত হাজার বৎসর ধরিয়া পরিপাক পাইয়া তবে প্রস্তুত হইয়াছে।

এই সময়ের মধ্যে কেল্ট রোমান অ্যাঙ্গল জুট ডেন স্যাকসন নর্মান প্রভৃতি বিচিত্র ভিন্ন জাতি এক ঐতিহাসিক চুল্লির উপরে চড়ানো ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রভেদ ও বিরোধ ঘুচিয়া যখন তাহারা ঘনভাবে এক হইয়া উঠিল তখন তাহারা ব্রিটিশ জাতিরূপে গণ্য হইল।

এত দীর্ঘকালনির্মিত জাতীয়তা পরের সংঘাত হইতে আপনাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য স্বভাবতই উদ্যত হইয়া থাকে। ধর্মনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি সম্বন্ধে তাহার সংস্কারসকল এমন একান্ত বিশেষত্ব ও দৃঢ়তা লাভ করে যে, তাহার মধ্যে বহির্জাতির প্রবেশপথ থাকে না।

ভারতবর্ষের হিন্দুগণ বিশেষ একটি জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিনা তাহা লইয়া কেহ কেহ তর্ক উত্থাপন করেন। সে তর্ক অসংগত নহে।

জগতে হিন্দুজাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। ইহাকে বিশেষ জাতিরূপে গণ্য করা যায় এবং যায়ও না। জাতীয়ত্বের সংকীর্ণতা ইহার মধ্যে আছে অথচ জাতীয়ত্বের বল ইহার মধ্যে নাই। ইহা এক অথচ অনেক, ইহা বিপুল অথচ দুর্বল। ইহার বন্ধন যেমন কঠিন তেমনি শিথিল, ইহার সীমা যেমন দৃঢ় তেমনি অনির্দিষ্ট।

য়ুরোপে জাতিগত উপাদানে রাজনৈতিক ঐক্যই সর্বপ্রধান। হিন্দুদের মধ্যে সেটা কোনোকালেই ছিল না বলিয়া যে হিন্দুরা জাতিবদ্ধ নহে সে-কথা ঠিক নহে।

বৈদিক সময় হইতে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া শাস্ত্র এবং সংস্কার, আচার এবং অনুশাসন হিন্দুদিগের জন্য এক বিরাট বিস্তৃত আবাসভবন নির্মাণ করিয়াছে। তাহার সকল কক্ষগুলি সমান নহে ;-- মাঝে মাঝে দেয়াল উঠিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মধ্যে যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হইয়াছে কিন্তু তথাপি এই বিপুলতার মধ্যে একটা বৃহৎ ঐক্য আছে।

এই অট্টালিকার মধ্যে যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহারা আদৌ একবংশীয় নহে। দক্ষিণের দ্রাবিড়ী হইতে হিমালয়ের নেপালি পর্যন্ত নানা বিচিত্র জাতি বহুকালে ক্রমে ক্রমে ইহার মধ্যে সম্মিলিত হইয়াছে।

বরঞ্চ যে-সকল জাতি মিশ্রিত হইয়া ইংরেজ মহাজাতি রচিত হইয়াছে তাহারা মূলত ভিন্নগোত্রীয় নহে। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে বিসদৃশ জাতিপরম্পরা যেমন একত্র মিশ্রিত হইয়াছে জগতে এমন আর কুত্রাপি ঘটে নাই।

স্পেক্টেটর যে স্বাভাবিক পরজাতিবিদ্বেষের কথা বলিয়াছেন আদিম আর্যদের মধ্যে তাহা প্রচুর পরিমাণেই ছিল। আদানপ্রদান আচারবিচার, এমন কি, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় তাঁহারা আপনাদিগকে অনার্যদের সংস্রব হইতে দূরে রক্ষা করিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এ এক বহুদিনব্যাপী প্রকাণ্ড যুদ্ধ। রামায়ণ-মহাভারতের সুবিশাল ছন্দঃস্রোতের মধ্যে এই প্রাণপণ যুদ্ধের প্রলয়কল্লোল এখনও ধ্বনিত হইতেছে।

কিন্তু চারিদিকের সহিত চিরকাল লড়াই করা চলে না। ক্রমে বিরোধচেষ্টা শিথিল হইয়া আসে এবং অল্পে অল্পে সন্ধি স্থাপিত হয়। এবং এইরূপে ধীরে ধীরে আর্য-অনার্যের মাঝখানের ব্যবধান ক্ষীয়মাণ হইয়া আসিল এবং ক্রমে অনার্যদের সংস্কার তাহাদের পূজাবিধি তাহাদের দেবতা অভিমানী আর্যাবর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আবর্তিত করিয়া তুলিল।

সেইজন্যই আজ হিন্দুজাতি জ্ঞানে অজ্ঞানে আচারে অনাচারে বিবেকে এবং অন্ধ কুসংস্কারে এমন একটা অদ্ভুত মিশ্রণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যদিচ সকল বিষয়েই আর্য-অনার্যের মধ্যবর্তী সীমা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, এমন কি, আমাদের বর্ণ, আকার, আয়তনে রক্তমিশ্রণেরও সাক্ষ্য দিতেছে তথাপি স্বাতন্ত্র্যরক্ষাজন্য বহুকালব্যাপী সেই যুদ্ধচেষ্টা আজিও হিন্দুসমাজের আভ্যন্তমধ্যে সজাগ হইয়া আছে।

তবে, পূর্বেকার সেই আর্য-অনার্যের সংগ্রাম অন্ধ হিংস্র উগ্রতা পরিত্যাগ করিয়াছে বটে কিন্তু তাহা পরিব্যাপ্ত হইয়া সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছে।

তাহার এক কারণ আমাদের পরস্পরের মধ্যে বৈসাদৃশ্য এত অধিক যে, প্রকৃতির অনিবার্য নিয়মে যখন আমরা মিলিতেছিলাম তখনও শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বাতন্ত্র্যচেষ্টার বিরাম ছিল না। আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণ কেহই সম্পূর্ণ হার মানিতে চাহে নাই।

এই কারণে যদিচ আমরা বহুসংখ্যক আর্য অনার্য এবং সংকর জাতি হিন্দুত্ব নামক এক অপরূপ ঐক্যলাভ করিয়াছি, তথাপি আমরা বল পাই নাই। আমরা যেমন এক তেমনি বিচ্ছিন্ন।

এই দুর্বলতার প্রধান কারণ আমরা অভিভূতভাবে এক, আমরা সচেষ্টভাবে এক নহি। যাহারা আমাদের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে, যাহাদিগকে আমরা কিছুতেই খেদাইয়া

রাখিতে পারি নাই, আমাদের বেড়া-দেওয়া উদ্যানের মধ্যে যে-সকল আগাছা আপনি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহারা ক্রমে অনবধান অথবা অভ্যাসের জড়ত্ববশত আমাদের সহিত এক হইয়া গেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা, কি শারীরসংস্থানে, কি বুদ্ধিবৃত্তিতে আর্যদের সশ্রেণীয় বা সমকক্ষ নহে। তাহারা সর্ববিষয়েই নিকৃষ্ট। এই কারণে তাহারা আর্যসভ্যতায় বিকার উৎপাদন না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা যেমন আর্যরক্তের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছে তেমনি আর্যধর্ম-আর্যসমাজকেও বিকৃত করিয়া দিয়াছে।

এই বহুদেবদেবী, বিচিত্র পুরাণ এবং অন্ধলোকাচারসংকুল আধুনিক বৃহৎ বিকারের নাম হিন্দুত্ব।

কিন্তু আমাদের এই বিকারের জন্য তত ক্ষোভ নাই বিচ্ছেদের জন্য যত। এক্ষণে ধর্মে আচারে বিশ্বাসে ও শিক্ষায় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের মধ্যে ভেদ ক্ষীণপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, বহুকালের সংঘর্ষে পরস্পরের মধ্যে অনেক অদলবদল হইয়া আর্য অনার্যতর এবং অনার্য আর্যতরভাবে এক হইয়া আসিয়াছে।—যাহা হইবার তাহা হইয়া গেছে। কিন্তু তবু বিচ্ছেদ ভাঙে না।

অর্থাৎ ঐক্যের যা ক্ষতি তাহাও ঘটিয়াছে এবং অনৈক্যের যা দোষ তাহাও বর্তমান।

এক্ষণে এই দুটাই সংশোধন করা আমাদের কাজ। নতুবা আমাদের উন্নতির ভিত্তি দৃঢ় হইবে না। নতুবা আমাদের শিক্ষা মিথ্যা, আমাদের আন্দোলন নিষ্ফল, আমাদের কনগ্রেস কনফারেন্স প্রভৃতি সমস্তই ক্ষণকালের ক্ষীণ উদ্যম।

এক্ষণে যিনি জড়ীভূত হিন্দুজাতির মধ্যে আচারে ব্যবহারে সমাজে ধর্মে আর্যভাবের একটি বিশুদ্ধ আদর্শ স্থাপন এবং কৃত্রিম ক্ষুদ্র নিরর্থক বিচ্ছেদগুলি দূর করিয়া সমগ্র লোক-স্তূপের মধ্যে একটি সজীব ঐক্য সঞ্চার করিয়া দিবেন তিনিই ভারতবর্ষের বর্তমান কালের মহাপুরুষ।

পূর্বেই বলিয়াছি রাষ্ট্রতন্ত্রীয় একতা আমাদের ছিল না। শত্রুকে আক্রমণ, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা, এবং এক শাসনতন্ত্রের অধীনে পরস্পরের স্বার্থ ও শুভাশুভের একত্ব অনুভব আমরা কখনো দীর্ঘকাল করি নাই। আমরা চিরদিন খণ্ড খণ্ড দেশে খণ্ড খণ্ড সমাজে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা দ্বারা বিভক্ত। আমাদের স্থানীয় আচার স্থানীয় বিধি স্থানীয় দেবদেবীগণ বাহিরের আক্রমণ ও সংশোধন হইতে নিরাপদভাবে সুরক্ষিত হইয়া একদিকে ক্ষুদ্র অসংগত, অন্যদিকে প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের ভিতরকার অনার্যতা, অদ্ভুত লোকাচার ও অন্ধসংস্কারে শাখাপল্লবিত হইয়া, আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সর্বসাধারণ মানবজাতির

রাজপথকে আমাদের নিকট হইতে অবরুদ্ধ করিয়াছে। আমরা প্রাদেশিক, আমরা পল্লীবাসী; বৃহৎ দেশ ও বৃহৎ সমাজের উপযোগী মতের উদারতা, প্রথার যুক্তিসংগতি এবং সাধারণ স্বার্থরক্ষার উদ্‌যোগপরতা আমাদের মধ্যে নাই। এক কথায়, বৃহৎক্ষেত্রে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার যে সফলতা তাহা আমরা লাভ করিতে পারি নাই।

এক্ষণে ইংরেজ-রাজত্বে আমরা পরস্পর নিকটবর্তী হইয়াছি। এক্ষণে আমাদের প্রাদেশিক বিচ্ছেদগুলি ভাঙিয়া ফেলিবার সময় হইয়াছে। বহুদিনের বিরোধ-দ্বন্দ্বের মধ্যে যে একটি প্রাচীন ঐক্যগ্রন্থি আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বাঁধিয়া গিয়াছে সেইটেকেই প্রবল করিয়া আমাদের স্থানীয় এবং সাময়িক অনৈক্যগুলিকে ক্ষুদ্র কোণজাত ধুলার মতো ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে।

বর্তমান কালে হিঁদুয়ানির পুনরুত্থানের যে একটা হাওয়া উঠিয়াছে তাহাতে সর্বপ্রথমে ওই অনৈক্যের ধুলা সেই প্রাদেশিক ও ক্ষণিক তুচ্ছতাগুলিই উড়িয়া আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। কারণ সেইটেই সর্বাপেক্ষা লঘু, এবং সেইটেই অল্প ফুৎকারে আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে।

কিন্তু এ ধুলা কাটিয়া যাইবে, আমাদের নিশ্বাসবায়ু বিশুদ্ধ হইবে, আমাদের চারিদিকের দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইবে সন্দেহমাত্র নাই। আমাদের দেশের যাহা স্থায়ী, যাহা সারবান্‌, যাহা গভীর, যাহা আমাদের সকলের ঐক্যবন্ধনের উপায় তাহাই ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

যখন কোনো প্রবল সংঘর্ষে কোনো নূতন শিক্ষায় একটা জাতি জাগ্রত হইয়া উঠে তখন সে নিজেরই মধ্যে শক্তি সন্ধান করে। সে জানে যে ধার করিয়া চলে না। যদি পৈতৃক ভাণ্ডারে মূলধন থাকে তবেই বৃহৎ বাণিজ্য এবং লক্ষ্মীলাভ নতুবা চিরদিন উঞ্ছবৃত্তি।

আমাদের সংস্কার ও শিক্ষা এত দীর্ঘকালের, তাহা আমাদিগকে এমন জটিল, বিচিত্র ও সুদৃঢ়ভাবে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে যে, বৃহৎ জাতিকে চিরকালের মতো তাহার বাহিরে লইয়া যাওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই চিরোদ্‌ভিন্ন ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির মধ্য হইতেই আমাদের অভ্যুত্থানের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। আমরা ধূমকেতুর মতো দুই-চারিজন মাত্র গর্ববিস্ফারিতপুচ্ছে লঘুবেগে সাহেবিয়ানার দিকে ছিটকিয়া যাইতে পারি, কিন্তু সমস্ত দেশের পক্ষে তেমন লঘুত্ব সম্ভবপর নহে।

অতএব একদিকে আমাদের দেশীয়তা, অপরদিকে আমাদের বন্ধনমুক্তি উভয়ই আমাদের পরিত্রাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সাহেবি অনুকরণ আমাদের পক্ষে নিষ্ফল এবং হিঁদুয়ানির গোঁড়ামি আমাদের পক্ষে মৃত্যু।

মহাত্মা দয়ানন্দ স্বামীর প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজ ক্ষুদ্র হিঁদুয়ানিকে আর্য উদারতার দিকে

প্রসারিত করিবার যে প্রয়াস পাইতেছেন এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে তাহা যেরূপ পরিব্যাপ্ত হইতেছে তাহাতে আমরা মহৎ আশার কারণ দেখিতেছি।

উক্ত সমাজের, অন্তত সমাজস্থাপয়িতা দয়ানন্দ স্বামীর প্রচারিত মতের প্রধান গুণ এই যে, তাহা দেশীয়তাকেও লঙ্ঘন করে নাই অথচ মনুষ্যত্বকেও খর্ব করে নাই। তাহা ভাবে ভারতবর্ষীয় অথচ মতে সার্বভৌমিক। তাহা হৃদয়ের বন্ধনে আপনাকে প্রাচীন স্বজাতির সহিত বাঁধিয়াছে অথচ উন্মুক্ত যুক্তি এবং সত্যের দ্বারা সর্বকালের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে।

এই সমাজের সমস্ত লক্ষণগুলি পর্যালোচনা করিয়া আমরা আশা করিতেছি যে, ইহা ভারতে আর-একটি অভিনব সম্প্রদায়রূপে নূতন বিচ্ছেদ আনয়ন না করিয়া সমস্ত সম্প্রদায়কে ক্রমশ এক করিতে পারিবে।

বারান্তরে আর্যসমাজ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভিন্ন জাতির সহিত সংস্রব ইংরেজের যেমন ঘটিয়াছে এমন আর কোনো য়ুরোপীয় জাতির ঘটে নাই। কিন্তু ইংরেজের পরজাতিবিদ্বেষ সমান সুতীব্র রহিয়াছে। ইহা তাহাদের জাতীয়তার অত্যুগ্র বিকাশের পরিচয়স্থল।

বিদেশ হইতে আগত বিজাতি, ইংলণ্ডে অথবা ইংরেজ-উপনিবেশে বাসগ্রহণে উদ্যত হইলে ইংরেজের মনে যে বিরোধভাবের উদ্রেক করে স্পেক্টেটর সেই সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপিত করিয়াছেন।

কিন্তু পরদেশে গিয়া তদ্দেশীয়দের প্রতি ইংরেজের উদ্ধত বিমুখ ভাবও সুবিখ্যাত। এমন কি, য়ুরোপের মহাদেশবাসীয়গণ সম্বন্ধেও ইহার অন্যথা হয় না।

আহারবিহারে আচারে ও ভাবে দ্বীপবাসী ইংরেজের সহিত মহাদেশবাসী য়ুরোপীয়ের স্বল্পই প্রভেদ কিন্তু সেই প্রভেদগুলিও সাধারণ ইংরেজের মনে অবজ্ঞা এবং প্রতিকূল ভাব আনয়ন করে। তাহাদের জাতিসংস্কার এত দৃঢ় এবং সুকঠিন।

ইহার উপরে যখন পরজাতির সহিত স্বার্থের সংঘর্ষ জন্মিবার লেশমাত্র সম্ভাবনা ঘটে তখন ইংরেজের অসহিষ্ণুতা যে অত্যন্ত বর্ধিত হইবে ইহা স্বাভাবিক।

ইংলণ্ডপ্রবাসী জর্মান, ইতালীয় ও পোলীয় ইহুদিগণের প্রতি ইংরেজ অধিবাসীদের মনে যে শত্রুতার উদ্রেক করে তাহা যে কেবলমাত্র সুমহৎ জাতীয়ভাবের প্ররোচনায় তাহা বলিতে পারি না—উহার মধ্যে স্বার্থহানির আশঙ্কাই প্রবলতর।

একে বিজাতীয় তাহার উপরে স্বার্থের সংঘর্ষ—এইরূপ স্থলে খ্রীস্টীয় ধর্মনীতি এবং ন্যায়-অন্যায়ের উচ্চতর আদর্শ টেঁকাই কঠিন হয়। ইহাতে যে অন্ধতা আনয়ন করে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতারশ্মি তাহা ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না।

অল্পদিন হইল ভূতপূর্ব ভারত-স্টেট-সেক্রেটারি সার হেনরি ফাউলার পার্লামেন্টে বলিয়াছিলেন "ওআরেন হেস্টিংস এবং লর্ড ক্লাইভের কার্যবিধি যদি পার্লামেন্টের বিচারাধীন হইত তবে সম্ভবত ভারতসাম্রাজ্য আমরা পাইতাম না।" তাঁহার এই বাক্যে পার্লামেন্টে খুব একটা উৎসাহসূচক করতালি পড়িয়াছিল।

এ-কথাটার কি এই অর্থ যে, যেখানে স্বার্থ স্বজাতির এবং দুঃখ পরজাতির সেখানে অত বিচার-আচার করিলে চলে না? পার্লামেন্টের মতো প্রকাশ্য বৃহৎ সভায় এ-কথার উচ্ছ্বসিত অনুমোদন কি ধর্মনীতির মূলসূত্রের প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন নহে।

ধর্মনীতির প্রতি এই অবজ্ঞা পরজাতির প্রতি সুগভীর অবজ্ঞা হইতেই প্রসূত। ক্লাইভ ও হেস্টিংস যাহাদের প্রতি প্রতারণা মিথ্যাচার ও নিদারুণ উপদ্রব করিয়াছিলেন তাহারা অনাত্মীয়, তাহারা কেহই নহে, এ-কথা পার্লামেন্টের সদস্যবর্গের মনের মধ্যে অন্তত অস্পষ্টভাবেও ছিল।

সাধারণত ধর্মনীতিবোধ তাঁহাদের যে অল্প তাহা বলিতে সাহস হয় না। কারণ বল্‌গেরীয় ও আর্মানিদের প্রতি তুরস্কের অত্যাচার, কুবানদের প্রতি স্পেনের কঠোরতা সম্বন্ধে পার্লামেন্টের সভ্যগণ প্রবলপক্ষের প্রতি উৎসাহ-করতালি বর্ষণ করে না। কিন্তু ভারতবর্ষীয়ের প্রতি হেস্টিংসের ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহাদের নীতিবোধ যে এমন সহসা সবেগে বিপর্যস্ত হইয়া যায় তাহার কারণ স্বার্থজনিত অন্ধতা এবং পরজাতি, বিশেষত প্রাচ্য পরজাতির প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক সুগভীর অবজ্ঞাপরতা।

যে-অবজ্ঞা ফাউলার সাহেবকে প্রকাশ্য স্পর্ধার সহিত নির্লজ্জ নীতিবিরুদ্ধ বাক্য বলাইয়াছে, সেই স্পর্ধা এবং সেই অবজ্ঞাই ভারতবর্ষীয় পাপাকুলিদের সম্বন্ধে কালস্বরূপ, সেই অবজ্ঞাই সমস্তিপুরে দরিদ্রের বিবাহ-উৎসবে হত্যাকাণ্ডের হাহাকার তুলিয়াছিল, সেই অবজ্ঞাই গোরাবিভীষিকাগ্রস্ত মারীপীড়িত দুর্ভাগাগণের অন্তিম অনুনয় হইতেও কর্তৃপুরুষদিগকে বধির করিয়া রাখিয়াছিল।

ইংরেজের নীতিবোধ এইরূপে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য স্বজাতি-বিজাতির মধ্যে অভিযোগ উপস্থিত হইলে বিচার করা তাঁহাদের পক্ষে সুকঠিন। কারণ, ইহা অসম্ভব নহে যে, যে ইংরেজ ফস্ করিয়া ঘুষা লাথি অথবা গুলি চালাইয়া ভারতবর্ষীয় জনসংখ্যা হ্রাস করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই স্বজাতিসমাজে সে শুভ্র মেষশাবক বিশেষ,—অতএব একজন দেশী হত্যাকারীকে ইংরেজের যেরূপ খুনি বলিয়া মনে হয় তাহাকে সেরূপ খুনি বলিয়া মনেই হয় না,—সুতরাং এমন লোকটাকে ফাঁসি দেওয়া একটা আইনসংগত হত্যাকাণ্ড বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে।

আমাদের প্রতি চাঁদের কলঙ্কের দিকটা ফেরানো আছে, কিন্তু তাহার বিপরীত

পৃষ্ঠটা হয়তো সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্কভাবে নিজের নিকট দেদীপ্যমান—অতএব ঠিক কলঙ্কের বিচার করিতে হইলে একবারে আমাদের তরফে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়, কিন্তু তাহার মতো দুঃসাধ্য কাজ আর নাই।

ওআরেন হেস্টিংস লর্ড ক্লাইভ পরজাতির সম্বন্ধে যেমনই হ'ন স্বজাতির সম্বন্ধে তাঁহারা মহৎ। ইংরেজ কবি হুড জিরাফ জন্তুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন

"So very lofty in thy front—but then
So dwindling at the tail !"

অর্থাৎ সম্মুখের দিকে তুমি এত সমুচ্চ কিন্তু তবু লাঙুলের দিকে এতই খর্ব। ইংরেজ-জিরাফের লাঙুলের দিকটা পরজাতির দিকে পড়িয়াছে বলিয়া যে, তাহার স্বজাতি তাহাকে সেইদিকেই পরিমাপ করিবে ইহা কখনো সম্ভবপর হইতে পারে না।

কিন্তু পররাজ্য অধিকার করিয়া স্বজাতি ও বিজাতিকে এক ন্যায়দণ্ডে তুলিত করিবার কঠিন অধিকার ইংরেজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং স্বার্থের অনুরোধে সেই ন্যায় হইতে ভ্রষ্ট হইলে তাহাতে উৎসাহ-করতালি বর্ষণের কোনো কারণ দেখি না। তাহা স্বাভাবিক হইতে পারে কিন্তু তাহাতে স্পর্ধা প্রকাশের বিষয় লেশমাত্র নাই।

ইংরেজের এই পরবিদ্বেষ, বিশেষত প্রাচ্যবিদ্বেষ, নেটাল অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশে কিরূপ নখদন্ত বিকাশ করিয়া উঠিয়াছে তাহা কাহারও অগোচর নাই। অথচ ইহাও দেখা যাইতেছে, ইংরেজ ভারতবর্ষীয় সৈন্যকে আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যের মধ্যে রক্তপাত করাইতে কুণ্ঠিত নহেন। তখন, এক রাজ্ঞীর প্রজা এক সাম্রাজ্যের অধিবাসী এমন সকল সৌভ্রাত্র্যমধুমাখা কথা শুনা যায়। ইংরেজ মহারানীর অধিকার-বিস্তারে প্রাণপাত করিতে ভারতবাসীর কোনো বাধা নাই কিন্তু সেই অধিকারে স্থানলাভ করা তাহার পক্ষে নির্বাধ নহে। এই প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে যে একটা ক্ষুদ্রতা হীনতা আছে তাহা ইংলণ্ড উপলব্ধি করেন না—তাঁহার সম্মুখভাগের মহত্ত্ব লাঙুলবিভাগের খর্বতার কোনো খবরই রাখে না। অথচ ওই খর্ব দিকটার লাঙুল, আস্ফালন-ব্যাপারে ন্যূন নহে। দমন-শাসন-তাড়ন-তর্জনে সর্বদাই সে চঞ্চলিত। তাহার চক্ষু নাই বলিয়া চক্ষুলজ্জাও নাই।

চক্ষুলজ্জা যে নাই ভারতবর্ষীয় ইংরেজি খবরের কাগজে সর্বদাই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সমস্তিপুর ব্যারাকপুরের হত্যাব্যাপার ইংরেজি কাগজে কোনোপ্রকার আখ্যা পাইল না, কিন্তু শালিমারের দুর্ঘটনা "শালিমার ট্র্যাজেডি" নামে সমুচ্চস্বরে বারংবার ঘোষিত হইতে লাগিল। তাহাতেও খেদ নাই কিন্তু দুর্বিনীত নেটিভের হস্তে প্রবাসী ইংরেজের প্রাণমান উত্তরোত্তর বিপদ্‌গ্রস্ত হইতেছে বলিয়া যে-সমস্ত প্রেরিতপত্র বাহির

হইতেছিল তাহা পাঠ করিয়া যদি আমাদের শঙ্কার উদয় না হইত তবে বড়ো দুঃখেও হাসিতে পারিতাম। আমরা হাসিতে সাহস করিলাম না, কিন্তু অদৃষ্ট একটা ভীষণ কৌতুকের সৃষ্টি করিল। দেখিতে দেখিতে ইংরেজকর্তৃক কতকগুলি দেশীয় লোকের বীভৎস হত্যা পরে পরে সংঘটিত হইল—ইংরেজ সম্পাদকগণ একবারেই মৌন অবলম্বন করিলেন। ইংরেজ সম্পাদকগণকে যিনি কাল্পনিক নেটিভভীতিদ্বারা মুখর করিয়া তোলেন তিনিও আমাদের দুরদৃষ্ট, এবং যিনি সাংঘাতিক প্রতিবাদের দ্বারা তাহাদিগকে নিরুত্তর করিয়া দেন তিনিও আমাদের দুরদৃষ্ট।

১৩০৫

৩

আমাদের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা ম্যাকেঞ্জি সাহেব তাঁহাদের স্বদেশের শীতল বায়ুতে ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের গরম এখনও তাঁহাকে ছাড়ে নাই। ইতিমধ্যে এক ভোজ উপলক্ষ্যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটির বাঙালি কমিশনারদের প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে গণ্য ব্যক্তির মধ্যে আমল দেন নাই।

তাঁহার সেই বক্তৃতার রিপোর্টে দৈবাৎ রিপোর্টার একটা ভুল করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন "কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটিতে ইংরেজমণ্ডলীর প্রতিনিধিগণ স্থান পান নাই"—রিপোর্টার "প্রতিনিধি ইংরেজ" না লিখিয়া "ভদ্র ইংরেজ" লিখিয়াছিল।

কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটিতে ভদ্র ইংরেজ নাই এ-কথা শুনিলে কলিকাতার ইংরেজ-হৃদয়ে পাছে আঘাত লাগে সেইজন্য তাড়াতাড়ি সমুদ্রপার হইতে তিনি তাহা সংশোধন করিয়া পাঠাইয়াছেন। বাঙালি কমিশনারদের যে গালি দিয়াছেন সেজন্য অনুতাপ প্রকাশ করেন নাই।

অবশ্য, বাঙালি কমিশনারগণ দেশের আমির-ওমরাও দলের না হইতে পারেন, কিন্তু সিভিল সার্ভিস ও মিলিটারি বিভাগে যে রাজপুরুষেরা ভারতশাসন করিতেছেন তাঁহারাই যে সকলে লাটের পুত্র বা রাজবংশীয় তাহাও নয়। তাঁহারা যে একদা স্বদেশী সমাজের উন্নত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী হইতে খসিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িয়াছেন তথ্যতালিকা লইলে এমনটা প্রকাশ হইবে না।

কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা অবজ্ঞেয় নহেন; তাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা যোগ্য লোক;

এবং তাঁহারা যদিও ইংলণ্ড হইতে আসিবার সময় শুদ্ধমাত্র স্বনামটুকু লইয়া আসেন তথাপি যাইবার সময় অনেকে তাহার সহিত উপাধি জুড়িয়া যাইতে পারেন।

কোনো ইংরেজ ভদ্রলোক লিখিতেছেন :

Sir James Westland is a Scotsman, and I have in my possession an old directory for the year 1818, which gives the names of the principal residents in the rural districts of Scotland. The name of Westland, however, is conspicuous by its absence.

এ-কথা সত্য হইলেও ইহাতে আমরা কোনো দোষ দেখি না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এবং দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারাই ভারতবর্ষীয় কনগ্রেস প্রভৃতি সভামণ্ডলীর মধ্যে পৈতৃক ধনে ধনী এবং বৃহৎ উপাধিতে ভূষিত লোকের সন্ধান করেন এবং না পাইলে উপেক্ষা প্রকাশের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

কনগ্রেসেই কি, আর ম্যুনিসিপ্যাল পৌরসভাতেই কি, সুযোগ্য বাঙালি ভদ্রলোকের অভাব নাই। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীনাথ মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, নলিনবিহারী সরকার, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ইঁহারা কোনোকালে লেফটেনান্ট গবর্নর হইতে পারিবেন না সন্দেহ নাই, কিন্তু না পারিবার কারণ এই যে, ইংরেজ-আমলে ভারত-শাসনের উচ্চতর অধিকারসকল হইতে আমরা বঞ্চিত।

আমাদিগকে যেটুকু অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি সহ্য না হয়, যদি সেটা ফিরাইয়া লইবার মতলব থাকে তবে লও—কিন্তু গালিমন্দ কেন ?

ঈসপের কথামালায় নেকড়ে বাঘ যখন মেষশাবকটিকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে তখন বলে, তুমি আমার ঝরনার জল নষ্ট করিয়াছ,—মেষ বলে, প্রভু, তুমি উপরের জল পাও আমি নিচের জল খাইতেছি তোমার জল আমি নষ্ট করিলাম কেমন করিয়া ? বাঘ বলে, তুই না করিস তোর বাপ করিয়াছিল। তাহার পর এক চপেটাঘাত।

আমরা মেষশাবকেরও অধম। প্রভেদ এই যে, বাঘের পক্ষে যেটা ছুতা ছিল ম্যাকেঞ্জি সাহেবের পক্ষে সেইটেই আসল কথা। এতদিন সেটা চাপিয়া গিয়াছিলেন; খানার পরে পরিতৃপ্তমনে বন্ধুসভায় সেটা ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐশ্বর্য-ঝরনায় ম্যাকেঞ্জি সাহেবদের অনেক নিচের জলে আমরা তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকি। কিন্তু সেও অসহ্য। ম্যাকেঞ্জি সাহেব তাঁহার ভোজাবসানের বক্তৃতায় বলিয়াছেন, কলিকাতার কর্তৃত্বভার অসাবধানে আমাদের হাত হইতে অনেকটা খসিয়া পড়িয়াছে। হায়! এটুকুর প্রতিও লোভ! যাহা স্বহস্তে দান করিয়াছ তাহার প্রতিও লোলুপ দৃষ্টি! বিস্তর নিচে আছি, এবং অত্যন্ত অল্প জল পাই, আমাদের দেশী স্পর্শে তোমাদের উচ্চশিখরের জল তো আমরা ঘোলা করি নাই।

নেকড়ে বাঘ মনে মনে বলেন, উচ্চ হ'ক নীচ হ'ক প্রভুত্বের স্বাদমাত্রই তোমাদিগকে দিতে চাহি না। তাহার পর মুখে বলেন, তোমরা অযোগ্য, ইণ্ডিয়া-ক্লাবে বৈঠক কর, তোমরা স্বদেশের প্রতিনিধি নও।

বেসরকারি ইংরেজ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের বাগ্‌যুদ্ধ চলে। আমরা অনেক সময় রাগের মুখে পরস্পরের প্রতি করুণবাক্য প্রয়োগ করি না। কিন্তু যাঁহারা ভারতশাসনকার্যে রাজস্থানীয় এতদিন তাঁহারা প্রজাসাধারণকে প্রকাশ্যে রূঢ়ভাষায় অপমান করেন নাই।

আমাদের প্রতি তাঁহাদের যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা আছে তাহা না হইতে পারে, প্রচুর স্নেহ আছে এমন অভিমানও হয়তো না করিতে পারি কিন্তু তাঁহারা বাক্‌সংযম করিয়া গেছেন। তাহার একটা কারণ, তাঁহারা যে উচ্চপদের উন্নতশিখরে থাকেন সেখান হইতে একটি ছোটো কথা বর্ষণ করিলেও নিচের লোকের মাথার পক্ষে তাহা গুরুতর হইয়া উঠে; এরূপ অসমকক্ষ আক্রমণ বীরোচিত নহে। ইংরেজি ভাষায় যাহাকে cowardliness অর্থাৎ কাপুরুষতা বলে ইহাও তাহাই। আর-একটা কারণ এই যে, কথার কলহ তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক এবং অযোগ্য। কারণ, তাঁহার হাতে ক্ষমতা আছে। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। সে-ক্ষমা কাজের ক্ষমা না হইলেও অন্তত বাক্যের ক্ষমা হওয়া উচিত।

রাজনীতির হিসাবেও বাক্‌সংযমের সার্থকতা আছে। রাজকার্য সকল সময়ে প্রজার অনুকূলে যায় না। অতএব মাঝে মাঝে যখন কঠিন আইন বা অপ্রিয় করবৃদ্ধি প্রজার উপরে জারি করিতে হইবে তখন দুর্বাক্য দ্বারা সেটাকে আরও তিক্ত করিয়া তুলিলে রাজাপ্রজার মধ্যে একটা সংঘর্ষ অনাহূত বাড়াইয়া তোলা হয়।

স্বাধীন ইংলণ্ডে পার্লামেন্টে ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে বিবাদ-বচসা হইয়া থাকে; কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহে না। কিন্তু সেখানে জনসাধারণে যাহা চায় রাজশক্তি তাহার বিরুদ্ধে যায় না। এইজন্য দেশ যে কী চায় তাহা নানা দলের আন্দোলনে সম্পূর্ণ আলোচিত হইয়া স্পষ্ট আকার ধারণ করে। এ-দেশে, আমরা যাহা প্রার্থনীয় জ্ঞান করি না তাহাও রাজা আমাদিগকে গিলিতে বাধ্য করেন—আমাদের মতামত-ইচ্ছানিচ্ছার দ্বারা রাজশাসন নিয়মিত হয় না। এখানে সম্পূর্ণ ই কর্তার ইচ্ছা কর্ম;—সে-স্থলে গায়ে পড়িয়া প্রজাসাধারণ বা সম্প্রদায়বিশেষকে রূঢ় কথায় ক্ষুব্ধ করিয়া তোলা না সুশোভন, না রাজনীতিসংগত।

তিক্ত বড়িকে মিষ্ট আকারে গেলানো রাজনীতির নৈপুণ্য। রাজশাসনের পথকে যত সংঘাত-সংঘর্ষহীন করিয়া তোলা যায় ততই রাজ্যের পক্ষে এবং শাসনকর্তাদের পক্ষে

মঙ্গল। অবশ্য, রাজ্যশাসন সম্পূর্ণ যন্ত্রসাধ্য নহে, তাহার মধ্যে রাগদ্বেষ ও পক্ষপাত আপনি আসিয়া পড়ে কিন্তু তাহা কিছুমাত্র প্রকাশ হইলে শাসনকার্যের গৌরব নষ্ট হয়।

আজকাল ইংরেজশাসনে এই নীতির ব্যতিক্রম দেখিতেছি। ম্যাকেঞ্জি সাহেব যখন বাংলার রাজপদে ছিলেন, যখন একেবারে অনেকগুলা অপ্রিয় বিধির প্রস্তাব উপলক্ষে সমস্ত দেশ স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হইয়া আছে, সেই সংকটের সময়, দেশের সেই দুর্ভাগ্যের সময়, সেই কঠোর বিলগুলি পাস করিবার সময় ম্যাকেঞ্জি সাহেব বঙ্গভূমির ক্ষতবেদনার উপরে অকারণে তাঁহার বাক্যহলাহলজ্বালা যোগ করিয়া দিলেন।

বিল তো পাস হইবেই। বিল-স্রষ্টাদের ইচ্ছার কোনো বাধা নাই। কিন্তু যত নির্বিরোধে হয় ততই ভালো। যদি প্রজার ক্ষতস্থানে ছুরি চালাইতেই হয় সেটা যাহাতে যথাসম্ভব অল্প বেদনায় সমাধা হয় সেই চেষ্টাই উচিত; যাঁহার কিছুমাত্র দায়িত্ববোধ আছে তিনি সে-জায়গাটা অনাবশ্যক আঘাতে ব্যথিত রক্তবর্ণ করিয়া তোলেন না।

কিন্তু উচ্চপদের যে স্বাভাবিক শান্তি সংযম ও ক্ষমা তাহা ম্যাকেঞ্জি সাহেব দেখান নাই। তিনি নিজে রুগ্ন ছিলেন এবং রাজকার্যকেও রোগাতুর করিয়া তুলিয়াছিলেন। অদ্য শাসনকার্য হইতে অবসর লইয়া ভারতভাণ্ডার হইতে বৃত্তিভোগ করিতে করিতেও তাঁহার ভূতপূর্ব প্রজাগণের প্রতি বিষোদ্গার করিতেছেন।

ইহাতে অমিশ্র কুফল ছাড়া আর কিছু দেখি না। ম্যুনিসিপাল বিল পাস করা যদি কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত হয় তবে ভূতপূর্ব বঙ্গাধিপ এ-সম্বন্ধে যতই চুপ করিয়া থাকেন ততই ভালো। তিনি বিলাতে বসিয়া খানার পরে অসংযত বক্তৃতা করিয়া উপদ্রব বাড়াইয়া তুলিতেছেন তিনি কথায় বার্তায় ভাবে ভঙ্গিতে বাঙালিবিদ্বেষ ও স্বজাতি-পক্ষপাত দেখাইয়া কেবল যে আত্মমর্যাদা লাঘব করিতেছেন তাহ নহে শাসনকার্যকেও কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিতেছেন।

গবর্মেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আত্মবিস্মৃতি ও ধৈর্যচ্যুতি আমরা বর্তমানকালের একটা কুলক্ষণ বলিয়া গণ্য করি। ইংরেজ ও দেশীয়দের মধ্যে উত্তরোত্তর যে বিচ্ছেদ ও বিরোধ বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা যদি রাজপুরুষদিগকেও স্পর্শ করে, তাঁহারাও যদি এ অবস্থার প্রতিকারচেষ্টা না করিয়া একটা দলভুক্ত হইয়া পড়েন তবে আমাদের পক্ষে সেটা সংকটের অবস্থা।

সেই রকমের যেন লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অবশ্য, স্বজাতিপ্রেম সকল সময়েই স্বাভাবিক, কিন্তু আজকাল যেন ভারতবর্ষের সরকারি ও বেসরকারি ইংরেজ ক্রমশই ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইতেছে। ভারতবর্ষীয় ইংরেজি খবরের কাগজের নাড়ীতেও যখন বেগ প্রকাশ পায় তখন গবর্মেণ্টেরও চক্ষু লাল এবং গাত্র উত্তপ্ত দেখিতে পাই।

ইংরেজি খবরের কাগজে বাঙালিদের প্রতি যে সুতীব্র অসহিষ্ণুতা দেখা যায় গবর্মেন্টের আচরণেও নানা আকারে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

অন্তত ম্যাকেঞ্জি সাহেব সে-ভাবটি চাপিয়া রাখেন নাই। তিনি যদিচ বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, ইংরেজি খবরের কাগজের সম্পাদক ছিলেন না তথাপি ইংরেজ প্লান্টার প্রভৃতিকেও সুমিষ্ট স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন, অথচ যে নিরন্ন জাতি আজ পর্যন্ত তাঁহার মুখের অন্নজল জোগাইতেছে তাহাদের ভদ্রমণ্ডলী সম্বন্ধে তাঁহার মুখে একটি মিষ্টবাক্য জুটিল না।

যাহা হউক, আমরা এমন দুরাশা করি না যে ম্যাকেঞ্জি সাহেব বিলাতে বসিয়া

রচিবেন মধুচক্র গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি—

কিন্তু আমরা প্রার্থনা করি নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির ন্যায় এক্ষণে তিনি বিশ্রাম লাভ করুন; এখনও অন্তর্জ্বালার উত্তেজনায় তাঁহাকে যেন বাঙালিবিদ্বেষ উদ্গীর্ণ করিতে না হয়।

১৩০৫

৪

শ্রীযুক্ত বাবু পৃথ্বীশচন্দ্র রায় বিরচিত "দি পভার্টি প্রব্লেমস ইন ইণ্ডিয়া" নামক সর্বসমাদরযোগ্য সারবান গ্রন্থে লর্ড ফ্যারারের একটি উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে এইখানে তাহার পুনরুদ্ধার করি :

The persons who carry on our trade on the outskirts of civilization are not distinguished by a special appreciation of the rights of others. ··· When a difficulty arises between ourselves and one of the weaker nations, these are the persons whose voice is most loudly raised for acts of violence, of aggression, or of revenge. ··· Our dealings in the Far East, and elsewhere have not always been such as would do credit to an honest merchant.

অর্থাৎ যে-সকল ব্যক্তি সভ্যতার বহিরঞ্চলে আমাদের বাণিজ্য বিস্তার করিয়া থাকে তাহারা অন্যের ন্যায্য স্বত্বের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবত্তার জন্য বিখ্যাত নহে। যখনই আমাদের সহিত কোনো দুর্বলতর জাতির একটা সংকট বাধিয়া উঠে তখন ইহাদেরই কণ্ঠস্বর,

পীড়ন, আক্রমণ ও প্রতিহিংসাসাধনের জন্ত সর্বোচ্চে ধ্বনিত হইয়া উঠে। দূরপ্রাচ্যদেশে এবং অন্তত্র অনেক সময় আমাদের আচরণ যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সাধুপ্রকৃতি বণিকের যোগ্য নহে।

রাজকর্মচারিগণ ব্যতীত অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় ইংরেজই বাণিজ্যজীবী। তুচ্ছতম উৎপাত উপলক্ষ্যেই তাঁহারা গুরুতর আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া উঠিবেন ইহা স্বাভাবিক। কারণ, ভারতশাসনকার্যকে নিজেদের স্বার্থসাধন হিসাব ছাড়া আর-কোনো হিসাবে দেখিতে তাঁহারা বাধ্য নহেন। তাঁহাদের মুখ হইতে এমন কথা প্রায়ই শুনা যায় যে, এ-ভারতবর্ষটা টুপিওআলারই ভারতবর্ষ। পাগড়িওআলা ও খালিমাথাগুলো কেবলমাত্র তাঁহাদের চাবাগানের কুলি, নীলক্ষেত্রের চাষি, পাটজোগানের পাইকড়, এবং লাংকাশিয়রের খরিদ্দার।

রাজনীতির মঞ্চ সুপ্রশস্ত; তাহা দেশে এবং কালে, ধর্মে এবং অর্থে সুদূরব্যাপী, তাহার উপরে যাঁহারা অধিষ্ঠিত হইয়া দূরবিস্তীর্ণ দৃষ্টির দ্বারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার পর্যালোচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রভূতপরিমাণ ধৈর্য ও বিচক্ষণতা আবশ্যক, তাঁহারা তুচ্ছ ও বৃহৎ ব্যাপারের আপেক্ষিকতা, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও মহৎ সার্থকতার প্রভেদ বুঝিতে সক্ষম। কিন্তু ইংরেজবণিকগণ ভারতবর্ষকে যেখান হইতে নিরীক্ষণ করেন সে-জায়গাটা যতই উচ্চ হউক তাহার ভিত্তি সংকীর্ণ, তাহা ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত লাভক্ষতির উপর দাঁড়াইয়া; একটু নাড়া খাইলেই তাহা দুলিয়া উঠে। গতবর্ষে ভূমিকম্পে কারখানা-ঘরের চিমনিগুলা হাতির শুঁড়ের মতো যেমন করিয়া দুলিয়াছিল, বড়োলাটসাহেবের প্রাসাদ এমন দোলে নাই।

ভারতবর্ষে সরকারি ও বেসরকারি ইংরেজের মতের এবং ভাবের প্রভেদ অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে মহাজনকর্তৃক অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া দলবদ্ধ সাঁওতালগণ গবর্মেন্টের নিকট দুঃখ নিবেদন করিতে আসিয়া যে-দুর্যোগ ঘটাইয়াছিল তদুপলক্ষ্যে মনস্বী সার উইলিয়ম হাণ্টার সাহেব লিখিতেছেন:

The Anglo-Indian community is naturally liable to apprehensions and hasty conclusions incident to a small body of settlers surrounded by an alien and a greatly more numerous race. ··· With the government rests the heavy responsibility of counteracting the natural tendency to panic on the part of the public.

হতভাগ্য সাঁওতালদের দুঃখ কেহ দেখিল না, তাহাদের নালিশ কেহ বুঝিল না,— যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া তাহারা দাবানলপীড়িত মৃগযূথের ন্যায় তাহাদের অরণ্যবাস-

ভূমি ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল, তখন রাজসৈন্যগণ তাহাদিগকে গুলিবর্ষণে দলে দলে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে লাগিল।[১] অবশেষে এই হত্যাকাণ্ড যখন প্রচুর সাঁওতাল-রক্তে পরিতৃপ্ত হইয়া শান্তিলাভ করিল তখন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ কিরূপ ধুয়া তুলিলেন?

হাণ্টার সাহেব এ-সম্বন্ধে ক্যালকাটা রিভিয়ু নামক বিখ্যাত পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ-বিশেষের উল্লেখ করিয়া তাঁহার "গ্রাম্যবঙ্গবৃত্তান্ত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

In short, no one knew anything about the wrongs or the peaceful industry of the Santals. They were simply "adult tigers" or "bloodthirsty savages"; and the reviewer, dismissing the ordinary plan of punishing only the actual rebels as insufficient, adopts a proposal to deport across the seas, not one or two ringleaders, but the entire population of the inflicted districts.

এইরূপ অসংগত এবং অসংযত ভাষা ইংরেজচালিত পত্রে মধ্যে মধ্যে শুনা গিয়াছে এবং নিশ্চয়ই কালে কালে আরও শুনা যাইবে। তাহার কারণ হাণ্টার সাহেব পূর্বেই নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহা আতঙ্ক; এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, সাধারণ মনের সেই উদ্দাম আতঙ্কের প্রতিকূলে দৃঢ়ভাবে ধৈর্যরক্ষা করা গবর্মেণ্টের গুরুতর কর্তব্যের অঙ্গ।

আতঙ্ক যে কিরূপ দৃঢ়বদ্ধমূল এবং কতদূর অন্ধ মূঢ়তার দ্বারা বেষ্টিত তাহা সম্প্রতি প্রকাশিত কোনো ইংরেজ পত্রের একটি প্যারাগ্রাফে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে আমাদের গবর্মেণ্ট যখন ভারতবর্ষের উপর দ্বাদশাদিত্যের মূর্তিধারণ করিয়া উঠিয়াছিলেন তখন কলিকাতার বস্‌তিবাসী ইতর-সাধারণের মধ্যেও একটা প্রকাশ্য ইংরেজবিদ্বেষ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। সম্প্রতি ঠিক তাহার উলটা ভাব দেখিয়া ইংরেজ সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু জুজুর ভয় যুক্তির দ্বারা যায় না। সম্প্রতি একজন ইংরেজ আগন্তুককে দেখিয়া কোনো বস্‌তির অধিবাসিগণ ছোটোলাট ভ্রমে তাঁহাকে প্রচুর ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল এই প্রসঙ্গ উপলক্ষ্যে উক্ত পত্র লিখিয়াছেন যে, ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে দেশের সাধারণের মনে ইংরেজ-রাজভক্তি প্রবল—কিন্তু—উহার মধ্যে জুজু আকারে একটা কিন্তু রহিয়া গেছে—কিন্তু বোধ করি কুমন্ত্রীদের উত্তেজনায় মাঝে মাঝে তাহারা বিগড়িয়া যায়।

সাহেবের হৃদয়াকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইল না। একটা কালো রঙের খটকা

১ তুলনীয়, "ইংরেজের আতঙ্ক", পৃ. ৫৩৭

রাখিয়া দিলেন। একটা কুমন্ত্রী কোনো একটা জায়গায় নিশ্চয়ই আছে। এ-প্রশ্ন একবার মনে উদয় হইল না যে, এক্ষণে তিনি কোথায় আছেন? হঠাৎ কেনই বা তিনি জাগিয়া উঠেন আবার হঠাৎ ছুটিই বা লন কেন?

জুজুর-থিয়োরি ছাড়িয়া দিলেও এই রহস্যের যে একটা অত্যন্ত সরল মীমাংসা আছে সেটা কেন সাহেবের মাথায় প্রবেশ করিল না। কেন তিনি ভাবিলেন না, বর্তমান বঙ্গাধিপকে দেশের লোক যথার্থ রক্ষক বলিয়া অনুভব করিয়াছে, তাঁহারই সহৃদয়তা দেশের হৃদয়কে ইংরেজের দিকে আকর্ষণ করিতেছে।

কিন্তু বোধ করি যাহাদের অতিশয় বুদ্ধি সরল মীমাংসাই তাহাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা দুর্গম। একটা কোথাও কিছু গোল আছে এটা বোধ করি বুদ্ধিমানের কথা। কারণ, গোল যদি দৈবাৎ বাহির হইয়া পড়ে তবে বুদ্ধিমান তাঁহার বুদ্ধির জয়ঢাক বাজাইতে পারিবেন, যদি বাহির নাই হয় সেটা যে কোনো একটা জায়গায় নাই তাহার অপ্রমাণ করিবে কে!

আরও একটা কথা আছে। নিজেদের যে লেশমাত্র দোষ নাই এ-কথা মনে করিতে আরাম আছে—এবং ইংরেজ আরাম ভালোবাসে। দেশের জনসাধারণ কেনই বা ইংরেজের প্রতি কোনো অবস্থায় কিছুমাত্র বিদ্বেষভাব বহন করিবে তাহা ইংরেজ কিছুতেই বুঝিতে পারেন না; কারণ তাঁহারা অতিশয় প্রিয়চারী, তাঁহাদের স্বভাষায় যাহাকে বলে অ্যামিয়েবল;—অতএব, তাঁহাদের প্রতি বিরুদ্ধভাব তাঁহাদের দোষে জন্মিতেই পারে না। তবে কেন এমনতরো ঘটে? নিশ্চয়ই কোনো একটা কুমন্ত্রী আছে। বাস। ইংরেজের বুদ্ধিতে সমস্তই পরিষ্কার হইয়া গেল।

এই মূঢ় অন্ধতা যদি কেবলমাত্র ইংরেজ সম্পাদকদের মধ্যে বদ্ধ থাকিত তাহা হইলেও আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি আজকাল ইংরেজ সম্পাদকের আসন হইতে ভারতরাজতক্তা পর্যন্ত একটা সমভূমিতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

বোম্বায়ের দুর্ঘটনাবলীতে দেখা গিয়াছে বোম্বাই-কর্তৃপক্ষদিগের মেজাজ টাইমস অব ইণ্ডিয়ার মেজাজ হইতে বড়ো তফাত নয়। তেমনি উদ্ধত অবিবেচনা, অবজ্ঞাপূর্ণ কঠোরতা, দেশীয় লোকের গভীরতম বেদনা এবং করুণতম আবেদনের প্রতি নিরতিশয় উপেক্ষা।

তা ছাড়া, দেশীয় লোকদের ব্যবহারে যদি কোনোপ্রকার অসন্তোষের লক্ষণ দেখা যায়, সেজন্য তাহারাই একমাত্র দোষী; গবর্মেন্টও এই প্রকারের একটা আরামদায়ক মূঢ় সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াছেন। ইংরেজ, সে সামান্য সৈন্যই হউক বা জিলার কর্তাই

হউন,—কখনোই দোষী হইতে পারে না, তাহাদের আচরণে পীড়া অনুভব করাই পীড়িতের পক্ষে বেয়াদবি ; তাহাদের দুর্ব্যবহারের সকল কথাই মিথ্যা ; অতএব নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কুমন্ত্রী আছে।

অতএব ধরো নাটু-ভাইদুটোকে। দাও তিলককে জেলে। দেশী সম্পাদকগুলাকে এক-একটা তৃণের মতো উৎপাটন করিয়া আনো। কুমন্ত্রী থাকিতেই হইবে, কারণ, ইংরেজ অতিশয় প্রিয়চারী, ভারি অ্যামিয়েবল।

এ-সমস্ত, ফলাফলবিচারী ধৈর্যশীল গবর্মেন্টের মতো ব্যবহার নহে ; এ ঠিক দৈনিক ইংরেজি কাগজের দ্রুতলিখিত গরম গরম ঝাঁঝালো প্রবন্ধকে ইতিহাসে প্রতিফলিত করা। মনে হয় যেন দায়িত্ববিহীন বেসরকারি ইংরেজ-সমাজের উদ্বেলিত অসহিষ্ণুতা গবর্মেন্টকেও অত্যন্ত অদ্ভুত এবং অশোভনরূপে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

গবর্মেন্টের এই সমস্ত আধুনিক লক্ষণ দেখিয়া আমাদের মনে আশঙ্কা হয়। লর্ড ক্যানিং প্রভৃতি মনস্বী রাজনীতিজ্ঞগণের গবর্মেন্ট সমুদ্রতীরে শৈলতটের মতো উদার, অটল এবং ক্ষমাশীল ছিল ; তাঁহাদের সময়ে ঝড় কম যায় নাই, এবং তরঙ্গিত ইংরেজ-সমাজ দেশটাকে হাঁ করিয়া গিলিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল ; তখন উন্নত কঠিন গবর্মেন্ট তাহাদিগকে ঠেকাইয়াছিল।

মনে হইতেছে যেন কালক্রমে সেই উন্নত তীর অল্পে অল্পে খইয়া আসিতেছে, জলের সহিত সমতল হইতেছে ; ঝড়ঝাপটের দিনে তুফানকে অটলভাবে ঠেকাইয়া রাখিবার ক্ষমতা তাহার চলিয়া যাইতেছে। অথচ ফুংকারমাত্রেই তুফান উঠিয়া পড়ে এবং কেন যে এই সমুদ্র সর্বদাই ফেনিল বিচলিত হইয়া উঠিতেছেন তাহার রহস্য জলবায়ুতত্ত্বের রহস্যের মতোই দুর্বোধ।

আসল কথা, ভারতবর্ষীয় ইংরেজসম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিকতার ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। সিমলা দার্জিলিং নৈনিতাল নীলগিরি জাঁকিয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষে পূর্বাপেক্ষা ইংরেজনারীদের প্রাদুর্ভাব বেশি হওয়াতে তাহার দুইটি ফল দেখা যায়। প্রথমত দেশীয়দের সহিত ব্যবধান দৃঢ়তর, দ্বিতীয়ত নিজেদের মধ্যে বন্ধন ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। কাজকর্ম কোনোমতে সারিয়া ফেলিয়া আপনাদের সেই মণ্ডলীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার প্রলোভন স্বাভাবিক। সেই মণ্ডলীর সহিত অবশিষ্ট ভারতবর্ষের প্রভেদ ইংরেজের কাছে অত্যন্ত অধিক এবং অরুচিকর।

এই কারণে ভারতবর্ষের সহিত ইংরেজের সম্পর্ক উত্তরোত্তর তেলে-জলের মতো হইতেছে। এবং নিজেরাই আপনাদের সুখসান্ত্বনা আরামের একমাত্র উপায় হওয়াতে পরস্পরের নিকট পরস্পরের গৌরব অতিশয় বাড়িয়া উঠিতেছে।

এরূপ কুটুম্বিতা যখন স্বাভাবিক তখন ইহার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিবার জো নাই। আমরা কেবল, সরকারি ও বেসরকারি ইংরেজ কেমন করিয়া একাকার হইয়া আসিতেছে তাহার কারণ নির্ণয় করিতেছি মাত্র।

এখন, যে-কোনো বিধান বা রাজনীতি ভারতবর্ষীয় ইংরেজ-সাধারণের অপ্রিয় তাহাতে হাত দিতে গেলেই সামাজিক চঞ্চলতাটা অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে। টেনিস-কোর্ট, নৃত্যশালা, শিকার-পার্টি, রঙ্গমঞ্চ, সংগীতসভায় স্বসম্প্রদায়ের মতামতকে সর্বদা ঠেলিয়া চলা অসামান্য বলশালী লোকের কর্ম। তর্কদ্বন্দ্বে বা কর্মক্ষেত্রে মতবিরোধ অনেক সময় স্বমতরক্ষার উত্তেজনাস্বরূপ হয়,—কিন্তু খেলায় আমোদে আহারে বিহারে নারীকণ্ঠে বা স্ত্রীকটাক্ষে অনুক্ত এবং অর্ধোক্ত মতামতগুলি অত্যন্ত দুর্ধর্ষ।

তা ছাড়া যে শাসনকর্তা রাজোচিত ঔদার্যের সহিত আমাদের কথায় কর্ণপাত করিতে নারাজ না হন, ইংরেজ-মহলে তাঁহার প্রতি একটা অত্যন্ত কঠিন অপবাদ প্রচার হয়। বলে যে, তিনি ভারতবর্ষীয় আন্দোলনকারীদের দ্বারা চালিত হইতেছেন। ইংরেজের পক্ষে এমন দুর্বলতা আর কী হইতে পারে।

কিন্তু অপবাদকারীরা এ-কথা ভুলিয়া যায় যে, দুর্বলের কথায় কান দেওয়া দুর্বলতার ঠিক বিপরীত। তাহাই সবলের লক্ষণ। আজকাল শাসনকর্তাদের পক্ষে শক্ত হইয়াছে ইংরেজ-সমাজের দ্বারা চালিত না হওয়া; তাহাই তাঁহাদের পক্ষে দুর্বলতা। পাছে এমন কথা উঠে যে, কনগ্রেসের দলবদ্ধ কাতরতায় ভুলিল, সেই মনে করিয়া কোনো উদারনীতি প্রবর্তনে দ্বিধা বোধ করা ইহাই দুর্বলতা; ইংরেজ পত্রসম্পাদকের সহিত রাজসিংহাসন ভাগাভাগি করিয়া লওয়া, ইহাই দুর্বলতা। এখনকার ভারত-শাসনব্যাপার ভারতবর্ষীয় ইংরেজের সামাজিকতাজালে আপাদমস্তক জড়িত এবং সেইজন্যই দুর্বল। সেইজন্য প্রেমনীতি-ক্ষমানীতির উপরে ভারতসাম্রাজ্যকে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা যে কেবল রহিত হইতেছে তাহা নহে তাহা প্রকাশ্যভাবে উপেক্ষিত অবজ্ঞাত উপহসিত হইতেছে। সর্বপ্রকার বিচারবিবেকবিধান লঙ্ঘন করিয়া আকস্মিক জবরদস্তি দ্বারা দুঃখিত প্রজাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেওয়াই প্রবলের ধর্ম এবং ক্ষমা, ধৈর্য, অবিচলিত অপক্ষপাত, অথবা দুর্বলের প্রতি প্রজার প্রতি নিরুপায়ের প্রতি পক্ষপাত দুর্বলের লক্ষণ বলিয়া প্রতিদিন কীর্তিত হইতেছে।

১৩০৫

৫

বরিশাল হইতে দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় কনগ্রেস সম্বন্ধে একটি আলোচনাপত্র আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব।

আমরা জানি ইংলণ্ডে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য অনেক সভা আছে। এবং সময়ে সময়ে "কর্ন ল" প্রভৃতি বিশেষ বিধি লইয়া ইংলণ্ডের অনেক উদ্যমশীল মহাত্মা অশ্রান্ত অধ্যবসায়ের সহিত স্বদেশকে স্বমতে দীক্ষিত করিয়াছেন।

তাঁহাদের উৎসাহ ও অধ্যবসায় বারংবার বাধা সত্ত্বেও নিরস্ত হয় না, এবং আমাদেরই বা অল্প বিঘ্নে কেন হয়? অবশ্য, উদ্যমশীলতায় তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সে একটা কারণ; কিন্তু যথার্থ কারণ, তাঁহারা আশালতার বীজ নিজের জমিতে বপন করিতেছেন, আকাশকুসুমপ্রত্যাশী হতভাগ্য আমাদের মতো বাতাসে উড়াইয়া দিতেছেন না।

গবর্মেণ্টের সহিত তাঁহাদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তাঁহাদের হৃৎপিণ্ড হইতেই রক্ত সঞ্চালিত হইয়া গবর্মেণ্টের হাত-পাকে কার্যক্ষম করিয়া তুলে। তাঁহাদের পক্ষে দেশকে বিশেষ মতে দীক্ষিত করা এবং সেই মতের দ্বারা গবর্মেণ্টকে চালিত করা একই কথা।

কিন্তু আমাদের কনগ্রেস গবর্মেণ্টের দ্বারের বাহিরে। তাহার কেবল ভিক্ষার অধিকার আছে। সেই ভিক্ষার মধ্যে এমন আশার মহত্ত্ব বা কর্মের গৌরব কিছুই নাই যাহাতে দেশকে দীর্ঘকাল উৎসাহিত করিয়া রাখিতে পারে।

আমরা নিশ্চয় জানি অনুগ্রহস্বরূপ আজ যাহা লাভ করিব, কাল তাহা হারাইবার কোনো বাধা নাই। দয়া করিয়া আজ যদি আমাদিগকে কেহ স্বায়ত্তশাসন দিলেন ভাবিলাম এক পরমার্থ লাভ হইল, আবার কর্তাদের মধ্যে কাল যদি সেটাকে কেহ পঙ্গু করিয়া দেন তবে আমরা কেবল বক্ষে করাঘাত করিয়া হাহাকার করিয়া মরিব।

আমাদের অদৃষ্টে ভারতের রাজশক্তি অনেকটা পদ্মানদীর মতো। আজ পাঁচ বৎসরে আমাদের কপালে যেখানে পলি পড়িল পরের পাঁচ বৎসরে সেখানে বালি পড়িতে এবং তাহার পরের পাঁচ বৎসরে ভাঙন ধরিতে কোনো বাধা নাই। এই চরের উপর যদি আমরা কনগ্রেসের ভিত্তি স্থাপন করিয়া তাহার স্থায়িত্ব প্রত্যাশা করি তবে আমরা মূঢ়। কনগ্রেস যদি নিজ শক্তিতে দেশের স্থায়ী উন্নতি সাধন করিতে পারে, তবেই সে দেশের হৃদয়ের মধ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, কিন্তু যদি বিচিত্র মেজাজের প্রভুপরম্পরার

নিকট কনস্টিট্যুশনাল লাঙ্গুল আন্দোলনকেই সে আপন কর্তব্য জ্ঞান করে, তবে অন্ত্য রুটির টুকরা এবং কল্য লাঠির গুঁতা খাইয়া পথের প্রান্তে পঞ্চত্বলাভই তাহার অদৃষ্টে আছে।

এইরূপ ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে অনেক নীচত্ব আপনি আসিয়া পড়ে। স্বাধীনক্ষমতাদৃপ্ত প্রভুর মন জোগাইতে গেলেই কপট নম্রতা, মিথ্যা আস্ফালন, সত্য গোপন এবং আত্মপ্রবঞ্চনা, দুর্বলপক্ষ স্বতই, অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতসারেও, অবলম্বন করিয়া বসে। ইহাতে ক্রমশ যে হীনতা আসে ভিক্ষালব্ধ অধিকারখণ্ডে তাহা পূরণ করিতে পারে না।

এইজন্য আমরা অনেক সময়ে ভাবিয়াছি গবর্মেণ্ট অবজ্ঞাসহকারে কনগ্রেসের আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া আমাদিগকে শাপে বর দিতেছেন। আমাদিগকে যথার্থ পথে প্রেরণ করিতেছেন। সে-পথ আত্মশক্তির পথ। ভিক্ষা যদি পূরণ করিতেন তবে আমাদিগকে কঠিন কর্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া সহজ দেশহিতৈষিতার সুকোমল হীনতাপঙ্কের মধ্যে, ভিত্তিহীন আত্মশ্লাঘা, অমূলক কৃত্রিম উন্নতি, এবং অনধিকারলব্ধ আরামনিদ্রার রসাতলে লইয়া ফেলিতেন।

এ-কথা আমরা অন্তরের মধ্যে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এতদিন কী করিলাম, ইহাতে ফল কী হইতেছে; এতকাল যাহা বর্ষে বর্ষে প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি সবই যদি ইংরেজ-রাজ আমাদের জীর্ণ আঁচল পূর্ণ করিয়া দান করেন তবু কি আমরা যথার্থ বড়ো হইব, অন্তরের মধ্যে সার্থকতা অনুভব করিব? এই সমস্ত প্রশ্ন এবং এই সকল সংশয় বর্ষে বর্ষে আমাদের উৎসাহ নির্বাণ করিয়া আনিতেছে।

কনগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনেই আমাদিগকে দেশের হিতানুষ্ঠানে খানিকটা দূর করিয়া অগ্রসর হওয়া চাই। চাকা যে কেবলমাত্র তেল ও ঠেলার দ্বারা চলে তাহা নহে নিজের গতিবেগও তাহাকে চালনা করে। সেইরূপ, কার্যচক্র লোকের আকর্ষণে যেমন চলে নিজের কর্মগতিতেও তেমনি বেগ প্রাপ্ত হয়,—কাজের দ্বারা কাজ অগ্রসর হয়।

কিন্তু কাজের ভার যখন পরের উপর, কেবল প্রার্থনার অধিকার আমাদের—এবং সেই পরও যখন প্রতিকূল, তখন, কিছু যে কাজ হইতেছে তাহা অনুভব করিব কেমন করিয়া। এই লক্ষ্মীছাড়া ভিক্ষাকার্যে আমাদের উৎসাহ কিসে সজীব রাখিবে।

সমালোচ্য পত্রখানির এক জায়গায় আভাস আছে যে নূতনত্বের হ্রাস হওয়াতে আমাদের উৎসাহ ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যেমন বিজ্ঞানের নব নব

আবিষ্কারের সঙ্গে জগতের রহস্য অধিকতর প্রসারিত হইয়া যায় তেমনি কাজ যত সম্পন্ন হয় উদ্যমের নূতনত্ব ততই বাড়িতে থাকে। কিন্তু যেখানে কাজ নাই কেবলই আয়োজন সেখানে উৎসাহের নবীনতা কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করা অসাধ্য। ভিক্ষাচর্যা যতই নৈপুণ্যসহকারে নব নব কৌশলে নিষ্পন্ন হউক তাহাকে কাজ বলিয়া গণ্য করিতে পারি না।

প্রতি বৎসর সমস্ত ভারতবর্ষ একত্র হইয়া অন্তত একটা কিছু কাজ আমরা নিজেরা যদি করিতে পারি, তবে সেই কৃতকার্যতার উৎসাহে পরবৎসরের কনগ্রেস আপনি সজীব হইয়া উঠিবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা কাজের উল্লেখ করিতে পারি। বোম্বাইয়ের পার্সি মহাত্মা শ্রীযুক্ত টাটা ভারতবর্ষে যে বিজ্ঞানপরীক্ষাশালার জন্য প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন তাহার সহিত সমস্ত ভারতের যোগসাধন করা কেবল কনগ্রেসের ন্যায় কোনো বিশ্বভারত-সম্মিলনীসভার দ্বারাই সাধ্য।

উক্ত পরীক্ষাশালা কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত টাটার অর্থসাহায্য দ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব প্রদেশ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া যদি টাটাসাহেবের এই প্রস্তাবটিকে প্রতিষ্ঠা দান করিতে পারেন তবে কনগ্রেসের জন্ম সার্থক হয়।

এইরূপ শিল্প বাণিজ্য বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি সর্ববিষয়েই আমাদের সুগভীর দৈন্য আমাদের দেশের লোকের মুখ তাকাইয়া আছে। সমস্ত ভারতবর্ষ একত্র হইয়া তিনটে দিনের একটা দিনও সে-কথার কোনো উল্লেখ হয় না,—এমন মহৎ সুযোগ কেবল প্রতিকূল রাজশক্তির রুদ্ধ লৌহদ্বারের উপর মাথা কুটিয়াই ফাটিয়া যায়, ইহাতে আমাদের আশা ও উৎসাহের কারণ কী আছে জানি না।

ফ্রান্স জর্মানি ইটালি প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশসকল স্বরাজ্যের বাণিজ্য-উন্নতি সাধনের জন্য যে-সকল শিল্পবিদ্যালয় বাণিজ্যবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিতেছেন তাহা যদি সে-সকল দেশের পক্ষেও অত্যাবশ্যক হয় তবে আমাদের দেশে তাহার যে কিরূপ প্রয়োজন, বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের এ অভাব কে পূরণ করিবে? রাজা যদি নাই করে তবে কি আমরা বসিয়া থাকিব এবং আবেদন করিব?

আমাদের রাজা বিদেশী; তাঁহারা যে রাজকর সংগ্রহ করেন তাহা মাহিনাপত্র, পেনশন, কম্পেনসেশন, যুদ্ধবিগ্রহ, শৈলবিহার প্রভৃতিতে অনেকটা শুষিয়া যায়। সে-সমস্ত বিস্তর বাজেখরচ খাটো করিয়া দেশের ধন দেশের স্থায়ী হিতসাধনে ব্যয় করিবার জন্য কনগ্রেস বহুবৎসর চীৎকার করিলেও রাজার কিরূপ মর্জি হইবে তাহা কেহই বলিতে

পারে না। সেই অনিশ্চিত আশ্বাসে সুদীর্ঘ কাল বক্তৃতাদি না করিয়া আমরা যদি সমস্ত ভারতের সমবেত চেষ্টায় একটা উপযুক্ত শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারি তবে তাহাতেই কনগ্রেসের গৌরব বাড়িবে। বিদেশী রাজা নানাকারণে অনেক কাজ করিতে পারে না, স্বদেশী কনগ্রেস সেই কাজগুলি সম্পন্ন করুক। আমাদের রাজা যাহা পারে না বা করে না, কনগ্রেস তাহাই নিজের সাধ্যমত করিবে ইহাই তাহার ব্রত হউক। বিদেশী তো আমাদের অনেক করিয়াছে এখন স্বদেশী কী করিতে পারে তাহাই দেখাইবার সময় আসিয়াছে,—বৎসর বৎসর এখন আর সেই অভ্যস্ত পুরাতন ভিক্ষার বুলি হতাশ্বাস-কণ্ঠে পরের ভাষায় পরের দ্বারে ঘোষণা করিয়া লেশমাত্র সুখ হয় না।

যেমন আত্মীয়ের মৃত্যুদর্শনে আমাদের মনে একটা সুগভীর বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং সেই বৈরাগ্য আমাদিগকে ক্ষণকালের জন্যও মোহবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়— সম্প্রতি আমাদের মনে সেইরূপ একটা রাজনৈতিক বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। মহামারী দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে আমরা যখন অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলাম সেই সময় হঠাৎ আমাদের গবর্মেন্টের যেরূপ চেহারা বাহির হইয়াছিল তাহাতে বুঝিয়াছিলাম আমরা তাঁহাদের আপনার নহি। এবং তৎপূর্বে আমাদের একটা ধারণা ছিল যে, রাজ্যের বিধিব্যবস্থা সমস্তই পাকা, কিন্তু হঠাৎ যখন দেখিলাম তাহাও দ্বিধাবিদীর্ণ হইল, এবং তাহার মধ্যে দুই নাটু-ভ্রাতা কোথায় তলাইয়া গেলেন, তখন রাজবিধানের প্রতি আমাদের যে একটা অটল শ্রদ্ধা ও নির্ভর এতদিন লালিত হইয়া উঠিতেছিল তাহার অপঘাতমৃত্যু হইল। সেই সময়ে ভারতবর্ষের আদ্যোপান্তে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের মনে একটা সুগভীর রাজনৈতিক বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল, মোহ ছুটিয়াছিল, বুঝিয়াছিলাম নিজের চেষ্টায় যতটুকু হয় তাহারই উপর যথার্থ স্থায়ী নির্ভর।

এই বৈরাগ্য এই চৈতন্য পরম হিতকর। ইহাতে আমাদের যথার্থ অবস্থা আমরা বুঝিতে পারি এবং আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত চেষ্টা নিজের দিকে ফিরিয়া আসে। ভিক্ষাবৃত্তির অনিশ্চিত আশ্বাসের প্রতি একান্ত ধিক্কার জন্মে। কিন্তু সেদিনের কঠিন শিক্ষা আমরা এই অল্পকালের মধ্যেই যেন ভুলিতে বসিয়াছি। কিন্তু সে-শিক্ষা ভুলিবার নয়; অন্তত দেশের দুই-চার জনের মনেও তাহা মুদ্রিত থাকিবে; এবং সেই শিক্ষা কনগ্রেস ও কনফারেন্সকে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে এই ধিক্কৃত ভিক্ষাবৃত্তির অনন্ত লাঞ্ছনার পথ হইতে স্বচেষ্টায় স্বকার্যসাধনের দিকে নিঃসন্দেহ ফিরাইয়া আনিবে। তাহা যদি না আনিতে পারে তবে একদা এই কনগ্রেসকে লজ্জা, নৈরাশ্য ও অপমৃত্যুর হাত হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

১৩০৫

মুখুজ্যে বনাম বাঁড়ুজ্যে

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি এক সম্প্রদায় জমিদারের মুখপাত্র হইয়া কনগ্রেসপক্ষীয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশপূর্বক আক্ষেপ করিয়াছেন যে, দেশের যাহারা "ন্যাচারাল লীডার" বা স্বাভাবিক অধিনেতা বা প্রকৃত মোড়ল, নানা অস্বাভাবিক কারণে ক্ষমতা তাহাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে।

রাজত্ব কাহার হইবে ইহা লইয়া অনেক দেশে অনেক লড়াই হইয়া গিয়াছে। কুরুপাণ্ডবের মধ্যেও একটা খুব বড়ো রকম তর্ক হইয়াছিল যে, রাজ্যে কাহার স্বাভাবিক অধিকার। উভয় পক্ষ হইতে যে-সকল সূক্ষ্ম এবং স্থূল, তীক্ষ্ণ এবং গুরুতর মারাত্মক যুক্তি প্রয়োগ হইয়াছিল মহাভারতে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

দাদা ধৃতরাষ্ট্র বড়ো বটে কিন্তু তিনি অন্ধ, সেইজন্য কনিষ্ঠবংশে রাজ্যের ভার পড়িয়াছিল। আমাদের জমিদার-কৌরবপক্ষীয়ের যদি স্বাভাবিক অন্ধতা না থাকিত তবে কনিষ্ঠ কনগ্রেস-পাণ্ডবগণের নেতৃত্ব-সিংহাসনে দাবি থাকিত না।

যাহা হউক, গৃহবিবাদে মঙ্গল নাই। কতকটা সুখের বিষয় এই যে, এ-বিবাদ একটা মৌখিক অভিনয়মাত্র। মুখুজ্যেমহাশয় মনে মনে বেশ জানেন যে, বাঁড়ুজ্যে-মহাশয় কম লোক নহেন কিন্তু সরকারের কাছে সে-কথা বলিয়া সুবিধা নাই। তাঁহাদের বলিতে হয়, হুজুরেরা যে কনগ্রেসকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না আমাদেরও ঠিক সেই দশা।

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, গান্ধারী সেই আক্ষেপে নিজের চোখে কাপড় বাঁধিতেন, কারণ তিনি সাধ্বী ছিলেন। গবর্মেন্ট যদি কাহারও প্রতি অন্ধ হন, তবে মুখুজ্যে মহাশয়ের কর্তব্য চোখে কাপড় বাঁধা, কারণ তাঁহারা খয়ের খাঁ।

কেবল রাজভক্তি নহে, ইহার মধ্যে একটু পাকা চালও আছে। উপরওআলা রাজপুরুষেরা আজকাল যখন স্পষ্টত নূতন জনসভাসকলের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন তখন এ-কথা বলিবার সুযোগ হইয়াছে যে, সরকার যদি মুখুজ্যেমহাশয়দিগকে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া দেন তাহা হইলে বাঁড়ুজ্যেমহাশয়রা আর এত বাড়াবাড়ি করিতে পারেন না। আমরা স্বভাবতই বড়োলোক, তোমরাও আমাদিগকে বড়ো করিয়া রাখো, কনগ্রেস আপনি ছোটো হইয়া যাইবে। আমরা স্ফীত আছি বটে কিন্তু আরও স্ফীত হইতে পারি তোমরা আর-একটু ফুঁ দাও যদি। তাহা হইলে ওই চাকরিবঞ্চিত নৈরাশ্যপীড়িত কৃশ কনগ্রেসটাকে আরও অনেকটা ক্ষীণ দেখিতে হয়।

কনগ্রেসকে নির্বাসনে দিয়া নিজেরা পরিপুষ্ট হইবার জন্য জমিদার-সমাজ এ একটা দ্যূতক্রীড়ার স্থচনা করিয়াছেন। তাঁহারা সময় বুঝিয়া যে অক্ষ ফেলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অকপট নহে ইহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য। এইবার পৌরাণিক তুলনাটাকে খতম করিয়া দিয়া প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করি।

প্রশ্ন এই যে আমাদের দেশের জনসাধারণের স্বাভাবিক অধিনেতা কে? উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, "লীডার" ইংরেজি শব্দ যদিচ আমাদের অভ্যস্ত এবং তাহার বাংলা অনুবাদও সুকঠিন নহে, এবং সৈন্যগণের নেতা, ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপে নেতৃত্বের ভাব আমাদের নিকট পরিচিত বলিয়া জনসাধারণের নেতা শব্দটা আমাদের কানে খট করিয়া বাজে না কিন্তু জিনিসটা এখানকার নহে। এই নেতৃত্বের কোনো ঐতিহাসিক নজির নাই সুতরাং কাহার পক্ষে ইহা স্বাভাবিক, অর্থাৎ চিরপ্রথাসংগত, তাহা হঠাৎ বলা যায় না।

প্রথম কথা এই যে, জনসাধারণ বলিয়া একটা পদার্থ এ-দেশে ছিল না। গ্রাম ছিল, পল্লী ছিল, পরিবার ছিল, পঞ্চায়ত ছিল, মোড়ল ছিল, কর্তা ছিল, কিন্তু জনসাধারণ ছিল না এবং তাহার অধিনেতা আরও দুর্লভ ছিল।

এক্ষণে, ইংরেজের দৃষ্টান্ত, শিক্ষা এবং একেশ্বর রাজত্বের বিপুল পক্ষপুটের তা লাগিয়া জনসাধারণ যদি ফুটিয়া উঠিবার উপক্রম করে, সে আপনার মাথা আপনি লইয়া আসিবে, গবর্মেণ্ট জোর করিয়া মুখুজ্যেমশায়দিগকে তাহার সহিত যোজনা করিয়া দিলে আর-কিছু না হউক তাহা তাঁহাদের কথিতমতো ন্যাচারাল অর্থাৎ স্বাভাবিক হইবে না।

এমন কি জনসাধারণ নামক বিরাট বিহঙ্গমের মুণ্ডটাই সব-প্রথমে চঞ্চুদ্বারা ঠুকিয়া ঠুকিয়া ডিম্ব বিদারণ করিয়া আলোকপথে দেখা দেয়, পুচ্ছ-অংশ পরে বাহির হইয়া পড়ে। আমরা এখন সেই অবস্থায় আছি। জনসাধারণের মুণ্ড যাঁহারা তাঁহারাই সম্প্রতি বহুকলরবসহকারে প্রকাশমান, তাঁহাদেরই চঞ্চুযুগল মুক্তিপথের কঠিন আবরণ অপসারণে প্রবৃত্ত, অবশিষ্ট অংশ এখনও বাধাদ্বারা গুপ্ত। মুখুজ্যেমহাশয়েরা যে সেই পুচ্ছের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছেন তাহা না হইতে পারে। তাঁহারা জনসাধারণ নহেন, তাঁহারা বিশিষ্টসাধারণ, মাটিতে তাঁহাদের বাসা নহে, উচ্চ শাখায় তাঁহাদের নীড়—কিন্তু তাঁহারা যতই মহৎ হউন না কেন জনসাধারণের মুখপাত্র নহেন।

অবশ্য এ-কথা স্বীকার করিতেই হয় যাঁহার হস্তে ক্ষমতা অধিক অনেক লোক তাঁহার অনুবর্তী হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এবং দেশাচারে ক্ষমতা এমনি খণ্ড খণ্ড বিভাগ করিয়া দিয়াছে যে, যতবড়োই লোক হউন তাঁহার ক্ষমতা পদে পদে সীমাবদ্ধ। আমাদের দেশে জমিদার জমিদারমাত্র, তিনি জুলুম করিয়া

খাজনা আদায় করিতে পারেন কিন্তু সমাজে তাঁহার অধিক অধিকার নাই। তাঁহারই একজন দীন প্রজা সমাজে হয়তো তাঁহা অপেক্ষা প্রতাপশালী। এইজন্য জাতি ও সমাজ লইয়া রাজা-মহারাজাকেও হিমসিম খাইতে হয়।

ইংলণ্ডে ইহা সম্ভবপর নহে। একজন ইংরেজ বড়ো জমিদার তাঁহার কোনো দীন প্রজা অপেক্ষা সমাজে খাটো হইতে পারেন না। তাঁহার ধনসম্পদ ও ক্ষমতা, সমাজে তাঁহাকে উচ্চাসন দেয়। তাঁহার অধীনস্থ কোনো ফার্মার (বাংলার জোতদারের সমতুল্য ব্যক্তি) সোসাইটিতে তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব সে-স্থলে একজন ইংরেজ বড়ো জমিদার প্রজাদের নিকট হইতে সর্বতোভাবে মর্যাদালাভ করিতে পারেন।

কেবল তাহাই নহে। ইংলণ্ডে উপাধিধারী প্রাচীন জমিদারবংশ আছে। শুনা যায় এই সকল প্রাচীন উপাধিধারীর প্রতি মুগ্ধভাব ইংরেজ জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। তাহার কারণ, এই সকল লর্ড প্রভৃতি উপাধির সহিত অধিনায়কতার ভাব দেশের লোকের মনে বদ্ধমূল। পূর্ব-ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ শান্তিস্থাপন এবং সর্বপ্রকার সাধারণকার্যের নেতৃত্বে ইঁহারাই এককালে প্রধান ছিলেন। এখন যদিচ ইঁহাদের কার্যকারিতা হ্রাস হইয়া ইঁহারা অনেকটা অলংকারের কাজ করিতেছেন তথাপি কাল-পরম্পরাগত সেই সম্মানপ্রবাহ তাঁহাদিগকে সমাজের অগ্রভাগে বহন করিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের দেশে তাহার অনুরূপ আদর্শ ব্রাহ্মণমণ্ডলী। কিন্তু ভ্রান্ত উপমা খাটাইয়া আমাদের জমিদারবর্গ আপনাদিগকে ইংলণ্ডের সেই লর্ডশ্রেণীর সহিত তুলনীয় জ্ঞান করেন, এবং তাঁহাদের ভাবভঙ্গি অনুকরণেরও চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, আমরা অ্যারিস্টক্র্যাটস।

অ্যারিস্টক্র্যাট শব্দের বাংলাই পাওয়া যায় না। প্রাচীন "অভিজাত" শব্দ বাংলাদেশে অপরিচিত। "কুলীন" শব্দ সর্বজনবিদিত। কিন্তু কৌলীন্য বিলাতিভাবের অ্যারিস্টক্র্যাসি নহে।

আমাদের দেশে ধনের সম্মান য়ুরোপের ন্যায় তেমন অধিক নহে। এমন কি, যে-সকল জাতির মধ্যে ধনী মহাজন বিস্তর আছে তাহারা সমাজে উচ্চস্থান লাভ করিতে পারে নাই।

আমাদের দেশে রাজা-রায়বাহাদুরদের দেখিয়াও লোকে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়ে না। তাহার একটা কারণ এই যে, এই সকল পদবীধারী উপাধিধারিগণ সমাজে এক ইঞ্চি উপরে উঠিতে পারেন না। বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে যাহাদের সহিত তাঁহাদের আদানপ্রদান চলে তাহাদের কেহ হয়তো যাত্রার দলে বেহালা বাজায়,

এমন কি, কেহ হয়তো কনগ্রেসের উপাধিহীন প্রতিনিধি। ইংলণ্ডীয় সমাজে যাহারা উপরকার দশজনা বলিয়া বিখ্যাত নিচেকার দশলক্ষের সহিত তাঁহাদের ব্যবধান দুর্গম—এই জন্য সেই দশলক্ষের ভক্তি সেই রহস্যাবৃত দশজনার দিকে ধাবিত হইতে থাকে। আমাদের দেশে গবর্মেন্টের খেতাব দশলক্ষের সন্নিধান হইতে সেই দশজনাকে কাঁটাগাছের মতো বেড়িয়া রাখিতে পারে নাই। বৈবাহিক মহাশয়েরা আভিজাত্যের ব্যূহ চারিদিক হইতেই ভেদ করিয়া দেন।

আবার রাজা-রায়বাহাদুরবংশের শাখাপ্রশাখা আত্মীয়কুটুম্ব ভাগিনেয়-ভ্রাতুষ্পুত্র খুড়তুত-মাসতুত ভাইরা মিলিয়া উক্ত বংশকে বংশমর্যাদার বহুদূর বাহিরে ব্যাপ্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। বটের উচ্চশাখা যেমন তাহার নিম্নগামী অসংখ্য ঝোরাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না, যতই অদ্ভুত এবং যতই গুরুতর হউক তাহাদিগকে রাত্রিদিন ঘনিষ্ঠভাবে বহন করিতে থাকে তেমনি আমাদের দেশে নিম্নগামী দূরতম এবং দীনতম কুটুম্বস্বজনকেও ত্যাগ করিবার জো নাই;—যদি বা তাহাদিগকে অন্ন হইতে বঞ্চিত করা যায় তথাপি সর্বপ্রকার ক্রিয়াকর্মে লৌকিকাচারে তাহাদের স্পর্শক্রামকতা হইতে আপন আভিজাত্যকে বাঁচাইয়া চলিবার কোনো উপায় নাই। এইরূপে উচ্চ পদবী বাহিরকে ভিতর হইতে এবং ভিতরকে বাহির হইতে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। সাধারণ এবং অসাধারণের মাঝখানে মারাগণ্ডি কিছুতেই টিকে না।

আমাদের দেশে কঠিন জাতিভেদ যেমন একদিকে ভিন্ন বর্ণের মধ্যে অলঙ্ঘ্য সামাজিক ব্যবধান স্থাপন করিয়াছে তেমনি অন্যদিকে ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, রাজটিকালাঞ্ছিত ও খেতাববঞ্চিতদিগকে সমান করিয়া রাখিয়াছে।

প্রাচীন বংশের একটা মোহ আছে বটে। কিন্তু বর্তমান ধনী জমিদারদের মধ্যে নাটোর প্রভৃতি দুই-এক ঘর ছাড়া প্রাচীন বংশ নাই বলিলেই হয়। আমাদের দেশে যেরূপ সম্পত্তিবিভাগ তাহাতে ধনগৌরবকে প্রাচীন করিয়া তোলা একপ্রকার অসাধ্য; দায়ভাগের শতঘ্নীপ্রহারে সে দেখিতে দেখিতে শতধা বিভক্ত হইয়া অকালে পঞ্চত্ব এমন কি, পঞ্চাধিকত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই তো গেল গৌরবের কথা। কিন্তু আমাদের দেশে ধনের গৌরব অদ্যাপি যথেষ্ট জাগে নাই বটে তবু তাহার প্রয়োজন যথেষ্ট আছে এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। অতএব যাঁহাদের হাতে ধন আছে তাঁহারা প্রয়োজনসাধন করিয়া সাধারণের আনুগত্য আকর্ষণ করিতে পারেন। তাঁহাদের পক্ষে নেতা হইবার সেই একটা সোনার রাস্তা আছে।

কিন্তু আমাদের অভিজাতগণ যাহাকে রাজপথ জ্ঞান করেন তাহা রাজা হইবার পথ;—অন্য পথের শেষে দেশের কল্যাণ ও সাধারণের হৃদয় থাকিতে পারে কিন্তু

খেতাবের খনি নাই, এইজন্য সে-পথে বড়োলোকের জুড়িগাড়ি প্রায় দেখা যায় না। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা সকলের প্রতীত হইবে। সার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট হয়তো ভালো লোক এবং বড়োলোক, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁহা অপেক্ষা অনেক বেশি ভালো লোক এবং বড়োলোক, এবং সকলের বেশি, তিনি আমাদের স্বদেশী লোক। কিন্তু ক্রফ্‌ট সাহেব ভারত ছাড়িয়া স্বদেশে গিয়াছেন সেই শোকে বিহ্বল হইয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণে ধনিগণ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন, আর, বিদ্যাসাগর ইহসংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন দেশের ধনশালীরা কোনোপ্রকার চেষ্টা করিলেন না! ইঁহারা দেশের ন্যাচারাল লীডর! আমাদের স্বাভাবিক চালক! ইঁহারা কোন্‌দিকে আমাদিগকে চালনা করিবেন? আমাদের দেশের মহোচ্চ মহদাশয়দিগের দিকে নহে, ইংরেজ মেজো-সাহেব সেজোসাহেব ছোটোসাহেবের দিকে; আমাদের দীনহীন দেশের সহস্র অভাব মোচনের দিকে নহে, সাহেবের নিকুঞ্জবনে গড়ের বাদ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের দিকে? সাহেব রাজকর্মচারীরা বিলাতে চলিয়া গেলে দেশীয় ধনিগণ তাঁহাদের প্রতিমা স্থাপন করিবেন ইহাতে আমরা আপত্তি করি না, কিন্তু দেশীয় পূজ্যগণের জন্যও যদি সেই পরিমাণে কিছু ত্যাগস্বীকার করেন তবে দেশের নায়কত্বে তাঁহাদের কথঞ্চিৎ দাবি থাকে।

সেকালের ধনী জমিদারগণ নবাব-সরকারে প্রতিপত্তি ও পদবী লাভের জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেন ও কোনো চেষ্টা করিতেন কিনা তাহা আমরা ভালোরূপ জানি না। তখন নবাব-দরবারের প্রসন্নতা হইতে কেবল শূন্যগর্ভ খেতাব ফলিত না, তখন সম্মানের মধ্যে সৌভাগ্য এবং রাজপদের মধ্যে সম্পদ পূর্ণ থাকিত, অতএব তাহা লাভের জন্য অনেকেই চেষ্টা করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনকার যাহা সাধারণ হিতকার্য,— অর্থাৎ দিঘি খনন, মন্দির স্থাপন, বাঁধ নির্মাণ, এই সকলকেই তাঁহারা যথার্থ কীর্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন, খেতাবলাভকে নহে। দশের নিকট ধন্য হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের প্রবল ছিল। তখন এই সকল হিতকার্য রাজসম্মানের মূল্যস্বরূপ ছিল না,—ইহাতে সাধারণের সম্মান আকর্ষণ করিত। সেই সাধারণের সম্মানের প্রতি তাঁহাদের উপেক্ষা ছিল না। রানী ভবানী, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহারা তৎকালীন নবাবদত্ত বিশেষ অনুগ্রহের দ্বারা উজ্জ্বল নহেন, ইঁহারা বিচিত্র কীর্তিদ্বারা লোকসাধারণের হৃদয়ের মধ্যে আপন অক্ষয় মূর্তি স্থাপন করিয়াছেন। তখন জনগণের নিকট হইতে হিতকারী দেশপতিগণ যে খেতাব লাভ করিতেন, তাহা আধুনিক দেশী বিলাতি সর্বপ্রকার খেতাবের অপেক্ষা অনেক উচ্চ; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

আর্তানাম্ ইহ জন্তূনাম্ আর্তিচ্ছেদং করোতি যঃ
শঙ্খচক্রগদাহীনো দ্বিভুজঃ পরমেশ্বরঃ।

কীর্তিস্থাপনের দ্বারা লোকহিতসাধন অথবা সাধারণের নিকট খ্যাতিলাভ এখনকার ধনিগণের নিকট তেমন স্পৃহনীয় নহে।

আরব্য উপন্যাসে সিন্ধবাদের কাহিনীতে পড়া যায় যে, চুম্বকশৈলের আকর্ষণে দূর হইতে জাহাজের সমস্ত লোহার পেরেক ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিত, তেমনি আমাদের যে-সকল ধনী জমিদার আপন আপন ভূখণ্ডের মধ্যে দৃঢ়ভাবে নিহিত ছিলেন, দানধ্যান ক্রিয়াকলাপ এবং লোকহিতকর বিচিত্র স্থায়ী কীর্তিদ্বারা এই জীর্ণ দেশটাকে একপ্রকার জুড়িয়া রাখিয়া বহুলোকবহনকার্য সম্পন্ন করিতেছিলেন, প্রবল ইংরেজ রাজার সমুচ্চ চুম্বকশৈল অলক্ষ্যে অনায়াসে তাঁহাদিগকে দেশের লোকের নিকট হইতে ছিঁড়িয়া যেন একমাত্র নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে। সমস্ত পূজা-অর্চনা দান-দক্ষিণা সাহেবের অভিমুখে, সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি সম্মান-সমাদর সাহেবের হস্ত হইতে। সেকালে রাজার আকর্ষণ এবং স্বদেশী সাধারণের আকর্ষণ অন্তত সমান ছিল—নবাব-বাদশারা আমাদের ধনী জমিদারগণকে দেশের কাছ হইতে এমন করিয়া টানিয়া গ্রাস করিতে পারে নাই; কর্তব্য-অকর্তব্যের আদর্শ, স্তুতিনিন্দার চরম দণ্ড-পুরস্কার বিধান দেশের লোকের হাতে ছিল।

অতএব দেখা যাইতেছে, সেকালে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সর্বসাধারণের সহিত যে হিতানুষ্ঠানসূত্রে বদ্ধ ছিলেন একালে তাহাও নাই, আবার নিজেদের মধ্যে একটা অভিজাতমণ্ডলীবন্ধন করিয়া সম্প্রদায়গত মহত্ত্বকে অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষণ ও পোষণ, তাহারও সম্ভাবনা নাই। ইঁহারা নিজগৌরবেও উচ্চ নহেন, সর্বসাধারণের সহিত ঐক্য দ্বারাও বৃহৎ বলিষ্ঠ নহেন। ইঁহারা বিলাতের লর্ডদের ন্যায় স্বতন্ত্র নহেন, বিলাতের জননায়কদের ন্যায়ও প্রবল নহেন। ইঁহারা বনস্পতির ন্যায় বিচ্ছিন্ন বৃহৎ নহেন, ওষধির মত ব্যাপ্ত বিস্তৃতও নহেন; ইঁহারা কুষ্মাণ্ডলতার ন্যায় একমাত্র গবর্মেন্টের আশ্রয়যষ্টি বাহিয়া উন্নতির পথে চড়িতে চাহেন,—ভুলিয়া যান যে সেই সংকীর্ণ রাজদণ্ডবাহী উচ্চতা অপেক্ষা গুল্মসমাজের খর্বতা শ্রেয় এবং তৃণসমাজের নম্রতা শোভন।

পুরাকালের বড়ো জমিদারগণ রাস্তাঘাট করিয়া সাধারণের অভাব মোচন, যাত্রাগান প্রভৃতি উৎসবের দ্বারা সাধারণের আমোদ বিধান এবং গুণী, পণ্ডিত ও কবিদের প্রতিপালন দ্বারা দেশের শিল্পসাহিত্যের রক্ষণ ও পালন করিতেন। তাঁহারাই আমাদের দেশে দানশীলতার ও সমাজহিতৈষার উচ্চ আদর্শ জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শুভানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ত্যাগস্বীকারে পরাঙ্মুখতা যে লজ্জাকর তাহা তাঁহারাই দেশের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়াছিলেন।

বর্তমান জমিদারগণ যদি সেকালের দৃষ্টান্ত অনুসারে, কেবল রাজার মুখ না চাহিয়া,

খেতাবের লক্ষ্য ছাড়িয়া, জনহিতসাধন ও দেশের শিল্পসাহিত্যের রক্ষণপালনে সহায়তা করেন তবেই তাঁহাদের ক্ষমতার সার্থকতা হয় এবং গৌরব বাড়িয়া উঠে।

যখন আমাদের রাজা বিদেশী, এবং তাঁহাদের রুচি, ভাষা ও সাহিত্য স্বতন্ত্র তখন দেশী ভাষা ও সাহিত্যের অবহেলা অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা জীবিকাসংগ্রামে প্রবৃত্ত, বাংলা ভাষার দিকে তাকাইবার সময় তাঁহাদের নাই। সর্বত্রই দেশের ধনিগণ স্বদেশীয় তরুণ সাহিত্যের পালনকর্তা। আমাদের বিদেশী-শাসিত দেশে সাহিত্যের পক্ষে ধনীদের সহায়তা বিশেষ আবশ্যক।

কিন্তু মুখ্য জমিদারগণ, জমিদার সভার প্রধান প্রতিনিধিবর্গ, ইংরেজি শেখেন, ইংরেজি লেখেন, ইংরেজি বলেন। পিতাকেও চিঠি লিখিতে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন ইংলণ্ডের অভিজাতবর্গের মতো আমরা রক্ষণশীল, কিন্তু মাতৃভাষাকেও তাঁহারা রক্ষা করেন না। দেশের জনসাধারণের ন্যায় দেশের ভাষাও তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ নহে।

তাহার কারণ পূর্বেই বলিয়াছি,—এমন কিছুতে তাঁহাদের উৎসাহ নাই রাজার নিকট যাহার কোনোপ্রকার আদর না থাকে,—যাহা কেবলমাত্র দেশের।

দেশীয় রুচি এবং শিল্প এখনও কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাদের আদর পায় কিন্তু তাহাও ক্রমশ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বিলাতি রুচির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি পণ্য তাঁহাদের গৃহ হইতে দেশের শিল্পকে অবমাননা সহকারে নির্বাসিত করিয়া দিতেছে।

সংক্ষেপত, এ-দেশে পূর্বকালে জমিদার-সম্প্রদায়ের যে গৌরব ছিল তাহা খেতাব অবলম্বনে ছিল না,—তাহা দান, অর্চনা, কীর্তিস্থাপন, আর্তগণের আর্তিচ্ছেদ, দেশের শিল্পসাহিত্যের পালন-পোষণের উপর নির্ভর করিত। সেই মহৎ গৌরব এখনকার জমিদাররা প্রতিদিন হারাইতেছেন। দেশ যখন চাহিতেছে রুটি তাঁহারা দিতেছেন প্রস্তর,—বঙ্গভূমি তাহার জলকষ্ট, তাহার অন্নকষ্ট, তাহার শিল্পনাশ, তাহার বিদ্যাদৈন্য, তাহার রোগতাপ লইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে, আর তাঁহারা স্বদেশ-প্রত্যাগত সাহেব-রাজকর্মচারীদের পাষাণ-প্রতিমূর্তি গড়িয়া দিতেছেন।

সাহেবের জন্য তাঁহারা অনেক করেন কিন্তু সাহেবেরা চেষ্টা করিলেও তাঁহাদিগকে দেশীয় সাধারণের স্বাভাবিক অধিনেতা করিতে পারিবেন না। কারণ ইংরেজ রাজা অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে পারেন না। যদি তাঁহারা আপন পুরাতন উচ্চ-স্থান অধিকার করিতে চাহেন তবে গবর্মেন্ট-প্রাসাদের গম্বুজটার দিকে অহরহ ঊর্ধ্বমুখে না তাকাইয়া নিম্নে একবার দেশের দিকে সাধারণের দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে।

১৩০৫

অপরপক্ষের কথা

ভাদ্রমাসের ভারতীতে "মুখুজ্যে বনাম বাঁড়ুজ্যে" প্রবন্ধের লেখক বাঁড়ুজ্যেমশায়দের হইয়া যে ওকালতি করিয়াছেন, তাহা পক্ষপাতবিহীন নহে। ইংরেজ-প্রসাদবুভুক্ষু উপাধিভিক্ষুকদের পক্ষে আমি কোনো কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু লেখক অস্মৎপক্ষীয়দের প্রতি যে-সমস্ত গুণের আরোপ করিয়াছেন তাহার কোনো প্রমাণ দেন নাই।

এ-কথা সত্য হইতে পারে এখনকার জমিদারবর্গ রাজপুরুষদের অত্যন্ত "ন্যাওটো" হইয়া পড়িয়াছেন, দেশের লোকের দিকে তাঁহারা তাকান না। স্বদেশীয়ের নিকট হইতে খ্যাতিলাভের জন্য এবং স্বদেশের প্রতি স্বাভাবিক বদান্যতাবশত পুরাকালের জমিদারগণ যে-সকল কীর্তিকলাপ স্থাপন করিতেন, এখনকার জমিদারগণ তাহাতে উৎসাহ বোধ করেন না।

কেন করেন না? পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তাহার কতকটা হেতু দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজের প্রভাব আমাদের দেশে এত অধিক প্রবল হইয়াছে যে, তাহা সকল প্রভাবকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। দেশের লোককে আমরা গণ্য জ্ঞান করি না। দেশের লোকের কাছে প্রশংসা পাওয়ার কোনো স্বাদ নাই।

মুসলমানদের আমলে আমরা স্বদেশকে তুচ্ছ বোধ করিতাম না। কারণ, বিজেতারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও আমাদেরও নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা ছিল। অন্তত আমাদের উভয়ের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য ছিল না।

কিন্তু ইংরেজরাজার সঙ্গে আমাদের প্রভেদ সর্ববিষয়ে এত অত্যধিক, তাহাদের বুদ্ধিবল যন্ত্রতন্ত্র বিলাসবিভূতি সর্বদাই আমাদের পক্ষে এত দুরায়ত্ত বলিয়া বোধ হয় যে, অলক্ষিতভাবে আপনাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হ্রাস হইয়া আসিয়াছে।

যে অনিবার্য শ্রদ্ধার অভাবে ইংরেজ অনেক সময় আমাদের প্রতি সদ্‌বিচার করিতে পারে না, সেই শ্রদ্ধার অভাবে স্বদেশের লোকও আমাদের প্রতি বিমুখ হইয়াছে।

সেইজন্য আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত লোক এবং বিলাতফেরতরা সাধারণ লোকদের হইতে আপনাদিগকে যেন স্বতন্ত্রশ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখিতে ভালোবাসেন। বাহ্য বেশভূষা-আচারব্যবহারেও তাঁহারা আপনাদের পার্থক্য কিছু যেন অস্বাভাবিক আড়ম্বরের সহিত জাহির করিয়া রাখিতে চান।

কতকটা পার্থক্য যে আপনিই হইয়া পড়ে সে-কথা অস্বীকার করিবার জো নাই। ইংরেজি-শিক্ষিত এবং ইংরেজিতে অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে যে কেবল শিক্ষার তারতম্য

তাহা নহে শিক্ষার শ্রেণীভেদ বর্তমান। পরস্পরের বিশ্বাস, সংস্কার, রুচি এবং চিন্তা করিবার প্রণালী ভিন্নরকমের হইয়া যায়। এবং ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তি আপনাদিগকেই শিক্ষিত ও শ্রেষ্ঠ এবং অপরসাধারণকে অশিক্ষিত এবং পশ্চাদ্‌বর্তী না মনে করিয়া থাকিতে পারে না।

জ্ঞানস্পৃহা ও রসবোধ, বুদ্ধি এবং কল্পনা, সাহস ও বাহুবল, অধ্যবসায় ও আত্মসম্মানে য়ুরোপীয় জাতির যে এক মহোচ্চ আদর্শ ইংরেজি শিক্ষা আমাদের মনে জাজ্বল্যমান করিয়া তুলিতেছে তাহার যদি কোনো আকর্ষণ না থাকিবে তবে আমাদের শিক্ষাকে ধিক্‌!

সেই আকর্ষণ আমাদিগকে অনেক সময় ছদ্মবেশ এবং আত্মপ্রতারণায় লইয়া যায়। কেবল ইংরেজি শিখিয়াই আমরা যেন ইংরেজের মহত্ত্বকে কতকটা আপনার বলিয়া মনে করি। এবং যাহারা ইংরেজি শেখে নাই তাহাদিগকে কতকটা বাহিরের লোকের মতো করিয়া দেখি। ইংরেজের মহত্ত্ব যে ঐতিহাসিক, তাহা যে বংশপরম্পরাগত, কর্মগত, চরিত্রগত,—ইংরেজের ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান যে সেই ইতিহাস সেই চরিত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা যে শুদ্ধমাত্র স্কুলে অধ্যয়ন এবং পরীক্ষা পাস হইতে নহে ইহা আমরা চোখ বুজিয়া ভুলিতে ইচ্ছা করি। এবং ইংরেজের স্কুলে পড়িয়াছি বলিয়াই আমরা নিজেকে ইংরেজশ্রেণীয় জ্ঞান করি।

এইরূপ ইংরেজের টানে দেশ হইতে পৃথক হইয়া যাইবার যে ভাব আমাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে তাহা কোনো এক পক্ষের মধ্যে বদ্ধ নহে; তাহা নানা আকারে নানা দিক হইতে প্রকাশ পায়। মুখুজ্যেমশায় এবং বাঁড়ুজ্যেমশায় কেহই তাহা হইতে পরিত্রাণ পান নাই।

আজকাল জমিদারবর্গ ইংরেজের মুখ না তাকাইয়া উপাধির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া দেশহিতকর কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইতে চান না—দেশের লোকের স্তুতিনিন্দা তাঁহাদের কাছে এতই ক্ষুদ্র হইয়া গেছে।

তেমনি আমাদের দেশে যাঁহারা জননায়ক বলিয়া সর্বদা সভামঞ্চের উপরে আরোহণ করেন তাঁহাদেরও ভাবগতিক দেখিয়া আমাদের মনে আশ্বাস হয় না। বরঞ্চ আমাদের জমিদারদিগকে দেখিতে শুনিতে ঠিক আমাদের দেশের লোকের মতো, কিন্তু আমাদের জননায়কদের অনেকেই যে-দেশের মুরুব্বি বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার করেন সে-দেশকে আচারে ব্যবহারে জীবনযাত্রায় অহরহ অপমানিত করেন। ইংরেজরাহুকর্তৃক জমিদারদের যদি অর্ধগ্রাস হইয়া থাকে ইঁহাদের একেবারে পূর্ণগ্রাস।

জমিদারগণ দেশের জন্য যাহা করেন তাহা গবর্মেণ্টের মুখ তাকাইয়া, ইঁহারা যাহা করেন তাহাও ইংরেজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। তাহার ভাষা ইংরেজি, তাহার প্রণালী

ইংরেজি, তাহার প্রচার ইংরেজিতে। ইংরেজ-দৃষ্টির প্রবল আকর্ষণ হইতে ইহারা আপনা-দিগকে প্রাণ ধরিয়া বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন না।

এই স্থলে আমাদের কোনো বন্ধুর লেখা হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটি আমরা উদ্ধৃত করি।

> "স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বদেশপ্রীতির বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। দুই-তিন বার কনগ্রেস হইবার পর একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে কনগ্রেস সম্বন্ধে অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষ একটা মহাদেশ; এই মহাদেশের অন্তর্গত প্রত্যেক বিভাগের নেতাগণের যত্নে যদি সমস্ত দেশ মিলিত হইতে পারে তাহা হইলে এক মহাজাতির অভ্যুত্থান কল্পনা করিতে পারি বটে, কিন্তু বর্তমান কনগ্রেসওআলাদিগের দ্বারা যে তাহা সংসাধিত হইবে না তাহা নিশ্চয় বলা যায়। ইহাদের উত্তম-আলোচনা-আন্দোলনের ফলে চাই কি আমাদের অনেক অভাব-অবিচার দূর হইতে পারে কিন্তু রাজার নিকট সুবিচারপ্রাপ্তি কিংবা দুই-এক স্থলে রাজার সহিত সমান অধিকার প্রাপ্তিই যদি কনগ্রেসের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে কনগ্রেসের উদ্দেশ্য যে অতি ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ও অদূরদর্শী তাহা বলিতে বাধ্য হইব। কনগ্রেসওআলারা যদি সুসজ্জিত পট্টাবাসের পরিবর্তে হোগলার চালা, চেয়ারের পরিবর্তে কেবলমাত্র মাদুর, পেণ্টলুনের পরিবর্তে ধুতি, এবং ইংরেজির পরিবর্তে ভারতবর্ষীয় ভাষার ব্যবহার করিতে সংকুচিত হয়েন তাহা হইলে বর্তমান কনগ্রেস দ্বারা দেশের কোনো স্থায়ী উপকার সম্ভবপর নহে।'"

মুখে মুখে কথা বিকৃত হয় এবং ভূদেববাবু ঠিক কী-কথাটা বলিয়াছিলেন তাহা জানি না। আমাদের মনে উদ্দেশ্য যাহাই থাক্, তাহা যতই সংকীর্ণ হউক কিন্তু অনুষ্ঠান যদি বৃহৎ হয় তবে উদ্দেশ্যও আপনি বাড়িয়া চলে। সূচির মুখে সুতা পরাইতেও যদি বাতি জ্বালি তবে সেই বাতিতে সমস্ত ঘর আলোকিত হইয়া উঠে। তেমনি যে-উদ্দেশ্যেই কনগ্রেস হউক তাহা স্বভাবতই আপন উদ্দেশ্যকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গিয়া দেশের বৃহৎ মঙ্গলের অবতারণা করিবে ইহা আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। কিন্তু জনসভা ও জনসভাপতিদের মধ্যে ভূদেববাবু যে-সকল দুর্লক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাও আমাদের ভাবিবার কথা। আমরা মাছ ধরিতে চাই কিন্তু জলের সহিত সংস্রব রাখিতে চাই না,—আমরা দেশের হিত করিব কিন্তু দেশকে আমরা স্পর্শ করিব না!

দেশকে কেমন করিয়া স্পর্শ করিতে হয়? দেশের ভাষা বলিয়া, দেশের বস্ত্র পরিয়া। ইংরেজের প্রবল আদর্শ যদি মাতার ভাষা এবং ভ্রাতার বস্ত্র হইতে আমাদিগকে

দূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যায় তবে জননায়কের পদ গ্রহণ করিতে যাওয়া নিতান্তই অসংগত।

কিন্তু, ভিন্নভাষী ভারতকে এক করিবার জন্য কনগ্রেসের ভাষা ইংরেজি হওয়া উচিত এমন তর্ক যাঁহারা এ-স্থলে উত্থাপন করিবেন তাঁহারা আমার কথা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই। যেখানে ইংরেজি বলা দরকার সেখানে অবশ্য ইংরেজি বলিবে,—কিন্তু তোমার ভাষাটা কী? তোমার লেখাপড়া ধ্যানধারণা মন্ত্রতন্ত্র সমস্তই ইংরেজিতে কি না? জনসভার বাহিরে দেশের সহিত তুমি কিরূপ সংস্রব রাখিয়া চল? ইংরেজি ভাষায় যেটুকু কর্তব্য তাহা যেন সাধন করিলে কিন্তু দেশী ভাষায় যে-কর্তব্যপুঞ্জ পড়িয়া আছে, যাহা কাগজে রিপোর্টের জন্য নহে, যাহা সমুদ্রপারে উদ্বেলিত হইবার জন্য নহে, যাহার ফলাফল যাহার ধ্বনিপ্রতিধ্বনি শুদ্ধমাত্র আমাদের দেশী মণ্ডলীর মধ্যে বদ্ধ তাহাতে হাত দিতে তোমার মন উঠে? গবর্মেণ্টের সম্মান যাঁহাদের কর্তব্যবুদ্ধির আশ্রয়দণ্ড তাঁহাদিগকে তোমরা নিন্দা কর, কিন্তু ইংরেজ-করতালির এলাকার বাহিরে যাঁহাদের কর্তব্যবুদ্ধি পদনিক্ষেপ করে না তাঁহারাই কি প্রচুর সম্মানের অধিকারী!

কনগ্রেস যেমন সমস্ত ভারতবর্ষের মিলনসভা, কনফারেন্স তেমনি সমস্ত বাংলার। সেই সমগ্র বাংলার মিলনক্ষেত্রে বাঙালির কী অভাব বাঙালির কী কর্তব্য সেও যদি আমরা ইংরেজি ভাষায় বলিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারি তবে তাহা হইতে কী প্রমাণ হয়? এই প্রমাণ হয় যে, দেশকে যাঁহারা চালনা করিতে চাহেন তাঁহারা, হয় দেশী ভাষা জানেন না, নয় কর্তব্যের ক্ষতি করিয়াও ইংরেজি ভাষা ব্যবহার না করিলে তাঁহাদের অভিমান চরিতার্থ হয় না।

অতএব ভালো করিয়া দেখিলে দেখা যায় জমিদারের চরিত্রে যে-ঘুণ ঢুকিয়াছে আমাদের জননায়কদের চরিত্রেও সেই ঘুণ। ইংরেজের কৈশিকাকর্ষণ আমাদের দুই পক্ষেরই মস্তকের উপরে। ইংরেজকে বাদ দিলে আমাদের কর্তব্যে স্বাদ থাকে না, সম্মানে গৌরব থাকে না, বেশভূষায় মর্যাদা থাকে না; আমাদের দেশের লোকের খ্যাতি অপেক্ষা গবর্মেণ্টের খেতাব, আমাদের দেশের লোকের আশীর্বাদ অপেক্ষা বিলাতি কাগজের রিপোর্ট আমাদের কাছে শ্রেয়।

ইংরেজের সহিত সমান অধিকার ভিক্ষা করিয়া লইবার জন্য ইংরেজি ভাষা আবশ্যক হইতে পারে কিন্তু স্বদেশকে উচ্চতর অধিকারের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য দেশীয় ভাষা, দেশীয় সাহিত্য, দেশীয় সমাজের মধ্যে থাকিয়া সমাজের উন্নতিসাধন একমাত্র উপায়। যাঁহারা স্বদেশ অপেক্ষা আপনাকে অনেক উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত বলিয়া জানেন,

যাঁহারা স্বদেশের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে লজ্জাবোধ করেন তাঁহারাও স্বদেশকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন স্বীকার করি; কিন্তু সেটুকু না করিয়া যদি তাঁহারা নিজের দেশকে নিজের উপযুক্ত জ্ঞান করেন এবং নিজেকে স্বদেশের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, তবে তাহাতে তাঁহাদেরও আত্মসম্মান থাকে এবং দেশকেও সম্মান করা হয়।

১৩০৫

আলট্রা-কনসার্ভেটিভ

মুখ গোপন করিয়া কেবল পুচ্ছটুকু বাহির করিলে পরিচয়ের সুবিধা হয় না। যে বাঙালি পায়োনিয়রে পত্র লিখিয়া কেবল "আলট্রা-কনসার্ভেটিভ" বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন কেমন করিয়া জানিব তিনি কে?

জানিতে কৌতূহল হইতে পারে কারণ তিনি যে-সে লোক নহেন সবিনয়ে এমনতরো আভাস দিয়াছেন। তিনি না উকিল, না মোক্তার, না স্কুলমাস্টার।[১] অহো, তিনি এত মস্ত লোক! তাঁহাকে নিজের চেষ্টায় বড়ো হইতে হয় নাই; নিজের চেষ্টায় উন্নতিলাভ করা তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক, এবং হয়তো অসম্ভব; যে ইংরেজি চিঠিখানা কাগজে ছাপা হইয়াছে সেও হয়তো বা তাঁহার নিজের রচনা নহে, হয়তো তাঁহার সেক্রেটারি লিখিয়া দিয়াছে। সেইজন্য গবর্মেন্ট-কালেজের ভূতপূর্ব ছাত্রদের প্রতি তাঁহার এত অবজ্ঞা এবং বর্তমান সুলভ শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি তাঁহার এত বিদ্বেষ।

উকিল, স্কুলমাস্টার, এবং গবর্মেন্ট কালেজের ভূতপূর্ব ছাত্রগণ শিক্ষিত সন্দেহ নাই, শিক্ষাই তাঁহাদের-প্রধান সম্মান এ-কথাও কবুল করিতে হয়; অতএব আলট্রা

১ **"Have vakils, attorneys, pleaders, mukhtars, and schoolmasters a greater stake in the country than the zamindars?"**

২ **"The self-elected delegates who make up that body (Congress) are lawyers, to whom notoriety means more fees, disappointed office-seekers, and ex-students from Government colleges, whose vanity is gratified by the honour—whatever may be its value—of being a Congress delegate. Their number is, I fear, likely to increase under the present system of practically free education."**

বলিতেছেন, ধিক তাঁহাদিগকে। অতএব আলট্রা-কনসার্ভেটিভগণই দেশের স্বাভাবিক অধিনেতা,—কারণ, শিক্ষা বল, বুদ্ধি বল, অভিজ্ঞতা বল, আত্মনির্ভরই বল, কিছুতেই তাঁহাদের লেশমাত্র প্রয়োজন নাই—দেশেতে তাঁহাদের "স্টেক" গাড়া আছে।

তবে আমাদের এই আলট্রায় এত সংকোচ কিসের? যদি ইনি উকিল না হন, যদি ইনি স্কুলমাস্টার অথবা স্কুলমাস্টারের দ্বারা উপকারপ্রাপ্ত কেহও না হন তবে কোন্ লজ্জার অনুরোধে আপনার এতবড়ো নিষ্কলঙ্ক নামটা গোপন করিলেন? যদি তিনি জাত-সিংহই হন তবে শিকারের পূর্বে একবার গর্জনসহকারে নিজের নামটা ঘোষণা করিয়া দিলেন না কেন—দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় কালেজের কক্ষ হইতে আদালতের প্রাঙ্গণে, ম্যুনিসিপাল সভা হইতে কনগ্রেসের পাণ্ডালে পর্যন্ত কম্পান্বিত হইতে থাকিত।

যদি অবাধে নামটা প্রকাশ করিতে পারিতেন তবে দেশের সমস্ত গণিতশাস্ত্রবিৎ উকিল, স্কুলমাস্টার ও গবর্মেন্ট-কালেজের ভূতপূর্ব ছাত্রগণ খড়ি পাতিয়া আঁক পাড়িয়া একবার গণনা করিতে বসিত তাঁহার "নোবিলিটি" কতদিনকার, একবার মাপিয়া দেখিত হতভাগ্য দেশের বক্ষঃস্থলে তাঁহার "স্টেক" কতদূর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে।

হায় বঙ্গদেশ, তোমার উচ্চতাবিহীন সমতল ভূমিতে "নোবিলিটি", প্রাচীন আভিজাত্য টিকিতে পারে না। তোমার নানাস্রোতঃসংকুল পলিমাটিতে আজ যেখানে স্থল কাল সেখানে জল, আজ যেখানে গ্রাম কাল সেখানে নদী, আজ যিনি উকিল কাল তিনি জমিদার, বাপ যাহার জমিদার পুত্র তাহার স্কুলমাস্টারমাত্র, অদ্য যে "প্রেজেণ্ট সিস্টেম অফ প্র্যাকটিক্যালি ফ্রী এডুকেশন"কে অবজ্ঞা করে তাহারই পৌত্র বি. এ পাস পূর্বক বিবাহের হাটে উচ্চ দরে বিকাইয়া যায়।

বৌদ্ধ সাধু মশাটিকে মারিতেও কুণ্ঠিত হন পাছে সেই মশা তাঁহার কোনো পূজনীয় পূর্বপুরুষের নূতন সংস্করণ হয়, পাছে হয়তো সেই বংশে অদূরভবিষ্যতে তিনিও জন্মলাভ করেন। আমাদের দেশেও যাঁহারা প্রভাতে জাগিয়া অকস্মাৎ আপনাদিগকে অ্যারিস্ট-ক্র্যাট বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারা উকিল-মোক্তার-ইস্কুলমাস্টারের প্রতি চপেটাঘাত উদ্যত করিবার পূর্বে যদি একবার চিন্তা করিয়া দেখেন যে, হয়তো তাঁহাদের অনতিদূরবর্তী পূজনীয় পূর্বপুরুষ উকিল, মোক্তার অথবা তদনুরূপ কেহ ছিলেন অথবা অনতিদূরবর্তী ভবিষ্যতে তাঁহাদেরই "আত্মা বৈ" উকিল-মোক্তার হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে তাহা হইলে তাঁহারা এই সকল শিক্ষিত ও সুযোগ্য সম্প্রদায়ের প্রতি যথোচিত ভদ্রোচিত বিনয়ের সহিত ব্যবহার করিতে পারেন।

কিন্তু আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ মহাশয়েরা অত্যন্ত সুখী। তাঁহাদের গায়ে

কথা সহে না। সম্প্রতি আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী তাঁহাদের সম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়াছিল। অন্যায় করিয়াছিল কি ন্যায় করিয়াছিল তাহা তর্কের বিষয়। কিন্তু আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ মহাশয় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া দুই চক্ষু মুছিতে মুছিতে সাহেবের নিকট সোহাগ লইতে গিয়াছেন। দুই বাহু মেলিয়া পায়োনিয়রের কোলের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিতেছেন, "দেশের আর-সকলে উকিল অ্যাটর্নি ইস্কুলমাস্টার এবং কালেজের ছাত্র, তাহারা শিক্ষিত, দেশের উপরে তাহাদের কোনো অধিকার নাই—বিশাল ভারতবর্ষে কেবলমাত্র আমাদেরই কয়েকজনের খোঁটা গাড়া আছে, "We the ultra-conservatives" আমরা জমিদার, আমরা নোবিলিটি; কিন্তু সাহেব উহারা কেন আমাদিগকে খারাপ কথা বলে।" আহা কী আদর! পায়োনিয়রের কোল হইতে ইংলিশ-ম্যানের কোলে কত সান্ত্বনা! একদিকে সোনার-গোট-পরা হৃষ্টপুষ্ট তৈলচিক্কণ আলট্রা-কনসারভেটিভ প্রৌঢ় শিশুটি, অন্যদিকে কালো-কোর্তা-পরা গুপ্তহাস্যকুটিলমুখ রক্তবর্ণ ইংরেজ সম্পাদক,—অশ্রুপরিষিক্ত বাৎসল্যের কী অপরূপ দৃশ্য। কি সুপবিত্র স্নেহসম্মিলন।

আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটিতে তাঁহাদের স্বদেশীয়ের কর্তৃত্ব দেখিয়া পায়োনিয়রের বক্ষদেশে মুখ গোপন করিয়া কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন, "সাহেব এও কি হয়! তোমরা কি কেহ নও! কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটি কেবল দিশি লোকের আড্ডা হইয়া উঠিল। আমরা যে-সম্প্রদায়ের লোক আমরা কি ইহা সহ্য করিতে পারি?" [১] তাঁহাকে এ-কথা কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই, তোমরা যে দশশালা বন্দোবস্তে দেশের কর্তা হইয়া উঠিয়াছ তাহাই বা চিরদিন থাকে কেন? ইংরেজ যে রক্তপাত দ্বারা দেশ জয় করিয়াছে এবং দেশ রক্ষা করিতেছে তাহা কি কেবল তোমাদের মতো অলস বিলাসীদের মুখে নিরাপদে অন্ন তুলিয়া দিবার জন্য? ইংরেজ সিভিলিয়ানদিগকে পেনশন না দিয়া কেন এক-এক টুকরা জমিদারি দেওয়া হয় না? জীবনের অধিকাংশ কাল যাঁহারা ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গেলেন তাঁহারা কি বৃদ্ধবয়সে ইংলণ্ডের কোনো এক অখ্যাত বাসাবাড়িতে মরিতে যাইবেন? তাঁহারই মুখ হইতে ভাষা লইয়া এ-কথা কি কেহ বলিতে পারে না যে, I do not think that any one will venture to seriously deny that the Permanent Settlement has proved a failure in this country? আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ যেরূপ-ভাবে দেশের মধ্যে খোঁটা গাড়িয়া তাঁহাদের জমিদারি শাসন করেন একজন ইংরেজ প্রভু কি তাহা অপেক্ষা ভালো শাসন করিতে পারে না? তাহার দ্বারা কি স্থানীয় স্বাস্থ্য, শস্য, শিক্ষা ও শিল্প বর্তমান বন্দোবস্তের চেয়ে অনেক বেশি উন্নতি লাভ করিতে পারে না?

১ "Under the present system the municipality exists for the Native Commissioners, their friends and canvassers."

এ-প্রশ্নের উত্তরে আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ পায়োনিয়রের বক্ষস্থলে হেলিয়া দুলিয়া বাঁকিয়া চুরিয়া বলিবেন, পারে, অবশ্য পারে, তোমরা সাহেব, তোমাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা কিসের ? কিন্তু যে-অধিকার দিয়াছ সে কি ফিরাইয়া লইবে ?

হায় আলট্রা-কনসার্ভেটিভ, তুমি মস্তলোক এবং আমাদের উকিল-ইস্কুলমাস্টারগণ তোমার সহিত তুলনীয় নহেন কিন্তু আমাদের সকলেরই অধিকার অতি সামান্য, এবং ইংরেজের কথার উপরেই তাহার একমাত্র নির্ভর। তোমারও কোনো জোর নাই, উকিল মোক্তারদেরও কোনো জোর নাই। যদি একটা অধিকার, একটা উন্নত আশ্বাসের কারণ আমাদিগকে দান করিয়া আবার তাহা ইংরেজ কাড়িয়া লন তবে তোমরা "নোবিলিটি" বর্গই বা কী করিবে আর যাঁহারা স্ববুদ্ধিজীবী তাঁহারাই বা কী করিবেন ?

হে আলট্রা-কনসার্ভেটিভ, কংগ্রেসের শূন্য বাগ্মিতার প্রতি তুমি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছ এবং একটা পাকা কথা বলিয়াছ যে, কঠিন কার্যের দ্বারাই দেশের উন্নতি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আগামী শাসনকর্তা কার্জন সাহেব আসিয়া যদি তোমাদের দশশালা বন্দোবস্তটি কাড়িয়া অন্য দশজনের মধ্যে বাঁটোয়ারা করিয়া দেন তবে তোমরাই বা কী কঠিন কার্যটায় প্রবৃত্ত হও ? তোমরা কি তোমাদের লাঠিয়ালগুলিকে দাঁড় করাইয়া লড়াই কর, না, কনগ্রেসেরই মত বাগ্মিতা অবলম্বন কর ?

কনগ্রেস ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট যাহা চায় তাহা কেবলমাত্র বাগ্মিতার দ্বারা চায়, কঠিন কার্যের দ্বারা চায় না,—আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ মহাশয়েরা কি তাহার বিপরীত কোনো দৃষ্টান্ত দেখাইতে ইচ্ছুক আছেন ?

আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ যদিচ মহোচ্চ জমিদার-সম্প্রদায়ভুক্ত তথাপি তাঁহার সংসারজ্ঞান যে একেবারেই নাই তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার একটা কথায় অত্যন্ত চতুরতা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, কনগ্রেস যে প্রচুর রাজভক্তি প্রকাশ করে, গোড়াতেই মহারানীর জয়কীর্তন করিয়া কার্য আরম্ভ করে ইহার অপেক্ষা চালাকি তাহার পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না।

বাস্তবিক চোরের কাছে চোর ধরা পড়ে। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, "অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।" সেই অতিভক্তি কনগ্রেসই প্রকাশ করুন আর আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ-সম্প্রদায়েরাই করুন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য চুরি। যাঁহারা ডফারিন-ফণ্ডে টাকা দেন, ভূতপূর্ব সাহেব-কর্মচারীদের অভূতপূর্ব পাষাণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশকে ভারাতুর করিয়া তোলেন, পায়োনিয়রকে গোপনে জিজ্ঞাসা করো দেখি তাঁহাদের অতিভক্তির মূল্য কি সাহেবেরা বোঝে না ? ইহার মধ্যে ফাঁকি দিয়া কিছু কি আদায়ের চেষ্টা নাই ? আলট্রাগণ না হয় নিজের জন্য উপাধি সন্ধান করেন, কনগ্রেস না হয় দেশের

জন্য একটা কিছু সুযোগের চেষ্টায় থাকেন, পরন্তু ভক্তি-জিনিসটাকে ব্যবহারে লাগানো হইয়া থাকে। এ ভক্তিকে ঠিক বলা যায় না

The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow!

তবু অতিভক্তিতে তোমাদের কাছে কনগ্রেসকে হার মানিতে হইবে। একবার ভাবিয়া দেখো তুমি যে রাজভক্তির প্রচুর তৈল লেপনে পায়োনিয়র পত্রটাকে সিক্ত করিয়া তুলিয়াছ তাহার মধ্যে কত অভিসন্ধিই আছে। ওই যে মুগ্ধচক্ষু সাহেবের মুখের উপর স্থাপন করিয়া অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতেছ, সাহেব তোমারই জন্য দেশের লোকের কাছে গাল খাইলাম—(অতএব কিছু আশা রাখি!) ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর, পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর। (অতএব কিঞ্চিৎ সুবিধা চাই।) নাথ, তুমি বল কনগ্রেস মন্দ আমিও বলি তাই; (অতএব দেশের লোকের মাথার উপরে আমাকে চড়াইয়া দাও।) বঁধু, তুমি ম্যুনিসিপালিটি হইতে দিশি জঞ্জাল বিদায় করিয়া বিলাতির আমদানি করিতে চাও সেই হচ্ছে "জেনারেল সেন্টিমেণ্ট অফ দি ক্লাস টু হ্বিচ আই হ্যাভ দি অনার টু বিলঙ্গ" (অতএব তোমার পাদপীঠপার্শ্বে আমাদিগকে স্থান দিয়ো!) ভারতবর্ষের মন্ত্রসভাই বল আর পৌরসভাই বল সমস্ত আগাগোড়া নূতন নিয়মে পরিবর্তন করা আবশ্যক (অর্থাৎ সকল সভাতেই তুমি বসো সিংহাসন জুড়িয়া, আর আমি বসি তোমার কোলে।) ইতি তোমার আদরের অতিভক্ত আলট্রা-কনসার্ভেটিভ।

এমন শুভদিন কখনোই আসিবে না কিন্তু যদি দৈবাৎ আসে, যদি কোনো কারণে সাহেবের প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া কনগ্রেসের নিকট হইতেই সম্মান, সৌভাগ্য ও সহায়তার প্রত্যাশা জন্মে তবে অতিভক্তির প্রবল স্রোত কি কনগ্রেসের দিকেই ফিরিয়া আসে না? তখনও কি রাজা-রায়বাহাদুরগণ সাহেবের ডালি জোগান এবং পায়োনিয়রে পত্র লেখেন?

সাংসারিক ভক্তির এই নিয়ম। তাহা নিঃস্বার্থ নহে। যেখানে পাওনার সম্পর্ক নাই সেখানে আলট্রা-কনসার্ভেটিভেরও যদ্রূপ মনের ভাব গবর্মেন্ট-কালেজের ভূতপূর্ব ছাত্রেরও তদ্রূপ। মনুষ্যচরিত্রের মধ্যে বৈষম্য এতই যৎসামান্য।

উভয় পক্ষের মধ্যে কেবল একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। ভূতপূর্ব ছাত্র দেশের হিতোদ্দেশে "হার্ড ওআর্কে" যদি বা অপটু হন অন্তত তাঁহার "এল্‌পাটি এলোকোয়েন্স"ও আছে কিন্তু আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভটি যে-সম্প্রদায়ের মুখোজ্জ্বল করেন তাঁহারা

বাগ্মিতার জন্যও বিখ্যাত নহেন "কঠিন কর্ম"ও তাঁহাদের কর্ম নহে। তাঁহারা শিক্ষাকেও অবহেলা করেন এবং সামর্থ্য হইতেও বঞ্চিত। তাঁহাদের ধন আছে; দেশের হিতোদ্দেশে সে-ধন যদি ব্যয় করিতে পারিতেন তবে বাক্যবীর ও কর্মবীর সকলের উপরে উঠিতে পারিতেন,—কারণ, কবি বলিয়াছেন,

শতেষু জায়তে বক্তা, সহস্রেষু চ পণ্ডিতঃ,
শূরো দশসহস্রেষু, দাতা ভবতি বা ন বা।

কিন্তু সম্প্রতি দানে যিনি আমাদের দেশে আদর্শ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি অধ্যাপক ছিলেন, দেশে তাঁহার কোনো স্টেক ছিল না এবং তাঁহারই উদার বদান্যতায় "প্রেজেণ্ট সিস্টেম অফ প্র্যাকটিক্যালি ফ্রী এডুকেশন" এই দীনহীন দেশে বদ্ধমূল হইতে পারিয়াছে।

১৩০৫

বিরোধমূলক আদর্শ

ওগ্যস্‌ৎ ফ্রেয়াল কনটেম্পোরারি রিভিয়ু পত্রে আক্ষেপ করিয়াছেন যে, ফরাসি ইংরেজকে জানে না, ইংরেজ ফরাসিকে বোঝে না।

ফরাসিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ইংরেজের প্রতি তোমার এত বিদ্বেষ কেন—উত্তর পাওয়া যাইবে, ইংরেজ মানুষটাকে আমার খারাপ লাগে না, কিন্তু ইংরেজ জাতটার উপর আমার ঘৃণা।

য়ুরোপের বিদ্যালয়ে যে-ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে অন্য দেশের প্রতি বিরোধ প্রকাশ করিয়া নিজেদের দেশের গৌরব ঘোষণা করা হয়। প্যাট্রিয়টিক ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছেলেদিগকে, অন্য দেশের সহিত স্বদেশের সাবেক কালের ঝগড়ার কথা স্মরণ করাইয়া, ভবিষ্যৎ পর্যন্ত সেই বিরোধ টানিয়া রাখা হয়। কর্সিকা-দেশের মাতৃগণ, অন্য পরিবারের সহিত স্বপরিবারের কুলক্রমাগত যে বিদ্বেষ চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের প্রতি যে প্রতিহিংসা করিবার আছে, শিশুকাল হইতে সন্তানের কানে তাহা জপ করিতে থাকে,—য়ুরোপীয় বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ানোও ঠিক সেইরূপ।

আজকাল ইংলণ্ডে খুব একটা লড়াইয়ের নেশা চাপিয়াছে। সৈনিকদলে ভিড়িবার জন্য ডাক পড়িয়াছে। এই ডাক অন্য সকল বাণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ধ্বনিত হইতেছে

ফ্রান্সও যে এ-বিষয়ে নিরপরাধ, তাহা নহে। এখন দুই পক্ষের পালোয়ান সাহিত্যে পরস্পরকে শাসাইতেছে। ব্রিটিশ চ্যানেলের দুই পারে একদল খবরের কাগজ সৈনিকতার রাস্তা দিয়া বর্বরতায় পৌঁছিবার জন্ম ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে। লেখক আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—ব্যক্তিগত ধর্মনীতি হইতে ন্যাশনাল ধর্মনীতির আদর্শের যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, শেষে তাহার কি এইরূপ সমন্বয় হইবে? য়ুরোপ কি ইচ্ছা করিয়া বিধিমতে বর্বরতায় ফিরিয়া যাইবে?

আজকাল দুই পয়সা দিলেই খবরের কাগজে পড়িতে পাওয়া যায় যে, ধাতুগত বিরোধের ভাব, অনিবার্য পার্থক্য এবং জাতিগত বিদ্বেষে পরস্পরের বংশানুক্রমিক শত্রুজাতির সহিত, আজ হউক বা কাল হউক, একটা সংঘর্ষ হইবেই। তাহাদের মতে মানুষের প্রবলতম প্রবৃত্তি এবং ন্যায়ধর্মের উচ্চতম নীতিসকল দুই জাতিকে দুই বিপরীত দিকে ঠেলিয়া লইয়া গেছে। তাহারা বলে, নেশনদের মধ্যে শান্তিস্থাপনের আশা বাতুলের খেয়ালমাত্র। ইত্যাদি।

এই সকল বিরোধ-বিদ্বেষের বাক্য লক্ষ লক্ষ খণ্ড ছাপা হইয়া দেশে বিদেশে বিতরিত হইতেছে। এই প্রাত্যহিক বিষের মাত্রা নিয়মমতো পান করিয়া দেশের ক্ষতি হইতেছে সন্দেহ নাই।

প্যাট্রিয়টিজম, ধর্মনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি বাঁধিবোল আছে, যাহা লোকে মুখে উচ্চারণ করে, এবং সে-সম্বন্ধে আর চিন্তা করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। সে-বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে গেলেই হাতাহাতি বাধিয়া যায়। বাঁধিবোল মুখে মুখে চলিয়া যায়—লোকে নিঃসংশয়ে জীবনযাপন করে। প্যাট্রিয়টিক খুনাখুনি অথবা যোদ্ধৃধর্ম, এইরূপের একটা বাঁধিবোল।

য়ুরোপীয় লেখক যে-কথা বলিতেছেন, তাহার উপরে আমরা আর কী বলিব? তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া নাই বলিয়া লেখক অনেক দুঃখ করিয়াছেন—আর ইংরেজে ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে যে বোঝাপড়ার অভাব দাঁড়াইয়াছে, সেজন্য আমাদের কী দুর্গতি ঘটিতেছে, তাহা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ হইতেছে। প্রাচ্যজাতীয়ের প্রতি, ভারতবর্ষীয়ের প্রতি অবজ্ঞা ইংরেজি সাহিত্যের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। ইংরেজ বালকদিগকে ইংরেজ-বীরত্বের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত করিবার জন্য যে-সকল ছেলেভুলানো গল্প ঝুড়ি ঝুড়ি বাহির হইতেছে তাহাতে ম্যুটিনি-গল্পের উপলক্ষ্য করিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে রক্তপিপাসু পশুর মতো আঁকিয়া দেবচরিত্র ইংরেজের সহিত তাহাদের পার্থক্য প্রমাণ করিতেছে। ফরাসিকে ইংরেজের ঠিক বুঝিবার উপায় আছে—পরস্পরের আচার, ব্যবহার, ধর্ম, বর্ণ, একই প্রকার,—কিন্তু আমাদের

মধ্যে যথার্থই পার্থক্য বিদ্যমান। সেই পার্থক্য অতিক্রম করিয়া, এমন কি, সেই পার্থক্যবশতই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবে ঘটিবে, তাহা বিধাতা জানেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অত্যুক্তি ও মিথ্যার দ্বারা অন্ধতা, অবিচার ও নিষ্ঠুরতা সৃষ্টি করিতেছে।

বস্তুত এই অন্ধতা নেশনতন্ত্রেরই মূলগত ব্যাধি। মিথ্যা দ্বারাই হউক, ভ্রমের দ্বারাই হউক, নিজেদের কাছে নিজেকে বড়ো করিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে এবং সেই উপলক্ষ্যে অন্য নেশনকে ক্ষুদ্র করিতে হইবে, ইহা নেশনের ধর্ম, ইহা প্যাট্রিয়টিজমের প্রধান অবলম্বন। গায়ের জোর, ঠেলাঠেলি, অন্যায় ও সর্বপ্রকার মিথ্যাচারের হাত হইতে নেশন-তন্ত্রকে উপরে তুলিতে পারে, এমন সভ্যতার নিদর্শন তো আমরা এখনও য়ুরোপে দেখিতে পাই না।

পরস্পরকে যথার্থরূপ জানাশুনা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? নেশনের মেরুদণ্ডই যে স্বার্থ। স্বার্থের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, এবং স্বার্থের সংঘাতে মানুষকে অন্ধ করিবেই। ইংরেজ যদি সুদূর এশিয়ায় কোনোপ্রকার সুযোগ ঘটাইতে পারে, ফ্রান্স তখনই সচকিত হইয়া ভাবিতে থাকিবে, ইংরেজের বলবৃদ্ধি হইতেছে। প্রত্যক্ষ সংঘাত না হইলেও, পরস্পরের সমৃদ্ধিতেও পরস্পরের চিত্তকে বিষাক্ত করে। এক নেশনের প্রবলত্ব অন্য নেশনের পক্ষে সর্বদাই আশঙ্কাজনক। এ-স্থলে বিরোধ, বিদ্বেষ, অন্ধতা, মিথ্যাপবাদ, সত্যগোপন, এ-সমস্ত না ঘটিয়া থাকিতে পারে না।

সমাজের পক্ষে উদারতা সহজ। হিন্দুরা বলে, স্ব স্ব ধর্ম পালন করাই পুণ্য। অবস্থাভেদে আচারব্যবহারের পার্থক্য ঘটিতেই পারে এবং সে-পার্থক্য পরস্পরের পক্ষে মঙ্গলেরই কারণ, এ-কথা শান্তচিত্তে নির্মলজ্ঞানে অনুধাবন করিয়া দেখা যায় এবং ভিন্ন সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাসম্মান সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াও স্বসমাজের কর্তব্যপালন করা কঠিন হয় না। সামাজিক উন্নতিতে মানুষের চারিত্রগত উন্নতি হয়—সে উন্নতিতে কাহারও সহিত স্বার্থের বিরোধ ঘটে না। সর্বপ্রকার বিদ্বেষ, অসত্য, হিংসা সেই উন্নতির প্রতিকূল। সদ্‌ভাব ও সত্যই সমাজের মূল আশ্রয়। নেশন অনেক সময় ধর্মকে উপেক্ষা ও উপহাস করা আবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করে, বাহুবলকে ন্যায়ধর্মের অপেক্ষা বড়ো বলিয়া স্পষ্টতই ঘোষণা করে—সমাজ কদাপি তাহা করিতে পারে না; কারণ ধর্মই তাহার একমাত্র অবলম্বন, স্বার্থকে সর্বদা সংযত করাই তাহার আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।

আমরা যদি বাঁধিবোলে না ভুলি, যদি 'প্যাট্রিয়টি'কেই সর্বোচ্চ বলিয়া না মনে করি, যদি সত্যকে, ন্যায়কে, ধর্মকে, ন্যাশনালত্বের অপেক্ষাও বড়ো বলিয়া জানি, তবে আমাদের ভাবিবার বিষয় বিস্তর আছে। আমরা নিকৃষ্ট আদর্শের আকর্ষণে কপটতা, প্রবঞ্চনা ও

অসত্যের পথে পা বাড়াইয়াছি কি না, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। এবং ধর্মের দিকে না তাকাইলেও সুবুদ্ধির হিসাব হইতে এ-কথা পর্যালোচনা করিতে হইবে যে, ন্যাশনাল স্বার্থের আদর্শকে খাড়া করিলেই বিরোধের আদর্শকে খাড়া করা হয়—সেই আদর্শ লইয়া আমরা কি কোনো কালে য়ুরোপের মহাকায় স্বার্থদানবের সহিত লড়াই করিয়া উঠিতে পারিব?

আমরা লড়াই করিতে পারি জ্ঞানে, ধর্মে। সেখানে আমাদের পৈতৃক মূলধন আছে। সেখানে কেহ আমাদিগকে ঠেকাইবে না—সেখানে পিতৃলোক এবং দেবতা আমাদের সহায় হইবেন এবং বাঁধিবোলে যদি না ভুলি, তবে ইহা জানা উচিত যে, সেখানে যে-মহত্ত্বের উপাদান আছে, তাহা সকল মহত্ত্বের উচ্চে।

কিন্তু এরূপ উপদেশ শুনা যায় যে, প্রকৃতির নিয়ম বিরোধ, অতএব বিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বাহির যদি আমার বিরুদ্ধ হয়, তবে আমিও তাহার বিরুদ্ধ না হইলে বাঁচিতে পারিব না। এইজন্য শিশুকাল হইতে ভিন্নজাতির সহিত বিরোধ-ভাবের একান্ত চর্চাই 'প্যাট্রিয়টি'র সাধনা। হিন্দুজাতি সেই পোলিটিকাল বিরোধভাবের চর্চাকেই সকল সাধনার অপেক্ষা প্রাধান্য দেয় নাই বলিয়াই নষ্ট হইয়াছে।

পূর্বোক্ত কথাটি যদি একান্তই স্বীকার করিতে হয়, তবে সেই সঙ্গে এ-কথাও বলিব আত্মরক্ষাই মানুষের অথবা লোকসম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ ধর্ম নহে। ধর্মে যদি নাশ করে, তবে তাহাতেই মাথা পাতিয়া দিতে হইবে।

ন্যাশনালধর্মেও সকল সময়ে রক্ষা করে না। ক্ষুদ্র বোয়ারজাতি যে লড়িতে লড়িতে নিঃশেষ হইবার দিকে চলিয়াছে—কিসের জন্য? তাহাদের হৃদয়ে ন্যাশনালধর্মের আদর্শ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই। সে-ধর্মে তাহাদিগকে রক্ষা করিল কই?

তা ছাড়া বিনাশের চেহারা অনেক সময় ছদ্মবেশী। অনেক সময় পরিপূর্ণ সম্পদ তাহার মুখোশের মতো। কথিত আছে, ক্ষয়কাশে রোগীর কপোলে রক্তিম-লাবণ্য ফুটিয়া উঠে। সম্প্রতি উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান মিলিটারিজ্মের রক্তিমায় য়ুরোপের গণ্ডস্থল যে টকটকে হইয়া উঠিতেছে, সে কি স্বাস্থ্যের লক্ষণ? তাহার ন্যাশনালত্বের ব্যাধি, অতিমেদস্ফীতির ন্যায় তাহার হৃদয়কে, তাহার মর্মস্থানকে, তাহার ধর্মনীতিকে আক্রমণ করিতেছে, ইহা কি আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি না?

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কুশল লাভ করে, শত্রুদিগকে জয় করিয়াও থাকে—কিন্তু সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

প্রকৃতির নিয়মের প্রতি প্রকৃতিতত্ত্ববিদ য়ুরোপের যেরূপ অটল বিশ্বাস, ধর্মের প্রতি ধর্মতত্ত্ববিদ হিন্দু সেইরূপ একান্ত বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া পূর্বোক্ত শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচারেই যে ধ্রুব মৃত্যু তাহা নহে, ধর্মনিয়মের ব্যভিচারেও ধ্রুব বিনাশ। ধার্মনীতিক নিয়মের অমোঘত্বে য়ুরোপ শ্রদ্ধা হারাইতেছে দেখিয়া, আমরাও যেন না হারাইয়া বসি। আমাদের রাজার এক চোখ কানা বলিয়া আমাদের দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চোখের উপরে যেন পাগড়ি টানিয়া না দিই।

নদী তাহার দুই তটভূমির মধ্য দিয়া তটহীন সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। নদীকে যদি তাহার তটের মধ্যেই সম্পূর্ণ বদ্ধ করিবার জন্য বাঁধ দেওয়া যায়, তবে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া তটকে প্লাবিত ও বিনষ্ট করে। প্রাকৃতিক নিয়ম জড় হইতে সচেতনে ধর্মপরিণামের দিকে নিয়ত ধাবিত। সেই পরিণামের দিকে তাহার গতিকে বাধা দিয়া যদি তাহাকে বর্তমানের আদর্শেই একেবারে বাঁধিয়া ফেলা যায়, তবে তাহা ভীষণ হইয়া প্রলয় সাধন করে। স্বার্থের আদর্শ, বিরোধের আদর্শ, যতই দৃঢ়, যতই উচ্চ, যতই রন্ধ্রহীন হইয়া ধর্মের গতিকে বাধা দিতে থাকে, ততই তাহার বিনাশ আসন্ন হইয়া আসে। য়ুরোপের নেশনতন্ত্রে এই স্বার্থ, বিরোধ ও বিদ্বেষের প্রাচীর প্রতিদিনই কঠিন ও উন্নত হইয়া উঠিতেছে। নেশনের মূলপ্রবাহকে অতি-নেশনত্বের দিকে বিশ্বনেশনত্বের দিকে যাইতে না দিয়া, নিজের মধ্যেই তাহাকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রত্যহ প্রবল হইতেছে। আগে আমার নেশন, তার পরে বাকি আর-সমস্ত কিছু, এই স্পর্ধা সমস্ত বিশ্ববিধানের প্রতি ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। তাহার প্রলয়পরিণাম যদি বা বিলম্বে আসে, তথাপি তাহা যে কিরূপ নিঃসন্দেহ, কিরূপ সুনিশ্চিত, তাহা আর্যঋষি দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন—

> অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
> ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

এই ধর্মবাণী সকল দেশের সকল কালের চিরন্তন সত্য, ন্যাশনালত্বের মূলমন্ত্র ইহার নিকট ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক। নেশন শব্দের অর্থ যখন লোকে ভুলিয়া যাইবে, তখনও এ-সত্য অম্লান রহিবে এবং ঋষি-উচ্চারিত এই বাক্য স্পর্ধামদমত্ত মানবসমাজের ঊর্ধ্বে বজ্রমন্দ্রে আপন অনুশাসন প্রচার করিতে থাকিবে।

১৩০৮

রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি

এলাহাবাদে সোমেশ্বর দাসের কারাবরোধের কথা সকলেই জানেন। কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অবিচার মাসিকপত্রের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু বর্তমান ব্যাপারটি ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত ভারতবাসীর প্রতি লক্ষ্যনিবেশ করিয়াছে। সেইজন্য এ-সম্বন্ধে সংক্ষেপে গুটিকয়েক কথা বলিতে হইতেছে।

পায়োনিয়র লিখিতেছেন, ভারতবর্ষে নানাজাতীয় লোক একত্রে বাস করে। ইহাদের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিয়া চলা ব্রিটিশ গবর্মেন্টের একটি দুরূহ কর্তব্য। সুতরাং যে-ঘটনায় ভিন্নজাতির মধ্যে সংঘর্ষ বাধিবার সম্ভাবনা হয়, সেটার প্রতি বিশেষ কঠিন বিধানের প্রয়োজন ঘটে। সে-হিসাবে সোমেশ্বর দাসের কারাদণ্ডকে গুরুদণ্ড বলা যায় না।

সুযোগ্য ইংরেজি সাপ্তাহিক "নিয়ু ইণ্ডিয়া" পত্রে পায়োনিয়রের এই সকল যুক্তির অযথার্থতা ভালোরূপেই দেখানো হইয়াছে। ইংরেজের যে-সকল ব্যবহারে ভারতবাসীর মনে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, ইংরেজ বিচারক তাহাকে যে কত লঘুভাবে দেখিয়া থাকে, তাহার শতশত প্রমাণ প্রত্যহ দেখিতে পাই। এই সেদিন একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকে কোনো ইংরেজ পাদুকা বহন করাইয়াছিল—দেশের উচ্চতম আদালতে পর্যন্ত স্থির হইয়া গেছে, ব্যাপারটা অত্যন্ত তুচ্ছ।[১] তুচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু পায়োনিয়রের যুক্তি অনুসারে তুচ্ছ নহে। ভদ্র ব্রাহ্মণের এরূপ নিষ্ঠুর অপমান ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত গুরুতর।

তাহা হইলে কথাটা কী দাঁড়াইতেছে, বুঝিয়া দেখা যাক। যে-সকল জাতি law-abiding অর্থাৎ বিনা বিদ্রোহে আইন মানিয়া চলে, তাহাদেরই অপমান আদালতের কাছে তুচ্ছ। যাহারা কিছুতেই শান্তিভঙ্গ করিবে না, তাহাদিগকে অন্যায় আঘাত করাও অল্প অপরাধ। আর যাহারা অসহিষ্ণু, যাহারা নিজের আইন নিজে চালাইয়া বসে, সংগত কারণেও তাহাদের গায়ে হাত দিবার উপক্রমমাত্র অপরাধ। ব্রিটিশরাজ্যে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খাওয়াইবার উপায় বাঘকে দমন করিয়া নহে, গোরুটারই শিং ভাঙিয়া।

কিন্তু পায়োনিয়রের এ-কথাটা লইয়া রাগ করিতে পারি না। পায়োনিয়র বন্ধুভাবে আমাদিগকে একটা শিক্ষা দিয়াছেন। বস্তুতই বারুদে আগুন দেওয়া যতবড়ো

১ তুলনীয় "ব্রাহ্মণ", 'ভারতবর্ষ', রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড।

অপরাধ, ভিজা তুলায় আগুন দেওয়া ততবড়ো অপরাধ নহে। যাহারা চিরসহিষ্ণু, তাহাদের অপমানকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। অতএব আঘাত-অপমান সম্বন্ধে আমরা আইন বাঁচাইব, কিন্তু আইন আমাদিগকে বাঁচাইবে না। Mild Hindu-দের প্রতি পায়োনিয়রের ইহাই নিগূঢ় বক্তব্য।

আর-একটা কথা। বিচারের নিক্তিতে সক্ষম-অক্ষম এবং কালো-সাদায় ওজনের কমবেশি নাই। কিন্তু পোলিটিকাল প্রয়োজন বলিয়া একটা ভারী জিনিস আছে, সেটা যেদিকে ভর করে, সেদিকে নিক্তি হেলে। এ-দেশে ইংরেজের প্রতি দেশী লোকের অন্ধ সম্ভ্রম একটা পোলিটিকাল প্রয়োজন, অতএব সেরূপ স্থলে সূক্ষ্মবিচার অসম্ভব। ন্যায়বিচারের মতে এ-কথা ঠিক বটে যে, ইংরেজের প্রতি দেশী লোক যে-ব্যবহার করিয়া যে-দণ্ড পায়, দেশী লোকের প্রতিও ইংরেজ সেই ব্যবহার করিয়া সেই দণ্ডই পাইবে। আইনের বহিতেও এ সম্বন্ধে কোনো বিশেষ বিধি নাই। কিন্তু পোলিটিকাল প্রয়োজন ন্যায়বিচারের চেয়েও নিজেকে বড়ো বলিয়া জানে।

এ-কথা ঠিক বটে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিক ধর্মশাস্ত্রে পলিটিক্স সর্বোচ্চে, ধর্ম তাহার নিচে। যেখানে পোলিটিকাল প্রয়োজন আসন ছাড়িয়া দিবে, সেইখানেই ধর্ম বসিবার স্থান পাইবে। পোলিটিকাল প্রয়োজনে সত্য কিরূপ বিকৃত হইয়া থাকে, অন্য প্রবন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সরের গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেছে। পোলিটিকাল প্রয়োজনে ন্যায়বিচারকেও বিকারপ্রাপ্ত হইতে হয়, পায়োনিয়র তাহা একপ্রকারে স্বীকার করিয়াছেন। জজ বার্কিট সোমেশ্বরের ব্যবহারকে audacity অর্থাৎ দুঃসাহস বলিয়াছেন। স্বত্বরক্ষার উপলক্ষ্যে ইংরেজকে বাধা দেওয়া যে দুঃসাহস, বিচারকই তাহা দেখাইয়াছেন, এবং এই সাহসিকতার অপরাধে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দিয়া বিচারক যে মানসিক গুণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাকে আমরা কোনো-মতেই সাহসের কোটায় ফেলিতে পারি না। বস্তুত তিনি অবান্তর কারণে সোমেশ্বরের প্রতি অপক্ষপাত ন্যায্য বিচার করিতে সাহসই করেন নাই। এ-স্থলে দণ্ডিত যদি audacious হয়, তবে দণ্ডদাতার প্রতি ইংরেজি কোন্ বিশেষণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কিন্তু এইরূপ বিচারের ফলাফলকে আমরা তুচ্ছ বলিয়া সাপ্তাহিক পত্রের এক প্যারাগ্রাফের মধ্যে তাহার সমাধি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। আমরা প্রতিদিন নানা দৃষ্টান্তের দ্বারা শিখিতেছি যে, পোলিটিকাল প্রয়োজনের যে বিধান, তাহা ন্যায়ের বিধান সত্যের বিধানের সঙ্গে ঠিক মেলে না।

ইহাতে আমাদের শিক্ষাদাতাদের ইষ্ট বা অনিষ্ট কী হইতেছে, তাহা লইয়া

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার প্রয়োজন দেখি না। ভয়ের কারণ এই যে, আমাদের মন হইতে ধ্রুব ধর্মে বিশ্বাস শিথিল, সত্যের আদর্শ বিকৃত হইয়া যাইতেছে। আমরাও প্রয়োজনকে সকলের উচ্চে স্থান দিতে উদ্যত হইয়াছি। আমরাও বুঝিতেছি, পোলিটিকাল উদ্দেশ্যসাধনে ধর্মবুদ্ধিতে দ্বিধা অনুভব করা অনাবশ্যক। অপমানের দ্বারা যে-শিক্ষা অস্থিমজ্জার মধ্যে প্রবেশ করে, সে-শিক্ষার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিব কী করিয়া? ধর্মকে যদি অকর্মণ্য বলিয়া ঠেলিয়া রাখিতে আরম্ভ করি, তবে কিসের উপর নির্ভর করিব? বিলাতি সভ্যতার আদর্শের উপর? বিশ্বজগতের মধ্যে এই সভ্যতাটাই কি সর্বাপেক্ষা স্থায়ী? দুর্ভাগ্যক্রমে, যে-জিনিসটা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের বুকের উপরে চাপিয়া বসে, সেটা আমাদের পক্ষে পৃথিবীর সব-চেয়ে ভারী—আমাদের পক্ষে হিমালয়পর্বতও তাহার চেয়ে লঘু। সেই হিসাবে বিলাতি সভ্যতার নীতিই আমাদের পক্ষে সব-চেয়ে গৌরবান্বিত—তাহার কাছে ধর্মনীতি লাগে না।

অতএব ইচ্ছা করি আর না করি বিলাত আমাদিগকে ঠেসিয়া ধরিয়া যে-সকল শিক্ষা দিতেছে, তাহা গলাধঃকরণ করিতেই হইবে। আমরা ক্লাইভকে, হেস্টিংসকে, ড্যালহৌসিকে আদর্শ নরোত্তম বলিয়াই স্বীকার করিব,—ইংরেজের সহিত ন্যায্য-অন্যায্য সর্বপ্রকার সংঘাত-সংঘর্ষস্থলে আমরা ন্যায়বিচারের প্রত্যাশাই করিব না—যেখানে ভারতশাসনের প্রয়োজনবশত প্রেস্টিজের দোহাই পড়িবে সেখানে বিশ্ববিধাতার দোহাই মানিব না—ইহাই ঘাড় পাতিয়া লইলাম,—কিন্তু এই গুরুই যখন শিবাজির রাষ্ট্র-নীতিকে অধর্ম বলিয়া আমাদের নিকট নীতিপ্রচার করিতে আসিবেন, তখন আমরা কী করিব? তখনও কি ইহাই বুঝিব যে, ধর্মনীতিশাস্ত্রও বর্তমান ক্ষমতাশালীকেই ভয় করিয়া নিজের রায় লিখিয়া থাকেন, অতএব ধিক শিবাজি।

১৩০৯

রাজকুটুম্ব

"নিয়ু ইণ্ডিয়া" ইংরেজি কাগজখানি আমরা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করি। ইহার রচনায় পাঠক ভুলাইবার বাঁধাবুলি ও সহজ কৌশলগুলি দেখি না। সম্পাদক যে-সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে রস অথচ গাম্ভীর্য আছে, তাহাতে বলের অভাব নাই অথচ পদে পদে সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার লেখা সাময়িক সংবাদের তুচ্ছতাকে অনেকদূর ছাড়াইয়া মাথা তুলিয়া থাকে।

১২ই মার্চের পত্রে সম্পাদক "ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় ক্রিমিনাল" নাম দিয়া একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বৃথা অনুবাদের চেষ্টা না করিয়া ক্রিমিনাল-শব্দটা আমরা বাংলায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।

য়ুরোপীয় ক্রিমিনালদের সম্বন্ধে কেন যে সদ্‌বিচার হয় না, সম্পাদক বিচারকের মতো ধীরভাবে তাহার মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

তিনি বলেন, একপক্ষে অপরিসীম সহিষ্ণুতা ও আর-একপক্ষে অপ্রতিহত শক্তি যেখানে সম্মুখীন হয়, সেখানে স্বভাবতই এইরূপ ঘটিতে বাধ্য। এ-স্থলে আমরা হইলেও এমনিই করিতাম—এমন কি, সম্পাদক টিপ্পনী দিয়া বলিয়াছেন, এশিয়াবাসী হয়তো সুযোগ পাইলে "রিফাইণ্ড" পাশবিকতায় য়ুরোপীয়কে জিনিতে পারিত।

শুদ্ধমাত্র প্রসঙ্গক্রমে আমরাও একটি মনস্তত্ত্বের কথা বলিয়া লই। সম্পাদকের এই টিপ্পনীটুকুতে একটি দুর্বলতা প্রকাশ পাইতেছে। তিনি নিজের বক্তব্যকে সবল করিবার জন্য অপক্ষপাতিতা দেখাইবার প্রলোভনটুকু সংবরণ করিতে পারেন নাই। স্বজাতির প্রতি অতিমাত্র পক্ষপাতও যেমন স্থলবিশেষে একপ্রকার কৌশলমাত্র, জাতিনির্বিশেষে একান্ত অপক্ষপাতও স্থলবিশেষে সেইরূপ কৌশল ছাড়া আর কিছু নহে। নিয়ু ইণ্ডিয়ার সম্পাদকের পক্ষে এটুকুর কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ, তিনি দুর্বল নহেন।

প্রাচ্যদের সম্বন্ধে ইংরেজদের কতকগুলি বাঁধিবুলি আছে, আমাদের "রিফাইণ্ড" নিষ্ঠুরতা তাহার মধ্যে একটা। পূর্বদিকটা একটা মস্তদিক—এদিকে যাহারাই বাস করে, তাহাদের সকলকে এক নামের অধীনে একশ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া ভূগোলবৃত্তান্ত রচনা করিলেই যে তাহারা দানা বাঁধিয়া এক হইয়া যায়, তাহা নহে। বিদেশীরা সামান্য বাহ্যসাদৃশ্যের ভিতর দিয়া বৈসাদৃশ্য ধরিতে পারে না। একজন চাষার চক্ষে এক গোরার সঙ্গে আর-এক গোরার ভেদ সহজে ধরা পড়ে না—ইংরেজের অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে একজন বাঙালিও যেমন, আর-একজনও প্রায় সেইরূপ। এই কারণেই য়ুরোপীয়েরা সমস্ত প্রাচ্যজাতিকে একটা পিণ্ড পাকাইয়া দেখে এবং সকলের দোষগুণকে একটা নামের ঝোলার মধ্যে ভরিয়া "ওরিয়েন্টাল" লেব্‌ল আঁটিয়া দেয়।

য়ুরোপীয়েরা আমাদের আধুনিক গুরু, সুতরাং তাঁহাদের কাছ হইতে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে অন্ধতাটুকুও আমরা শিখিয়াছি। রিফাইণ্ড পাশবিকতায় এশিয়া য়ুরোপীয়ের চেয়ে অধিক বাহাদুরি কী পাইতে পারে, ইতিহাস ঘাঁটিয়া তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে চাহি না। কিন্তু স্বজাতিপক্ষপাতের অপবাদটুকু শিরোধার্য করিয়া এ-কথা অন্তরের সহিত, দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি যে, হিন্দুকে অকর্মণ্য বল,

অবোধ বল, দুর্বল বল সহ্য করিয়া যাইব, কারণ, সহ্য করা আমাদের অভ্যাস আছে। কিন্তু হিন্দুজাতির সত্যমিথ্যা নানা অপযশের মধ্যে রিফাইণ্ড পাশবিকতার অপবাদটা সব-চেয়ে অন্যায়। আর এশিয়াটিক-নামক বন্ধনবিহীন একটা প্রকাণ্ড বিচিত্র ব্যাপারের সহিত য়ুরোপীয় বলিয়া একটি ক্ষুদ্র ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ের পশুত্ব, মনুষ্যত্ব, বা দেবত্বর তুলনা একেবারেই অসংগত, অনর্থক। একটা মানকচুর সহিত একটা বাগানের তুলনা হইতেই পারে না।

এটা একটা অবান্তর কথা। মোটের উপর, সম্পাদক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহার প্রশংসা করিতেই হইবে। ইহার মধ্যে চাপা কথা ঢের আছে, তাহা চাপাই থাক্। আমরা কেবল একটি কথা যোগ করিতে চাই মাত্র।

যাহার হাতে শক্তি আছে, সে যে স্বসম্প্রদায়ের দিকে টানিয়া অবিচার করিবে, ইহা মানুষের স্বভাব। ইংরেজও মানুষ, তাই সে ইংরেজ-ক্রিমিনালকে সাজা দিয়া উঠিতে পারে না। যাহার হাতে শক্তি নাই, সে প্রবলের অন্যায়বিচার অগত্যা সহ্য করে, ইহাও মানুষের স্বভাব। আমরাও মানুষ, তাই আমাদিগকে ইংরেজের আক্রমণ চুপ করিয়া সহ্য করিতে হয়। এই এক জায়গায় মনুষ্যত্বের সমনিম্নভূমিতে ইংরেজের সঙ্গে আমরা একত্রে মিলিতে পারিয়াছি।

নূতন ইস্কুল হইতে বাহির হইয়া যখন সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী প্রভৃতি বিদেশী বচনগুলি বাংলায় তর্জমা করিবার ভার আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন আমরা এই জানিতাম যে, য়ুরোপ বাহুবলে প্রবল হইলেও মনুষ্যত্বের অধিকার সম্বন্ধে দুর্বলের সহিত আপনার সাম্য স্বীকার করেন। তখন আমরা ইস্কুলের উত্তীর্ণ ছেলেরা একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, ইহারা দেবতা। আমরা চিরকাল ইহাদিগকে পূজা করিব এবং ইহারা চিরকাল আমাদিগকে প্রসাদ বিতরণ করিবে—ইহাদের সহিত আমাদের এই সম্বন্ধই শাশ্বত। আমরা মনের ভিতর হইতে ইহাদের কাছে সম্পূর্ণ হার মানিয়াছিলাম।

আজ যখন বুঝিতেছি, ইহারা আমাদের অসমকক্ষ নহে—আমরাও দুর্বল, ইহারাও দুর্বল—আমাদের অক্ষমের দুর্বলতা, ইহাদের সক্ষমের দুর্বলতা—তখন অভিভূতির ভার কাটিয়া গিয়া আমরা মাথা তুলিতে পারি। ইংরেজ ক্রমাগত আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, ন্যায়পরতা প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমাদের স্বশ্রেণীর কোনো জাতির সহিত আমাদের তুলনাই হয় না। এক সময়ে ইংরেজ যেন এই ধর্মশ্রেষ্ঠতার প্রেস্টিজ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। যে-ব্যক্তি অক্ষমের নিকট ধর্মরক্ষা করিয়া চলে, তাহার কাছে হার না মানিয়া থাকা যায় না—সেকালে আমাদের

মন হার মানিয়াছিল। এখন ইংরেজ প্রতাপের প্রেস্টিজ সর্বাগ্রগণ্য করিয়াছে—স্বদেশী ও এ-দেশীকে ধর্মের চক্ষে সমান করিবার বল ও সাহস এখন তাহার নাই—এখন ইংরেজের কাছে ইংরেজ-গবর্মেণ্ট দুর্বল। এখন ম্যাঞ্চেস্টার রাজা, বার্মিংহাম রাজা, নীলকর রাজা, চা-কর রাজা, চেম্বর অফ কমার্স রাজা,—তাই আজকাল আমাদের প্রতি ভয়-দ্বেষ-ঈর্ষার নানা লক্ষণ দেখিতে পাই। দেখি, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে আমরা তাড়া খাইতেছি, আপিস হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি, ডাক্তারিশিক্ষায় বাধা পাইতেছি, বিজ্ঞানশিক্ষায় গূঢ়ভাবে প্রতিহত হইতেছি। ইহাতে আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, কিন্তু এই সান্ত্বনাটুকু পাইতে পারি যে, কর্তারা আমাদের চেয়ে বেশি বড়ো নহে। ইহারা আমাদের অগ্রাহ্য করিয়া বাঁচে না—ইহাদের মনে এ-আশঙ্কাটুকু আছে যে, সুযোগ পাইলে আমরা বিদ্যায় ক্ষমতায় ইহাদের সমান হইয়া উঠিতে পারি। ইংরেজ-ক্রিমিনাল দেশীয়ের প্রতি অন্যায় করিয়া ন্যায়সংগত শাস্তি পাইলে ইংরেজকে দেশীয় আপন সমতুল্য বলিয়া জ্ঞান করিবে, এই ভয়টুকু যখন ইংরেজের মনে প্রবেশ করিয়াছে, তখন তাহার আত্মসম্মান নষ্ট হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আমাদের চিত্তও ইংরেজের কাছে নতিস্বীকারের দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতেছে—প্রত্যহ তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

সম্পাদকমহাশয় বলেন, আমরা যদি ঘুষির পরিবর্তে ঘুষি ফিরাইতে পারি, তবে রাস্তায়-ঘাটে ইংরেজকে অনেক অন্যায় হইতে নিরস্ত রাখিতে পারি। কথাটা সত্য—মুষ্টিযোগের মতো চিকিৎসা নাই—কিন্তু সম্পাদকের উপদেশ সহসা কেহ মানিতে রাজি হইবে না। তাহার গুটিকতক কারণ আছে।

একটি কারণ এই যে, আমরা একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ হইয়াছি—পরস্পর মিলিয়া-মিশিয়া থাকিবার যত-কিছু আদেশ-উপদেশ-অনুশাসন সমস্তই শিশুকাল হইতে আমাদিগকে প্রত্যহ পালন করিতে হইয়াছে। ঘুষাঘুষি করা, বিবাদ করা, পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা ও নিজের অধিকার লড়াই করিয়া রাখা, একান্নবর্তী পরিবারে কিছুতেই চলে না। আমাদের পরিবার ভালোমানুষ হইবার, পরস্পরের অনুকূলকারী হইবার, একটি কারখানাবিশেষ। অতএব ঘুষি শিক্ষা করিলেও মানুষের নাসিকাগ্রে ও চক্ষুতারকায় তাহা নির্বিচারে প্রয়োগ করিবার ক্ষিপ্রকারিতা আমাদের অভ্যাস হয় না। নিজের অসুবিধা করিয়াও পরস্পরের সহিত মিলিবার ভাবই আমাদের স্বভাব ও অভ্যাসসংগত—পরস্পরের সহিত লড়িবার ভাব আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোথাও স্ফূর্তি পাইবার স্থান পায় নাই।

এক, ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে যেটুকু বীররসের অবসর আছে, কর্তৃপক্ষ তাহা সহজে

প্রশ্রয় দিতে চান না। তাঁরা কেবলই বলেন, আমাদের ছাত্রদিগকে যথেষ্ট শাসনে রাখা হয় না। তাঁহাদের স্বদেশে ছাত্রেরা যে-ভাবে মানুষ হয়, এ-দেশের ছাত্রদের ব্যবহারে তাহার আভাসমাত্রও তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। যাহা দলন করিতে হইবে, তাহা অঙ্কুরেই দলন করা ভালো, এ-কথা ইংরেজ জানে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। কোনো কলেজের ছাত্র ফুটবল খেলিতে খেলিতে আহত হইয়াছিল। তাহার সঙ্গীরা শুশ্রূষার প্রয়োজনে কাছের একটি সরোবর হইতে কাপড়ে ভিজাইয়া জল লইয়াছিল। সেই সরোবর সাহেবদের পানীয় জলের জন্য সুরক্ষিত ছিল। সেখানে ছাত্রকে নাবিতে দেখিয়া পাহারাওআলা নিষেধ করে। সেই উপলক্ষ্যে উভয়পক্ষে বচসা, এমন কি, হাতাহাতিও হইয়া থাকিবে। ম্যাজিস্ট্রেট সেই ছাত্রকয়টিকে লইয়া দীর্ঘকাল তাঁহার ডিস্ট্রিক্টের যত দুর্গম স্থানে যে-কৌশলে ঘুরাইয়া-মারিয়া অবশেষে জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহা সেই ছাত্রগণ ও তাহাদের অভিভাবকেরা কোনো-কালে ভুলিতে পারিবে না। বাল্যলীলার এরূপ দণ্ডবিধি ইংরেজের নিজের দেশে যে নাই, সে-কথা সকলেই জানেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো বিদ্যালয়েও, দেশীয় প্রিন্সিপালের বিচারেও, ছাত্রদিগকে যে-সকল লঘুপাপে গুরুদণ্ড সহ্য করিতে হয়, তাহাতে তাহাদের পৌরুষচর্চা হয় না।

এই তো গেল ঘরে এবং বিদ্যালয়ে। তাহার পরেও যদি ইংরেজ-অন্যায়কারীর গায়ে ঘুষি তুলিবার মতো স্ফূর্তি কাহারও থাকে, তবে বিচারালয় আছে। দেশীয়দের বিরুদ্ধ-চারী ইংরেজ-ক্রিমিনালের প্রতি ইংরেজ-বিচারকের মানবস্বভাবসংগত পক্ষপাত সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করেন—সেই স্বাভাবিক পক্ষপাত দেশীয় অপরাধীর পক্ষে কী আকার ধারণ করিতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান-যুবা গড়ের মাঠে গাড়ি হইতে অন্য গাড়ির একজন ইংরেজকে চাবুক মারিয়া জেলে গিয়াছিল মনে আছে—এলাহাবাদের সোমেশ্বর দাসের কথাও আমরা ভুলিতে পারি না। ইংরেজের গায়ে হাত দিতে দিয়া গ্রামশুদ্ধ দোষী-নির্দোষী বহুতর লোকের কিরূপ অসহ্য লাঞ্ছনা ঘটে, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। তাহার কারণ, এ-দেশে পোলিটিকাল নীতিতে অন্য নীতিকে জটিল করিয়া ফেলে। এদেশে ইংরেজকে মারার মধ্যে ব্যক্তিগত মার এবং পোলিটিকাল মার, দুই আছে—ইস্কুলের ছেলের তুচ্ছ ক্রীড়ার মধ্যে ভাবীকালের পোলিটিকাল সংকটের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে—সুতরাং আমাদের ব্যক্তিগত অপমানের প্রতিকার করিতে গিয়া আমরা হঠাৎ পোলিটিকালের মধ্যে পা দিয়া ফেলি, তখন সহসা কাঁধের উপরে যে-দণ্ডটা আসিয়া পড়ে, তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝিতে আমাদের কিছু বিলম্ব হয়। দেশীয়ের প্রতি উপদ্রব করিয়া ইংরেজ অল্প দণ্ড ও ইংরেজের গায়ে

হাত দিয়া আমরা গুরু দণ্ড পাই, ইহার মধ্যে শুধু যে মনুষ্যধর্ম আছে তাহা নহে, তাহার সঙ্গে রাজধর্মও যোগ দিয়াছে। এ-স্থলে ঘুষি তোলা কম কথা নহে।

মনুষ্যস্বভাবে সাহসের একটা সীমা আছে। জাহাজের একজন কাপ্তেন হাজার অন্যায়কারী হইলেও তাহার অধীনস্থ য়ুরোপীয় নাবিকদল সংখ্যাধিক্যসত্ত্বেও সকলপ্রকার অপমান ও দৌরাত্ম্য অগত্যা সহ্য করিয়াছে, এরূপ ঘটনার কথা অনেক শুনা গিয়াছে। আইনের শাসনকে উপেক্ষা করা শক্ত। জাষ্টিস্ হিল ইংরেজ-ক্রিমিনালকে উপদেশ দিবার প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন, তোমার স্বদেশীয় ভৃত্য তোমার এরূপ ব্যবহার সহ্য করিত না। না করিবার কারণ আছে। বিচারের চক্ষে স্বদেশীয় ভৃত্য ও স্বদেশীয় মনিব সম্পূর্ণ সমান। সে-স্থলে মনিবের দুর্ব্যবহার সহ্য না করিবার প্রভূত বল ভৃত্যের আছে। সে-বল ভৃত্যের একলার বল নহে, তাহা তাহার সমস্ত স্বজাতির বল। এই বিপুল বলের সহিত একজন দেশীয় ভৃত্যের একলার বলের তুলনা করা ঠিক নহে।

এখানেও একান্নবর্তী পরিবারের কথা পাড়িতে হয়। একজন ইংরেজের উপর অল্প লোকেরই নির্ভর—আমরা প্রত্যেকেই বহুতর আত্মীয়ের সহিত নানাসম্বন্ধে আবদ্ধ। সেই সকল সম্বন্ধ আমাদিগকে ত্যাগপরতা, সংযম, মঙ্গলনিষ্ঠা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের উচ্চতর গুণে ভূষিত করিয়াছে—সেই সকল সম্বন্ধই হিন্দুজাতিকে রিফাইণ্ড ও অকৃত্রিম পাশবিকতা হইতে দূরে রাখিয়াছে—আমাদের পক্ষে হঠকারিতা সহজ হইতেই পারে না, আমাদিগকে জেলের দিকে আকর্ষণ করিলে অনেকগুলা শিকড়েই সাংঘাতিক টান পড়ে। অতএব আমাদের জীর্ণ প্লীহা ইংরেজের বুটাগ্রের পক্ষে যেরূপ সহজ লক্ষ্য, ইংরেজের নাসাগ্র আমাদের বদ্ধমুষ্টির পক্ষে সেরূপ সুন্দর সুগম নহে। সেজন্য ইংরেজ যদি নিজেকে আমাদের চেয়ে বেশি বাহাদুর মনে করেন তো করুন—কিন্তু আমরা কেন ইংরেজের তরফ হইতে স্বজাতিকে বিচার করি? যে-ভাবে আমরা চিরকাল মনুষ্যত্বচর্চা করিয়া আসিতেছি, ইংরেজের সহিত সংঘাতে তাহাতে আমাদের অসুবিধা ও অপমান ঘটিতেছে। তা হইতে পারে—কিন্তু তাই বলিয়া মনুষ্যত্বে আমরা খাটো, এ-কথা আমরা তো স্বীকার করিতে পারিব না। মানুষ হইতে গেলে দাঁত-নখের খর্বতা ঘটিয়া থাকে—তাই বলিয়া কি লজ্জা পাইব? রোমের সম্রাট নগ্ন-নিরস্ত্র খ্রীস্টানদিগকে ক্রীড়াঙ্গনে পশু দিয়া হত্যা করিয়াছিলেন—ধর্মরাজ যদি তাহার বিচার করিয়া থাকেন, তিনি কি রোমরাজের পৌরুষকেই সম্মান দিয়াছেন? আমরা যদি যথার্থভাবে সহ্য করিতে পারি, আমরা যদি সহিষ্ণুতার জন্য নিজেকে হেয় বলিয়া অন্যায় ভ্রম না করি, তবে ধর্ম আমাদের বিচার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু রচনানীতির খাতিরে বা যে-কারণেই হউক, এ-কথা আমরা যেন অনায়াসেই উচ্চারণ করিয়া না বসি যে, আমরা হইলেও ঠিক

এইরূপ করিতাম বা ইহাদিগকেও ছাড়াইয়া যাইতাম। না, আমরা হইলে এরূপ করিতাম না। ইহাই আমাদের সান্ত্বনা। আমাদের সমাজের আমাদের ধর্মের যে-আদর্শ, আমাদের শাস্ত্রের যে-অনুশাসন, আমাদের স্বভাবের যে-গতি, তাহাতে অক্ষমকে আমরা আত্মীয়শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতাম। আমরা ভিক্ষুককে, দুর্বলকে, প্রাচীনকে কখনো অবজ্ঞা করি নাই।

রাজা এবং রাজকুটুম্ব ঠিক এক নহে, কিন্তু তবু রাজসম্পর্কের গন্ধ থাকিলেও কুটুম্বদের উৎপাত সহ্য করিতেই হয়। মৃচ্ছকটিকের রাজশ্যালকের কথা পাঠকগণ স্মরণ করিবেন। প্রভেদ এই যে, উক্ত কুটুম্ববর্গের সংখ্যা এখন অনেক বাড়িয়া গেছে।

মৃচ্ছকটিকের সেই রাজশ্যালকটি যতই উপদ্রব করুক না কেন, প্রজাবর্গের কাছে তাহার সম্মান ছিল না—সকলেই তাহাকে উৎপাত বলিয়াও জানিত, অথচ তাহাকে মনে-মুখে পরিহাস-বিদ্রূপ করিতে ছাড়িত না। এখনকার রাজশ্যালকগণের নিকট হইতে ঠিক সে-পরিমাণ হাস্যরস আদায় করা কঠিন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহারে তাঁহারা প্রত্যহ আমাদের কাছে যে-পরিমাণে সম্ভ্রম হারাইতেছেন, তাহা যেন আমাদের মাথা তুলিবার সহায়তা করে।

১৩১০

ঘুষাঘুষি

গত বৈশাখমাসের বঙ্গদর্শনে "রাজকুটুম্ব"-শীর্ষক প্রবন্ধে নিয়ু ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত কোনো রচনার সমালোচনা করা হইয়াছিল। নিয়ু ইণ্ডিয়ার সম্পাদকমহাশয় আমাদিগকে ভুল বুঝিয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, এক গালে চড় খাইয়া অন্য গাল ফিরাইয়া দেওয়া যদি বা আমাদের মত না হয়, অন্তত অশ্রুজলপ্রবাহে আহতগণের আঘাতবেদনার উপশমচেষ্টাই আমাদের মতে শ্রেয়।

ইংরেজের ঘুষিঘাষা খাইয়া নাকিসুরে নালিশ করা এ-দেশে কিছুকাল পূর্বে অত্যন্ত অধিকমাত্রায় প্রচলিত ছিল। একটা কাককে ঢেলা মারিলে পৃথিবীসুদ্ধ কাক যেমন চীৎকার করিয়া মরে, দেশী লোকের মার খাইবার খবরে আমাদের খবরের কাগজগুলি তেমনি করিয়া অবিশ্রাম বিলাপপরিতাপে আকাশ বিদীর্ণ করিত।

আমরাই সর্বপ্রথমে 'সাধনা' পত্রিকায় এই নাকিকান্নার বিরুদ্ধে বারংবার আপত্তি উত্থাপন করিয়াছি—এবং কথঞ্চিৎ ফললাভ করিয়াছি, তাহাও দেখা যাইতেছে। আজ হঠাৎ আত্মপ্রতিবাদের যে কোনো কারণ ঘটিয়াছে, তাহা বোধ হয় না।

ছবিতে যেমন চৌকা জিনিসের চারিটা পাশই একসঙ্গে দেখানো যায় না, তেমনি প্রবন্ধেও একসঙ্গে একটা বিষয়ের একটি, বড়োজোর, দুইটি দিক দেখানো চলে। "রাজকুটুম্ব" প্রবন্ধেও আমাদের বক্তব্য বিষয় খুব ফলাও নহে। নিয়ু ইণ্ডিয়ার সম্পাদক-মহাশয় যখন ভুল বুঝিয়াছেন, তখন সম্ভবত আমাদের রচনায় কোনো ত্রুটি থাকিতে পারে। এবারে ছোটো করিয়া এবং স্পষ্ট করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষে যে মারে এবং যে মার খায়, এই দুই পক্ষের অবস্থা লইয়া আমরা কিঞ্চিৎ তত্ত্বালোচনা করিয়াছিলাম মাত্র। আমরা কোনো পক্ষকেই কর্তব্যসম্বন্ধে কোনো উপদেশ দিই নাই।

যে লোক জলে পড়িয়াছে, ডাঙা হইতে তাহাকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারা সহজ। অপর-পক্ষের সে-মার ফিরাইয়া দেওয়া শক্ত। এরূপ স্থলে কোন্ পক্ষকে কাপুরুষ বলিব? যে মারে, না যে মার ফিরাইয়া দেয় না?

ইংরেজের পক্ষে ভারতবর্ষীয়কে মারা নিতান্ত সহজ—কেবল তাহার গায়ে জোর আছে বলিয়া যে, তাহা নহে। সেও একটা কারণ বটে, কিন্তু সে-কারণকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। তাহার বাহুবল বেশি, কিন্তু তাহার পশ্চাতের বল আরও অনেক বেশি। তাহার দৃশ্যশক্তির সঙ্গে লড়াই চলে, কিন্তু তাহার অদৃশ্যশক্তি অত্যন্ত প্রবল। আমি যেমন একটি মানুষ, সে-ও যদি তেমনি একটি মানুষমাত্র হইত, তবে আমরা কতকটা সমকক্ষ হইতাম। কিন্তু এ-স্থলে আমি একটি ব্যক্তিমাত্র, আর সে ইংরেজ, সে রাজশক্তি। বিচারকালে, মানুষ বলিয়া আমার বিচার হইবে, আর তাহার বিচার হইবে ইংরেজ বলিয়া।

আর, আমি যখন ইংরেজকে মারি, তখন বিচারক সেটাকে এই বলিয়া দেখে যে, ভারতবর্ষের রাজশক্তিকে আমি আঘাত করিলাম, ইংরেজের প্রেষ্টিজকে আমি ক্ষুণ্ণ করিলাম—অতএব সামান্ত আঘাতকারী বলিয়া আমার বিচার হয় না।

আমাদের মধ্যে এই গুরুতর অসমকক্ষতা আছে বলিয়াই যে মার খায়, তাহার চেয়ে যে মারে, সেই কাপুরুষ বেশি। এই কাপুরুষতার জন্ম ইংরেজ আঘাতকারী বিচারে নিষ্কৃতি পাইয়াও যদি স্বজাতির কাছে ধিক্‌কারলাভ করিত, তাহা হইলে তাহাতেও আমরা একটু বল পাইতাম। কিন্তু দেখিতে পাই, উলটা তাহারা বেশি করিয়া সোহাগ পাইয়া থাকে। তাহাদের জন্ম চাঁদা ওঠে, স্বজাতীয় কাগজে আহা-উহুর অন্ত থাকে না। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ায় এইরূপ কাপুরুষতার জন্ম কেবল প্রকাশ্যে ভিক্টোরিয়া ক্রস দেওয়া হয় না, এই পর্যন্ত।

সম্প্রতি একজন দেশী লোককে খুন করিয়া মার্টিন বলিয়া একজন ইংরেজের

দ্বিতীয়বার বিচারে তিন বৎসর জেল হইয়াছে। ইহার পর হইতে ইংলিশম্যান প্রভৃতি কাগজে কিরূপ আতঙ্কের আর্তনাদ উঠিয়াছে, তাহার নিম্নলিখিত নমুনাটি কৌতুকজনক :

There are some things that foreign Governments, and even Native States in India, manage better than we do; one of these is the protection of their own kith and kin, and the maintenance of that prestige so necessary for upholding constituted authority. To the disinterested observer in India, it seems that the white man is becoming very much discounted under the ægis of the British "Raj." Time was when the Britisher, as conqueror and ruler of this land, enjoyed certain rights and privileges, and one of these was his right to be tried by jury. Quite recently we have had the spectacle of the unanimous verdicts of juries, acquitting Europeans, charged with offences triable by these tribunals, set aside, not because there was any outcry against such acquittals, or on the application of the prosecution, but on appeal by the Government against the acquittal. To quote one specific instance, we may refer to the trial of Mr. Rose, of Dulu Tea Estate, Cachar. The relations between Europeans and natives are becoming acutely antagonistic, and this racial gulf is being widened by the violent writings of the native press. The time has arrived to look into this question a little more closely. The unprovoked assaults on Europeans, especially soldiers, are becoming increasingly frequent. Europeans are insulted, abused and jeered at by the lowest type of natives and if they retaliate, they are set upon by a mob. If the European gets badly mauled, nothing is done, no one cares, but if in the brawl he happens to seriously hurt one of his numerous assailants, in the exercise of his right of self-defence, he is tried for his life and liberty. This we say is one-sided and it behoves the Government to look a little deeper into the causes at work that bring about these frequent conflicts between Europeans and natives.

দেখো, এই একটি সামান্ত ঘটনায় ইংলিশম্যান কম্পান্বিত। অন্তায় করিবার অপ্রতিহত ক্ষমতা যদি কোনো উপায়ে একটু খর্ব হয়, তবে কী আতঙ্কের বিষয়! ইহা

হইতে এই প্রমাণ হয় যে, এ-দেশে ইংরেজ অবিচারের বলেই আপনাকে বলী মনে করে। সেই বলের পশ্চাতে নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারা অত্যাচার করিবার সহজ স্বত্বকে চিরস্থায়ী করিতে চাহে। করিতে পারে করুক—কিন্তু ইহার পরে ভীরুতার অপবাদ আমাদিগকে দেওয়া আর চলে না।

ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে অপক্ষপাত বিচারে "কন্বর" ও "কলর"-দের যে প্রেস্টিজের হানি হয়, এ-আশঙ্কা এ-দেশের সাধারণ ইংরেজের মনে জাগিয়া আছে—জজ এবং জুরি নিতান্ত অসাধারণ না হইলে ইহার ব্যতিক্রম হয় না। অপক্ষপাতে সুবিচার করিতে যাহারা ভয় করে, তাহারা একদিকে আমাদের পক্ষে ভয়ানক, তেমনি আর-একদিকে তাহাদের এই ভীরুতাই আমাদের কাছে তাহাদের দুর্বলতা প্রতিপন্ন করে। আমাদের কাছে ইহাতে তাহাদের মর্যাদা কমিয়া গেছে। এখন আমরা ইংরেজকে ঘরে-ঘরে এবং মনে-মনে খাটো করিতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অন্ধভক্তি এক সময়ে আমাদিগকে যেরূপ সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া দিয়াছিল, এখন আমরা ক্রমশই তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতেছি। আমাদের দেশের চিরন্তন ধর্মনীতির যে-আদর্শ, তাহা প্রত্যহ আমাদের কাছে উজ্জ্বলতর হইয়া আসিতেছে। আমরা পাশ্চাত্য বর্বরতার নগ্নমূর্তি যতই দেখিতেছি, ততই আশ্রয়লাভের জন্য আমাদের স্বদেশীয় কুলায়ের মধ্যেই একে একে ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছি। এইরূপে আমাদের অপমানের মধ্য দিয়াও আত্মসম্মানের পথ কিরূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, আমার প্রবন্ধে তাহার আভাস ছিল।

আর-একটি কথা ছিল, বোধ হয় "নিয়ু ইণ্ডিয়া"-সম্পাদকমহাশয় সেইটেতেই আপত্তি করিয়াছেন। আমি বলিয়াছিলাম, আমাদের দেশে একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা এমন যে, বাল্যকাল হইতে আমাদিগকে সর্বপ্রকারে বিরোধের অপেক্ষা মিলনের জন্যই প্রস্তুত করে। আমাদিগকে আত্মত্যাগ এবং ধৈর্যই শিক্ষা দিতে থাকে। আমরা যদি ক্ষমায় দীক্ষিত না হই, তবে এতগুলি লোকের একত্রে থাকা অসম্ভব হয়। অতএব আমরা যে খপ করিয়া কাহারও নাক-চোখের উপর ঘুষি মারিতে, বা ভূপতিত ব্যক্তির মুখের উপর বা রাগ করিয়া কাহারও তলপেটে উপর্যুপরি লাথি মারিতে পারি না, তাহার কারণ আমাদের সাহসের অভাব নহে—তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের সামাজিক আদর্শে আমাদিগকে নিরীহ করিয়াছে। ইংরেজ কথঞ্চিৎ পরিহাসের ভঙ্গিতে আমাদিগকে "mild Hindu" বলিয়া থাকে—বস্তুতই আমরা মাইল্‌ড হিন্দু। ইহাতে আমাদের অসুবিধা ঘটিতেছে, তাহা দেখিতেছি এবং এখন বর্তমান অবস্থায় কী করা কর্তব্য, তাহাও বিচার্য—কিন্তু মাইল্‌ড বলিয়া আমাদের লজ্জায় ঘাড় হেঁট

করিবার কথা নহে। ভারতবাসী মৃত্যুকে ভয় করে বলিয়া যে কাহাকেও আক্রমণ করে না, তাহা নহে—বোয়ার-যুদ্ধে ভারতবর্ষীয় ডুলিবাহকেরাও দেখাইয়াছে যে, তাহারা বিনা উত্তেজনাতেও অবিচলিত ভাবে মৃত্যুর মুখের সম্মুখে আপনার কাজ করিয়া যাইতে পারে—[১] কিন্তু তাহার ধর্ম, তাহার সমাজ তাহার হিংস্রপ্রবৃত্তি লোপ করিয়া দিয়াছে—এতদূর করিয়াছে যে, তাহাতে তাহার স্বার্থহানি ও অসুবিধা ঘটে এবং তাহার মানহানি ঘটিতেছে। এই নিরীহতাকে যদি তিরস্কার করিতে হয়, তবে ভীরুতাকে যে-ভাষায় করিবে, ইহাকেও কি সেই ভাষায় করিবে?

যাহাই হউক, ইংরেজের মার খাইয়া মার ফিরাইয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে কী কী কারণে সহজ নহে, "রাজকুটুম্ব" প্রবন্ধে তাহারই আলোচনার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ফিরাইয়া দেওয়া উচিত কিনা, সে-কথা তুলি নাই। কর্তব্য দুঃসাধ্য হইলেও কর্তব্য—বরঞ্চ সে-কর্তব্যের গৌরব বেশি। এলাহাবাদের কোনো দেশীয় ধনী ব্যাঙ্কর স্বত্বরক্ষা উপলক্ষ্যে তাঁহার কোনো ইংরেজ ভাড়াটিয়াকে ফুলগাছের টব লইতে ভৃত্যদের দ্বারা বাধা দেন—সেই স্পর্ধায় তাঁহার কারাদণ্ড হয়। স্বত্বরক্ষা বা আত্মরক্ষা বা মানরক্ষার খাতিরে কোনো ইংরেজের গায়ে হাত তুলিলে তাহার পরিণাম সুখজনক না হইতে পারে এ-আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও যখন আমাদের দেশের লোক আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করিতে শিখিবে, তখনই ইংরেজের কাপুরুষতার সংশোধন হইবে—এই অত্যন্ত সহজ কথাটি যদি অস্বীকার করি, তবে স্বভাবের নিয়ম সম্বন্ধে আমার সুগভীর অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে।

স্বভাবের নিয়মের অপেক্ষা উচ্চতর নীতি আছে। কিন্তু সে-নীতি যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত বাধা পরাভূত করিয়া নিজেকে দুর্নিবারভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া তোলে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বভাবের নিয়মকেই আশ্রয় করিতে হয়।

কিন্তু এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই যে ঘুষাঘুষির উত্তেজনা আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আমাদের ধর্মনীতিতে আঘাত না করিয়া থাকিতে

১ স্যাভেজ ল্যাণ্ডর নামক ভ্রমণকারী যখন তিব্বতভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সমুদয় ভৃত্যই প্রাণভয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, কেবল চন্দনসিং ও মানসিং বলিয়া তাঁহার যে দুটিমাত্র হিন্দুভৃত্য ছিল, তাহারা কখনো পলায়নের চেষ্টামাত্রও করে নাই—তাহারা আসন্নমৃত্যুর শঙ্কায় এবং অসহ্য উৎপীড়নেও অবিচলিত থাকে—অথচ নূতন দেশ আবিষ্কারের উত্তেজনা, সমাজে যশের প্রত্যাশা বা ভ্রমণবৃত্তান্ত ছাপাইয়া অর্থলাভের প্রলোভন, তাহাদের কিছুই ছিল না। তাহাদের প্রভুও বিদেশী এবং অন্যদিনের—কিন্তু তাহারা হিন্দু, অন্যকে মারিবার জন্য তাহারা সর্বদাই উদ্যত নয়, অথচ মরিতে ভয় করে না।

পারে না। অশুভপ্রবৃত্তি প্রয়োজনটুকু সিদ্ধ করিয়াই অন্তর্ধান করে না। তাহাকে দাসত্বের ছুতায় আহ্বান করিলেও শেষে সে রাজত্ব করিতে চায়। কোনো কোনো দুর্বৃত্ত মদ না খাইলে যেমন কাজ করিতে পারে না বিদ্বেষ সেইরূপ অন্ধ না হইলে পুরাদমে কাজ করিতে পারে না। গুণ্ডাগিরিকে যদি একবার রীতিমতো জাগাইয়া তুলি, তবে সে অন্ধবিদ্বেষের নেশায় না মাতিয়া থাকিতে পারিবে না। তখন সে উঠিয়া-পড়িয়া কাজ আরম্ভ করিবে বটে, কিন্তু আমাদের উচ্চতন মনুষ্যত্বের বুকের রক্ত হইতে সে প্রতিদিন তাহার খোরাক আদায় করিতে থাকিবে। গুণ্ডাগিরি বল পাইয়া উঠিয়া মনুষ্যত্বকে শোষণ করে—বাহাদুরির নেশা জাগিয়া ওঠে।

এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে, শুষ্ক উপদেশে কোনো ফল হয় না—অভ্যাস তাহা অপেক্ষা দরকারি জিনিস। মারা উচিত বলিলেই মারা যায় না, মারা অভ্যাস করা চাই। যাহাদের ঘুষি প্রস্তুত হইয়া আছে, তাহারা শিশুকালে প্রতিবেশীর ছেলেকে মারে, বিদ্যালয়ে সহপাঠীকে মারে, কলেজে gownsman হইয়া townsmanকে মারে—এমনি করিয়া একেবারে এমন পাকিয়া যায় যে, তাহাদের ধর্মগ্রন্থের উপদেশ অরণ্যে রোদনে পরিণত হয়। তাই হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁহার Facts and Comments গ্রন্থের ৩০তম পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন :

But the refusal to recognize the futility of mere instruction as a means to moralization, is most strikingly shown by ignoring the conspicuous fact that after two thousand years of Christian exhortations, uttered by a hundred thousand priests throughout Europe, pagan ideas and sentiments remain rampant, from emperors down to tramps. Principles admitted in theory are scorned in practice. Forgiveness is voted dishonourable. An insult must be wiped out by blood : the obligation being so peremptory that an officer is expelled from the army for even daring to question it. And in international affairs the sacred duty of revenge, supreme with the savage, is supreme also with the so-called civilized.

ইহা না হইয়া যায় না। চালের একটি খড় পোড়াইতে গেলেও সমস্ত চালে আগুন লাগে। কাড়াকাড়ি-ঘুষাঘুষিকে সমাজের সর্বত্র প্রচলিত করিলে, তবেই আবশ্যকের সময় তাহা অনায়াসপ্রাপ্য হয়।

টুথ প্রভৃতি বিলাতি কাগজে পুলিস-আদালতের বিবরণে নিজের স্ত্রীকে, পুত্র-কন্যাকে, আত্মীয়-প্রতিবেশীকে যেরূপ নির্মম পাশবভাবে আঘাত করার উদাহরণ

দেখিতে পাই, আমাদের হিন্দুসমাজে তাহার সিকির সিকিও দেখা যায় না। শিকারি বিড়ালের গোঁফ দেখিলেই চেনা যায়;—কে পিলা ফাটাইবে এবং কাহার পিলা ফাটিবে, এই পুলিসের বিবরণী হইতেই তাহা স্পষ্ট দেখা যাইবে।

আমাদের দেশে ছেলেতে-ছেলেতে ঝগড়া যদি মারামারি পর্যন্ত ওঠে, তবে যাহাতে আঘাত গুরুতর না হয়, লড়াইকারীর সে-চেষ্টা বরাবর থাকে—গালে চড়, পিঠে চাপড়ের ঊর্ধ্বে প্রায় ওঠে না। সে আমাদের সমাজের শিক্ষা; দূর হইতে সুদূরে আত্মীয়তা বিস্তার করাই আমাদের অভ্যাস,—আমরা ঘনিষ্ঠ হইয়া বাস করি—আমরা যদি ক্ষমা না করি, ধৈর্য না ধরি, তবে আমাদের সমাজ ভাঙিয়া যায়, শাস্ত্রের শিক্ষা ব্যর্থ হয়।

অতএব আমাদের দুই জাতের দুইরকম আচরণ। য়ুরোপে শাস্ত্রের শিক্ষা ও সমাজের ব্যবহার পরস্পরবিরোধী। আমাদের সমাজ ক্ষমা, ধৈর্য, সন্তোষ ও সর্বভূতে দয়া, এই শাস্ত্রমতের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজে সুদীর্ঘকাল হইতে আমাদের চরিত্র গঠিত। অতএব মারামারিতে আমাদিগকে ইংরেজের কাছে হঠিতে হয়—কেবল ভয়ে নহে, অনভ্যাসে।

যদি হঠিতে না চাও, তবে শিশুকাল হইতে ঘরে-পরে সর্বত্র তাহার আয়োজন করিতে হয়। যাহা আমার, তাহাতে কাহাকেও অংশ বসাইতে দিব না; যাহা পরের তাহা জবরদখল করিতে চেষ্টা করিব; দুর্বল সহপাঠীর উপর অন্যায় অত্যাচার করিব; ঘুষি মারিবার সময় কাহারও নাকচোখ বাঁচাইয়া চলিব না, এবং নিষ্ঠুরতায় বিমুখ হওয়াকে পৌরুষের অভাব বলিয়া গণ্য করিব।

এইরূপে যখন আমাদের আমূল পরিবর্তন হইবে, তখন ইংরেজে-দেশীতে হাতাহাতি সমানভাবে চলিবে। বাঘে-সিংহে থাবা-মারামারি যেমন অত্যন্ত আমোদজনক দৃশ্য, আমাদেরও দাঁত-ভাঙাভাঙি সেইরূপ পরমকৌতুকাবহ হইতে পারিবে।

নতুবা কী হইবে? যে-ব্যক্তি শিক্ষায় ও অভ্যাসে ও পুরুষানুক্রমে স্বভাববর্বর নহে, সে যদি কর্তব্যের অনুরোধে চোখকান বুজিয়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হয়, তবে যে ভীষণ বর্বরতাকে জাগাইয়া তুলিবে, তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উপযুক্ত নখদন্ত কোথায় মিলিবে? আমরা উপদেশের তাড়নায় অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ আরম্ভ করিব, কিন্তু যে নিষ্ঠুর বিদ্বেষ উন্মথিত হইয়া উঠিবে, সেই হলাহল অনায়াসে গলাধঃকরণ করিবার শক্তি ও অভ্যাস আমাদের নাই।

আমি এ-কথা ভয় হইতে বলিতেছি না। দাঁত ভাঙা, নাক থ্যাবড়ানো, জেলে যাওয়া অত্যন্ত গুরুতর অশুভ বলিয়া গণ্য না-ই হইল। কিন্তু যে-গরলকে পরিপাক

করিতে আমরা স্বাভাবিক কারণেই অক্ষম, সেই গরলকে উদ্রিক্ত করিয়া তোলা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক কিনা, জানি না।

কিন্তু একটা অবস্থা আছে, যখন ফলাফল বিচার অসংগত এবং অন্যায়। ইংরেজ যখন অন্যায় করিয়া আমাকে অপমান করে, তখন যতটুকু আমার সামর্থ্য আছে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিয়া জেলে যাওয়া এবং মরাও উচিত। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, হয়তো ঘুষায় পারিব না এবং হয়তো বিচারশালাতেও দোষী সাব্যস্ত হইব; তথাপি অন্যায় দমন করিবার জন্য প্রত্যেক মানুষের যে স্বর্গীয় অধিকার আছে, যথাসময়ে তাহা যদি না খাটাইতে পারি, তবে মনুষ্যের নিকট হেয় এবং ধর্মের নিকট পতিত হইব। নিজের দুঃখ ও ক্ষতি আমরা গণ্য না করিতে পারি, কিন্তু যাহা অন্যায়, তাহা সমস্ত জাতির প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অন্যায় এবং বিধাতার ন্যায়দণ্ডের ভার আমাদের প্রত্যেকের উপরেই আছে। বিদ্বেষ হইতে, বাহাদুরি হইতে, স্পর্ধা হইতে নিজেকে সর্বপ্রযত্নে বাঁচাইয়া, ন্যায়নীতির সীমার মধ্যে কঠিনভাবে নিজেকে সংবরণ করিয়া দুষ্টশাসনের কর্তব্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। শারীরিক কষ্ট, ক্ষতি বা অকৃতকার্যতা ভয়ের বিষয় নহে—ভয়ের বিষয় এই যে, ধর্মকে বিস্মৃত হইয়া প্রবৃত্তির হাতে পাছে আত্মসমর্পণ করি, পরকে দণ্ড দিতে গিয়া পাছে আপনাকে কলুষিত করি, বিচারক হইতে গিয়া পাছে গুণ্ডা হইয়া উঠি। আমরা দেখিয়াছি, দুই দিক বাঁচাইয়া চলা সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, এইজন্য ভালোমন্দ ওজন করিয়া অনেক সময় আমাদিগকে একটা দিক অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে সেরূপ রফা করিতে গেলেই সেই ছিদ্রযোগে শনি প্রবেশ করে—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যে সামঞ্জস্যপথ আছে, তাহা অত্যন্ত দুরূহ হইলেও তাহাই আমাদিগকে নিয়তযত্নে অনুসন্ধান ও অবলম্বন করিতে হইবে—নতুবা বিনাশপ্রাপ্ত হইতেই হইবে। ধর্মের এই অমোঘ নিয়ম হইতে য়ুরোপ বা এশিয়া কাহারও নিষ্কৃতি নাই।

অতএব ঘুষাঘুষি-মারামারির কথা যখন ওঠে, তখন সাবধান হইতে বলি। দেবতার তূণেও অস্ত্র আছে, দানবের তূণও শূন্য নহে—অপ্রমত্ত হইয়া অস্ত্র নির্বাচন যদি করিতে পারি, তবেই যুদ্ধের অধিকার জন্মে, তখন

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

১৩১০

বঙ্গবিভাগ

বঙ্গবিভাগ এবং শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে একটি অপূর্বত্ব বিদেশী লোকেরাও লক্ষ্য করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, এবারকার বক্তৃতাদিতে রাজভক্তির ভড়ং নাই, সামলাইয়া কথা কহিবার প্রয়াস নাই, মনের কথা স্পষ্ট বলিবার একটা চেষ্টা দেখা গিয়াছে। তা ছাড়া, এ-কথাও কোনো কোনো ইংরেজি কাগজে দেখিয়াছি যে, রাজার কাছে দরবার করিয়া কোনো ফল নাই,—এমনতরো নৈরাশ্যের ভাবও এই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে।

কনগ্রেস প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক সভাস্থলে আমরা বরাবর দুই কূল বাঁচাইয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছি। রাজভক্তির অজস্র গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা আমরা সর্বপ্রথমেই গোরার মনোহরণব্যাপার সমাধা করিয়া তাহার পরে কালার তরফের কথা তুলিয়াছি। হতভাগ্য হতবল ব্যক্তিদের এইরূপ নানাপ্রকার নিষ্ফল কলকৌশল দেখিয়া নিষ্ঠুর অদৃষ্ট অনেকদিন হইতে হাস্য করিয়া আসিয়াছে।

এবারে কিন্তু দুর্বল ভীরুর স্বভাবসিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় নাই—প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিরাও একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া সোজা সোজা কথা কহিয়াছেন।

ইহার কারণ এই, যে-দুটো ব্যাপার লইয়া আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে, সে দুটোই আমাদের মনে গোড়াতেই একটা অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে। এ-দুটো ব্যাপারের ভিত্তিই অবিশ্বাস।

এই অবিশ্বাসের যথার্থ হেতু আছে, কি না আছে, তাহা লইয়া তর্ক করা মিথ্যা—কারণ চাণক্য স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক এবং রাজা উভয়ের মনস্তত্ত্ব সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়। এবং যাহা দুর্জ্ঞেয়, আত্মরক্ষার জন্য দুর্বল লোকে তাহাকে গোড়াতেই অবিশ্বাস করিয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক।

বর্তমান আন্দোলনে আমরা এই কথা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি যে, য়ুনিভার্সিটি বিলের দ্বারা তোমরা এ-দেশের উচ্চশিক্ষা, স্বাধীন শিক্ষার মূলোচ্ছেদ করিতে চাও এবং বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তোমরা বাঙালিজাতিকে দুর্বল করিতে ইচ্ছা কর।

শিক্ষা এবং ঐক্য, এই দুটাই জাতিমাত্রেরই আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার চরম সম্বল। এই দুটার প্রতি ঘা পড়িয়াছে, এমন যদি সন্দেহমাত্র মনে জন্মায়, তবে ব্যাকুল হইয়া উঠিবার কথা। বিশেষত যখন মনে জানি অপর পক্ষ বলিষ্ঠ, আমাদের হাতে কোনো উপায় নাই, এবং যাঁহারা আমাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই আমাদের সহায় ও সখা বলিয়া আহ্বান করিতে হইবে।

কিন্তু বর্তমান ঘটনায় আমাদের কাছে সব-চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই মনে হয় যে, আমরা অবিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করিতে পারি নাই। ইহাকেই বলে ওরিয়েন্টাল—এইখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ। য়ুরোপ কায়মনোবাক্যে অবিশ্বাস করিতে জানে। আমরা ক্ষণকালের জন্য রাগ করি আর যাই করি, অন্তরের মধ্যে আমরা পুরাপুরি অবিশ্বাস করিতে পারি না। ষোলো আনা অবিশ্বাসকে জাগাইয়া রাখিবার যে-শক্তি, তাহা আমাদের নাই—আমরা ভুলিতে চাই, আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলে বাঁচি।

আমি জানি, আমার একজন বাঙালি বন্ধুর বিরুদ্ধে কোনো ইংরেজ মিথ্যা চক্রান্ত করিয়াছিল। সেই মিথ্যা যখন প্রমাণ হইয়া গেল, তখন তাঁহাকে তাঁহার এক ইংরেজ সুহৃদ বলিয়াছিলেন, "Spare him not, crush him like a worm!" কিন্তু বাঙালি সে-সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং তাহার ফল এখনও ভোগ করিতেছেন। নিঃশেষে দলন করিতে, নিঃশেষে অবিশ্বাস করিতে, নিঃশেষে চুকাইয়া ফেলিতে আমরা জানি না—আমাদের চিরন্তন প্রকৃতি এবং শিক্ষা আমাদিগকে বাধা দেয়—এক জায়গায় আমাদের মন বলিয়া ওঠে, "আহা, আর কেন, আর কাজ নাই, আর থাক্।" পরিপূর্ণ অবিশ্বাসের মধ্যে যে একটা কাঠিন্য, যে একটা নির্দয়তা আছে, আমাদের গার্হস্থ্যপ্রধান, আমাদের মিলনমূলক সভ্যতা তাহা আমাদিগকে চর্চা করিতে দেয় নাই—সম্বন্ধবিস্তার করিবার জন্যই আমরা সর্বতোভাবে চিরদিন প্রস্তুত হইয়াছি, সম্বন্ধবিচ্ছেদ করিবার জন্য নহে। যাহা অনাবশ্যক তাহাকেও রক্ষা করিবার, যাহা প্রতিকূল তাহাকেও অঙ্গীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কোনো জিনিসকেই ঝাড়ে-মূলে উপড়াইয়া একেবারে টান মারিয়া ফেলিয়া দিতে শিখি নাই—আত্মরক্ষার পক্ষে, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ইহা সুশিক্ষা নহে।

য়ুরোপ যাহা-কিছু পাইয়াছে, তাহা বিদ্রোহ করিয়া পাইয়াছে ; আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি, তাহা বিশ্বাসের ধন। এখন, বিদ্রোহপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাস-পরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুশকিল হইয়াছে। স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধা করে না।

চাণক্যপণ্ডিতের "স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ" শ্লোক বাঙালির কণ্ঠস্থ—কিন্তু বাঙালির তদপেক্ষা কণ্ঠলগ্ন তাহার স্ত্রী। সেজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না—কারণ, শুষ্ক পুঁথির চেয়ে সরস রক্তমাংসের প্রমাণ ঢের বেশি আদরণীয়। কিন্তু রাজকুল সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। হাতে-হাতেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখো :

যদি সত্যই তোমার এই ধারণা হইয়া থাকে যে, বাঙালিজাতিকে দুর্বল করিবার

উদ্দেশেই বাংলাদেশকে খণ্ডিত করা হইতেছে, যদি সত্যই তোমার বিশ্বাস যে, য়ুনিভার্সিটি বিলের দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক য়ুনিভার্সিটির প্রতি মৃত্যুবাণ বর্ষণ করা হইতেছে, তবে সে-কথায় উল্লেখ করিয়া তুমি কাহার করুণা আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? উদ্যত কুঠারকে গাছ যদি করুণস্বরে এই কথা বলে যে, "তোমার আঘাতে আমি ছিন্ন হইয়া যাইব," তবে সেটা কি নিতান্ত বাহুল্য হয় না? গাছের মজ্জার মধ্যে কি এই বিশ্বাসই রহিয়াছে যে, কুঠার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছে, ছিন্ন করিতে নহে?

আর, মনের মধ্যে যদি অবিশ্বাস না জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাস প্রকাশ করিতেছ কেন—অমন চড়াসুরে কথা কহিতেছ কেন—কেন বলিতেছ, "তোমাদের মতলব আমরা বুঝিয়াছি, তোমরা আমাদিগকে নষ্ট করিতে চাও।" এবং তাহার পরক্ষণেই কাঁদিয়া বলিতেছ, "তোমরা যাহা সংকল্প করিয়াছ, তাহাতে আমরা নষ্ট হইব, অতএব নিরস্ত হও।" বলিহারি এই "অতএব"।

আমাদের প্রকৃতি এবং শিক্ষার বৈষম্যে সকল বিষয়েই আমাদের এইরূপ দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা মুখে অবিশ্বাস দেখাইতে পারি, কিন্তু আচরণে অবিশ্বাস করিতে পারি না। তাহাতে সকল দিকই নষ্ট হয়—ভিক্ষাধর্মও যথানিয়মে পালিত হয় না—স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেও প্রবৃত্তি থাকে না।

আমাদের মনে সত্যই যদি অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাসের মধ্য হইতে যেটুকু লাভের বিষয়, তাহা গ্রহণ না করি কেন? আমাদের শাস্ত্রে এবং সমাজে রাজায়-প্রজায় মিলনের নীতি ও প্রীতিসম্বন্ধই চিরকাল প্রচার করিয়া আসিয়াছে, সেইটেই আমরা বুঝি ভালো, সেইটেই আমাদের পক্ষে সহজ। সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের দ্বারা আমরা কী লাভ করিতে পারিতাম, তাহা বর্তমানে কল্পনা করিয়া কোনো ফল নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষে সম্প্রতি রাজাপ্রজার মাঝখানে খুব যে একটা মন-কষাকষি চলিতেছে, তাহা এত স্পষ্ট, এত প্রত্যক্ষ যে, কোনো পলিসি উপলক্ষ্যেও তাহা গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা এবং লজ্জাকর। আমরা যদি বা কপটভাষায় তাহা ঢাকিতে ইচ্ছা করি, কর্তৃপক্ষদের কাছে তাহা ঢাকা পড়ে না। কারণ, ইংরেজ ও দেশী কোনো পক্ষেই প্রেমের ছড়াছড়ি নাই—এমন অবস্থায় রাস্তার-ঘাটে, আপিসে-আদালতে, রেলে-ট্র্যামে, কাগজে-পত্রে, সভাসমিতিতে উভয়রূপে পরস্পরের মন-জানাজানি হইয়া থাকে।

আমরা ঘরে ঘরে বলিয়া থাকি, বাঙালিজাতির প্রতি ইংরেজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে এবং কর্তৃপক্ষেরা বাঙালিজাতিকে দমন করিতে উৎসুক। ইংরেজি সাহিত্যে

বিলাতি কাগজে বাঙালিজাতির প্রতি প্রায় মাঝে মাঝে তীব্রভাষা প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়া থাকে।

ইহাতে অধীন দুর্বলজাতির চাকরিবাকরি, সাংসারিক সুযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটিবার কথা। তাহা আক্ষেপের বিষয় হইতে পারে কিন্তু ইহা হইতে যেটুকু সুবিধা স্বভাবত প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত, তাহারও কোনো লক্ষণ দেখিতে পাই না কেন? গালেও চড় পড়িবে, মশাও মরিবে না, আমাদের কি এমনি কপাল।

পরের কাছে সুস্পষ্ট আঘাত পাইলে পরতন্ত্রতা শিথিল হইয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হয়। সংঘাত ব্যতীত বড়ো কোনো জিনিস গড়িয়া উঠে না, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

কিন্তু আমরা আঘাত পাইয়া নিরাশ্বাস হইয়া কী করিলাম? বাহিরে তাড়া খাইয়া ঘরে কই আসিলাম? আবার তো সেই রাজদরবারেই ছুটিতেছি। এ-সম্বন্ধে আমাদের কী কর্তব্য, তাহার মীমাংসার জন্য নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া জুটিলাম না।

আন্দোলন যখন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন আমরা কোনো কথা বলি নাই, এখন বলিবার সময় আসিয়াছে।

দেশের প্রতি আমাদের কথা এই—আমরা আক্ষেপ করিব না, পরের কাছে বিলাপ করিয়া আমরা দুর্বল হইব না। কেন এই রুদ্ধদ্বারে মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি, কেন এই নৈরাশ্যের ক্রন্দন। মেঘ যদি জল বর্ষণ না করিয়া বিদ্যুৎকশাঘাত করে, তবে সেই লইয়াই কি হাহাকার করিতে হইবে। আমাদের দ্বারের কাছে নদী বহিয়া যাইতেছে না? সেই নদী শুষ্কপ্রায় হইলেও তাহা খুঁড়িয়া কিছু জল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু চোখের জল খরচ করিয়া মেঘের জল আদায় করা যায় না।

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে এ-কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না। বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয়, তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকারচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টাই আমাদের যথার্থ লাভ। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আন্তরিক ঐক্য উদ্বেল হইয়া উঠিবে—তখনই আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্বপশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত

ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন, এই পূর্বপশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায় একই সনাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে। আমাদিগকে কিছুতে পৃথক করিতে পারে, এ-ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে-ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর-কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। এখন হইতে সর্বতোভাবে সেই শঙ্কার কারণগুলিকে দূর করিতে হইবে, ঐক্যকে দৃঢ় করিতে হইবে, সুখে-দুঃখে নিজেদের মধ্যেই মিলন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

এই হইল প্রাণের কথা,—ইহার মধ্যে সুবিধা-অসুবিধার কথা, লাভক্ষতির কথা যদি কিছু থাকে, যদি এমন সন্দেহ মনে জন্মিয়া থাকে যে, বঙ্গবিভাগসূত্রে ক্রমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপ পাইতে পারে, আমাদের চাকরিবাকরির ক্ষেত্র সংকীর্ণ হইতে পারে, তবে সে-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, পারে বটে। কিন্তু কী করিবে? কর্তৃপক্ষ যদি মনে মনে একটা পলিসি আঁটিয়া থাকেন, তবে আজ হউক, কাল হউক, গোপনে হউক, প্রকাশ্যে হউক, সেটা তাঁহারা সাধন করিবেনই—আমাদের তর্ক শুনিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হইবেন কেন? মনে করো না কেন, কথামালার বাঘ যখন মেষশাবককে খাইতে ইচ্ছা করিয়া বলিল, "তুই আমার জল ঘোলা করিতেছিস, তোকে মারিব"—তখন মেষশাবক বাঘকে তর্কে পরাস্ত করিল, কহিল, "আমি ঝরনার নিচের দিকের জল খাইতেছি, তোমার উপরের জল ঘোলা ইহল কী করিয়া?" তর্কে বাঘ পরাস্ত হইল, কিন্তু মেষশিশুর কি তাহাতে কোনো সুবিধা হইয়াছিল?

অনুগ্রহই যেখানে অধিকারের নির্ভর, সেখানে মমতা বাড়িতে দেওয়া কিছু নয়। ম্যুনিসিপালিটির স্বায়ত্তশাসন এক রাজপ্রতিনিধি আমাদিগকে দিয়াছিলেন, আর-এক রাজ-প্রতিনিধি তাহা স্বচ্ছন্দে কাড়িয়া লইলেন। উপরন্তু গাল দিলেন, বলিলেন, "তোমরা কোনো কর্মের নও।" আমরা হাহাকার করিয়া মরিলাম, "আমাদের অধিকার গেল।" অধিকার কিসের। এ মোহ কেন। মহারানী একসময়ে আমাদের একটা আশ্বাসপত্র দিয়াছিলেন যে, যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে আমরাও রাজকার্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিব—কালো চামড়ার অপরাধ গণ্য হইবে না। আজ যদি কর্মশালা হইতে বহিষ্কৃত হইতে থাকি, তবে সেই পুরাতন দলিলটির দোহাই পাড়িয়া লাভ কী? সেই দলিলের কথা কি রাজপুরুষের অগোচর আছে? ময়দানে মহারানীর প্রস্তরমূর্তি কি তাহাতে বিচলিত হইবে? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আজও স্থায়ী আছে, সে কি আমাদের অধিকারের জোরে, না রাজার অনুগ্রহে। যদি পরে

এমন কথা উঠে যে, কোনো বন্দোবস্তই স্থায়ী হইতে পারে না, শাসনকার্যের সুবিধার উপরেই স্থায়িত্বের নির্ভর, তবে সত্যরক্ষার জন্ম লর্ড কর্নওআলিসের প্রেতাত্মাকে কলিকাতা টাউনহল হইতে উদ্‌বেজিত করিয়া লাভ কী হইবে। এ-সমস্ত মোহ আমাদিগকে ছিন্ন করিতে হইবে, তবে আমরা মুক্ত হইব। নতুবা প্রতিদিনই পুনঃপুন বিলাপের আর অন্ত থাকিবে না।

কিন্তু যেখানে আমাদের নিজের জোর আছে, সেখানে আমরা দৃঢ় হইব। যেখানে কর্তব্য আমাদেরই, সেখানে আমরা সচেতন থাকিব। যেখানে আমাদের আত্মীয় আছে, সেইখানে আমরা নির্ভর স্থাপন করিব। আমরা কোনোমতেই নিরানন্দ নিরাশ্বাস হইব না। এ-কথা কোনোমতেই বলিব না যে, গবর্মেণ্ট একটা কী করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই অমনি আমাদের সকল দিকে সর্বনাশ হইয়া গেল—তাহাই যদি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে, তবে কোনো কৌশললব্ধ সুযোগে, কোনো ভিক্ষালব্ধ অনুগ্রহে আমাদিগকে বেশিদিন রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যাহা দিয়াছেন, তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নিচে যদি-বা তিনি আমাদের জন্ম গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন, যাহাতে বিধিমত কর্ষণ করিলে ফললাভ হইতে কখনোই বঞ্চিত হইব না।

ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট নানাবিধ অনুগ্রহের দ্বারা লালিত করিয়া কোনোমতেই আমাদিগকে মানুষ করিতে পারিবেন না, ইহা নিঃসন্দেহ—অনুগ্রহভিক্ষুদিগকে যখন পদে পদে হতাশ করিয়া তাঁহাদের দ্বার হইতে দূর করিয়া দিবেন, তখনই আমাদের নিজের ভাণ্ডারে কী আছে, তাহা আবিষ্কার করিবার অবসর হইবে,—আমাদের নিজের শক্তি দ্বারা কী সাধ্য, তাহা জানিবার সময় হইবে,—আমাদের নিজের পাপের কী প্রায়শ্চিত্ত, তাহাই বিশ্বগুরু বুঝাইয়া দিবেন। যাচিয়া মান কাঁদিয়া সোহাগ যখন কিছুতেই জুটিবে না, বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন ভিক্ষা করিয়া দরখাস্ত করিয়া অতি অনায়াসে মিলিবে না তখন ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্ম গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে, তাহার মূল্য বুঝিব—তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত সুখদুঃখ-লাভক্ষতির আলোচনায় প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব, প্রোভিনশাল কনফারেন্সে দেশের লোকের কাছে বিদেশের ভাষায় দুর্বোধ্য বক্তৃতা করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিব না—এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে, ইংরেজ যখন ঘাড়ে ধরিয়া আমাদিগকে আমাদের নিজের ঘরের দিকে, নিজের চেষ্টার দিকে জোর করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিবে, তখন ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে

বলিব ধন্য—তখনই অনুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। হে রাজন, আমাদিগকে যাহা যাচিত ও অযাচিত দান করিয়াছ তাহা একে একে ফিরাইয়া লও, আমাদিগকে অর্জন করিতে দাও। আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রার সহায়তা করিয়ো না, আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না—তোমাদের রুদ্রমূর্তিই আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র উপায় আছে;—আঘাত, অপমান ও একান্ত অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে।

১৩১১

দেশের কথা

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন শ্রীযুক্ত সখারাম দেউস্কর মহাশয়ের রচিত 'দেশের কথা' নামক পুস্তকের সমালোচনা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার আরম্ভে তিনি লিখিতেছেন:

"এই পুস্তকের বিষয়গুলি মৌলিক নহে। ভারতহিতৈষী ডিগবি প্রভৃতি ইংরেজগণ এবং দাদাভাই নরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ভারতের সুসন্তানগণ যে-সকল বিষয় লইয়া বহুবৎসর যাবৎ আলোচনা করিতেছেন তাহাই মূলত অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অস্পষ্টভাবে আমাদের ধারণায় ছিল, এই পুস্তকখানি পড়িয়া তাহা সুস্পষ্ট, জীবন্ত এবং আকারপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

"কোনো সাধুপুষ্পিত সুন্দর উদ্যান দাবদগ্ধ হইয়া গেলে কিংবা কোনো সুদর্শন পরিচিত বন্ধুর হঠাৎ কঙ্কাল দেখিলে মনের যেরূপ অবস্থা হয়, বর্তমান চিত্রে অঙ্কিত ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যাদির অবস্থা দর্শনে সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইবে, অথচ দেউস্করমহাশয় কোনো উত্তেজিত বক্তৃতা প্রদান করেন নাই,—কতকগুলি সংখ্যাবাচক অঙ্ক এবং সেন্সাস ও স্ট্যাটিস্টিক্‌স্‌ হইতে সমুদ্ধৃত কথা নিঃশব্দে একটি মর্মভেদী দৃশ্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইবে। এই দৃশ্য একটি বিয়োগান্ত নাটকের ন্যায়,—প্রভেদ এই যে, ইহাতে কাল্পনিক দুঃখের কথা নাই, ইহা আমাদের নিজেদের দুঃখদারিদ্র্য ও মৃত্যুর চিত্র প্রদর্শন করিতেছে। গ্রন্থকার ভিষকের ন্যায় আমাদের ক্ষতস্থানটি জাগাইয়া তুলিয়া বেদনাবোধের সঞ্চার করিয়াছেন।"

ইহার অনতিদূর পরেই তিনি লিখিতেছেন:

"দেউস্করমহাশয় বলেন, পুনঃপুন আন্দোলন করিলে গবর্মেন্ট অবশ্যই আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন।"

শিক্ষাটা কি এই হইল ? ইতিহাসে প্রমাণ হইতেছে, প্রবল জাতি ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা করিয়া দুর্বলজাতির স্বত্ব নষ্ট করিতেছে ; ইহা হইতে কি এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সেই প্রবলজাতির নিকট পুনঃপুন আন্দোলন করিলেই লোপ্‌ত্রদ্রব্য ফিরিয়া পাওয়া যায় ? ব্যাপারটা এতই সহজ ?

ইহার উত্তরে আন্দোলনের দল বলিবেন, তা ছাড়া আর কী করিব ? একটা তো কিছু করা চাই।

আমরা বলি, কিছু যদি করিতেই হয় তো ওই অরণ্যে রোদনটা নয়। আমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা এই ইতিহাস হইতে লাভ করিবার বিষয় কী দেখিলে ? আমরা বলিব, লাভের বিষয় দেখিয়াছি, কিন্তু সেটা দরখাস্তপত্রিকা নহে। আমাদের লাভ এই যে : ইংরেজের আদর্শ আমাদের হৃদয় জয় করিয়াছিল—স্বদেশের সকল দিক হইতে আমাদের হৃদয় বিমুখ হইতেছিল। মুখে আস্ফালন করিয়া যাহাই বলি, আমাদের অন্তঃকরণ বলিতেছিল, বিলাতি সভ্যতার মতো সভ্যতা আর নাই। এই কারণে আমাদের দেশের আদর্শ কী, শক্তি কোথায়, তাহা যথার্থভাবে বিচার করিয়া বাহির করিতে পারিতেছিলাম না। প্যাট্রিয়টিজ্‌ম-মূলক সভ্যতার চেহারা ইতিহাসে উত্তরোত্তর যতই উৎকট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, ততই আমাদের হৃদয়ের উদ্ধার হইতেছে। ক্রমশই আমাদের দেশ যথার্থভাবে আমাদের হৃদয়কে পাইতেছে। ইহাই পরম লাভ। ধনলাভের চেয়ে ইহা অল্প লাভ নহে।

অন্যপক্ষ বলিবেন, তবে দেশহিতৈষিতাটাকে তোমরা ভালোই বল না। আমরা বলি, দেশহিতৈষিতা কাহাকে বলে, তাহা লইয়া এত তর্কের বিষয় আছে যে, কেবল ওই নামটাকে লইয়া মুখে মুখে লোফালুফি করিয়া কোনো ফল নাই। প্যাট্রিয়টিজমের প্রতিশব্দ দেশহিতৈষিতা নহে। জিনিসটা বিদেশী, নামটাও বিদেশী থাকিলে ক্ষতি নাই—যদি কোনো বাংলা শব্দই চালাইতে হয়, তবে "স্বাদেশিকতা" কথাটা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

স্বাদেশিকতার ভাবখানা এই যে, স্বদেশের ঊর্ধ্বে আর কিছুকেই স্বীকার না করা। স্বদেশের লেশমাত্র স্বার্থে যেখানে বাধে না, সেইখানেই ধর্ম বল, দয়া বল, আপনার দাবি উত্থাপন করিতে পারে—কিন্তু যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে সত্য দয়া মঙ্গল সমস্ত নিচে তলাইয়া যায়। স্বদেশীয় স্বার্থপরতাকে ধর্মের স্থান দিলে যে-ব্যাপারটা হয়, তাহাই প্যাট্রিয়টিজ্‌ম শব্দের বাচ্য হইয়াছে।

স্বার্থপরতা কখনোই ধর্মের জন্য আপনাকে সংযত করে না, স্বার্থের জন্যই করে। ইংরেজ কখনোই এ-কথা ভাবে না যে, পৃথিবীতে ফরাসি সভ্যতার একটা উপকারিতা

আছে, অতএব সে-সভ্যতার আঘাত করিলে সমস্ত মানবের, সুতরাং আমাদেরও ক্ষতি ; —নিজের পেট ভরাইবার জন্ত আবশ্যক হইলে ফরাসিকে সে বটিকার মতো গিলিয়া ফেলিতে পারে, দ্বিধামাত্র করে না। তাহার দ্বিধার একমাত্র কারণ, আমারও গায়ে জোর আছে, ফরাসিও নেহাত ক্ষীণজীবী নহে, অতএব কী জানি, লাভ করিতে গিয়া মূলধনসুদ্ধ হারানো অসম্ভব নহে। এ-স্থলে ক্ষুধানিবৃত্তির জন্ত এশিয়া-আফ্রিকার ডালপালা সমস্ত মুড়াইয়া খাইলে কোনো দোষ দেখি না। অতএব তিব্বতে শান্তিদূত প্রেরণের ব্যবস্থাকালে কপোলযুগ লজ্জায় রক্তিমবর্ণ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, স্বার্থপরতাকে যদি ধর্মের আসনের প্রান্তে বসাইয়া কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তবে অবশেষে সে একদিন ধর্মকে ঠেলা মারিয়া ফেলিবেই। স্বদেশীয় স্বার্থপরতা আজ সেইজন্ত কেবলই পৃথিবীময় তাল ঠুকিয়া-ঠুকিয়া দেবতাকে শুদ্ধ ভয় দেখাইয়া স্তম্ভিত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বিখ্যাত ভ্রমণকারী স্বেন হেডিন Sven Hedin-এর নাম সকলেই শুনিয়াছেন ইংরেজের তিব্বত-আক্রমণপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন :

"The English campaign in Tibet is a fresh proof of the Imperialist brutality which seems to characterise the political tendencies of our times, and in face of which the position of the smaller states appears precarious. A small state which does not possess the power to defend itself is doomed to decay, whether it is Christian or not. If our priests taught the people the meaning of the words "Love thy neighbours as thyself", "Thou shalt not steal", "Thou shalt do no murder", "Peace on earth and goodwill towards men", instead of losing themselves and their hearers in unfathomable and completely useless dogmas, such an injustice as the present one would be impossible. But probably such really Christian feelings are nonsense in modern policy. And the same Christians send our missionaries to Japan. In the name of truth one ought to protect the Asiatics from such Christianity."

এ-সকল কথার তাৎপর্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। টেলিগ্রাফ, রেলগাড়ি ও বড়ো বড়ো ইস্কুলবই যে সভ্যতার প্রকৃত উপকরণ ও লক্ষণ নহে, তাহা নিশ্চয় জানিয়া যথার্থ মনুষ্যত্বলাভের জন্ত অন্তত্র সন্ধান করিতে হইবে—তখন জ্ঞান হইতেও পারে যে, মনুষ্যত্বচর্চার জন্ত পাশ্চাত্য শস্ত্রধারীদের ছাত্রত্ব স্বীকার করা আমাদের পক্ষে

অত্যাবশ্যক নহে। তখন নিজের দেশের আদর্শ ও নিজের শক্তিকে নিতান্ত অবজ্ঞেয় বলিয়া মনে হইবে না।

কিন্তু অন্নের অভাবে কৃশ হইয়া, তেজের অভাবে ম্লান হইয়া ঝরিয়া মরিয়া পড়িলে তখন তোমার দেশের আদর্শই বা কোথায়, ধর্মই বা কোথায়? আদর্শ রক্ষা করিতে গেলেও যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহার অবাধ চর্চার স্থল কোথায়? কাজেই সেজন্যে দরখাস্ত করিতেই হয়—শুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় রেজোল্যুশন পাস না করিলে চলেই না।

একদিকে স্বদেশীয় স্বার্থপরতার সংঘাত আক্রমণ করিলে অপরদিকেও স্বদেশীয় স্বার্থরক্ষার উদ্যম স্বভাবতই জাগিয়া উঠে। এমনি করিয়া ইংরেজিতে যাহাকে নেশন অর্থাৎ পোলিটিকাল স্বার্থবদ্ধ জনসম্প্রদায় বলে, তাহার উদ্‌ভব হইতে থাকে।

আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় তাহার উদ্‌ভব না হইয়া থাকিতেই পারে না। সুতরাং এই সময়েই আমাদের মোহমুক্ত হওয়া দরকার। অনিবার্য প্রয়োজনে যাহা আমাকে লইতেই হইবে, তাহার সম্বন্ধে অতিমাত্রায় মুগ্ধভাব থাকা কিছু নয়। এ-কথা যেন না মনে করি, জাতীয় স্বার্থতন্ত্রই মনুষ্যত্বের চরম লাভ। তাহার উপরেও ধর্মকে রক্ষা করিতে হইবে,—মনুষ্যত্বকে ন্যাশনালত্বের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে। ন্যাশনালত্বের সুবিধার খাতিরে মনুষ্যত্বকে পদে পদে বিকাইয়া দেওয়া, মিথ্যাকে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, নির্দয়তাকে আশ্রয় করা প্রকৃতপক্ষে ঠকা। সেইরূপ ঠকিতে ঠকিতে অবশেষে একদিন দেখা যাইবে, ন্যাশনালত্ব সুদ্ধ দেউলে হইবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ স্বার্থপরতার স্বভাবই এই যে, সে ক্রমশই সংকীর্ণতার দিকে আকর্ষণ করে। তাহার প্রমাণ, বোয়ার যুদ্ধে ইংরেজের তরফের রসদের মধ্যে রাশি রাশি ভ্যাজাল। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষেও সেইরূপ দেখা গেছে। মনুষ্যত্বের মঙ্গলকে যদি ন্যাশনালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে ন্যাশনালত্বের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে। ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মই যে অমোঘ, ধর্মের নিয়ম যে অমোঘ নহে, তাহা নয়।

বাল্যশিক্ষার প্রভাব বড়ো কম নয়। ভারতবর্ষের অস্থিমাংস লইয়াও দীনেশবাবুর ন্যায় মনীষী ব্যক্তি 'দেশের কথা'র সমালোচনার ছলে এক জায়গায় লিখিয়াছেন :

"গবর্মেণ্ট যখন এক চক্ষে ভারতবাসীর হিত ও ভাবী উন্নতির দিকে লক্ষ্য করেন, তখন তাঁহার আর-একটা চক্ষু সাগরমেখলা শ্বেতদ্বীপাধিষ্ঠাত্রী বাণিজ্যলক্ষ্মীর চরণনখরপ্রান্তে আবদ্ধ থাকিবে—ইহা আমরা কোনোক্রমেই অন্যায় বলিয়া মনে করিতে পারিব না।"

দুটি চোখের ঠিক একটি চোখ সাগরের এপারে এবং একটি চোখ ওপারে রাখিলে ন্যায়দণ্ড কতকটা সিধা থাকিত। কিন্তু দেউস্করমহাশয়ের গ্রন্থখানি কি তাহাই প্রমাণ করিয়াছে? আসল কথা, আজকাল অনেকেই মনে করি, ন্যাশনালিটির স্পর্শমণির স্পর্শে সমস্ত অন্যায় সোনার চাঁদ হইয়া উঠে।

যাহা হউক, আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে—কিন্তু বিলাতের নকলে নহে। আমাদের জাতির মধ্যে যে-নিত্যপদার্থটি,যে-প্রাণপদার্থটি আছে, তাহাকেই সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে—আমাদের চিত্তকে, আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে, আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বলশালী করিতে হইবে। এ-কার্যে স্বদেশের দিকে আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়, স্বদেশের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা চাই—যাহা শিক্ষা ও অবস্থার গুণে অন্যদিকে ধাবিত হইয়াছে, তাহাকে ঘরের দিকে ফিরাইতে হইবে। আশা করি, দেউস্করমহাশয়ের বইখানি আমাদিগকে সেইপথে যাত্রার সহায়তা করিবে—আমাদিগকে পুনঃপুন নিষ্ফল আন্দোলনের দিকেই উৎসাহিত করিবে না।

১৩১১

ব্যাধি ও প্রতিকার

কিছুকাল হইতে বাংলাদেশের মনটা বঙ্গবিভাগ উপলক্ষে খুবই একটা নাড়া পাইয়াছে। এইবার প্রথম দেশের লোক একটা কথা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছে। সেটা এই যে, আমরা যতই গভীররূপে বেদনা পাই না কেন সে-বেদনার বেগ আমাদের গবর্মেণ্টের নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। গবর্মেণ্ট আমাদের হইতে যে কতদূর পর তাহা আমাদের দেশের সর্বসাধারণ ইতিপূর্বে এমন স্পষ্ট করিয়া কোনোদিন বুঝিতে পারে নাই।

কর্তৃপক্ষ সমস্ত দেশের লোকের চিত্তকে এমন কঠোর ঔদ্ধত্যের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিল কোন্ সাহসে এই প্রশ্ন আমাদের মনকে কিছুকাল হইতে কেবলই পীড়িত করিয়াছে। ইহাতে আমাদের প্রতি মমত্বের একান্ত অভাব প্রকাশ পাইয়াছে—কিন্তু শুধু কি তাই? এই কি প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিকের পন্থা? রাজাই যেন আমাদের পর কিন্তু রাষ্ট্রনীতি কি দেশের সমুদয় লোককে একেবারে নগণ্য করিয়া চলিতে পারে?

যখন দেখি পারে, তখন মনের মধ্যে কেবল অপমানের ব্যথা নহে একটা আতঙ্ক

জাগিয়া উঠে। আমাদের অবস্থা যে কিরূপ নিঃসহ উপায়বিহীন, কিরূপ সম্পূর্ণ পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আছে, আমাদের নিজের শক্তি যে এতটুকুও অবশিষ্ট নাই যে রাষ্ট্রনীতির রথটা আমাদের প্রবল অনিচ্ছাকেও একটি ক্ষুদ্র বাধা জ্ঞান করিয়াও অল্পমাত্র বাঁকিয়া চলিবে ইহা যখন বুঝি তখন নিরুপায়ের মনেও উপায় চিন্তার জন্য একটা ক্ষোভ জন্মে।

কিন্তু আমাদের প্রতি রাষ্ট্রনীতির এতদূর উপেক্ষার কারণ কী? ইহার কারণ, আমাদের দ্বারা কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কেন নাই? আমরা বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ঢেউ কাহাকেও জোরে আঘাত করিতে পারে না। সুতরাং কোনো কারণে ইহার সঙ্গে আপস করিবার কোনোই প্রয়োজন হয় না। এমন অবস্থায় আমাদের কোনো ইচ্ছা বা অনিচ্ছা আমরা যদি মনের আবেগে কিছু উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করি, তবে উচ্চ-আসনের লোকেরা সেই অশক্ত আস্ফালনকে কখনোই বরদাস্ত করিতে পারেন না। ইচ্ছার পশ্চাতে যেখানে শক্তি নাই সেখানে তাহা স্পর্ধা।

এমন অবস্থায় ক্ষতি করিবার শক্তি আমাদের কোথায় আছে তাহা একাগ্রমনে খুঁজিয়া দেখিবার ইচ্ছা হয়। ইহা স্বাভাবিক। এই ইচ্ছার তাড়নাতেই "স্বদেশী" উদ্‌যোগ হঠাৎ অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের দেশে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা তোমাদের জিনিস কিনি বলিয়া তোমাদের কাছে ভারতবর্ষের এত দাম অতএব ওইখানে আমাদের একটা শক্তি আছে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র নাই কিন্তু যদি আমরা এক হইয়া বলিতে পারি যে, বরং কষ্ট সহিব তবু তোমাদের জিনিস আমরা কিনিব না, তবে সেখানে তোমাদিগকে হার মানিতে হইবে।

ইহার অনেক পূর্ব হইতেই স্বদেশী সামগ্রী দেশে চালাইবার চেষ্টা ভিতরে ভিতরে নানাস্থানে নানা আকারে দেখা দিতেছিল—সুতরাং ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত ছিল। তাহা না থাকিলে শুদ্ধ কেবল একটা সাময়িক রাগারাগির মাথায় এই উদ্‌যোগ এমন অভাবনীয় বল পাইয়া উঠিত না।

কিন্তু সশস্ত্র ও নিরস্ত্র উভয়প্রকার যুদ্ধেই নিজের শক্তি ও দলবল বিচার করিয়া চলিতে হয়। আস্ফালন করাকেই যুদ্ধ করা বলে না। তা ছাড়া একমুহূর্তেই যুদ্ধং দেহি বলিয়া যে-পক্ষ রণক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়ায় পরমুহূর্তেই তাহাকে ভঙ্গ দিয়া পালাইবার রাস্তা দেখিতে হয়। আমরা যখন দেশের পোলিটিকাল বক্তৃতাসভায় তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, এবার আমাদের লড়াই শুরু হইল, তখন আমরা নিজের অস্ত্রশস্ত্র-দলবলের কোনো হিসাবই লই নাই। তাহার প্রধান কারণ আমরা দেশকে যে যতই ভালোবাসি না কেন, দেশকে ঠিকমতো কেহ কোনোদিন জানি না।

চিরদিন আমাদিগকে দুর্বল বলিয়া ঘৃণা করিয়া আসাতে আমাদের প্রতিপক্ষ আমাদিগকে প্রথমে বিশেষ কোনো বাধা দেন নাই। মনে করিয়াছিলেন, এ সমস্তই কনগ্রেসি চাল, কেবল মুখের অভিমান, কেবল বাক্যের বড়াই।

কিন্তু যখন দেখা গেল, ঠিক কনগ্রেসের মলয়মারুতহিল্লোল নয়, ছুটো একটা করিয়া লোকসানের দমকা বাড়িয়া উঠিতেছে তখন অপর পক্ষ হইতে শাসন-তাড়নের পালা পুরাদমে আরম্ভ হইল।

কিন্তু ইংরেজ আমাদিগকে যতই পর মনে করুক না কেন, প্রজাদের প্রতি হঠাৎ উৎপাত করিতে ইংরেজ নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়। এ-প্রকার বেআইনি ভূতের কাণ্ড তাহাদের রাষ্ট্রনীতিপ্রথাবিরুদ্ধ। অল্পবয়সে অধীন জাতিকে শাসন করিবার জন্য যে-সব ইংরেজ এ-দেশে আসে তাহাদের মধ্যে এই ইংরেজি প্রকৃতি বিগড়িয়া যায়—এবং অধীন দেশের কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে ইংরেজ জাতির মনকে আধিপত্যের নেশায় অভ্যস্ত করিয়া আনিতেছে। তবু আজিও ইংলণ্ডবাসী ইংরেজের মনে আইনের প্রতি একটা সম্ভ্রমের ভাব নষ্ট হয় নাই। এই কারণে অত্যন্ত ত্যক্ত হইয়া উঠিলেও ভারত-রাজ্যশাসন-ব্যাপারে হাঙ্গামার পালা সহজে আরম্ভ হয় না—ইংরেজই তাহাতে বাধা দেয়। এইজন্য ফুলার তাঁহার দলবল লইয়া একদা পূর্ববঙ্গে যেরূপ বে-ইংরেজি দাপাদাপি শুরু করিয়াছিলেন, তাহা ভদ্র ইংরেজ-পক্ষের দৃষ্টিতে বড়োই অশোভন হইয়া উঠিয়াছিল।

এখানকার ক্ষুদ্র ইংরেজদিগের ওই একটা ভারি মুশকিল আছে। তাহারা যখন খাপা হইয়া উঠিয়া আমাদের হাড় গুঁড়া করিয়া দিতে চায় তখন স্বদেশীয়ের সঙ্গেই তাহাদের ঠেলাঠেলি পড়ে। তাহারা বিলক্ষণ জানে আমাদের উপরে খুব কষিয়া হাত চালাইয়া লইতে কিছুমাত্র বীরত্বের দরকার করে না—কারণ অল্পে অল্পে আমাদেরই শিল এবং আমাদেরই নোড়া লইয়া আমাদেরই দাঁতের গোড়া একটি একটি করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব তর্জনতাড়ন-ব্যাপারে হাত পাকাইবার এমন সম্পূর্ণ নিরাপদ ক্ষেত্র আমাদের দেশের মতো আর কোথাও নাই। কিন্তু সমুদ্রপারে যে-ইংরেজ বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে এখনও সেন্টিমেন্টের প্রভাব ঘোচে নাই, রাশিয়ান কায়দাকে লজ্জা করিবার সংস্কার এখনও তাহাদের আছে।

এই জন্য আমাদের মতো অস্ত্রহীন সহায়হীনেরা যখন কোনো একটা মর্মান্তিক আঘাত পাইয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে থাকি, তখন ক্ষুদ্র ইংরেজের মধ্যে হাত-নিসপিস ও দাঁত-কিড়মিড়ের অত্যন্ত প্রাচুর্ভাব হয়—তখন বৃহৎ ইংরেজের অবিচলিত সহিষ্ণুতা ও ঔদার্য তাহাদের কাছে অত্যন্ত অসহ্য হইতে থাকে। তাহারা বলে, ওরিয়েন্টালদের সঙ্গে

এ-রকম চাল ঠিক নয়—যেমন অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়া ইহাদিগকে পৌরুষহীন করা হইয়াছে তেমনি টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া ইহাদিগকে নির্বাক ও নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিলে তবে ইহারা নিজের ঠিক জায়গাটা বুঝিতে পারিবে।

এই কারণে বৃহৎ ইংরেজকে ভুলাইবার জন্য ক্ষুদ্র ইংরেজকে বিস্তর বাজে চাল চালিতে ও কাপুরুষতা অবলম্বন করিতে হয়। এই সমস্ত আধমরা লোকদিগকেও মারিবার জন্য মিথ্যা আয়োজন না করিলে চলে না; বোয়ার-যুদ্ধের পূর্বে এবং সেই সময়ে যে ভূরি ভূরি মিথ্যা গড়িয়া তোলা হইতেছিল তাহাও ইংরেজের সদ্‌বুদ্ধিকে পরাস্ত করিবার জন্য। কিন্তু আমরা যে এমন নিরুপায়, আমাদের সম্বন্ধেও গায়ের জ্বালা মিটাইতে এখানকার ক্ষুদ্র ইংরেজের দলকে যে এত ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করিতে ও এত মিথ্যা খাড়া করিয়া তুলিতে হয় ইহাতে ইংরেজ ইংরেজকে হয়তো ভুলাইতে পারে কিন্তু এ-দেশের জনসাধারণের কাছে তাহাদের লজ্জা কিছুমাত্র ঢাকা পড়ে না। ইহাতে তাহাদের কাজ উদ্ধার হইতেও পারে কিন্তু চিরকালের মতো সম্ভ্রম নষ্ট হয়।

যাহা হউক এ সমস্তই যুদ্ধের চাল। বঙ্গবিভাগের সময় আমরা যখন কাঁদিয়া কাটিয়া কর্তাদের আসন তিলমাত্র নড়াইতে পারিলাম না তখন বয়কটের যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলাম। এই স্পর্ধায় স্থানীয় ইংরেজের রক্ত আমরা যথেষ্ট গরম করিয়া তুলিয়াছি। তখন কি আমরা ঠাহরাইয়াছিলাম যুদ্ধ কেবল একপক্ষ হইতেই চলিবে, অপরপক্ষ শরশয্যা আশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে বুক পাতিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে?

অপরপক্ষে অস্ত্র ধরিবে না এ-কথা মনে করিয়া যুদ্ধে নামা একটা কৌতুকের ব্যাপার, যদি না অশ্রুজলে তাহার পরিসমাপ্তি হয়। এখন দেখিতেছি আমরা সেই আশাই মনে রাখিয়াছিলাম। ইংরেজের ধৈর্যের উপরে, ইংরেজের আইনের উপরেই আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা ছিল, নিজের শক্তির উপরে নহে। তাই যদি না হইবে, তবে আইনরক্ষকদের হাতে আইনের দণ্ড লেশমাত্র বিচলিত হইলেই, সামান্য দুই-একটা মাথা-কাটাকাটি ঘটিলেই আমরা এমন ভাব করি কেন, যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল? ভাবিয়া দেখো দেখি ইংরেজের উপরে আমাদের কতখানি শ্রদ্ধা কতখানি ভরসা জমিয়া উঠিয়াছে যে আমরা ঠিক করিয়া বসিয়াছিলাম যে, আমরা বন্দে মাতরম্‌ হাঁকিয়া তাহাদের দক্ষিণ হাতে আঘাত করিব তবু তাহাদের সেই হাতের ন্যায়দণ্ড অন্যায়ের দিকে কিছুমাত্র টলিবে না।

কিন্তু এই সত্যটা আমাদের জানা দরকার যে, ন্যায়দণ্ডটা মানুষের হাতেই আছে এবং ভয় বা রাগ উপস্থিত হইলেই সে-হাত টলে। আজ নিম্ন-আদালত হইতে শুরু করিয়া হাইকোর্ট পর্যন্ত স্বদেশী মামলায় ন্যায়ের কাঁটা যে নানা ডিগ্রির কোণ লইয়া

হেলিতেছে ইহাতে আমরা যতই আশ্চর্য হইতেছি ততই দেখা যাইতেছে আমরা হিসাবে ভুল করিয়াছিলাম।

অবশ্য তর্কে জিতিলেই যদি জিত হইত তবে এ-কথা বলা চলিত যে, রাগদ্বেষের দ্বারা আইনকে টলিতে দেওয়া উচিত নহে, তাহাতে অধর্ম হয়, অনিষ্ট হয় ইত্যাদি—এ সমস্তই সদ্‌যুক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার উপর ভর দিয়া একেবারে দুই চক্ষু বুজিয়া থাকিলে চলে না। যাহা ঘটে, যাহা ঘটিতে পারে, যাহা স্বভাবসংগত, আমরা দুর্বল বলিয়াই যে আমাদের ভাগ্যে তাহার অন্যথা হইবে বিধাতার উপরে আমাদের এত-বড়ো কোনো দাবি নাই। সমস্ত বুঝিয়া, জোয়ারভাঁটা রৌদ্রবৃষ্টি সমস্ত বিচার ও স্বীকার করিয়া লইয়া যদি আমরা যাত্রা আরম্ভ করি তবে নৌকা লেশমাত্র টলিলেই অমনি যেন একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল বলিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি না।

অতএব গোড়ায় একটা সত্য আমাদিগকে মনে রাখিতেই হইবে যে, যে-কোনো কারণেই এবং যে-কোনো উপায়েই হউক ইংরেজের যদি আমরা কোনো ক্ষতি করিতে যাই তবে ইংরেজ তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেই এবং সে-চেষ্টা আমাদের সুখকর হইবে না। কথাটা নিতান্তই সহজ কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এই সহজ কথাটা আমরা বিচার করি নাই এবং আমরা যখন উচ্চস্বরে নিজের বড়াই করিতেছিলাম তখন ইংরেজের মহত্ত্বের প্রতি উচ্চস্বরে আমাদের অটল শ্রদ্ধা ঘোষণা করিতেছিলাম—ইহাতে আমাদের সুবুদ্ধি অথবা পৌরুষ কোনোটারই প্রমাণ হয় নাই।

এই তো দেখিতেছি যুদ্ধের আরম্ভে আমরা বিপক্ষকে ভুল বুঝিয়াছিলাম, তার পরে আত্মপক্ষকে যে ঠিক বুঝি নাই সে-কথাও স্বীকার করিতে হইবে।

আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা যদি সত্যই হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন? দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবে না ইংরেজকে আমরা এতবড়ো নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব এমন কী কারণ ঘটিয়াছে?

মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না; অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই—আজ যদি না করে তো কাল করিবে, এক শত্রু যদি না করে তো অন্য শত্রু করিবে—অতএব শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিক্‌কার দিতে হইবে।

হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে। এ পাপ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনো মতেই নিষ্কৃতি নাই।

অভ্যস্ত পাপের সম্বন্ধে আমাদের চৈতন্য থাকে না। এইজন্য সেই শয়তান যখন উগ্রমূর্তি ধরিয়া উঠে তখন সেটাকে মঙ্গল বলিয়াই জানিতে হইবে। হিন্দু মুসলমানের মাঝখানটাতে কতবড়ো যে একটা কলুষ আছে এবার তাহা যদি এমন একান্ত বীভৎস আকারে দেখা না দিত তবে ইহাকে আমরা স্বীকারই করিতাম না, ইহার পরিচয়ই পাইতাম না।

পরিচয় তো পাইলাম কিন্তু শিক্ষা পাইবার কোনো চেষ্টা করিতেছি না। যাহা আমরা কোনোমতেই দেখিতে চাই নাই বিধাতা দয়া করিয়া আমাদিগকে কানে ধরিয়া দেখাইয়া দিলেন—তাহাতে আমাদের কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল, অপমান ও দুঃখের একশেষ হইল;—কিন্তু দুঃখের সঙ্গে শিক্ষা যদি না হয় তবে দুঃখের মাত্রা কেবল বাড়িতেই থাকিবে।

আর মিথ্যাকথা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।

আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখদুঃখে মানুষ—তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে-সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।

আমরা জানি বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসে না—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমে এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।

তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কী করা যায় শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখি না। যদি বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে-শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে-দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া

যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।

মানুষকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা যাহাদের অভ্যাস নহে, পরস্পরের অধিকার যাহারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার কাজেই ব্যাপৃত; যাহারা সামান্য স্খলনেই আপনার লোককে ত্যাগ করিতেই জানে, পরকে গ্রহণ করিতে জানে না; সাধারণ মানুষের প্রতি সামান্য শিষ্টতার নমস্কারেও যাহাদের বাধা আছে; মানুষের সংসর্গ নানা আকারে বাঁচাইয়া চলিতে যাহাদিগকে সর্বদাই সতর্ক হইয়া থাকিতে হয় মনুষ্যত্ব হিসাবে তাহাদিগকে দুর্বল হইতেই হইবে। যাহারা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐক্যনীতি অপেক্ষা ভেদবুদ্ধি যাহাদের বেশি, দৈন্য অপমান ও অধীনতার হাত হইতে তাহারা কোনোদিন নিষ্কৃতি পাইবে না।

যাহা হউক "বয়কট"-যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আমরা বাহির হইলাম এবং দেশধর্মগুরুর নিকট হইতে স্বরাজমন্ত্রও গ্রহণ করিলাম; মনে করিলাম এই সংগ্রাম্ ও সাধনার যত-কিছু বাধা সমস্তই বাহিরে, আমাদের নিজেদের মধ্যে আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই। এমন সময় হঠাৎ আমাদের ভিতরকার বিচ্ছিন্ন অবস্থা বিধাতা এমন সুকঠোর সুস্পষ্ট আকারে দেখাইয়া দিলেন যে, আমাদের চমক লাগিয়া গেল। আমরা নিজেরাই নিজেদের দলনের উপায়, অগ্রসর হইবার প্রতিবন্ধক, এ-কথা যখন নিঃসংশয়রূপে ধরা পড়িল তখন এই কথাই আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, স্বদেশকে উদ্ধার করিতে হইবে; কিন্তু কাহার হাত হইতে? নিজেদের পাপ হইতে।

ইংরেজ সমস্ত ভারতবর্ষের কাঁধের উপরে এমন করিয়া যে চাপিয়া বসিয়াছে সে কি কেবল নিজের জোরে? আমাদের পাপই ইংরেজের প্রধান বল। ইংরেজ আমাদের ব্যাধির একটা লক্ষণ মাত্র; লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় পাইয়া ঠিকমতো প্রতিকার করিতে না পারিলে গায়ের জোরে অথবা বন্দেমাতরম্ মন্ত্র পড়িয়া সন্নিপাতের হাত এড়াইবার কোনো সহজ পথ নাই।

বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে। দেশকে আপন চেষ্টায় আপন দেশ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। অন্নবস্ত্র-সুখস্বাস্থ্য-শিক্ষাদীক্ষাদানে দেশের লোকই দেশের লোকের সর্বপ্রধান সহায়, দুঃখে বিপদে দেশের লোকই দেশের জন্য প্রাণপণ করিয়া থাকে ইহা যেখানকার জনসাধারণে প্রত্যক্ষভাবে জানে সেখানে স্বদেশ যে কী তাহা বুঝাইবার জন্য এত বকাবকি করিতে হয় না। আজ আমাদের ইংরেজিপড়া শহরের লোক যখন নিরক্ষর গ্রামের লোকের কাছে গিয়া

চেষ্টার যুগে আছে, এ-কথা যখন তাহার ব্যবহারে বুঝা যাইতেছে তখন দেশের যে-সকল যুবক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি একটিমাত্র পরামর্শ এই আছে, সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার মধ্যে নিস্তব্ধভাবে আবদ্ধ করিয়া ফেলো, স্থির হও, কোনো কথা বলিয়ো না, অহরহ অত্যুক্তিপ্রয়োগের দ্বারা নিজের চরিত্রকে দুর্বল করিয়ো না। আর কিছু না পার খবরের কাগজের সঙ্গে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া যে-কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনোদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎসংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধসংস্কার হইতে রক্ষা করো। নূতন বা পুরাতন কোনো দলেই তোমার নাম না জানুক, যাহাদের হিতের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছ প্রতিদিন তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস ঠেলিয়া এক পা এক পা করিয়া সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকো। মিথ্যা আত্মপ্রকাশে আমরা যে-শক্তি কেবলই নষ্ট করিতেছি, সত্য আত্মপ্রয়োগে তাহাকে খাটাইতে হইবে। ইহাতে লোকে যদি আমাদিগকে সামান্য বলিয়া ছোটো বলিয়া অপবাদ দেয় উপহাস করে তবে তাহা অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া লইবার বল যেন আমাদের থাকে। আমরা যে সামান্য কেহ নহি, আমরা যে কিছু-একটা করিতেছি ইহাই পরের কাছে দিনরাত প্রমাণ করিবার জন্য পাঁচকে পনেরো করিয়া ফলাইয়া কেবলই সাগরপারে টেলিগ্রাফ করাকেই নিজের একমাত্র কাজ বলিয়া যেন না মনে করি। দেশের এক-একটি জায়গায় এক-একটি মানুষ বিরলে বসিয়া নিজের সমস্ত জীবন দিয়া যে-কোনো একটি কর্মকে গড়িয়া তুলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকুন—এই আমাদের সাধনা। আমরা কিছুই গড়িয়া তুলিতে পারি না, আমাদের হাতে সমস্তই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, আমরা কর্মের নানা সূত্রকে টানিয়া বাঁধিয়া রাশ বাগাইয়া নিজের হাতে দৃঢ় করিয়া ধরিতে পারি না—এই কারণেই আমরা কামনা করি কিন্তু সাধনার বেলা চোখে অন্ধকার দেখিতে থাকি—কেবল সমিতির অধিবেশনে অতি সূক্ষ্ম নিয়মাবলী রচনা লইয়া আমাদের তর্কবিতর্কের অন্ত থাকে না, কিন্তু নিয়ম খাটাইয়া বাধা কাটাইয়া সিদ্ধির পথে চলিবার দৃঢ় সংকল্পশক্তি আপনার মধ্যে খুঁজিয়া পাই না। চরিত্রের এই দৈন্য আমাদিগকে ঘুচাইতে হইবে। উত্তেজনার দ্বারা তাহা ঘুচে না—কারণ উত্তেজনা আড়ম্বরের কাঙাল—এবং আড়ম্বর কর্ম নষ্ট করিবার শয়তান। আজ নানা স্থানে নানা কাজ লইয়া আমরা নানা লোকে যদি লাগিয়া থাকি তবেই গড়িয়া তুলিবার অভ্যাস

আমাদের পাকা হইতে হইবে। এমনি করিয়াই ভিতরে ভিতরে স্বদেশ গড়িয়া উঠিবে এবং স্বরাজগঠনের যথার্থ অবকাশ একদিন উপস্থিত হইবে। তখন সত্য উপকরণ ও প্রকৃত লোকের অভাব কেবলমাত্র কথার জোরে ঢাকিয়া দিবার কোনো প্রয়োজন থাকিবে না।

এ-কথা নিশ্চয় জানি অপমানের ক্ষোভে ব্যর্থ আশার আঘাতে আমাদের আত্মাভিমান জাগিয়া উঠে ; এবং সেই আত্মাভিমান আমাদের আত্মশক্তি উদ্বোধনের একটা উপায়। বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বাঙালির সকল চেষ্টার নিষ্ফলতা যখন সুস্পষ্ট আকারে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর হইল তখন আমাদের অভিমান আলোড়িত হইয়া উঠিল। এই অভিমানের তাড়নায় আমরা নিজেকে প্রবল বলিয়া প্রমাণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অতএব ইহার মধ্যে যে মঙ্গলটুকু আছে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারি না।

কিন্তু ইহার মধ্যে বিপদের কথাটা এই যে, অভিমানের সঙ্গে যদি ধৈর্যের দৃঢ়তা না থাকে তবে পরিণামে তাহা আমাদের দুর্বলতার কারণ হইবে। চরিত্রের জোর থাকিলে অভিমানকে আত্মসাৎ করিয়া আপনার শক্তিকে স্থায়ী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংকল্প জন্মে, কারণ, যতক্ষণ শক্তি সত্য হইয়া না উঠে ততক্ষণ অভিমানকে অতিমাত্রায় প্রকাশ করিতে থাকা লজ্জাকর এবং তাহা কেবল ব্যর্থতাই আনয়ন করে। নিজের আবেগের আতিশয্যকে এইরূপ নিষ্ফলভাবে অসময়ে প্রকাশ করিয়া বেড়ানো শিশুকেই শোভা পায়। অভিমান যখন বিলম্ব সহিতে না পারে, তখন তাহা কর্মকে তেজ না দিয়া কর্মের অঙ্কুরকে ছারখার করিয়া ফেলে। যেদিন হইতে আমাদের মনে রাগ হইল সেইদিন হইতেই আমরা আকাশ কাঁপাইয়া বড়াই করিতে আরম্ভ করিয়াছি, আমরা এ করিব, সে করিব, আমরা ম্যাঞ্চেস্টরের রুটি বন্ধ করিব, লিভারপুলের দুই চক্ষু জলে ভাসাইয়া দিব। অথচ মনে মনে আমাদের ভরসাস্থল কী ? ইংরেজেরই আইন, ইংরেজেরই সহিষ্ণুতা। আইন বিচলিত হইলেই আমরা বলি এ যে মগের মুল্লুক হইল— মন্ত্রির মুখে লিবারেল নীতির উলটা কথা শুনিলেই আমরা বলি এ কি পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠিল।

আমার নিবেদন এই এমন অবস্থায় অভিমানকে নিজের মধ্যে দমন করিতে হইবে। সেই সংযত অভিমান মনের তলদেশ হইতে আমাদের শক্তির শিকড়ের মধ্যে তেজ সঞ্চার করিবে। এতদিন যে-সমস্ত কাজ আমাদের চেষ্টাকে টানিতে পারিত না, সেই সমস্ত কাজে আজ মন দিবার মতো ধৈর্য আমাদের জন্মিবে।

কাজের কি অন্ত আছে। আমরা কিছুই কি করিয়াছি। একবার সত্য করিয়া

ভাবিয়া দেখো দেশ আমাদের হইতে কত দূরে, কত সুদূরে। আমাদের "ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ।" সমস্ত ভারতবর্ষের কথা ভাবিলে তো মাথা ঘুরিয়া যায়—শুদ্ধমাত্র বাংলাদেশের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক কত ক্ষীণ। এই বাংলাদেশও জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমাদের প্রত্যেকের হইতে কতই দূরে। ইহার জন্য আমরা কতটুকুই বা দিতেছি, কতটুকুই বা করিতেছি এবং ইহাকে জানিবার জন্যই বা আমাদের চেষ্টা কত সামান্য। নিজের মন এবং ব্যবহার সত্যরূপে আলোচনা করিয়া সত্য করিয়া বলো দেশের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য কী সুগভীর। ইহার কোন্ দুঃখে কোন্ অভাবে কোন্ সৌন্দর্যে কোন্ সম্পদে আমাদের চিত্তকে এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে যে নানাদিক হইতে আমাদের নানা লোক তাহার প্রতি আপন সময় ও সামর্থ্যের বহুল অংশ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরা শিক্ষিত কয়েকজন এবং আমাদের দেশের বহুকোটি লোকের মাঝখানে একটা মহাসমুদ্রের ব্যবধান। ত্রেতাযুগের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালি যতটুকু কাজ করিয়াছিল আমাদের মাঝখানের এই সমুদ্রে সেতু বাঁধিতে আমরা ততটুকুও করি নাই। সকল বিষয়ে সকল কাজই বাকি পড়িয়া আছে।

অথচ এমন সময়ে আমাদের মনে দুর্দান্ত অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজকে ডাকিয়া বুক ফুলাইয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছে, আমরা সম্পূর্ণ সক্ষম, সমর্থ, প্রস্তুত। আমরা কোনোমতেই তোমাদের অবজ্ঞার পাত্র নই। তোমরা যদি আমাদিগকে অবজ্ঞা কর আমরাও তোমাদিগকে অবজ্ঞা করিতে পারি।

এই কটা কথা খুব জোরে বলিবার সুখই যদি আমাদের দেশের পক্ষে যথেষ্ট হয় তবে এই পালাই চলুক। কিন্তু এখনই আমরা সমস্তই পারি এই ভুলটা প্রচার করিয়া ও বিশ্বাস করিয়া ভবিষ্যতে আমরা যাহা পারিব তাহার গোড়া যদি মারিয়া দিই তবে আমাদের অদ্যকার সমস্ত আস্ফালন একদিন তিতুমীরের লড়াইয়ের সঙ্গে এক ইতিহাসে ভুক্ত হইবে।

বড়াই করিয়া নিজের ও অন্যের কাছে দুর্বলতা ঢাকিতে গিয়া সেই দুর্বলতাকে প্রতিপদে সপ্রমাণ করিতে থাকিলে এমন একদিন আসিবে যেদিন আমরা নিজেকে অন্যায়রূপে অবিশ্বাস করিব—নিজের মধ্যে যে-সম্ভাব্যতা আছে তাহাকে অস্বীকার করিব—স্বজাতিকে গালি পাড়িয়া নিষ্কর্মতাকে আড়ম্বরপূর্বক আশ্রয় করিব—অকালে উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আরামের মধ্যে হাল ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিব। অতএব পুরুষোচিত ধৈর্যের সহিত অভিমানের প্রমত্ততাকে একেবারে দূর করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইবে। দেশ আজ আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে যে, আমরা কতখানি রাগ করিয়াছি আমরা কতবড়ো ভয়ংকর সে-আলোচনায় কাহারও কোনো লাভ নাই; কার্জন

আমাদিগকে কেমন করিয়া মারিয়াছেন এবং মর্লি আমাদের কান্নার উপর কতবড়ো অন্যায় ধমকটা দিলেন সে-কথা লইয়া অনবরত এক সভা হইতে আর-এক সভায় এক কাগজ হইতে আর-এক কাগজে মুষলধারে অশ্রুবর্ষণ করিয়া কোনো ফল নাই। এখন স্পষ্ট করিয়া বলো কী কাজ করিতে হইবে? আচ্ছা মানিলাম স্বরাজই আমাদের শেষলক্ষ্য, কিন্তু কোথাও তো তাহার একটা শুরু আছে, সেটা একসময়ে তো ধরাইয়া দিতে হইবে। স্বরাজ তো আকাশকুসুম নয়, একটা কার্যপরম্পরার মধ্য দিয়া তো তাহাকে লাভ করিতে হইবে—নূতন বা পুরাতন বা যে-দলই হউন তাঁহাদের সেই কাজের তালিকা কোথায়, তাঁহাদের প্ল্যান কী, তাঁহাদের আয়োজন কী? কর্মশূন্য উত্তেজনায় এবং অক্ষম আস্ফালনে একদিন একান্ত ক্লান্তি ও অবসাদ আনিবেই—ইহা মনুষ্যস্বভাবের ধর্ম—কেবলই মদ জোগাইয়া আমাদিগকে সেই বিপদের মধ্যে যেন লইয়া যাওয়া না হয়। যে-অসংযম চরিত্রদুর্বলতার বিলাসমাত্র তাহাকে সবলে ঘৃণা করিয়া কর্মের নিঃশব্দ নিষ্ঠার মধ্যে আপন পৌরুষকে নিবিষ্ট করিবার সময় আসিয়াছে—এ-সময়কে যেন আমরা নষ্ট না করি।

১৩১৪

যজ্ঞভঙ্গ

কনগ্রেস তো ভাঙিয়া গেল।

এবারকার কনগ্রেসে একটা উপদ্রব ঘটিবে এ-আশঙ্কা সকল পক্ষেরই মনে পূর্বে হইতেই জাগিয়াছে কিন্তু ঠিকমতো প্রতিকারের চেষ্টা কোনো পক্ষই করেন নাই। দুই দলই কেবল নিজের বলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন অর্থাৎ উপদ্রবের সংঘাতটা যাহাতে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, সেইরূপ আয়োজন হইয়াছিল।

সমস্ত দেশকে লইয়া যে-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় সেই যজ্ঞের কর্তারা কে কোন্ বক্তৃতার বিষয় কেমন করিয়া বলিবেন বা লিখিবেন তাহাই ঠিক করিয়া খালাস পাইতে পারেন না। চারিদিকের অবস্থা বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচার করিয়া তদনুসারে কাজের ব্যবস্থা করার ভার তাঁহাদের উপর। কোনো কারণে কর্ম নষ্ট হইলে সেই কারণটাকে গালি দিয়া তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন না। বারুদের ভাণ্ডারে দেশলাই জ্বালাইতে দিলে অগ্নিকাণ্ড ঘটে ইহাতে সন্দেহ নাই—এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে হয় দেশলাই

না হয় বারুদকেই কর্তৃপক্ষেরা আসামির দলে দাঁড় করাইয়া থাকেন—জগতের সর্বত্রই তাহার প্রমাণ দেখা যায়। মণিপুরী হত্যাকাণ্ড যাঁহারা ঘটাইয়াছিলেন, মণিপুরীদের দণ্ড দিয়া তাঁহারা ধর্মবুদ্ধিকে তৃপ্ত করিয়াছেন এবং আজ বাংলাদেশে যে বিচিত্র রকমের উৎপাত বাধিয়া উঠিয়াছে সেজন্য বাঙালিকেই বন্ধনপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে ওদিকে কার্জন ও মর্লির জয়ধ্বনির বিরাম নাই।

বস্তুত বারুদকে ও দেশলাইকে যাহারা সত্য বলিয়া জানে ও স্বীকার করে তাহারা এই দুটোর সংশ্রবকে ঠেকাইবার জন্য সর্বপ্রকার উপায় উদ্‌ভাবন করিয়া থাকে। দোষ যাহারই হউক বা রাগ যাহার 'পরেই থাক্ সে-কথা লইয়া গরম না হইয়া হাতের কাজটা কী করিলে সিদ্ধ হয় এই ব্যবস্থা করিবার জন্যই তাহারা তৎপর হয়।

এবারকার কনগ্রেসের যাঁহারা অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহারা অপ্রিয় বা বিরুদ্ধ সত্যকে স্বীকার করিবেন না বলিয়া ঘর হইতে পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। স্বীকার করিলেই পাছে তাহাকে খাতির করা হয় এই তাঁহাদের আশঙ্কা।

চরমপন্থী বলিয়া একটা দল যে-কারণেই হউক দেশে জাগিয়া উঠিয়াছে এ-কথা লইয়া আক্ষেপ করিতে পার কিন্তু ইহাকে অস্বীকার করিতে পার না। এই দলের ওজন কতটা তাহা বুঝিয়া তোমাকে চলিতেই হইবে। কিন্তু যখন স্বয়ং সভাপতি-মহাশয়ের মন্তব্যেও এই দলের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছিল তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে তিনি নিজের বিরক্তিপ্রকাশকেই কর্তব্যসিদ্ধি বলিয়া মনে করিয়াছেন—অবস্থা বিচার করিয়া মার বাঁচাইয়া কনগ্রেসের জাহাজকে কূলে পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা ছিল না। ইহা যে ওকালতি নহে, বিরুদ্ধ পক্ষকে বক্তৃতার গদাঘাতে পাড়িয়া ফেলাই যে এই বৃহৎ কাজের পরিণাম নহে, দেশের সকল মতের লোককে একত্রে টানিয়া সকলেরই শক্তিকে দেশের মঙ্গলসাধনে নিয়োগ করিতে উৎসাহিত করাই যে ইহার সকলের চেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য তাহা সাময়িক উত্তেজনায় তিনি মনে রাখেন নাই। তিনি এমন ভাবে কনগ্রেসের হালের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন যেন ওই চরমপন্থীর দলটা জলের একটা ঢেউমাত্র, উহা পাহাড় নহে, যেন কেবল প্রবল বাক্যবায়ুতে পাল উড়াইয়াই উহাকে ডিঙাইয়া যাওয়া চলিবে।

আবার চরমপন্থীরাও এমনভাবে কোমর বাঁধিয়া কনগ্রেসের রণক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন যেন, যে-মধ্যমপন্থীরা এতদিন ধরিয়া কনগ্রেসকে চালনা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা এমন একটা বাধা যাহাকে ঠেলিয়া অভিভূত করিয়া চলিয়া যাইবেন, ইহাতে যাহা হয় তা হ'ক। এবং এটা এখনই করিতে হইবে—এইবারেই জয়ধ্বজা উড়াইয়া না গেলেই নয়। দেশের মধ্যে এবং কনগ্রেসের সভায় মধ্যমপন্থীর স্থানটা যে কী তাহা

সম্পূর্ণভাবে এবং ধীরতার সহিত স্বীকার না করিবার জন্য মনের মধ্যে যেন প্রচণ্ড আগ্রহ।

এই যে লুব্ধতা, এই যে অন্ধ নির্বন্ধ ইহা যদি দলবর্তী সাধারণ লোকের মধ্যেই বদ্ধ থাকে তাহা হইলে সেটাকে মার্জনীয় বলিয়া গণ্য করা যায়—কিন্তু যাঁহারা দলের কর্তৃপদে আছেন তাঁহারাও যদি না বুঝেন কোন্‌খানে রাশ টানিলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়, এবং কোন্‌খানে হার মানিলে তবেই যথার্থ জিতের সম্ভাবনা ঘটে, তবে ইহাই বলিতে হইবে সংসারে যাঁহারা বড়ো জিনিসকে গড়িয়া তুলিতে পারেন, যাঁহারা কার্যসিদ্ধির লক্ষ্যকে কোনোমতেই ভুলিতে পারেন না ইঁহারা সে-দলের লোক নহেন। ইঁহারা কবির লড়াইয়ের দলের মতো উপস্থিত বাহবা ও দুয়োকে অত্যন্ত বড়ো করিয়া দেখেন—দায়িত্বদৃষ্টিকে অবিচলিত স্থৈর্যের সহিত সুদূরে প্রসারিত করেন না।

বিরুদ্ধ পক্ষের সত্তাকে যথেষ্ট সত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার চেষ্টাতেই এবার কনগ্রেস ভাঙিয়াছে। এক গাড়ির এঞ্জিন যদি সামনের গাড়ির এঞ্জিনকে একেবারে নাই বলিতে চায়, এমন কি, ঠেকাঠেকি হইলেও তখনও পরস্পরকে অস্বীকার করিয়া যদি স্টীম চড়াইয়া দেওয়াকেই নিজের পথ খোলসার উপায় বলিয়া মনে করে তবে একটা চুরমার ব্যাপার না বাধিয়া থাকিতে পারে না। এ-অবস্থায় যাঁহারা চালক তাঁহাদিগকে প্রশংসাপত্র দেওয়া চলে না।

মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয় দলই কনগ্রেস অধিকার করাকেই যদি দেশের কাজ করা বলিয়া একান্তভাবে না মনে করিতেন, যদি দেশের সত্যকার কর্মক্ষেত্রে ইঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকিতেন—দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্নের অভাব মোচন করিবার জন্য যদি ইঁহারা নিজের শক্তিকে নানা পথে অহরহ একাগ্রমনে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন, দেশহিতের সত্যকার সাধনা ও সত্যকার সিদ্ধি কাহাকে বলে তাহার স্বাদ যদি পাইতেন এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেন তাহা হইলে কনগ্রেস-সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না। কনগ্রেসে হার হইলেও দেশের মধ্যে হার হয় না;—শনৈঃ শনৈঃ প্রত্যহ প্রত্যেকের অশ্রান্ত চেষ্টায় দেশের হৃদয়ের মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলিলে তবেই তাহাকে চলা বলে এবং সেই পথের চরম গম্যস্থান সভাপতির আসন নহে, এমন কি, ওই মঞ্চটা তাহার পান্থশালাও নহে।

আর যদিই মনে কর কনগ্রেসের কর্তৃত্বলাভ দেশহিতসাধনের একটা চরিতার্থতা তবে কি এতবড়ো একটা সম্পদকে এমন অধৈর্য ও প্রমত্ততার সহিত কাড়াকাড়ি করিতে হয়। ইহাতে যাহাকে চাই তাহাকেই কি অপমান করা হয় না?

কাজির বিচারের কথা মনে আছে? দুই স্ত্রীলোক যখন একটি ছেলেকে নিজের ছেলে বলিয়া কাজির কাছে নালিশ করিয়াছিল তখন কাজি বলিয়াছিলেন ছেলেটাকে দুইভাগে কাটিয়া দুইজনকে দেওয়া হউক। এই কথা শুনিয়া যথার্থ মা বলিয়া উঠিল ছেলে আমি চাই না অপরকেই দেওয়া হউক। যে যথার্থ মা সে ছেলেকে নষ্ট করার চেয়ে নিজের দখল ত্যাগ করা এবং মকদ্দমায় হার মানা অনায়াসে স্বীকার করে।

এবারকার কাজির বিচারে কী দেখা গেল? দুই দিকেরই এই জিদ যে বরং কনগ্রেস ভাঙিয়া যায় সেও ভালো তবু হার মানিব না। ইহাতে এই প্রমাণ হয় কোনো পন্থীই কনগ্রেসকে তেমন সত্য ও তেমন বড়ো করিয়া মনে করেন না। ইহা যে একটা জীবধর্মী পদার্থ, বিচ্ছিন্ন হইলে ইহার প্রাণহানি ও আঘাত লাগিলে ইহা দুর্বল হয় তাহা কেহ নিজের প্রাণের মধ্যে তেমন করিয়া অনুভব করেন না। তাহার কারণ কি এই নহে এই জিনিসটাকে বিশ বৎসর তা' দিয়াও ইহার মধ্যে প্রাণপদার্থের পরিচয় পাওয়া যায় নাই? সেইজন্যই ইহা আমাদের দেশকে ত্যাগে, ধৈর্যে দীক্ষিত করে নাই। আমাদের 'পরে এইজন্যই কনগ্রেসের দাবি অত্যন্ত দুর্বল—ইহা অতি অল্পও যেটুকু ভয়ে ভয়ে আমাদের কাছে চায় তাহাও পুরামাত্রায় পায় না। আমাদের অর্থ-সামর্থ্য-অবসরের উদ্‌বৃত্ত হইতে অতি অকিঞ্চিৎকর পরিমাণেই এই কনগ্রেসের জন্য রাখিয়া থাকি এবং যাঁহারা রাখেন সেই কয়জনের সংখ্যাও এই বিশাল ভারতের জনসংখ্যার মধ্যে অতি যৎসামান্য।

এই প্রসঙ্গে আমাদের নিবেদন এই যে, কনগ্রেসকে সত্য করিয়া তুলিতে গেলে তাহা কনগ্রেসের মঞ্চে বসিয়াই করা যায় না। দেশের ভিতরে সত্য কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, সমস্ত দেশের লোককে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিলে তবেই সমস্ত দেশের যোগে ওই কনগ্রেস সত্য হইয়া উঠিবে—সেই দিকে চেষ্টা নিযুক্ত করিলে চেষ্টা সার্থক হইবে। কনগ্রেসকে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে দেশের ভিতর দিয়া সত্য করিয়া তুলিব এই চেষ্টাই কোনো এক পন্থীর হউক। তাহাকে এ-বৎসর বা ও-বৎসর কোনোরকমে দখল করিয়া বসিব এ-চেষ্টা এমন মহৎ চেষ্টা নহে যাহার জন্য দুই ভাইয়ে লড়াই করিয়া কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অভিনয় করা যাইতে পারে।

আমাদের পুরাণে একটি যজ্ঞভঙ্গের ইতিহাস আছে। দক্ষ যখন তাঁহার যজ্ঞে সতী অর্থাৎ সত্যকে অস্বীকার করিয়া মঙ্গলকে অপমানিত করিয়াছিলেন তখনই প্রচণ্ড উপদ্রব উপস্থিত হইয়া তাঁহার যজ্ঞ বিনষ্ট হইয়াছিল। দক্ষ কেবল নিজের দক্ষতার প্রতি অন্ধ অভিমানবশত জগতে যে-যুগে এবং যে-ক্ষেত্রেই সত্যকে এবং শিবকে স্বীকার করা অনাবশ্যক মনে করিয়াছে সেইকালে এবং সেইখানেই কেবল যে কর্ম পণ্ড হইয়াছে তাহা

নহে মহান্ অনর্থ ঘটিয়াছে। ক্ষমতাশালীর জিদ সত্যকে ক্ষণকালের জন্য নির্জীব করিয়া ফেলিতেও পারে কিন্তু রুদ্রকে কখনোই ঠেকাইতে পারে না—এ-কথা ইংরেজ ভুলিয়াছে বলিয়া আমরা অভিযোগ আনিয়াছি কিন্তু আমরা নিজেও যদি ভুলি, বল ও কলকৌশলকেই অবলম্বন জ্ঞান করিয়া সত্য ও শিবকে যদি অবমানিত করি তবে প্রলয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিব তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সত্যকে যদি আমরা রক্ষা করি ও মঙ্গলকে বিশ্বাস করি তবে ধৈর্য শান্তি ও উদারতা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে; তবে বিলম্বে অসহিষ্ণু, পীড়নে ভীত ও পরাজয়ে হতাশ্বাস হইব না; বুদ্ধির পার্থক্য ও মতের অনৈক্যকে সহ্য করিব এবং স্বাধীনতা বা স্বরাজের যথার্থ ই অধিকার লাভ করিতে পারিব।

১৩১৪

দেশহিত

বঙ্গব্যবচ্ছেদের আঘাতে বাংলাদেশে স্বাদেশিকতার যে উদ্দীপনা জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহা যে অন্যদেশের এ-শ্রেণীর উদ্দীপনার ঠিক নকল নহে, তাহা যে আমাদের দেশের স্বকীয় প্রকৃতি অনুসারে একটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে এমন কথা আমাদের দেশের কোনো বিখ্যাত ইংরেজি কাগজে পড়িয়াছি। লেখক বলেন যে, আমাদের দেশের এই স্বাদেশিকতার উৎসাহ গভীরতর আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ; এইজন্য ইহা একটা ধর্মসাধনার আকার ধারণ করিতেছে।

এ-কথা নিশ্চয় মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশের কোনো উদ্‌যোগ যদি দেশের সর্বসাধারণকে আশ্রয় করিতে চায় তবে তাহা ধর্মকে অবলম্বন না করিলে কোনোমতেই কৃতকার্য হইবে না। কোনো দেশব্যাপী সুবিধা, কোনো রাষ্ট্রীয় স্বার্থসাধনের প্রলোভন কোনোদিন আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে শক্তি সঞ্চার করে নাই।

অতএব আমাদের দেশের বর্তমান উদ্দীপনা যদি ধর্মের উদ্দীপনাই হইয়া দাঁড়ায়, দেশের ধর্মবুদ্ধিকে যদি একটা নূতন চৈতন্যে উদ্বোধিত করিয়া তোলে তবে তাহা সত্য হইবে, স্থায়ী হইবে, দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

আমাদের বর্তমান আন্দোলন সেই সত্যতা লাভ করিয়াছে অথবা করিবে কিনা তাহা নিশ্চয় নিরূপণ করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমি রাখি না। এইটুকু বলা যায়

যে, দেশে যদি দুই-চারিজন মহাত্মাও এই আন্দোলনকে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের পোলিটিকাল চাঞ্চল্য মাত্র বলিয়া অনুভব না করেন, তাঁহারা যদি ইহার নিগূঢ় কেন্দ্রস্থলে সেই ধর্মের অগ্নিকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন যে-অগ্নি সমস্ত মিথ্যাকে ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া ফেলে, সমস্ত দীনতাকে ভস্মসাৎ করিয়া দেয় এবং আমাদের যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহামূল্য তাহাকেই তপ্ত সুবর্ণের মতো উজ্জ্বল করিয়া তোলে—তবে তাঁহাদের সেই উপলব্ধি ও সাধনা নিশ্চয়ই নানাপ্রকার সাময়িক বিক্ষিপ্ততাকে ব্যর্থ করিয়া চরম সফলতা আনয়ন করিবে।

কিন্তু আমরা যে এই ধর্মের মূর্তিকে দেখিতে পাইয়াছি তাহার প্রমাণ কিসে পাওয়া যাইবে? যে ইহাকে দেখিয়াছে সে তো আর উদাসীন থাকিতে পারে না। সে একান্ত উদ্বেগ একান্ত সতর্কতার সহিত ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য জাগ্রত থাকে—কোনো ভ্রষ্টতা কোনো ত্রুটি সে সহ্য করিতে পারে না। সেই প্রাণান্তিক সতর্কতা যদি দেখিতে না পাই, যদি দেখি উপস্থিত কোনো উদ্দেশ্য সাধনের কৃপণতায় আমাদের দুর্বল চিত্তকে এমনি অভিভূত করে যে আমাদের সাধনার কেন্দ্রস্থিত ধর্মকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার গুরুত্ব আমরা বিস্মৃত হই তবে ইহার মতো উৎকণ্ঠার বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। রাজার সন্দেহ জাগ্রত হইয়া আমাদের চারিদিকে যে শাসনজাল বিস্তার করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ আমরা সর্বদা উচ্চকণ্ঠেই প্রকাশ করিতেছি কিন্তু যেখানে আমাদের স্বদেশের লোক আমাদের যজ্ঞের পবিত্র হুতাশনে পাপ-পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া আমাদের হোমকে নষ্ট করিতেছে তাহাদিগকে আমরা কেন সমস্ত মনের সহিত ভর্ৎসনা করিবার, তিরস্কৃত করিবার শক্তি অনুভব করিতেছি না? তাহারাই কি আমাদের সকলের চেয়ে ভয়ংকর শত্রু নহে?

চৈতন্যদেব একদিন বাংলাদেশে প্রেমের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কাম-জিনিসটা অতি সহজেই প্রেমের ছদ্মবেশ ধরিয়া দলে ভিড়িয়া পড়ে এইজন্য চৈতন্য যে কিরূপ একান্ত সতর্ক ছিলেন তাহা তাঁহার অনুগত শিষ্য হরিদাসের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহারে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় চৈতন্যের মনে যে প্রেমধর্মের আদর্শ ছিল তাহা কত উচ্চ, তাহা কিরূপ নিষ্কলঙ্ক। তাহার কোথাও লেশমাত্র কালিমাপাতের আশঙ্কায় তাঁহাকে কিরূপ অসহিষ্ণু ও কঠিন করিয়াছিল। নিজের দলের লোকের প্রতি দুর্বল মমতাকে তিনি মনে স্থান দেন নাই—ধর্মের উজ্জ্বলতাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

আজ আমরা দেশে যদি শক্তিধর্মকেই প্রচার করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকি তবে তাহারও কি কোথাও বিপদের কোনো সম্ভাবনা নাই? সে-বিপদ, কি কেবলই,

যাহাদিগকে আমরা শত্রুপক্ষ বলিয়া জানি তাহাদেরই নিকট হইতেই? উন্মত্ততা, অন্যায় ও অত্যাচার কি শক্তিরই ছদ্মবেশ ধরিয়া তাহার মূলে আঘাত করে না? যথার্থ দুর্বলতাই কি উচ্ছৃঙ্খলতার আকার ধারণ করিয়া প্রবলতার ভান করে না? যাহা শক্তি নহে কিন্তু শান্তির বিড়ম্বনা শক্তিধর্মসাধনায় তাহার মতো সর্বনেশে বিঘ্ন আর তো কিছুই নাই। বর্তমানে আমাদের দেশে তাহার অভ্যুদয়ের লক্ষণ চারিদিকে দেখা যাইতেছে কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা তাহাকে স্পষ্টত প্রশ্রয় দিতেছেন না তাঁহারাও তাহাকে ক্ষমাহীন কঠোর শাসন ও ভর্ৎসনার দ্বারা দূরে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন না। যে-শক্তি ধর্ম, তিনি যদি আমাদের স্পষ্ট উপলব্ধিগোচর হইতেন তবে তাঁহার এই সকল নকল উৎপাতকে কখনো এক দণ্ডের জন্যও সহ্য করিতে পারিতাম না। আজ দস্যুবৃত্তি, তস্করতা, অন্যায় পীড়ন দেশহিতের নাম ধরিয়া চারিদিকে সঞ্চরণ করিতেছে এ কি এক মুহূর্তের জন্য তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন যাঁহারা জানেন আত্মহিত, দেশহিত, লোকহিত, যে-কোনো হিতসাধনই লক্ষ্য হউক না কেন কেবলমাত্র বীর ও ত্যাগী ও তপস্বী তাহার যথার্থ সাধক। জাতির চরিত্রকে নষ্ট করিয়া আমরা জাতিকে গড়িয়া তুলিব এমন ভয়ংকর ভুলকে তিনি কখনোই এক মুহূর্তের জন্যও মনে স্থান দিতে পারেন না যিনি ধর্মকেই শক্তি বলিয়া নিশ্চয় জানেন।

আমাদের দেশের সকল অমঙ্গলের মূল কোথায়? যেখানে আমরা বিচ্ছিন্ন। অতএব আমাদের দেশে বহুকে এক করিয়া তোলাই দেশহিতের সাধনা। বহুকে এক করিয়া তুলিতে পারে কে? ধর্ম। প্রয়োজনের প্রলোভনে ধর্মকে বিসর্জন দিলেই বিশ্বাসের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। যে অধর্ম দ্বারা আমরা অন্যকে আঘাত করিতে চাই সেই অধর্মের হাত হইতে আমরা নিজেকে বাঁচাইব কী করিয়া, মিথ্যাকে অন্যায়কে যদি আমরা কোনো কারণেই প্রশ্রয় দিই তবে আমরা নিজেদের মধ্যেই সন্দেহ, বিশ্বাসঘাতকতা, ভ্রাতৃবিদ্রোহের বীজ বপন করিব—এমন একটি প্রদীপকে নিভাইয়া দিব যে-আলোকের অভাবে পুত্র মাতাকে আঘাত করিবে, ভাই ভাইয়ের পক্ষে বিভীষিকা হইয়া উঠিবে। যে-ছিদ্র দিয়া আমাদের দলের মধ্যে বিশ্বাসহীন চরিত্রহীন ধর্মসংশয়িগণ অবাধে প্রবেশ করিতে পারিবে সেই ছিদ্রকেই দলবৃদ্ধি-শক্তিবৃদ্ধির উপায় মনে করিয়া কি কোনো দূরদর্শী কোনো যথার্থ দেশহিতৈষী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আমাদের দেশের যে দুইটি প্রাচীন মহাকাব্য আছে সেই দুই মহাকাব্যেই এই একটিমাত্র নীতি প্রচার করিয়াছে যে, অধর্ম যেখানে যে-নামে যে-বেশেই প্রবেশলাভ করিয়াছে সেইখানেই ভয়ংকর সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, আমরা শনির সঙ্গে কলির সঙ্গে আপাতত সন্ধি করিয়া মহৎ কার্য উদ্ধার করিব এমন ভ্রম আমাদের দেশের কোথাও যদি প্রবেশ করে তবে

আমাদের দেশের মহাকবিদের শিক্ষা মিথ্যা ও আমাদের দেশের মহাঋষিদের সাধনা ব্যর্থ হইবে। আমাদের দেশের পূজনীয় শাস্ত্র ফলের আসক্তি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। কারণ, ফল লক্ষ্য নহে, ধর্মই লক্ষ্য। দেশের কাজেও ভারতবর্ষ যেন এই শাস্ত্রবাক্য কদাচ বিস্মৃত না হয়। দেশের হিতসাধনের জন্য আমরা প্রাণ সমর্পণ করিব কেননা সেইরূপ মঙ্গলের জন্য প্রাণ সমর্পণ করাই ধর্ম; কিন্তু কোনো ফল— সে-ফলকে ইতিহাসে যত লোভনীয় বলিয়াই প্রচার করুক না—সেরূপ কোনো ফল লাভ করিবার জন্য ধর্মকে বিসর্জন দিব এরূপ নাস্তিকতাকে প্রশ্রয় দিলে রক্ষা পাইব না। বাইবেলে কথিত আছে, ফলের লোভে ধর্মকে ত্যাগ করিয়া আদিম মানব স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মরণধর্ম লাভ করিয়াছে। ফললাভ চরম লাভ নহে, ধর্ম-লাভেই লাভ, এ-কথা যদি কেবল দেশহিতের বেলাতেই না খাটে তবে দেশহিত মানুষের যথার্থ হিত নহে।

১৩১৫

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, রচনাবলী-সংস্করণ, এই তিনটির পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্য, এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যও মুদ্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে সংকলিত হইবে।]

উৎসর্গ

উৎসর্গ ১৩২১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

উৎসর্গে প্রকাশিত সকল কবিতাই মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ (১৩১০) হইতে গৃহীত। এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী গ্রন্থানুক্রমে মুদ্রিত না হইয়া ভাবানুষঙ্গক্রমে বিভিন্ন বিভাগে সজ্জিত হইয়াছিল; এবং এই সকল বিভাগের প্রবেশকরূপে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি নূতন কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, পুরাতন কোনো কোনো কবিতাও অবশ্য প্রবেশকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সমসাময়িক কালে নূতন রচিত অনেক কবিতাও কাব্যগ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়, অন্য কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই।

এই কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ পরে যখন রহিত হয়, এবং পূর্বের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবেই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতা-গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে থাকে তখন যে-সকল কবিতা শুধু কাব্যগ্রন্থেই প্রকাশিত হইয়াছিল কোনো স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই, সেগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করা আবশ্যক হয় এবং উৎসর্গ প্রকাশিত হয়।

১৩১০ সালের কাব্যগ্রন্থ হইতেই কবিতাগুলি সংকলিত বলিয়া, কাব্যগ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত স্মরণ ও শিশুর পরেই রবীন্দ্র-রচনাবলীতে উৎসর্গ মুদ্রিত হইল।

কাব্যগ্রন্থের কোন্ বিভাগে কোন্ কবিতা প্রবেশকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল পর-পৃষ্ঠায় তাহার একটি তালিকা মুদ্রিত হইল। ইহার মধ্যে যেগুলি উৎসর্গে মুদ্রিত হয় নাই, এবং যেগুলি স্বতন্ত্র সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হইলেও রচনাবলী-সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হয় নাই পাদটীকায় সেগুলির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিভাগ	প্রবেশক
১. যাত্রা	কেবল তব মুখের পানে
২. হৃদয়-অরণ্য	কুঁড়ির ভিতরে
৩. নিষ্ক্রমণ	আঁধার আসিতে[১]
৪. বিশ্ব	আমি চঞ্চল হে
৫. সোনার তরী[২]	তোমায় চিনি বলে
৬. লোকালয়	হে রাজন তুমি আমারে
৭. নারী	সাঙ্গ হয়েছে রণ
৮. কল্পনা[১]	মোর কিছু ধন
৯. লীলা	তোমারে পাছে সহজে বুঝি
১০. কৌতুক	আপনারে তুমি করিবে গোপন
১১ যৌবনস্বপ্ন	পাগল হইয়া বনে বনে
১২. প্রেম	আকাশসিন্ধু মাঝে
১৩. কবিকথা	দুয়ারে তোমার
১৪. প্রকৃতিগাথা	তোমার বীণায় কত তার আছে
১৫. হতভাগ্য	পথের পথিক করেছ
১৬. সংকল্প	সেদিন কি তুমি এসেছিলে
১৭. স্বদেশ	হে বিশ্বদেব মোর কাছে তুমি
১৮. রূপক	ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে
১৯ কাহিনী	কত কী যে আসে
২০ কথা	কথা কও কথা কও[১]
২১ কণিকা	হায় গগন নহিলে
২২ মরণ	চিরকাল এ কী লীলা গো
২৩ নৈবেদ্য[২]	প্রতিদিন তব গাথা[১]
২৪. জীবন-দেবতা	আজ মনে হয় সকলের মাঝে
২৫ স্মরণ	...
২৬ শিশু	জগৎপারাবারের তীরে[৩]
২৭ গান	...
২৮ নাট্য	আঁধারে আসিয়া এরা

কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন বিভাগের অন্যত্র-অপ্রকাশিত অনেক কবিতাও উৎসর্গে সংগৃহীত হইয়াছিল :

বিভাগ	কবিতা
বিশ্ব	সব ঠাঁই মোর
সোনার তরী	মন্ত্রে সে যে পূত
নারী	যদি ইচ্ছা কর তবে
কবিকথা	বাহির হইতে দেখো না
	আছি আমি বিন্দুরূপে
প্রেম	আমি যারে ভালোবাসি
প্রকৃতিগাথা	শূন্য ছিল মন
	দেখো চেয়ে গিরির শিরে
	ওরে আমার কর্মহারা
	আমার খোলা জানালাতে
হতভাগ্য	আলো নাই দিন শেষ হল, ওরে
রূপক	ভোরের পাখি ডাকে
	আমার মাঝারে যে আছে
	না জানি কারে দেখিয়াছি
	আজিকে গহন কালিমা
	আমাদের এই পল্লীখানি
স্বদেশ	হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ
	ক্ষান্ত করিয়াছ
	আজি হেরিতেছি আমি
	তুমি আছ হিমাচল
	হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা
	ভারতসমুদ্র তার
	ভারতের কোন্ বৃদ্ধ
কাহিনী	নিবেদিল রাজভৃত্য
মরণ	অত চুপি চুপি কেন
	সে তো সেদিনের কথা
	নব নব প্রবাসেতে

১৩১০ সালের কাব্যগ্রন্থের যে-সকল কবিতা অন্য কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই এবং উৎসর্গে সংকলিত হয় নাই, এবং ১৩১০ সালে ও তৎপূর্বে রচিত যে-সকল কবিতা অন্য কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই, (বা প্রকাশিত হইলেও ঐসকল গ্রন্থে এখন মুদ্রিত হয় না, বা রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ঐসকল গ্রন্থে মুদ্রিত হইবে না) কিন্তু সময়ানুক্রম বিবেচনায় কাব্যগ্রন্থে ও উৎসর্গে সংকলিত হইতে পারিত, এইরূপ কতকগুলি কবিতা উৎসর্গের সংযোজনে মুদ্রিত হইল।

কাব্যগ্রন্থ হইতে :

বিভাগ	কবিতা
যাত্রা	হে পথিক কোন্‌খানে[৮]
সোনার তরী	কত দিবা কত বিভাবরী
স্বদেশ	হে ভারত আজি নবীন বর্ষে[২]
	নববৎসরে করিলাম পণ[৯]
নৈবেদ্য	রোগীর শিয়রে রাত্রে
	কাল যবে সন্ধ্যাকালে
	নানা গান গেয়ে ফিরি
লোকালয়	হে জনসমুদ্র আমি ভাবিতেছি[১]

সাময়িক পত্র ইত্যাদি হইতে :

ওরে পদ্মা ওরে মোর রাক্ষসী প্রেয়সী[১]
বিরহ-বৎসর পরে মিলনের বীণা[৮]
অচির বসন্ত হায়[৮] ;
দিয়েছ প্রশ্রয় মোরে করুণানিলয়[১]
কী কথা বলিব বলে

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ "কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ" কবিতার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন :

> বাহিরে যাহার সার্থকতা, বাহিরে আসিবার পূর্বে সে তীব্র বেদনা অনুভব করে—বস্তুত এই বেদনাই জানায় যে তাহাকে বাহিরে আসিতে হইবে—ইহাই গর্ভবেদনা ; এবং মৃত্যুবেদনারও নিঃসন্দেহ এই তাৎপর্য। আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তিরই সার্থকতা বাহিরের জগতের সহিত মিলনে—যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মিলন সম্পূর্ণ না হয়, আমাদের প্রবৃত্তিগুলি বহির্মুখী হইয়া না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা আমাদের মধ্যে নানাপ্রকার পীড়ার সৃষ্টি করে—নিখিলের মধ্যে তাহারা

বাহির হইয়া আসিলেই সকল পীড়ার অবসান হয়। অতএব যখন আমরা পীড়া অনুভব করি তখন আমরা যেন না মনে করি এই পীড়াই চরম—ইহা মুক্তির বেদনা—একদিন যাহা বাহিরে আসিবার তাহা বাহিরে আসিবে এবং পীড়া অবসান হইবে—"কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে" কবিতাটির ভিতরকার তাৎপর্য আমার কাছে এইরূপ মনে হয়। সেইজন্য উহার নাম দিতেছি "মুমুক্ষু"। নামটা কিছু কড়া গোছের বটে—যদি অন্য কোনো সুশ্রাব্য নাম মনে উদয় হয় তবে চয়নিকার প্রকাশককে জানাইয়া দিয়ো।

খেয়া

খেয়া ১৩১৩ সালে প্রকাশিত হয়।

"আমার ধর্ম" প্রবন্ধে (সবুজ পত্র, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৪) প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ খেয়ার কোনো কোনো কবিতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

খেয়াতে "আগমন" বলে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করেনি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে, তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামে ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা।

ঐ খেয়াতে "দান" বলে একটা কবিতা আছে। তার বিষয়টি এই যে, ফুলের মালা চেয়েছিলুম, কিন্তু কী পেলুম? "এ তো মালা নয় গো, এ যে তোমার তরবারি।"...

এমন যে দান এ পেয়ে কি আর শান্তিতে থাকবার জো আছে? শান্তি যে বন্ধন যদি তাকে অশান্তির ভিতর দিয়ে না পাওয়া যায়।...

"অনাবশ্যক" কবিতা সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি পত্রে (৪ অক্টোবর ১৯৩৩) রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

খেয়ার "অনাবশ্যক" কবিতার মধ্যে কোনো প্রচ্ছন্ন অর্থ আছে বলে মনে করি নে। আমাদের ক্ষুধার জন্যে যা অত্যাবশ্যক, তার কতই অপ্রয়োজনে ফেলাছড়া যায় জীবনের ভোজে, যে ভোজ উদাসীনের উদ্দেশে। আমাদের অনেক দান উৎসর্গ করি তার কাছে যার তাতে দৃষ্টি নেই—সেই আবশ্যক নিবেদনে আনন্দও পেয়ে থাকি; অথচ বঞ্চিত হয় সে, যে একান্ত আগ্রহ নিয়ে হাত পেতে মুখ

চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি সংসারে যেখানে অভাব সত্য সেখান থেকে নৈবেদ্য প্রচুরপরিমাণেই বিক্ষিপ্ত হয় সেইদিকে যেখানে তার জন্যে প্রত্যাশা নেই ক্ষুধা নেই।

রাজা

রাজা ১৩১৬ সালের পৌষ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

> এই "রাজা" প্রথমে খাতায় যেমনটি লিখিয়াছিলাম তাহার কতকটা কাটিয়া ছাঁটিয়া বদল করিয়া [প্রথম সংস্করণ] ছাপানো হইয়াছিল। হয়তো তাহাতে কিছু ক্ষতি হইয়া থাকিবে এই আশঙ্কা করিয়া সেই মূল লেখাটি অবলম্বন করিয়া বর্তমান সংস্করণ ছাপানো হইল।—"লেখকের নিবেদন," রাজা

এই "বর্তমান সংস্করণ"ই এখন প্রচলিত, রচনাবলীতেও এই সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে।

রাজা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ পরে অন্যান্য নাট্য ইত্যাদি লিখিয়াছেন। অরূপ রতন (মাঘ ১৩২৬) "নাট্যরূপকটি রাজা নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।" "যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হল" (পৌষ ১৩৩৮)। রাজা নাটকটি রবীন্দ্রনাথ পুনর্লিখনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ বা প্রকাশিত হয় নাই, পাণ্ডুলিপি-আকারে রক্ষিত আছে।

"আমার ধর্ম" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে রাজা নাটকের আলোচনা করিয়াছেন :

> "রাজা" নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা—তার পরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে তা অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা-কিছু সৃষ্টি করেছে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য তাতেই আনন্দ।

অরূপ রতনের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন

> সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজনখ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে,

বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না ;—নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ-কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা-রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল,—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু কোনো বিশেষ রূপে বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়,—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

শেষের কবিতা

শেষের কবিতা ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

শেষের কবিতা "নির্ঝরিণী" কবিতাটি স্বতন্ত্রভাবে পাঠ্যগ্রন্থে সংকলিত হইলে, কেহ কেহ তাহার অর্থব্যাখ্যানের আবশ্যকতা জ্ঞাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথকে পত্র লেখেন। শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকারের পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> শেষের কবিতা গ্রন্থে "নির্ঝরিণী" কবিতার বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ অর্থ ছিল। তার থেকে বিশ্লিষ্ট করে নেওয়াতে তার একটা সাধারণ অর্থ খুঁজে বের করা দরকার হয়। আমার মনে হয় সেটা এই যে, আমাদের বাইরে বিশ্বপ্রকৃতির একটি চিরন্তনী ধারা আছে, সে আপন সূর্য-চন্দ্র আলো-আঁধার নিয়ে সর্বজনের সর্বকালের। জ্যোতিষ্কলোকের ছায়া দোলে তার ঝরনার ছন্দে। জীবনে কোনো বিপুল প্রেমের আনন্দে এমন একটা পরম মুহূর্ত আসতে পারে, যখন আমার চৈতন্যের নিবিড়তা আপনাকে অসীমের মধ্যে উপলব্ধি করে, তখন বিশ্বের নিত্য-উৎসবের সঙ্গে মানবচিত্তের উৎসব মিলিত হয়ে যায়, তখন বিশ্বের বাণী তারই বাণী হয়ে ওঠে। ইতি ৫ বৈশাখ ১৩৪৩

এইরূপ অন্যান্য পত্রের উত্তরে "নির্ঝরিণী" সম্বন্ধে নিম্নমুদ্রিত মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাজার পত্রিকায় [১৭] প্রকাশ করেন :

> শেষের কবিতায় নায়িকাকে সম্বোধন করে উপন্যাসের নায়ক বলছে, তুমি ঝরনার মতো, তোমার চিত্তের প্রবাহ স্বচ্ছ, বিশ্বের আনন্দ-আলোক তার মধ্যে অবাধে প্রতিফলিত হয়। তোমার সেই নির্মল হৃদয়ে আমার ছায়া পড়ুক, আমার চিন্তা তোমার হৃদয়ে দোলায়িত হতে থাক্,—তোমার মনে প্রতিবিম্বিত আমার ছবিটিকে বাণী দাও তোমার প্রেমের যে-বাণী নিত্যকালের। অর্থাৎ তোমার ভালোবাসার চিরন্তনতায় তাকে সার্থক করো, সত্য করো।
>
> তোমার অন্তরে পড়েছে আমার ছায়া, তার সঙ্গে মিলেছে তোমার আনন্দের দীপ্তি, তারই উপলব্ধিতে আমার অন্তরতম কবি উল্লসিত। পদে পদে তোমার আনন্দের ছটায় আমার প্রাণে করে ভাষার সঞ্চার। আমার মন জাগে তোমার ভালোবাসার প্রবাহবেগে, তার প্রেরণায় আমার যথার্থ স্বরূপকে জানি। তোমাতেই পাই আমার প্রকাশরূপিণী বাণীকে।
>
> এক কথায় এই কবিতার মর্মার্থ এই যে, অন্যের আনন্দের মধ্যে নিজেকে যখন প্রতিফলিত দেখি তখন নিজের আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

রাজা প্রজা। সমূহ। পরিশিষ্ট

রাজা প্রজা ও সমূহ গদ্যগ্রন্থাবলীর দশম ও একাদশ ভাগরূপে ১৩১৫ সালে প্রকাশিত হয়।

আত্মশক্তি (রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড), ভারতবর্ষ (রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড) রাজা প্রজা, সমূহ ও স্বদেশ (গদ্যগ্রন্থাবলী, দ্বাদশ ভাগ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড)—এই কয়খানি গ্রন্থে ১৩১৫ ও তৎপূর্ববর্তীকালে লিখিত রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ প্রায় সমস্তই সন্নিবিষ্ট হয়। যে-সকল রচনা সম্ভবত একান্ত সাময়িক বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নাই, বা অন্য কোনো কারণে বাদ পড়িয়াছে, ১৩১৫ বা তাহার পূর্ববর্তীকালে লিখিত এইরূপ রাষ্ট্রনৈতিক রচনার অধিকাংশই বর্তমান খণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। কতকগুলি রচনা রবীন্দ্রনাথের বলিয়া অনুমিত হইলেও সে-সম্বন্ধে এখনও নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই ; পরে এগুলি রবীন্দ্রনাথের বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা গেলে এবং রবীন্দ্রনাথের বলিয়া পরিজ্ঞাত আরো রচনা সংগৃহীত হইলে, সেগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলীর একটি বিশেষ খণ্ডে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অন্যান্য রচনার সহিত মুদ্রিত হইবে।

রাজা প্রজা, সমূহ ও বর্তমান খণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর সাময়িক পত্রে প্রথম মুদ্রণের তালিকা নিচে প্রকাশিত হইল। প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই সকল সাময়িক পত্রের অনেকগুলির সম্পাদনাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন (সাধনা, চতুর্থ বর্ষ, ১৩০১-০২ ; ভারতী, ১৩০৫ ; বঙ্গদর্শন, ১৩০৮-১২ ; ভাণ্ডার, ১৩১২-১৩—রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক পরিচালিত বা সম্পাদিত সাময়িক পত্রের ইহাও সম্পূর্ণ তালিকা নহে। সাধনার প্রথম তিন বৎসরের সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় থাকিলেও রবীন্দ্রনাথই প্রধান লেখক ছিলেন), এবং এই রচনার অনেকগুলি সম্পাদকীয় মন্তব্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

রাজা প্রজা

ইংরেজ ও ভারতবাসী[১১]	সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০০
রাজনীতির দ্বিধা	সাধনা, চৈত্র, ১৩০০
অপমানের প্রতিকার	সাধনা, ভাদ্র, ১৩০১
সুবিচারের অধিকার	সাধনা, অগ্রহায়ণ, ১৩০১
কণ্ঠরোধ	ভারতী, বৈশাখ, ১৩০৫
অত্যুক্তি[১২]	বঙ্গদর্শন, কার্তিক, ১৩০৯
ইম্পীরিয়লিজম	ভারতী, বৈশাখ, ১৩১২
রাজভক্তি[১৩]	ভাণ্ডার, মাঘ, ১৩১২
বহুরাজকতা	ভাণ্ডার, আষাঢ়, ১৩১২
পথ ও পাথেয়[১৪]	বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫
সমস্যা	প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৫

সমূহ

“স্বদেশী সমাজ”[১৫]	বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১৩১১
স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট[১৬]	বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, ১৩১১
দেশনায়ক[১৭]	বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩
সফলতার সদুপায়[১৮]	বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১৩১১
পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণ[১৯]	প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩১৪
সদুপায়	প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩১৫

পরিশিষ্ট

সার লেপেল গ্রিফিন	সাধনা, শ্রাবণ, ১২৯৯
ইংরেজের আতঙ্ক	সাধনা, পৌষ, ১৩০০

রাজা ও প্রজা	সাধনা, শ্রাবণ, ১৩০১
প্রসঙ্গ কথা ১—৫	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩০৫
মুখুজ্যে বনাম বাঁড়ুজ্যে	ভারতী, ভাদ্র, ১৩০৫
অপর পক্ষের কথা	ভারতী, আশ্বিন, ১৩০৫
আলট্রা কনসার্ভেটিভ	ভারতী, কার্তিক, ১৩০৫
বিরোধমূলক আদর্শ	বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, ১৩০৮
রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি	বঙ্গদর্শন, কার্তিক, ১৩০৯
রাজকুটুম্ব	বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১৩১০
ঘুষাঘুষি	বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১৩১০
বঙ্গবিভাগ	বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১
দেশের কথা	বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ, ১৩১১
ব্যাধি ও প্রতিকার[১৫]	প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩১৪
যজ্ঞভঙ্গ[১৬]	প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৪
দেশহিত	বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, ১৩১৫

স্বদেশী আন্দোলনের এক পর্বে যখন দেশে মতানৈক্য প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তখন "দেশনায়ক" প্রবন্ধে (পশুপতিনাথ বসুর সৌধপ্রাঙ্গণে আহূত মহাসভায় পঠিত, ১৫ বৈশাখ ১৩১৩) রবীন্দ্রনাথ "দেশের সমস্ত উদ্যমকে বিক্ষেপের ব্যর্থতা হইতে একের দিকে ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায়"রূপে "কোনো এক জনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার" করিবার প্রস্তাব করেন,[১৭] এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে "সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য" সমস্ত বঙ্গবাসীকে আহ্বান করেন :

> [১৮] অল্পকাল পূর্বে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যখন প্রথম জোয়ার আসিয়াছিল, তখন ছাত্রদের মুখে এবং চারিদিকে "নেতা" "নেতা" "নেতা" রব উঠিয়াছিল। তখন এই নেতৃহীন দেশে অকস্মাৎ নেতা এতই অদ্ভুত সুলভ হইয়াছিল যে, আমাদের মত সাহিত্যরসবিহ্বল অকর্মণ্য লোকেরও নেতা হইবার সাংঘাতিক ফাঁড়া নিতান্তই অল্পের উপর দিয়া কাটিয়াছে। শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকদের তখন এমনি বিপদের দিন গেছে যে, "আমি নেতা নই" বলিয়া গলায় চাদর দিলেও সেই তাহার গলার চাদরটা ধরিয়াই তাহাকে নেতার কাঠগড়ায় টানিয়া আনিবার নির্দয় চেষ্টা করা হইয়াছে।
>
> হঠাৎ সমস্ত দেশের এইরূপ উৎকট 'নেতা'-বায়ুগ্রস্ত হইবার কারণ এই যে,

কাজের হাওয়া দিবামাত্রই স্বভাবের নিয়মে সর্ব-প্রথমে নেতাকে ডাক পড়িবেই। সেই ডাকে প্রথম ধাক্কায় বাজারে ছোটো-বড়ো ঝুঁটা-খাঁটি বহুবিধ নেতার আমদানি হয় এবং লোকে প্রাণের গরজে বিচার করিবার সময় পায় না,—নেতা লইয়া টানাটানি-কাড়াকাড়ি করিতে থাকে। ইহাতে করিয়া অনেক মিথ্যার, অনেক কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে আসল সত্যটুকু এই যে, আমাদের নিতান্তই নেতা চাই—নহিলে আমাদের আশা-উদ্যম-আকাঙ্ক্ষা সমস্ত ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

যাহা হউক, একদিন যখন নেতাকে ডাকি নাই, কেবল বক্তৃতাসভার সভাপতিকে খুঁজিয়াছিলাম, সেদিন গেছে; তার পরে একদিন যখন "নেতা নেতা" করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, সেদিনও আজ নাই; অতএব আজ অপেক্ষাকৃত স্থিরচিত্তে আমাদের একজন দেশনায়ক বরণ করিয়া লইবার প্রস্তাব পুনর্বার সর্বসমক্ষে উত্থাপন করিবার সময় হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিতেছি। এ-সম্বন্ধে আজ কেবল যে আমাদের বোধশক্তি পরিষ্কার হইয়াছে, তাহা নহে, আমাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং দেশের হৃদয় নানা আন্দোলনের ও নানা পরিভ্রমণের পরেও অবশেষে যাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে, তাঁহার পরিচয় অদ্য যেন পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে।

আমি জানি, এই সভাস্থলে দেশনায়ক বলিয়া আমি যাঁহার নাম লইতে উদ্যত হইয়াছি, তাঁহার নাম আজ কেবল বাংলাদেশে নহে, ভারতবর্ষের সর্বত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি জানি, আজ বঙ্গলক্ষ্মী যদি স্বয়ংবরা হইতেন, তবে তাঁহারই কণ্ঠে বরমাল্য পড়িত। ব্রাহ্মণের ধৈর্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজ যাঁহাতে একত্রে মিলিত, যিনি সরস্বতীর নিকট হইতে বাণী পাইয়াছেন এবং যাঁহার অক্লান্ত কর্মপটুতা স্বয়ং বিশ্বলক্ষ্মীর দান—আজ বাংলাদেশের দুর্যোগের দিনে যাঁহারা নেতা বলিয়া খ্যাত, সকলের উপরে যাঁহার মস্তক অভ্রভেদী গিরিশিখরের মতো বজ্রগর্ভ মেঘপুঞ্জের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই সুরেন্দ্রনাথকে সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য আমি সমস্ত বঙ্গবাসীকে আহ্বান করিতেছি।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নবযৌবনের জ্যোতিঃপ্রদীপ্ত প্রভাতে দেশহিতের জাহাজে হাল ধরিয়া যেদিন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেদিন ইংরেজিশিক্ষাগ্রস্ত যুবকগণ একটিমাত্র বন্দরকেই আপনাদের গম্যস্থান বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন—সেই বন্দরের নাম রাজপ্রসাদ। সেখানে আছে সবই—লোকে যাহা কিছু কামনা করিতে পারে, অন্নবস্ত্র-পদমান সমস্তই রাজভাণ্ডারে বোঝাই করা রহিয়াছে।

আমরা ফর্দ ধরিয়া ধরিয়া উচ্চস্বরে চাহিতে আরম্ভ করিলাম—ডাঙা হইতে উত্তর আসিল, "এস না, তোমরা নামিয়া আসিয়া লইয়া যাও।" কিন্তু আমাদের নামিবার ঘাট নাই; আর-আর সমস্ত বড়ো-বড়ো জাহাজে পথ আটক করিয়া নোঙর ফেলিয়া বসিয়া আছে, তাহারা এক-ইঞ্চি নড়িতে চায় না। এদিকে ফর্দ আওড়াইতে আওড়াইতে আমাদের গলা ভাঙিয়া গেল—দিন অবসান হইয়া আসিল। কখনো বা রাগ করিয়া যাহা মুখে আসে তাহাই বলি, কখনো বা চোখের জলে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। কেহ নিষেধও করে না, কেহ পথও ছাড়ে না: বাধাও নাই, সুবিধাও নাই। আর-আর সকলে দিব্য কেনাবেচা করিয়া যাইতেছে, নিশান উড়িতেছে, আলো জ্বলিতেছে, ব্যাণ্ড বাজিতেছে। আমরা সন্ধ্যাকাশের অবিচলিত নক্ষত্ররাজি ও রাজবাতায়নের অনিমেষ দীপমালার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সকলের পশ্চাৎ হইতে আমাদের "দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ" অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ের সহিত অবিশ্রাম নিবেদন করিয়া চলিলাম।

এইভাবে কতদিন, কত বৎসর কাটিত, তাহা বলিতে পারি না। এমন সময় এই নিঃসহ নিশ্চলতার মধ্যে বিধাতার কৃপায় পশ্চিম-আকাশ হইতে হঠাৎ একটা বড়োরকম ঝড় উঠিল। আমাদের দেশহিতের জাহাজটাকে পূবের মুখে ছত্র করিয়া ছুটাইয়া চলিল অবশেষে যেখানে আসিয়া তীর পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম, চাহিয়া দেখিলাম, সে যে আমাদের ঘরের ঘাট। সেখানে নিশান উড়ে না, ব্যাণ্ড বাজে না, কিন্তু পুরলক্ষ্মীরা যে হুলুধ্বনি দিতেছেন, দেবালয়ে যে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। এতদিন অভুক্ত থাকিয়া পরের পাকশালা হইতে কেবল বড়ো-বড়ো ভোজের গন্ধটা পাইতেছিলাম, আজ যে দেখিতে দেখিতে সম্মুখে পাত পাড়িয়া দিল। আমরা জানিতাম না, এ যজ্ঞে আমাদের মাতা আমাদের জন্য এতদিন সজলচক্ষে অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। তিনিই আজ দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সুরেন্দ্রনাথের শিরশ্চুম্বন করিয়া তাঁহাকে আপন কোলের দিকে টানিয়াছেন। আমরা আজ সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি সেই পশ্চিম-বন্দরের শাদা-পাথরে বাঁধানো সোনার দ্বীপে এমন সুস্নিগ্ধ সার্থকতা একদিনের জন্যও লাভ করিয়াছেন? —এমন আশাপরিপূর্ণ অমৃতবাণী স্বপ্নেও শুনিয়াছেন?

বিধাতার কৃপাঝড়ে সুরেন্দ্রনাথের সেই জাহাজকে যে ঘাটে আনিয়া ফেলিয়াছে, ইহার নাম আত্মশক্তি। এইখানে যদি আমরা কেনাবেচা করিতে পারিলাম, তো পারিলাম—নতুবা অতলস্পর্শ লবণাম্বুগর্ভে ডুবিয়া মরাই আমাদের পক্ষে শ্রেয় হইবে। কাপ্তেন, এখানকার প্রত্যেক ঘাটে ঘাটে আমাদের বিস্তর

লেনাদেনা করিবার আছে—শিক্ষাদীক্ষা, সুখস্বাস্থ্য, অন্নবস্ত্র, সমস্ত আমাদিগকে বোঝাই করিয়া লইতে হইবে—এবারে আর সেই রাজ-অট্টালিকার শূন্যগর্ভ গুম্বজটার দিকে একদৃষ্টিতে দূরবীণ কষিয়া নোঙর ফেলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা আজ যে-যাহার ছোটোখাটো মূলধন হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি —এবারে আর বাঁধাবন্দরে পুনঃপুন বন্দনাগীত গাওয়া নয়,—এবার পাহাড় বাঁচাইয়া, ঝড় কাটাইয়া আমাদিগকে পার করিতে হইবে কাপ্তেন।—তোমার উপরে অনেকের ভরসা আছে—হাল ধরিয়া তোমার হাত শক্ত, ঢেউ খাইয়া তোমার হাড় পাকিয়াছে। এতদিন যে-নামের দোহাই পাড়িতে পাড়িতে দিন কাটিয়া গেল, সে-নাম ছাড়িয়া আজ যথার্থ কাজের পথে পাড়ি দিবার বেলায় ঈশ্বরের নাম করো, আমরাও এককণ্ঠে তাঁহার জয়োচ্চারণ করিয়া সকলে তোমার চতুর্দিকে সম্মিলিত হই।...

১৯ আপনাদের যদি অভিমত হয়, তবে আর কালবিলম্বমাত্র না করিয়া বঙ্গদেশের এই মঙ্গলমহাসনে সুরেন্দ্রনাথের অভিষেক করি। জানি, এরূপ কোনো প্রস্তাব কখনোই সর্ববাদিসম্মত হইতেই পারে না, কিন্তু তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে চিরদিন কেবল অপেক্ষা করিয়াই থাকা হইবে, তাহার বেশি আর কিছুই হইবে না। যাঁহারা প্রস্তুত আছেন, যাঁহারা সম্মত আছেন, তাঁহারা এই কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। তাঁহারা সুরেন্দ্রনাথকে সমস্ত ক্ষুদ্রবন্ধন হইতে মুক্ত করুন, তাঁহাকে দেশনায়কের উপযুক্ত গৌরবরক্ষার সামর্থ্য দিন, সকলের যোগ্যতা মিলিত করিয়া তাঁহাকে এই পদের যোগ্য করিয়া তুলুন।...

২০ যাঁহারা সাধক, যাহারা দেশের গুরু, তাঁহারা খ্যাতিপ্রতিপত্তির অপেক্ষা না রাখিয়া, বিরোধ-অবমাননার আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও দেশের মতি ফিরাইতে চেষ্টা করিবেন—আর যাঁহারা দেশের নায়ক, তাঁহারা দেশকে গতিদান করিবেন। যে-সকল জাতি স্থির হইয়া বসিয়া নাই, যাহারা চলিতেছে, তাহারা এইভাবেই চলিতেছে। এক দল উপর হইতে তাহাদের শুভবুদ্ধিকে নিয়মিত করিতেছে, আর-এক দল বক্ষের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের প্রাণশক্তি-গতিশক্তিকে প্রবর্তিত করিতেছে। এই উভয় দলের পরস্পরে অনেক সময়েই একমত হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া যাহারা চালাইতেছে, তাহাদের বসিয়া থাকিলে চলে না। কারণ, শিক্ষা শুধু উপদেশে নহে, চলার মধ্যেই শিক্ষা আছে।

অতএব এতদিন যে সুরেন্দ্রনাথ বিনা নিয়োগে নিজের ক্ষমতাবলেই দেশকে সাধারণহিতের পথে চালনা করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহাকে নিয়োগপত্র দিয়া

নায়কপদে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব আমি উত্থাপন করিতেছি। নিয়োগপত্র দিলে তাঁহার ক্ষমতা সুনিশ্চিত এবং তাঁহার দায়িত্ব গভীরতর হইবে এবং তিনি কেবলমাত্র শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ইংরেজিবিদ্যার অভ্যস্ত বুলির প্রতি কর্ণপাত না করিয়া আমাদের এই পুরাতন দেশের চিরন্তন প্রকৃতির প্রতি মনোযোগ করিবেন —যে-সকল পদার্থ পরদেশের সজীব কলেবরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যথাস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলে এ-দেশে যাহা অসংগত আবর্জনারূপে গণ্য হইবে, অনুকরণের মোহে তাহাকে তিনি আদর করিবেন না,—বিরোধমূলক যে সংগ্রামশীলতা য়ুরোপীয় সভ্যতার স্বভাবগত, যাহা কখনোই এ-দেশের মৃত্তিকায় মূলবিস্তার করিয়া ফলবান হইবে না, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে মঙ্গলময় মিলনপরতা, যে অবিচলিত ধর্মনিষ্ঠা ভারতবর্ষের চিরকালীন সাধনা, তাহাকেই বর্তমানকালের অবস্থান্তরের সহিত তিনি সংগত করিয়া লইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তিনি কী করিবেন না-করিবেন, এ-স্থলে তাহা অনুমান ও আলোচনা করা বৃথা—কেবল ইহাই সত্য যে, তাঁহার করার মধ্যে আমাদেরই কর্ম প্রকাশ পাইবে, দেশ তাঁহারই মধ্য দিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিবে, তাঁহারই এক হস্ত দ্বারা নিজের প্রাপ্য গ্রহণ করিবে ও তাঁহারই অন্য হস্ত দ্বারা নিজের দান বিতরণ করিবে—ধর্মবিরুদ্ধ না হইলে, সত্যকে লঙ্ঘন না করিলে ইঁহার বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ করিব না এবং এই নিয়ম ও নিয়ন্তাকে স্বেচ্ছাকৃত সুতরাং অলঙ্ঘ্য বাধ্যতাসহকারে মান্য করাই আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে আত্মসম্মান বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপে সমস্ত বলক্ষয়কর দ্বিধা ও সমস্ত আত্মাভিমানের কুশকণ্টক সবলে উৎপাটিত করিয়া যদি একের মধ্যে আমরা আমাদিগকে নিবিড়ভাবে একত্র করিতে পারি, তবে আর আমাদিগকে নিজের শক্তির অহংকার করিবার জন্য সর্বদা আস্ফালন করিতে হইবে না, পরের বিমুখতাকে ফিরাইবার জন্য প্রাণপণে অত্যুক্তির সৃষ্টি করিতে হইবে না—তবেই আমরা শান্তভাবে, বলিষ্ঠ ও ধীরভাবে মহৎ হইতে পারিব এবং নিজের দেশের মধ্যে নিজের যথার্থ স্থানটি অধিকার করিয়া কর্মগৌরবের মধ্যে সার্থকতা প্রাপ্ত হইয়া পোলিটিক্যাল ধনুষ্টংকারের অত্যুগ্র আক্ষেপ হইতে রক্ষা পাইব—আমরা সুস্থ হইব, স্বাভাবিক হইব, সংযত-আত্মসংবৃত হইব এবং নিজের চাপল্যবিহীন মর্যাদার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া পরের উপেক্ষাকে অকাতরে উপেক্ষা করিতে পারিব।

"দেশনায়ক" প্রবন্ধ বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনের "ছত্রভঙ্গ" হইবার পর লিখিত। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় বলেন :

এবারে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতিতে বাঙালি খুব একটা আঘাত পাইয়াছে, সে-কথা সকলেই জানেন। ভাতে মারার চেয়ে হাতে মারাটা উপস্থিতমতো গুরুতর বলিয়াই মনে হয়। আইন কলের রোলারের মতো নির্মমভাবে আমাদের অনেক আশা দলন করিতে পারে, কিন্তু পুলিসের সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপ বলিতে কী বুঝায়, সশরীরে তাহার অভিজ্ঞতালাভ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের সদাসর্বদা ঘটে না। এবারে অকস্মাৎ তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া দেশের মান্যগণ্য লোকের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

একটা প্রতিকারের পথ, একটা কাজ করিবার ক্ষেত্র না পাইলে, বেদনা নিজের প্রতি উত্তেজনার সমস্ত বেগ আকর্ষণ করিয়া অসংযত হইয়া অপরিমিত-রূপে বড়ো হইয়া উঠে। আমরা জানিতাম, ব্রিটিশরাজ্যে আইন-জিনিসটা ধ্রুব— এইজন্য সকল উপদ্রবের উপর আইনের দোহাই পাড়িতাম—কিন্তু আইন স্বয়ং বিচলিত হইয়া উপদ্রবের আকার ধারণ করিলে ক্ষণকালের জন্যও মনকে শান্ত করিবার কোনো উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জলের মধ্যে তুফান উঠিলে লোকে ডাঙার দিকে ছোটে—কিন্তু ভূমিকম্পে ডাঙা যখন স্বয়ং দুলিতে আরম্ভ করে, যাহাকে অচল বলিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম, সে যখন চঞ্চল হইতে থাকে, তখনই বিভীষিকা একেবারে বীভৎস হইয়া উঠে।

এইরূপ সাধারণ চঞ্চলতার সময় সংপরামর্শের সময় নহে। আমিও এই দেশব্যাপী ক্ষোভের সময় স্থিরভাবে মন্ত্রণা দিতে অগ্রসর হইতাম না। কাল— যিনি নীরব, যিনি বিধাতার সুদৃঢ় দক্ষিণহস্ত, যিনি সকল ফলকে ধৈর্যের সহিত পাকাইতে থাকেন, আমিও নিষ্ঠার সহিত তাঁহারই নিগূঢ় নিয়মের প্রতি নির্ভর করিয়া প্রতীক্ষা করিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু একটি মহান্ আশ্বাস এই অসময়েও আমাকে উৎসাহিত করিয়াছে।

এবারে কর্তৃপুরুষদের সহিত সংঘাতে বাঙালি জয়ী হইয়াছে। এই সংকট-কালে বাঙালি যে-বলের পরিচয় দিয়াছে, সেই বলের দৃষ্টান্তই তাহার সম্মুখে স্থিরভাবে ধরিব বলিয়া এই সভাস্থলে আমি অদ্য উপস্থিত হইয়াছি।

সেদিনকার উপদ্রবে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের ছাত্রদলের, যুবকগণের ও নায়কবর্গের অবিচলিত স্থৈর্য দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন। যে উৎপাত কোনোমতে আশা করা যায় না, তাহা সহসা মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িলে তখনই মানুষের গভীরতর প্রকৃতি আপনাকে অনাবৃতভাবে

প্রকাশ করিয়া ফেলে। সেদিন বাঙালি নিজেকে যেরূপে ব্যক্ত করিয়াছে, তাহাতে আমাদের লজ্জার কোনো কারণ ঘটে নাই।

আপনারা সকলেই জানেন, সেদিন সভাপতিকে লইয়া যখন প্রতিনিধি ও সভাসদ্‌গণ মন্ত্রণাসভার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন নায়কবর্গের আদেশ অনুসারে যাত্রিগণ কেহ একটি যষ্টিও গ্রহণ করেন নাই। এবং পুলিস যখন নিরস্ত্র-তাঁহাদের উপর পড়িয়া আঘাতবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, তখনও নায়কদের উপদেশ স্মরণ করিয়া তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত সমস্ত সহ্য করিয়াছেন।

আমি জানি, এ-সম্বন্ধে অবিচারের আশঙ্কা আছে।

"তেজস্বিত্ববলিপ্ততা মুখরতা বক্তৃত্বাশক্তিঃ স্থিরে"

তেজস্বিতাকে অহংকার, বাগ্মিতাকে মুখরতা এবং স্থৈর্যকে অশক্তি বলিয়া নিন্দুকে নিন্দা করে। সময়বিশেষে স্থৈর্য অশক্তির লক্ষণরূপে প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু যখন তাহা বীর্য হইতে প্রসূত হয়, তখন তাহা বীর্যের শ্রেষ্ঠলক্ষণ বলিয়াই গণ্য হয়। বরিশালে কর্তৃপক্ষ অসংযমের দ্বারা হাস্যকর কাপুরুষতা এবং আমরা স্থৈর্যের দ্বারা শক্তির গাম্ভীর্য প্রকাশ করিয়াছি, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই যে সাময়িক উৎপাতের দ্বারা আত্মবিস্মৃত না হইয়া সাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশে আমরা উদ্বেল প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ শাসনে রাখিয়াছিলাম, ইহার দ্বারাই আশান্বিত হইয়া উত্তেজনাশান্তির পূর্বেই অদ্যকার সভায় আমি দুই-একটি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

দেশের হিতসাধন একটা বৃহৎ মঙ্গলের ব্যাপার, নিজের প্রবৃত্তির উপস্থিত চরিতার্থতাসাধন তাহার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। যদি এই বৃহৎ লক্ষ্যটাকে আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে যথার্থভাবে ধরিয়া রাখিতে পারি, তবে ক্ষণিক উত্তেজনা, ক্ষুদ্র অন্তর্দাহ আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না।

"বয়কট"-আন্দোলন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বলেন :

" আপনাদের কাছে আমি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি, বাঙালীর মুখে "বয়কট" শব্দের আস্ফালনে আমি বারংবার মাথা হেঁট করিয়াছি। আমাদের পক্ষে এমন সংকোচজনক কথা আর নাই। বয়কট দুর্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্বলের কলহ। আমরা নিজের মঙ্গলসাধনের উপলক্ষ্যে নিজের ভালো করিলাম না, আজ পরের মন্দ করিবার উৎসাহেই নিজের ভালো করিতে বসিয়াছি, এ-কথা মুখে উচ্চারণ করিবার নহে। আমি অনেক বক্তাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে শুনিয়াছি—"আমরা য়ুনিভর্সিটিকে বয়কট করিব।" কেন করিব? য়ুনিভর্সিটি যদি ভালো জিনিস

হয়, তবে তাহার সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আড়ি করিয়া দেশের অহিত করিবার অধিকার আমাদের কাহারও নাই। যদি য়ুনিভর্সিটি অসম্পূর্ণ হয়, যদি তাহা আমাদিগকে অভীষ্টফল দান না করে, তবে তাহাকে বর্জন করাকে বয়কট করা বলে না। যে মনিব বেতন দেয় না, তাহার কর্ম ছাড়িয়া দেওয়াকে বয়কট করা বলে না। কচ দৈত্যগুরুর আশ্রয়ে আসিয়া দৈত্যদের উৎপীড়ন ও গুরুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধৈর্য ও কৌশল অবলম্বনপূর্বক বিদ্যালাভ করিয়া দেবগণকে জয়ী করিয়াছেন। জাপানও য়ুরোপের আশ্রম হইতে এইরূপ কচের মতোই বিদ্যালাভ করিয়া আজ জয়যুক্ত হইয়াছেন। দেশের যাহাতে ইষ্ট, তাহা যেমন করিয়াই হউক সংগ্রহ করিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত সহ্য করা পৌরুষেরই লক্ষণ—তাহার পর সংগ্রহকার্য শেষ হইলে স্বাতন্ত্র্যপ্রকাশ করিবার দিন আসিতে পারে। দেশের কাজে রাগারাগিটা কখনোই লক্ষ্য হইতে পারে না। দেশের কাজের মাহাত্ম্য যদি আমরা মনের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি, তবে তাহারই উদ্দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্তেজনা আমরা উপেক্ষা করিয়া কর্তব্যপথে স্থির থাকিতে পারিব।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, দেশে স্বদেশী উদ্‌যোগ আজ যে এমন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, বয়কট তাহার প্রাণ নহে। একটা তুচ্ছ কলহের ভাব কখনোই দেশের অন্তঃকরণকে এমন করিয়া টানিতে পারিত না। এই যে স্বদেশী উদ্‌যোগের আহ্বানমাত্রে দেশ একমুহূর্তে সাড়া দিয়াছে, কার্জনের সঙ্গে আড়ি তাহার কারণ হইতেই পারে না; জগতে কার্জন এতবড়ো লোক নহে; এই আহ্বান দেশের শুভবুদ্ধির সিংহদ্বারে আঘাত করিয়াছিল বলিয়াই আজ ইহা এত দ্রুত এমন সমাদর পাইয়াছে। আজ আমরা দেশের কাপড় পরিতেছি কেবল পরের উপর রাগ করিয়া, এই যদি সত্য হয়, তবে দেশের কাপড়ের এতবড়ো অবমাননা আর হইতেই পারে না। আজ আমরা স্বায়ত্তভাবে দেশের শিক্ষার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, রাগারাগিই যদি তাহার ভিত্তিভূমি হয়, তবে এই বিদ্যালয়ে আমরা জাতীয় অগৌরবের স্মরণস্তম্ভ রচনা করিতেছি।

আরও লজ্জার কারণ এই যে, বয়কটের মধ্যে আমরা যে স্পর্ধা প্রকাশ করিতেছি, সেই স্পর্ধার শক্তিটা কোথায় অবস্থিত? সে কি আমাদের নিজের গায়ের জোরে, না ইংরেজশাসনতন্ত্রের ক্ষমাগুণে! যখনই সেই ক্ষমাগুণের লেশমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখি, যখনই মানবধর্মবশত স্পর্ধার বিরুদ্ধে ক্ষমতাশালীর আক্রোশ আইনের বেড়ার কোনো-একটা অংশ একটুমাত্র আল্‌গা করিয়া ফেলে,

অমনি আমরা বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠি এবং তৎক্ষণাৎ প্রমাণ করিয়া করিয়া দিই যে, পরের ধৈর্যের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই আমরা পরকে উত্তেজিত করিতেছিলাম। আমাদের স্পর্ধা যদি যথার্থ আমাদেরই শক্তি হইতে উদ্ভূত হইত, তবে অপরপক্ষের স্বাভাবিক রোষ এবং শাসনের কাঠিন্য আমরা স্বীকার করিয়া লইতাম, তবে উদ্যতমুষ্টি দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমরা মিণ্টো-মর্লির দোহাই পাড়িতে ও আদালতের আবদার কাড়িতে ছুটিতাম না।

এ-কথা মানিতেই হয় যে, স্বভাবের নিয়মে স্পর্ধার বিরুদ্ধে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সক্ষমের ক্রোধ কোনো-না-কোনো উপায়ে হিংসার আকার ধারণ করে। যদি আমরা ইংরেজকে বলি, "তোমাকে জব্দ করিবার জন্যই আমরা দেশের ভালো করিতেছি" এবং তার পরে ইংরেজ রক্তচক্ষু হইবামাত্র বলি, "বাঃ, আমরা দেশের ভালো করিতেছি, তোমরা রাগ করিতেছ কেন", তবে গাম্ভীর্যরক্ষা করা কঠিন হয়।

জব্দ করিতে পারার একটা সুখ আছে, সন্দেহ নাই—কিন্তু দেশের ভালো করিতে পারার সুখ যদি তাহার চেয়ে বড়ো হয়, তবে তাহারই খাতির রাখিতে হয়। আমরা বয়কট করিয়াই দেশী কাপড় চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ-কথা বলিবামাত্র দেশী কাপড় চালানো বিঘ্নসংকুল হইয়া উঠে, সুতরাং জব্দ করিবার সুখ ভোগ করিতে গিয়া ভালো করিবার সুখ খর্ব করিতে হয়। দেশী কাপড় চালানো ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের একটা লড়াই, এ-কথা বলিলেই যাহা আমাদের চিরন্তন মঙ্গলের পবিত্র ব্যাপার, তাহাকে মল্লবেশ পরাইয়া পোলিটিকাল্ আখড়ায় টানিয়া আনিতে হয়; ইংরেজ তখন এই উদ্‌যোগকে কেবল যে নিজের দেশের তাঁতির লোকসান বলিয়া দেখে, তাহা নয়, এই হারজিতের ব্যাপারকে একটা পোলিটিকাল সংগ্রাম বলিয়া গণ্য করে। ইহাতে ফল হয় এই যে, নিজের দুর্বল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে আমরা স্বদেশের হিতকে ইচ্ছা-পূর্বক বিপদের মুখে ফেলিয়া দিই। আমাদের দেশে তো অন্তরে-বাহিরে, নিজের চরিত্রে ও পরের প্রতিকূলতায় বিঘ্ন ভূরিভূরি আছে, তাহার 'পরে আস্ফালন করিয়া নূতন বিঘ্নকে হাঁক দিয়া ডাকিয়া আনিব, এতবড়ো অনাবশ্যক শক্তিক্ষয়ের উপযুক্ত সঞ্চয় যে আমাদের কোথায় আছে, তাহার সন্ধান তো আমি জানি না।

বড়ো-বড়ো স্বাধীনজাতিকেও বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়, স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। স্বজাতির মঙ্গলসম্বন্ধে যাহাদের দায়িত্ববোধ আছে, তাহারা তেজস্বী হইলেও অনেক লাঙ্গুলমর্দন বিনম্রকণ্ঠায় নিঃশব্দে স্বীকার করে—ইংলণ্ড-

ফ্রান্স-জর্মনিতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। জাপান চীনের সঙ্গে লড়াইয়ে জয়ী হইয়াও রাশিয়ার চক্রান্তে লড়াইয়ের ফল যখন ভোগ করিতে পারে নাই, তখন চুপ করিয়া ছিল—আজ রাশিয়াকে পরাস্ত করিয়াও বন্ধুদের মধ্যস্থতায় যখন রক্তপাতের পুরা মূল্য আদায় করিতে পারিল না, তখন হাস্যমুখে বন্ধুগণকে ধন্যবাদ জানাইল। কেন? ইহার কারণ, অসহিষ্ণু হইয়া তেজ দেখাইতে যাওয়াই দুর্বলতা, দেশের মঙ্গলকে শিরোধার্য করিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকাই যথার্থ বীরত্ব। যদি ইংলণ্ড-ফ্রান্স-জাপানের পক্ষে এ-কথা সত্য হয়, যদি তাহারা ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করিয়া উন্নতির যাত্রাপথে স্বজাতির বোঝা বাড়াইয়া তুলিতে সর্বদাই কুণ্ঠিত হয়, তবে আমাদের এই অতিক্ষুদ্র কর্মক্ষেত্রে কেবল কথায়-কথায় সশব্দে তাল ঠুকিয়া বেড়ানোই কি আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কাজ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে? যথাসাধ্য মৌন থাকিয়া, স্তব্ধ থাকিয়া আমাদের চলিবার পথের বিপুলকায় বিঘ্নদৈত্যগুলিকে নিদ্রিত রাখাই কি আমাদের কর্তব্য হইবে না? অবশ্য, কারণ ঘটিলে ক্ষোভ অনুভব না করিয়া থাকা যায় না—কিন্তু অসময়ে অকিঞ্চিৎকরভাবে সেই ক্ষোভের অপব্যয় করা না-করা আমাদের আয়ত্তাধীন হওয়া উচিত।

১৯০৮ সালে (১৩১৪-১৫) মজঃফরপুরে বোমা-নিক্ষেপে দুইজন ইংরেজ মহিলা নিহত হইলে ও মানিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কার হইলে রবীন্দ্রনাথ "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধ রচনা ও সভায় তাহা পাঠ করিয়া এ-বিষয়ে নিজের অভিমত প্রকাশ করেন। এই সম্পর্কে শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত এই পত্রগুলি উল্লেখযোগ্য:

> মাত ইহা নিশ্চয় মনে রাখিবে, নিজের বা পরিবারের বা দেশের কাজে ধর্মকে লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করেন না। যদি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও পাপকে আশ্রয় করি তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। বিধাতার এই নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৃথা। দেশের যে দুর্গতিদুঃখ আমরা আজ পর্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি তাহার গভীর কারণ আমাদের জাতির অভ্যন্তরে নিহিত হইয়া রহিয়াছে—গুপ্ত চক্রান্তের দ্বারা নরনারী হত্যা করিয়া আমরা সে কারণ দূর করিতে পারিব না আমাদের পাপের বোঝা কেবল বাড়িয়াই চলিবে। এই ব্যাপারে যে-সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও বিচলিতবুদ্ধি যুবক দণ্ডনীয় হইয়াছে তাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে না—কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই দণ্ড আমাদের সকলের দণ্ড—ঈশ্বর আমাদিগকে এই বেদনা দিলেন—কারণ, বেদনা ব্যতীত পাপ দূর হইতেই পারেনা—সহিষ্ণুতার

সহিত এ সমস্তই আমাদিগকে বহন করিতে হইবে—এবং ধর্মের প্রশস্ততর পথকেই অবলম্বন করিতে হইবে। পাপের পথে পথ-সংক্ষেপ হয় বলিয়া আমরা ভ্রম করি সেইজন্যই অধৈর্য হইয়া আমরা সেইদিকে ধাবিত হই কিন্তু তাড়াতাড়ি করিতে গিয়াই সফলতাকে বিসর্জন দিই। আজ আমাদের পথ পূর্বের অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গেল—এখন আবার আমাদিগকে অনেক দুঃখ অনেক বাধা অনেক বিলম্বের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে মাথা নত করিয়া পুনবার আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে—যত কষ্ট হউক, যত দূরপথ হউক অবিচলিতচিত্তে যেন ধর্মেরই অনুসরণ করি। সমস্ত দুর্ঘটনা সমস্ত চিত্তক্ষোভের মধ্যে ঈশ্বর যেন আমাদিগকে সেই শুভবুদ্ধি দান করেন। ইতি ২৩ বৈশাখ ১৩১৫

মাত তুমি যে দুরূহ প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিয়াছ পত্রের মধ্যে তাহা বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমি এ-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে আমার মত যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। সম্ভবত ভারতীতে তাহা বাহির হইবে এবং যদি কর্তব্য বোধ করি, তবে কোনো সভাতেও তাহা পাঠ করিতে পারি। উদার দৃষ্টি দ্বারা জগদ্ব্যাপারকে বৃহৎ করিয়া দেখিতে থাকো—সমস্ত বিঘ্নবিপত্তি ও দুর্বিসহ দুঃখতাপের মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাসকে স্থির করিয়া তোমার করুণাপূর্ণ ব্যথিত চিত্ত সান্ত্বনা লাভ করুক এই আশীর্বাদ করি। ইতি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

…আমার প্রবন্ধ সভাস্থলে পড়া হয়ে গেছে। পুস্তিকা আকারে ছাপা হচ্ছে—তোমাকে দুই-একদিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দেব। এই কথা মনে রেখো, নিজের জন্যেই কি দেশের জন্যেই কি, যা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য তাই একমাত্র সত্য। কোনো উপস্থিত ক্রোধে, লোভে বা কোনো ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির উত্তেজনায় ধর্মকে খর্ব করতে গেলে কখনো মঙ্গল হতে পারে না। নিজের প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি অনুসারে ধর্মের উপরে হস্তক্ষেপ না করে মরুভূমির পথে ধ্রুবতারার মতো একাগ্রলক্ষ্যে তার দিকে দৃষ্টি রাখলে দুঃখ পাই আর যাই পাই, পথ হারিয়ে বিনাশের মধ্যে পড়তে হবে না। ইতি ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

স্বদেশী আন্দোলনের সময় দমননীতি অবলম্বিত হইলে রবীন্দ্রনাথ যে "স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন" প্রকাশ করেন তাহাও এইখানে মুদ্রিত হইল :

বাংলাদেশের বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনে যাঁহারা রাজদণ্ড ভোগ করিতেছেন তাঁহাদিগকে

পীড়িত করিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলাদেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইল, তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে। রাজচক্রের যে অপমান তাঁহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তাহা বরমাল্য রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের ললাটকে আজ ভূষিত করিয়াছে। যাঁহারা মহাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন বিধাতা জগৎসমক্ষে তাঁহাদের অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন। অদ্য কঠিনব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধিস্বরূপ যেই কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতা-কর্তৃক বিশেষরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের জীবন সার্থক। রাজরোষরক্ত অগ্নিশিখা তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমাপাত না করিয়া বার বার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে। বন্দে মাতরম্।

—ভাণ্ডার, ফাল্গুন, ১৩০২

[১] এই কবিতাটি নৈবেদ্য হইতে সংকলিত হইয়াছিল, কাব্যগ্রন্থের জন্য নূতন রচিত নহে; ইহা উৎসর্গের স্বতন্ত্র সংস্করণে নাই, রচনাবলীতেও ইহা নৈবেদ্যে মুদ্রিত হইয়াছে।

[২] এই নামের যে স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে তাহা কাব্যগ্রন্থের এই বিভাগ হইতে পৃথক।

[৩] স্বতন্ত্র কথা ও কাহিনীর কাহিনী বিভাগের প্রবেশক রূপেও মুদ্রিত হইয়া থাকে, রবীন্দ্র-রচনাবলীও সেইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া রচনাবলী-সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হইল না। স্বতন্ত্র সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হইয়া থাকে।

[৪] স্বতন্ত্র কথা ও কাহিনীর কথা বিভাগের প্রবেশকরূপেও মুদ্রিত হইয়া থাকে; রবীন্দ্র-রচনাবলীতেও সেইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া রচনাবলী-সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হইল না। স্বতন্ত্র সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হইয়া থাকে।

[৫] এই কবিতাটি স্বতন্ত্র সংস্করণ নৈবেদ্যে সর্বদা মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে; রচনাবলীতে সেইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা স্বতন্ত্র সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হয় না, রচনাবলী-সংস্করণ উৎসর্গেও মুদ্রিত হইল না।

[৬] এই কবিতাটি স্বতন্ত্র সংস্করণ শিশুতে মুদ্রিত হইয়া থাকে, রচনাবলীতেও সেইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা স্বতন্ত্র সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হয় না, রচনাবলী-সংস্করণ উৎসর্গেও মুদ্রিত হইল না।

[৭] ইহা কথা ও কাহিনী ও উৎসর্গ উভয়েই প্রকাশিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ইহা কথা ও কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া উৎসর্গে মুদ্রিত হইল না।

স্বতন্ত্র সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত তিনটি কবিতা রচনাবলী-সংস্করণ উৎসর্গে বাদ গেল: "কত কী যে আসে;" "কথা কও কথা কও;" "নিবেদিল রাজভৃত্য।"

৮ পূরবীর (প্রথম সংস্করণ, ১৩৩২) "সঞ্চিতা" অংশে সংকলিত হইয়াছিল; পূরবীতে এই "সঞ্চিতা" অংশ এখন আর মুদ্রিত হয় না।

৯ কাব্যগ্রন্থের অংশ, ও বর্তমানে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত, সংকল্প ও স্বদেশে মুদ্রিত। সংকল্প ও স্বদেশের অধিকাংশ কবিতাই বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংকলিত বলিয়া এগুলি রচনাবলীতে সংকল্প ও স্বদেশ নামে মুদ্রিত হইবে না।।

১০ আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদক সমীপে। সবিনয় নিবেদন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা বাংলা পাঠ্যগ্রন্থে আমার 'নির্ঝরিণী'' কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। ছাত্রেরা অনেকে জানাচ্ছেন মানে বোঝা গেল না। প্রত্যেককে স্বতন্ত্র পত্রে বোঝাতে গেলে অপরাধের চেয়ে শাস্তি বড়ো হয়ে ওঠে—অভিজ্ঞাদের কয়েদীর মতো শেষ মেয়াদ সম্বন্ধেও অনিশ্চিত থাকতে হয়। এজন্য আনন্দবাজার পত্রিকায় বক্তব্যটি পাঠানো গেল, অনুগ্রহপূর্বক প্রকাশ করে আমার দায় লাঘব করবেন। ইতি ৩ ভাদ্র ১৩৪৩।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১ চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে পঠিত; দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী নবম খণ্ড, পৃ. ৫৫৫

১২ ভারতবর্ষ গ্রন্থে পূর্বে প্রকাশিত; রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডে ভারতবর্ষে প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া রাজা প্রজা গ্রন্থে আর মুদ্রিত হইল না।

১৩ স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৪ আত্মশক্তি গ্রন্থে পূর্বে প্রকাশিত; রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ডে আত্মশক্তিতে প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া সমূহ গ্রন্থে আর মুদ্রিত হইল না।

১৫ রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৩১৪ সালের আশ্বিনের প্রবাসীতে, রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধে নির্দিষ্ট "পথকেই আমাদের গন্তব্য পথ বলিয়া নির্দিষ্ট" করিয়াও "সেই পথেও বিনা বাধায় চলিতে পাইব কিনা" তাহা আলোচনা করেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার প্রবন্ধের উপক্রমণিকা এইরূপ :

"দু-বৎসর ধরিয়া মাতামাতির পর কতকটা স্নায়বিক অবসাদে, কতকটা ইংরেজের ভ্রূকুটিদর্শনে আমরা এখন ঠাণ্ডা হইয়া পড়িতেছি। রবিবাবুও সময় বুঝিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, মাতামাতিতে বিশেষ কিছু হইবে না, এখন কাজ করো।

"আজ যিনি আমাদিগকে আস্ফালনে ক্ষান্ত হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন, বাংলার ইতিহাসে এই নূতন অধ্যায়ের আরম্ভে আমি তাঁহারই কৃতিত্ব দেখিতে পাইতেছি। ইংরেজের নিকট 'আবেদন নিবেদন' করিয়া তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিলে কিছুই স্থায়ী লাভ হইবে না, ইংরেজের মুখাপেক্ষা না করিয়া আপনার বলে ও আপনার চেষ্টায় যেটুকু পাওয়া যায়, তাহাই স্থায়ী লাভ, বঙ্গবিভাগের কিছুদিন পূর্ব হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উচ্চ ও অত্যন্ত তীব্র হইয়া মুহুর্মুহু ঐ কথা আমাদের কানে প্রবেশ করাইতেছিল।...

"স্বদেশীর আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাঁহাতে বাতাস দিতে ত্রুটি করে নাই। বেশ মনে আছে, ৩০শে আশ্বিনের পূর্ব হইতে হপ্তায় হপ্তায় তাঁহার এক একটা নূতন

গান বা কবিতা বাহির হইত, আর আমাদের স্নায়ুতন্ত্র কাঁপিয়া আর নাচিয়া উঠিত। বিফল ও অনাবশ্যক আন্দোলনে তিনি কখনোই উপদেশ দেন নাই; কিন্তু সে-সময়টায় যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না।

"উত্তেজনার বশে আমরা দুই বৎসর ধরিয়া ইংরেজের অনুগ্রহ লইব না, ইংরেজের শাসনযন্ত্র অচল করিয়া দিব বলিয়া লাফালাফি করিয়া আসিতেছি; এবং ইংরেজরাজা যখন সেই লাফালাফিতে ধৈর্যভ্রষ্ট হইয়া লগুড় তুলিয়া আমাদের গলা চাপিয়া ধরিয়াছেন, তখন আমাদের সেই অস্বাভাবিক আস্ফালনের নিষ্ফলতা দর্শনে ব্যথিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—ও-পথে চলিলে হইবে না—মাতামাতি-লাফালাফির কর্ম নহে, নীরবে ধীরভাবে কাজ করিতে হইবে।…

"রবিবাবু কেবল "কাজ করো" "কাজ করো" বলিয়া উপদেশ দিয়া চীৎকারের মাত্রাই বাড়াইতেছেন না বরং কোন্ পথে কাজ করা যাইতে পারে, তাহার দুই-একটা নমুনাও নিজের হাতে লইয়া দেখাইতেছেন।"…

১৬ সুরাট কনগ্রেসে বিসংবাদের পরে লিখিত।

১৭ তুলনীয়, "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে "সমাজপতি" নিয়োগের প্রস্তাব, রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড

১৮ পৃ. ৪৯২, ২৩শ ছত্রের পর

১৯ পৃ. ৪৯৩, ২৫শ ছত্রের পর

২০ পৃ. ৪৯৬, ২য় ছত্রের পর

২১ পৃ. ৪৮৭, ১২শ ছত্রের পর

সংযোজন: অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড

মেঘনাদবধ কাব্যের যে-সমালোচনাটি অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে সমালোচনা গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রে (১২৮৪) মেঘনাদবধ কাব্যের একটি সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই দুইটি আলোচনার একটিও মেঘনাদবধ কাব্যের অনুকূল নহে। গ্রন্থপরিচয়ে জীবনস্মৃতি হইতে উদ্ধৃত অংশ মেঘনাদবধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আলোচনাটির বিষয়েই বিশেষ ভাবে লিখিত হইলেও, মেঘনাদবধের প্রতি পূর্বতন বিরূপতা সম্বন্ধে পরে রবীন্দ্রনাথ কি মত পোষণ করিতেন, তাহারই নিদর্শনস্বরূপে সেটি উদ্ধৃত হইয়াছিল, বস্তুত ঐ উদ্ধৃতাংশের বক্তব্য দুইটি লেখা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

কিন্তু ১২৮৪ সালে প্রকাশিত লেখাটি অধিকতর আলোচিত বলিয়া, স্বতন্ত্র উল্লেখ না থাকিলে পাঠকগণ সমালোচনায় মুদ্রিত লেখাটির সহিত সেটিকে ভুল করিতে পারেন; শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানাইয়াছেন যে, অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে যে অনুবাদ-চর্চা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পরিপূরক গ্রন্থ *Selected Passages for Bengali Translation* মূল ইংরেজি বাক্যসমষ্টির সংকলন; ছাত্রেরা প্রথমে সেইগুলির বাংলা অনুবাদ করিবে ও অনুবাদ-চর্চার আদর্শ-বাংলার সহিত মিলাইয়া নিজেদের অনুবাদ মার্জিত করিবে, এবং সেই বাংলার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া *Selected Passages*-এর ইংরেজি বাক্যাবলীর সহিত মিলাইয়া দেখিবে- এই বই দুইটির ব্যবহার-রীতি এইরূপ।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অচির বসন্ত হায় এল, গেল চলে ৮৭

অত চুপি চুপি কেন কথা কও ৭১

অনাবশ্যক ১১৯

অনাহত ১১৫

অনুমান ১৭৬

অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে ২৬২

অপমানের প্রতিকার ৪১০

অপর পক্ষের কথা ৫৮৩

অবারিত ১২০

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে ১৬২

আকাশ-সিন্ধু মাঝে এক ঠাঁই ৬০

আগমন ১০৩

আছি আমি বিন্দুরূপে, হে অন্তরগামী ৩৮

আজ পুরবে প্রথম নয়ন মেলিতে ১৪৭

আজ বিকালে কোকিল ডাকে ১৫৮

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে ১৪৪

আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে ২৪

আজি কমলমুকুলদল খুলিল ২১৭

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে ৪৬

আজি দখিন দুয়ার খোলা ২০৩

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে ২৬০

আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমাদ্রি ৪২

আদি অন্ত হারিয়ে ফেলে ১২৬

আনিলাম অপরিচিতের নাম ২৭৯

আপনারে তুমি করিবে গোপন ১৩

আমরা যাব যেখানে কোনো ৩২৭

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই ২০৬

আমাদের এই পল্লিখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা ৬৯

আমায় অমনি খুশি করে রাখো ১১৯

আমার এ গান শুনবে তুমি যদি ১৬৬

আমার খোলা জানালাতে ৫৫

আমার গোধূলি-লগন এল বুঝি কাছে ১২৩

আমার ঘুর লেগেছে—তাধিন তাধিন ২২৯

আমার নাই বা হল পারে যাওয়া ১০১

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে ২০৯

আমার মাঝারে যে আছে ১৯

আমার সকল নিয়ে বসে আছি ২২৯

আমি এখন সময় করেছি ১৬৪

আমি কেবল তোমার দাসী ২৪৪

আমি কেমন করিয়া জানাব আমার ১৪১

আমি চঞ্চল হে ১৭

আমি তোমার প্রেমে হব সবার ২৪০

আমি বিকাব না কিছুতে আর ১৮৪

আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম ১৩০

আমি যারে ভালোবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে ৫১

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না ২৩৬

আমি শরৎশেষের মেঘের মতো ১২৫

আলট্রা কনসার্ভেটিভ ৫৮৭

আলোকে আসিয়া এরা লীলা করে যায় ৫৭

আলো নাই, দিন শেষ হল, ওরে ৬৫

আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা ... ২২৮

ইংরেজ ও ভারতবাসী ৩৭৯

ইংরেজের আতঙ্ক ৫৩৭

ইম্পীরিয়লিজ্‌ম ৪৩১

উৎসর্গ, খেয়া ৯৫

এ অন্ধকার ডুবাও তোমার ২৫১

এক রজনীর বরষনে শুধু ১০৮
এ কী রহস্য এ কী আনন্দরাশি ৩২৮
এ যে মোর আবরণ ১৯৭
ঐ তোমার ঐ বাঁশিখানি ১১৭
ওগো এমন সোনার মায়াখানি ১৭৭
ওগো তোরা বল্ তো, এরে ১২০
ওগো নিশীথে কখন এসেছিলে তুমি ১০৭
ওগো বর, ওগো বঁধু ১১২
ওগো মা, রাজার দুলাল গেল চলি মোর ১০২
ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ১০১
ওরা চলেছে দিঘির ধারে ৯৮
ওরে আমার কর্মহারা ৫২
ওরে পদ্মা, ওরে মোর রাক্ষসী প্রেয়সী ৮৬
কণ্ঠরোধ ৪২৪
কত দিবা কত বিভাবরী ৮২
কত ধৈর্য ধরি ৩৪২
কাল যবে সন্ধ্যাকালে বন্ধুসভাতলে ৮৪
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও ৩৭২
কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে ১১৯
কী কথা বলিব বলে ৮১
কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ ১৮
কুয়ার ধারে ১৩২
কৃপণ ১৩০
কৃষ্ণপক্ষে আধখানা চাঁদ ১৬৮
কেবল তব মুখের পানে ১০
কোকিল ১৫৮
কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি ১৭৪
কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে ২০১
ক্লান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে ৪২
খেয়া ১৮৬

খোলো খোলো দ্বার	...	...	১৯৬
গান শোনা	...	...	১৬৬
গোধূলিলগ্ন	.	...	১২৩
ঘাটে	...	...	১০১
ঘাটের পথ	...	...	৯৮
ঘুষাঘুষি	...	...	৬০৫
চাঞ্চল্য	...	...	১৭২
চিরকাল এ কী লীলা গো	...	...	৫৮
চুমিয়া যেয়ো তুমি	...	...	৩৩২
ছাদের উপরে বহিয়ো নীরবে	...	...	৩৩৪
জাগরণ	...	...	১৩৪
জাগরণ	...	...	১৬৮
জুড়াল রে দিনের দাহ	..	...	১৬০
ঝড়	...	..	১৬২
ঝরনা তোমার স্ফটিক জলের	...	..	৩১৫
টিকা	...	...	১৭৭
তখন আকাশতলে ঢেউ তুলেছে	...	...	১২৭
তখন ছিল যে গভীর রাত্রিবেলা	...	...	১৮৩
তখন রাত্রি আঁধার হল	...	...	১০৩
তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ	...	..	১৪৮
তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব	...	...	৩৭১
তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত	...	...	৪৩
তুমি এপার-ওপার কর কে গো	...	...	১৮৬
তুমি যত ভার দিয়েছ, সে ভার	...	...	১৪৫
তোমায় চিনি বলে আমি	...	...	১৪
তোমার কাছে চাই নি কিছু	...	...	১৩২
তোমার বীণায় কত তার কাছে	...	...	৩৩
তোমার বীণার সাথে আমি	...	...	১৪২
তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে	...	...	৩৪৬
তোমারে দিই নি সুখ	...	...	৩৩৬

তোমারে পাছে সহজে বুঝি ১২
তোরা কেউ পারবি নে গো ১৩৫
তোরা যে যা বলিস ভাই ২১৩
ত্যাগ ১০২
দাঁড়িয়ে আছ আধেক খোলা ১১৫
দাম ১১০
দিঘি ১৬০
দিনশেষ ১৫৬
দিনের শেষে ঘুমের দেশে ৯৭
দিয়েছ প্রশ্রয় মোরে, করুণানিলয় ৮৩
দুঃখমূর্তি ১০৬
দুখের বেশে এসেছ বলে ১০৬
দুয়ারে তোমার ভিড় করে যারা আছে ৩৫
দেখো চেয়ে গিরির শিরে ৪৮
দেশনায়ক ৪৮৭
দেশহিত ৬৩৯
দেশের কথা ৬১৯
ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে ৩৩
নব বৎসরে করিলাম পণ ৯০
না জানি কারে দেখিয়াছি ২২
নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয় ৮৫
নিরুদ্যম ১২৭
নিশ্বাস রুধে দু-চক্ষু মুদে ১৭২
নীড় ও আকাশ ১৫৩
নীড়ে বসে গেয়েছিলেম ১৫৩
পথ ও পাথেয় ৪৪৫
পথ চেয়ে তো কাটল নিশি ১৩৪
পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি ২৮৭
পথিক ১৩৯
পথিক, ওগো পথিক, যাবে তুমি ১৩৯

পথের নেশা আমায় লেগেছিল ১৫১
পথের পথিক করেছ আমায় ৬৪
পথের শেষ ১৫১
পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি ১৬
পাছে দেখি তুমি আস নি, তাই ১৭৬
পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে ২৩০
পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা ৩২৬
প্রচ্ছন্ন ১৭৪
প্রতীক্ষা ১৬৪
প্রভাতে ১০৮
প্রসঙ্গ-কথা ১--৫ ... ৫৪৯, ৫৫৫, ৫৬২, ৫৬৬, ৫৭২
প্রার্থনা ১৮৪
ফুল ফোটানো ১৩৫
বঙ্গবিভাগ ৬১৩
বন্দী ১৩৮
বন্দী, তোরে কে বেঁধেছে ১৩৮
বন্ধ হয়ে এল স্রোতের ধারা ১৫৭
বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা ৯৫
বর্ষাপ্রভাত ১৭৭
বর্ষাসন্ধ্যা ১৭৯
বসন্তে কি শুধু কেবল ২২২
বহুরাজকতা ৪৬২
বাঁশি ১১৭
বালিকা বধূ ১১২
বাহির হইতে দেখো না এমন করে ৩৬
বিকাশ ১৪৪
বিচ্ছেদ ১৪২
বিদায় ১৫০
বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই ১৫০
বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন ১৭১

বিরহ-বৎসর পরে মিলনের বীণা ৮৬
বিরহ মধুর হল আজি ২২৪
বিরোধমূলক আদর্শ ৫৯২
বৈশাখে ১৪৮
ব্যাধি ও প্রতিকার ৬২৩
ভয়েরে মোর আঘাত করো ২৩৮
ভাঙা অতিথিশালা ১৫৬
ভার ১৪৫
ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাস নিশ্বসে গগনে ৪৪
ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি ৪৫
ভেবেছিলাম চেয়ে নেব ১১০
ভোর হল বিভাবরী ২৬৩
ভোরের পাখি ডাকে কোথায় ৭
মন্ত্রে সে যে পূত ৬২
মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে ২২০
মিছে কথার বাঁধুনি ৪৮৮
মিলন ১৪১
মুক্তিপাশ ১০৭
মুখুজ্যে বনাম বাঁড়ুজ্যে ৫৭৬
মেঘ ১২৬
মোদের কিছু নাই রে নাই ২১৮
মোদের হারের দলে বসিয়ে দিলে ১৩৭
মোর কিছু ধন আছে সংসারে ১১
যজ্ঞভঙ্গ ৬৩৫
যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে, হে নারী ৪৭
যা ছিল কালো ধলো ২২৭
যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা ২০৫
রাজকুটুম্ব ৫৯৯
রাজনীতির দ্বিধা ৪০৪
রাজভক্তি ৪৩৫

রাজা ও প্রজা	...	...	৫৪২
রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি	...	...	৫৯৭
রে অচেনা, মোর মুষ্টি	...	...	৩০৫
রোগীর শিয়রে রাত্রে একা ছিনু জাগি	...	...	৮৪
লীলা	...	...	১২৫
শুভক্ষণ	...	...	১০১
শূন্য ছিল মন	...	...	৩৮
শেষ খেয়া	...	...	৯৭
সকালবেলায় ঘাটে যেদিন	...	...	১৫৪
সদুপায়	...	...	৫২২
সব ঠাঁই মোর ঘর আছে	...	...	২৬
"সব-পেয়েছি"র দেশ	...	...	১৮১
সব-পেয়েছির দেশে কারো	...	...	১৮১
সভাপতির অভিভাষণ	...	...	৪৯৬
সমস্যা	...	...	৪৬৮
সমাপ্তি	...	...	১৫৭
সমুদ্রে	...	...	১৫৪
সাঙ্গ হয়েছে রণ	...	...	৬৭
সার লেপেল গ্রিফিন	...	...	৫৩৫
সার্থক নৈরাশ্য	...	...	১৮৩
সীমা	...	...	১৪৪
সুন্দর তুমি চক্ষু ভরিয়া	...	...	৩৩৭
সুন্দরী তুমি শুকতারা	...	...	৩৩৯
সুবিচারের অধিকার	...	...	৪১৮
সেটুকু তোর অনেক আছে	...	...	১৪৪
সে তো সেদিনের কথা, বাক্যহীন যবে	...	...	৭৪
সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো	...	...	৬০
হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা	...	...	২৩
হার	...	...	১৩৭
হারাধন	...	...	১৭১

হে জনসমুদ্র, আমি ভাবিতেছি মনে … … ৮৭
হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত … … ৪১
হে পথিক কোন্‌খানে … … ৭৯
হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি … … ৩১
হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে … … ৮৮
হে রাজন্‌, তুমি আমারে … … ৩৪
হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার … ৪৩